বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা

(প্রাচীন যুগ থেকে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

প্রথম খণ্ড

কাবেদুল ইসলাম

ভারবি

১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৪০৫ / অক্টোবর ১৯৯৮

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২

উৎসর্গ

শেখ আবদুল কাদের
মোঃ মকবুল হোসেন
মোঃ আবদুর রব

—আমার বড়, মেজো ও
ছোট ভাইকে

মুখবন্ধ

দীর্ঘ মুখবন্ধ লেখার আমি বরাবরই বিরোধী। তার প্রথম কারণ, সাধারণত মুখবন্ধে যা বলা হয় তা মূল গ্রন্থেই থাকে, অতএব সেটা আমার কাছে যে কোনো বিচারেই পুনরুক্তি বৈ নয়। দ্বিতীয়ত, যেহেতু পুনঃকথন, ফলে তা লেখায় আমার রাজ্যির ক্লান্তি ও সমূহ বিরক্তি। তথাপি গতানুগতিকতা-চর্চার অজুহাতে এখানে দু-এক কথা বলবো।

১.১ বাংলাদেশের (শুধু বাংলাদেশেরই বা বলি কেন, মায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহত্তর অর্থে ভারতেরও) ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে এতো ব্যাপক বিশাল পরিসরে ইংরেজি বা বাংলা ভাষায় এ যাবৎ কোনো বই লেখা হয়েছে বলে আমার জানা নেই। সম্ভবত নব্য আর্য-ভারতীয় অন্য কোনো ভাষায়ও এর কোনো 'জোড়' পাওয়া যাবে না। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার প্রচেষ্টা এখন পর্যন্ত একক ও অনন্য হবে বলে দাবি করতে পারি।

১.২ মোট ৪-খণ্ডে সমগ্র গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা রয়েছে। এর প্রথম খণ্ড (বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা) ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, এবং একার্থে তা স্বয়ং সম্পূর্ণও বটে। এবার প্রকাশিত হলো বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ নবাব মিরকাশিমের যুগ পর্যন্ত)। বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ২য় খণ্ড (১৭৬৫ থেকে ১৯৪৭ অ., দিওয়ানি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে পুরো ব্রিটিশ শাসনকাল) অচিরেই প্রকাশের আশা রাখি। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখতে চাই যে এর শেষ খণ্ডে থাকবে দেশ-বিভাগ থেকে নিয়ে একেবারে হাল আমলের বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বশেষ স্থিতি, যার প্রধানতম আলোচনা কেন্দ্রীভূত হবে উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূমি সংস্কার। বলাবাহুল্য তখন সব মিলিয়ে সমগ্র গ্রন্থের কলেবর দাঁড়াবে আনুমানিক পৃষ্ঠায়, ১৪/১৫ শ', নিঃসন্দেহে বিশাল।

১.৩ একেবারেই কোনো গাইড বা নির্দেশক ছাড়াই আমিএ কাজে হাত দিয়েছি। স্বভাবত গ্রন্থ উপস্থাপনাগত বা একটি প্রকৃত গবেষণা গ্রন্থ প্রণয়নে যে সমুদয় বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করা জরুরি তার অনেক কিছুই আমি অনুসরণ করিনি। এ জন্য প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমি নিজেই দায়ী। তবে সেক্ষেত্রে আমার বলবার কথা এটাই যে,আমি মোটামুটি একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার আদিযুগ থেকে নিয়ে বর্তমান কালাবধি সমগ্র বিষয়টি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। এবং এ জন্যে যেখান থেকে, যতোটুকু সাহায্য গ্রহণ করা উচিত বা প্রয়োজন

বোধ করেছি, অকুণ্ঠচিত্তে, বলা যায় গো-গ্রাসে তা গ্রহণ করেছি। সত্যি বলতে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই আমি কীর্তিমান পূর্বসূরীদের ঋণ যথাস্থানে স্বীকার করেছি এবং কোথাও যদি সেটা না-করে থাকি, তবে তা আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল, অথবা হয়তো তেমন প্রয়োজন বোধ করিনি। তথাপি এ জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে আমি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী।

১.৪ গ্রন্থটি যাঁদেরকে উৎসর্গিত তাঁরা আমার নিতান্তই আপন জন। এ ব্যাপারে শুধু এটুকু বলাই যথার্থ হবে মরে করি, একজন লেখক হিশেবে তাঁদেরকে এর বেশি কিছু দেয়ার সামর্থ্য আমার সত্যিই নেই।

১.৫ প্রকাশনা কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধে বলতে গেলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, 'মাওলা ব্রাদার্স', বাংলাদেশের হাতে গোণা যে দু-চারটি প্রতিষ্ঠিত ও নামী, এবং রুচিশীল ও মানসম্মত বইয়ের প্রকাশক রয়েছে তাদের শীর্ষস্থানীয়দের মধ্যে তারা একটি। ফলে তাদের সম্বন্ধে বিশদ না বলে শুধু এটুকু বলতে পারি, তারা আমার 'বাংলাদেশের ভূমিব্যবস্থা' বইটি আগেই প্রকাশ করেছে, এবার এটি করলো। প্রকাশনার এই বিপুল খরচ স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নেয়ায় এর স্বত্বাধিকারী জনাব আহমেদ মাহমুদুল হক ভাইয়ের মহৎ চিন্তা ও গ্রন্থ নিবেদিত মনের দিগন্তআরেকবার উদ্ভাসিত হলো। এই সুযোগে আমি তাঁকে, ও প্রকাশনা ও কম্পিউটার কম্পোজ ইত্যাদি কাজের সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক মোবারকবাদ।

২.১ বলাবাহুল্য সেই '৯২ থেকে নিয়ে অর্থাৎ গত প্রায় ৮-বছর যাবৎ এই বিষয়টির ওপর আমি কাজ করছি এবং এখনও করছি; ফলে প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার পরিবারকে আমি যথাযথ সময় দিতে পারি না। সরকারি চাকুরির বাইরে পরিবারের প্রতি একজন স্বামী ও পিতা হিশেবে যে কর্তব্য পালন করা উচিত, সেটা করতে না-পারায় মানসিকভাবে সবসময়ই আমি পীড়িত। তবু সান্ত্বনা এটুকু যে;এই গ্রন্থ যখন প্রকাশিত হবে তখন হয়তো আমার স্ত্রী পারভিন ইসলাম শিমু, পুত্র সাজ্জাদুল ইসলাম পাভেল ও কন্যা ফারহানা ইসলাম অজন্তা–ওরা নিঃসন্দেহে যারপরনাই আনন্দিত হবে।

২.২ পরিশেষে গ্রন্থের ভাষা, বাক্য-গঠন, তথ্যগত ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ভুল ও মুদ্রণ প্রমাদের জন্য সহৃদয় সমাজের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি কামনা করছি।

কাবেদুল ইসলাম

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. নাজমুল করিম ভারতবর্ষের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে মোট চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন।[১] ড. করিমকৃত এই বিভক্তি নিম্নরূপ :—

ক. উত্তর ভারতীয় বা আর্য;

খ. দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণী;

গ. বঙ্গীয় (আমাদের আলোচ্য); এবং

ঘ. উপজাতীয় রাজস্ব ব্যবস্থা।

'ভূমি রাজস্বের মূল কথা এই যে, প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যে অংশীদারিত্বের অধিকার রয়েছে রাষ্ট্রের'।[২] বলাবাহুল্য বাংলাদেশের বিপুল জটিল ভূমি ব্যবস্থার মতো ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাও একটি সেকেলে, বহুস্তরী ও জটিল ব্যবস্থা। প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার যে চিত্র আমাদের সামনে বর্তমান, তাতে আধুনিক রাষ্ট্রের বাস্তবমুখী ও যুগোপযোগী চিন্তার ছাপ স্পষ্টতই অনুপস্থিত। প্রাচীন যুগ থেকে নিয়ে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের পদ্ধতি ও হারে এবং তার প্রয়োগ তথা এতদসংক্রান্ত আদায়ী প্রশাসনযন্ত্রের সময়ে সময়ে পরিবর্তন সাধিত হলেও তা সর্বদা যুগের চাহিদা মিটিয়ে চলতে পেরেছে—এরূপ দাবি করা কখনোই সমীচীন হবে না। এমন কি একেবারে হাল আমলে বাংলাদেশে বর্তমানে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার যে হাল-হকিকত আমরা দেখতে পাই, তাতে করে এটা স্বীকার করতে হবে যে, এই ব্যবস্থা শুধু জটিলই নয়, বরং রাজস্ব নিরূপণ ও আদায়করণে সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে নিম্নস্তরে ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা ও সুযোগের মূলে রয়েছে এর পদ্ধতিগত দুর্বলতা। তাছাড়া প্রাচীনকাল থেকে ইংরেজ শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত বাংলায় ভূমি-রাজস্ব ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধানতম আয়ের উৎস; কিন্তু ৭১ পরবর্তী বাংলাদেশে তা নিতান্তই একটি অবহেলিত ও অনালোকিত আয়সূত্র বলে বিবেচিত। এর মুখ্য কারণ অবশ্য রাষ্ট্রীয় অর্থায়নের ভিন্নতর উৎসসমূহ। অথচ অপর্যাপ্ত বিদেশি ঋণ ও বিশেষ করে প্রবাসীদের প্রেরিত বিপুল অর্থমুখ যখন ক্রমশ ছোট হয়ে আসবে (যা আসাটাই বরঞ্চ স্বাভাবিক) এবং এক পর্যায়ে তা প্রায় বন্ধের উপক্রম হবে, একমাত্র তখনই হয় তো সরকারি আয়ের এই প্রাচীন ও চিরন্তন উৎসটিতে হাত পড়বে সংশ্লিষ্টদের। তবে রাষ্ট্রযন্ত্রের

১ ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো, ড. লেনিন আজাদ, পৃষ্ঠা ৬৫ থেকে সংগৃহীত।

২ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. এম এ রহিম, পৃষ্ঠা ৯৮।

নীতিনির্ধারকগণ ভবিষ্যতে যখন এখানে হাত দেবেন বা দৃষ্টি ফেরাবেন তখন আর রাজস্ব ব্যবস্থার বাস্তবমুখীন ও যুগ-চাহিদা-অনুকূল সংস্কার সাধন সম্ভবপর না-ও হতে পারে। বাহ্যত ভূমি-রাজস্ব প্রদাতাগণ ততোদিনে দীর্ঘকালের অনভ্যস্ততার কারণে মানসিকভাবে ভূমি-রাজস্ব প্রদানে অনাগ্রহী হয়ে পড়বে। কেননা সবদেশে এবং সবকালে ভূমিতে রাজস্বত্ব তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানার প্রাধিকারের ভিত্তিস্বরূপ ভূমি রাজস্বের যে ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং আছে, সেই ধারণাটাই বর্তমানে এদেশে ক্রম-লুপ্তির পথে, যা একটি দেশের অর্থনীতির জন্য কোন অবস্থাতেই সুখকর নয়। যা হোক, এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ রয়েছে বিধায় এখন আমরা প্রাচীন বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে তার আগে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করতে চাই।

আগেই বলেছি ভূমি-রাজস্ব হল ভূমির ওপর রাজস্বত্বের স্বীকৃতি। এককভাবে এবং মৌলত যে কোন ভূমি বা তৎসংলগ্ন বিষয়াদির ওপর রাজস্ব বা কর আরোপের এটি হচ্ছে প্রথম ও প্রধান যুক্তি। প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি রাজা তথা রাষ্ট্রই যে ভূমির মূল স্বত্বাধিকারী বা উপরিস্থ মালিক (এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন এই লেখকের 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা')—এই স্বত্ব বিঘোষণা এবং সর্বসাধারণে বিশেষত ভূম্যধিকারী প্রজার মনে এই ধারণা সর্বদা প্রোথিত রাখার প্রয়োজনে সবযুগেই ভূমিতে রাজস্ব আরোপ সঙ্গত ও বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয়ত আমরা জানি যে, 'Sound finances are absolutely necessary for a stable and prosperous state.'[৩] ব্যক্তি জীবনে যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের প্রয়োজন তেমনি রাষ্ট্রের জীবনপ্রবাহও সদাসচল রাখার জন্যে একটি ধনৈশ্বর্যপূর্ণ কোষাগার একান্ত জরুরি। কোষ বা কোষাগারকে তাই বলা হয়ে থাকে 'the pillars of the state finance and source of effective administration.'[৪] ড. কামরুন্নেসা ইসলামও ঠিক একই কথা বলেছেন, 'The treasury is the repository of the physical wealth of a country.'[৫] প্রাচীন ভারতে তথা বাংলায় এটিকে রাষ্ট্রের সপ্তম উপাদানের অন্যতম উপাদান হিশেবে গণ্য করা হত[৬] এবং কখনো কখনো প্রতিরক্ষা বিভাগের (army) ওপর একে স্থান দেয়া হত।[৭] প্রসঙ্গত 'মহাভারত'-এর শান্তিপর্বের একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যায় যেখানে বলা হয়েছে—'the treasury and the army are the roots of kings; the treasury again is the root of the army.'[৮] বলাবাহুল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার পূর্ণ করার সবচেয়ে সহজতম পন্থা হল জনসাধারণের বৃত্তি ও বিত্তের ওপর নানা ধরনের করারোপ (Taxation),

৩ State and Government in Ancient India, Dr A S Altekar, pp. 262.

৪ Agrarian and Fiscal Economy in the Mauryan and Post-Mauryan Age (324 BC – 320AD), Dr Narendra Nath Kher, pp. 243.

৫ Aspects of Economic History of Bengal (C 400-1200 AD), Dr Kamrunnesa Islam, pp. 158.

৬ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 242 & Aspects, pp. 158.

৭ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 242.

৮ Quoted from 'Aspects', pp. 158

বিশেষত ভূমি বা তৎসংলগ্ন বিষয়াদির ওপর কর। যেহেতু 'in a country like India, where the land is almost the only source of income to the majority of the inhabitants', সেহেতু 'the State has always been dependent for the major part of its income from land.'[৯] অতীতকাল থেকেই 'All Governments in India have considered themselves entitled to a share of the produce, and this share of the produce, whether collected direct, or through farmers of revenue, or through subordinates or intermediate landlords, is called "land revenue".'[১০] ভূমির ওপর আরোপিত কর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে অভিহিত হলেও আমরা মনে করি ভূমি রাজস্বই এর যথোপযুক্ত অভিধা।[১১]

তৃতীয়ত জনসাধারণের বিত্তের (এ ক্ষেত্রে ভূমি) ওপর রাষ্ট্রকর্তৃক করারোপের পিছনে আর যে কারণটি বিশেষ উল্লেখ্য, তা 'Taxation was theoretically justified as a return for the protection granted by the king.'[১২] এখানে 'The term protection refers to protection of his people from external and internal troubles and security of their person and property.'[১৩] এ যেন রাষ্ট্র ও তার জনসাধারণের মধ্যে বিরাজমান এক ধরনের সামাজিক চুক্তি—'Taxation in lieu of protection sounds like a conception of 'social contract'.'[১৪] বলাবাহুল্য, 'In this contractual relationship, rights and obligations were to be fulfilled by both sides i.e. the king and his subjects.'[১৫] আদিম যুগের যে স্তরে মানুষ যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে ক্রমশ সমাজে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে এবং সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা রক্ষা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আগ্রাসন এবং যূথবদ্ধ জীবনে নিজেদের মধ্যেকার প্রাত্যহিক বিরোধ-বিসংবাদ মীমাংসা কল্পে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে, সেই স্তরেই ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্র গড়ে ওঠে। রাষ্ট্রের শীর্ষে থাকে রাজা ও রাজপরিবার এবং একটি অবিকল্প প্রশাসনযন্ত্র ও সৈন্যবিভাগ; মূলত এ সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণ ও

---

৯ Report of the Land Revenue Commission : Bengal, Vol. I., pp. 5.

১০ Ibid., pp. 5-6.

১১ এ বিষয়ে প্রথমেই মেধাতিথির কথা বলতে হয় যিনি 'মনু সংহিতা'-র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বালিপ্রভৃতি রাজগ্রাহ্য-করনামনি দেশভেদে সুপমনভকভত প্রসিদ্ধানি' অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে রাজস্ব তথা রাষ্ট্রীয় প্রাপ্য বিভিন্ন নামে পরিচিত। প্রাচীনকালে বাংলায় ভূমি-রাজস্ব বালি, ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উদকভাগ, উদরঙ্গ, উপরি-কর ইত্যাদি নামে অভিহিত হত। উল্লেখ্য, অধুনা বাংলাদেশে ভূমি-রাজস্ব 'ভূমি উন্নয়ন কর' নামে পরিচিত। যদিও আমাদের বিবেচনায় এই নামকরণ যথাযথ নয়। কেননা প্রথমত 'কর' শব্দ রাজস্ব শব্দের মূলানুগ নয় বলে আমি এক্ষেত্রে মনে করি। রাজস্ব শব্দে রাজা বা রাষ্ট্রের যে সার্বভৌম স্বত্বের অবস্থিতি ও দ্যোতনা রয়েছে, এতে তা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রীয়ভাবে ভূমি-রাজস্বকে 'ভূমি উন্নয়ন কর' নামে অভিহিত করা হলেও মূলত যে কারণে রাষ্ট্র ভূমিতে কর-আরোপ করে, সেটা উন্নয়নের সঙ্গে আদৌ সম্পর্কিত নয়। বরং সত্যি কথা বলতে প্রচলিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ভূমির প্রকৃতিগত বা অন্যবিধ কোন উন্নয়নই করে না। ফলত ভূমি-রাজস্বের 'ভূমি উন্নয়ন কর' অভিধা তাই অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর।

১২ Cultural History of Ancient India, Dr P S Joshi, pp. 124.

১৩ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 248.

১৪ Ibid., pp. 249.

১৫ Ibid., pp. 249.

প্রতিপালনের জন্যে দরকার হয় অর্থের। সঙ্গত কারণেই রাষ্ট্র এই অর্থ সংকুলান দাবি করে, যা এক পর্যায়ে জনসাধারণের বৃত্তি ও বিত্তের ওপর বিশেষ করে ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আদায়ের মধ্য দিয়ে পূরণ হয়। 'The rulers, Rajas, and emperors of the successive governments in all parts of India, have at all times raised the greater part of their state income, by levying a charge on the land. ... it came to be an universally-acknowledged principle, that the king, Raja, or chief of a territory, had a right to a SHARE IN THE PRODUCE OF ALL CULTIVATED LAND.'[১৬]

তবে এক্ষেত্রে ব্যাডেন-পাওয়েল একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'Whether this was an Aryan institution, or was learned from the Dravidians, or was a natural method, adopted independently, I leave the reader to form the opinion which best satisfies him.'[১৭] বস্তুত ঠিক কবে থেকে রাষ্ট্রকর্তৃক এই রাজস্ব বা করারোপ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল, সে কথা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

যা হোক যে সমস্ত কারণে রাষ্ট্রকর্তৃক জনসাধারণের বৃত্তি ও বিত্তের ওপর করারোপ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল তার স্বপক্ষে যত সদ্‌যুক্তিই থাকুক না কেন, সবকালেই এর কতকগুলি বস্তুনিষ্ঠ নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়, যা অতীতকালেও ছিল এবং বর্তমানেও আছে, যদিও মাঝে মাঝে রাষ্ট্রের অতিবিশেষ প্রয়োজনে (দুর্যোগ, বহিঃশত্রুর আক্রমণ, প্রশাসনযন্ত্রের অতিরিক্ত ব্যয় ইত্যাদি) এবং কখনো কখনো স্বৈর বা প্রজা নিপীড়ক রাজা বা শাসকের অনৈতিক ও অকল্যাণকামী রাজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে বজায় থাকেনি। মূলত তিনটি প্রধান সূত্রের ওপর এই নীতিমালা প্রতিষ্ঠিত, যা নীচে উদ্ধৃত হল :

এক. 'The taxation (is) to be reasonable and equitable'.[১৮] অন্যভাবে বললে বলা যায়, 'that taxation should not destroy the substance of the people, but should leave ample margin for their subsistence.'[১৯] 'The criterion of equitable taxation (is) that the state on the one side and the agriculturist.. on the other side should both feel that they have got a fair and reasonable return for their labours.'[২০]

দুই. 'the taxes should be levied by slow, almost imperceptible, degrees and not all in a lump'.[২১] শুধু তাই নয়, 'If increase in taxation becomes inevitable, it should be gradual and not sudden and steep.'[২২]

১৬ Land Systems of British India, Vol. I., Baden-Powell, pp. 241-2.
১৭ Ibid., pp. 241.
১৮ State and Government in Ancient India, pp. 265.
১৯ Contributions to the History of the Hindu Revenue System. Dr U N Ghoshal, pp. 30.
২০ State and Government in Ancient India, pp. 266.
২১ Hindu Revenue System, pp. 30.
২২ State and Government in Ancient India, pp. 266.

তিন. 'it should be levied at the time and place most suited for the subjects.'[২৩]

উপরিউক্ত নীতিমালার মৌল সূত্রের অতিরিক্ত যে বিষয়টি এখানে আরও প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি, তা 'Extra taxation (is) to be imposed only in times of national calamity after taking comprehensive steps to explain the situation to the people with a view to ensure a willing response.'[২৪] অবশ্য স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া, এ ক্ষেত্রে কখনই আশা করা যায় না।

(২)

ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা বলতে প্রধানত দু'টি বিষয়কে বুঝায়। এক. ভূমি ব্যবস্থা ও রাজস্ব সংগ্রহ পদ্ধতি, এবং দুই. এর সাধারণ অফিস ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন অর্থাৎ প্রশাসনিক দিক।[২৫]

আমাদের মূল আলোচনায় ভূমি ব্যবস্থা ব্যতীত (এ জন্যে লেখকের 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা' দ্রষ্টব্য) অন্যান্য বিষয়াবলি আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব। সেক্ষেত্রে আমাদের যুগ বিভাগ হবে—(ক) প্রাচীন, (খ) মধ্য ও (গ) আধুনিক যুগ। অন্যদিকে সার্বিক ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বলতে যা বুঝায় সেটাও অর্থাৎ মোট তিনটি বিষয় হবে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। যথা :

এক. ভূমি-রাজস্ব (Land Revenue) ;
দুই. ভূমি বন্দোবস্ত (Land Settlement) ও
তিন. ভূমি সংস্কার (Land Reforms).

২৩ Hindu Revenue System, pp. 30.
২৪ State and Government in Ancient India, pp. 266.
২৫ বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো (১৭৫৭-১৮৫৭), ড. সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৮৯.

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ)

আর্যদের ভারতে আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলা ছিল সভ্য জনপদ।[১] উত্তর ভারতের অঞ্চল বিশেষের মতই প্রাচীন বাংলার গ্রামসমাজ 'had reached a very high degree of development.'[২] উল্লেখ্য 'আর্যপূর্ব জাতিগুলির মাধ্যমে বাঙলায় যে গ্রাম সভ্যতার পত্তন হয়েছিল-তার চরিত্রটি ছিল একান্তভাবেই ট্রাইবাল।'[৩] পরবর্তীকালে আগন্তুক জাতির তথা আর্য প্রভাবে এই সভ্যতা ক্রমশ তার 'ট্রাইবাল' রূপ পরিহার করে অপেক্ষাকৃত উঁচু সংস্কৃতিতে বদলে যায়। গড়ে ওঠে আদি কৌম-সমাজের স্থলে উন্নতমানের কৃষিনির্ভর সমাজ-কাঠামো। যদিও এই সময় বিভিন্ন অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসক বা স্থানীয় প্রধানগণ কর্তৃক শাসিত হত এবং জনসাধারণের কাছ থেকে তারা কিছু কিছু ভূমি-রাজস্বও আদায় করত, তথাপি এটা আজ ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত যে, সেই প্রাচীনকালেই সমগ্র বাংলাদেশের প্রধান প্রধান অঞ্চলসমূহ কয়েকটি বিশিষ্ট নামে অভিহিত হত। যেমন-গৌড়, পুণ্ড্র, বরেন্দ্রী, রাঢ় (উত্তর ও দক্ষিণ), সমতট, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বঙ্গাল প্রভৃতি। এই সমস্ত আঞ্চলিক রাষ্ট্রনায়কগণ তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মোটামুটি একটি রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। অবশ্য প্রথম দিকে রাষ্ট্র যখন ততোটা সুসংবদ্ধ হয়নি এবং রাষ্ট্রের দৈনন্দিন ব্যয়ও ছিল সীমিত, তখন জনসাধারণের ওপর.রাজস্ব ছিল ঐচ্ছিক ও অনিয়মিত অর্থাৎ রাজার ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তিই ছিল রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস—'In the earliest period, the king's power was not well established and the taxation seems to have been occasional and voluntary, the king probably supporting himself, his retinue and meagre administrative staff out of the proceeds of his own lands, pastures and herds.'[৪] এই আঞ্চলিক রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা মৌর্য-গুপ্ত যুগে আরও সংহত, আরও পরিণত এবং বিস্তৃত রূপ লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থায় নিম্নস্তরে গ্রাম প্রধান (Headman of a Village) থেকে শুরু করে উর্ধ্বে জেলা পর্যায়ে 'স্থানিক' বা জেলার প্রধান রাজস্বাধিকারী (Collector

১ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, ড. তাপস বসু, পৃষ্ঠা ৬; বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৪; আবুল কালাম শামসুদ্দীন রচনাবলী, প্রথম খণ্ড মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৭১; বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা, প্রথম অধ্যায়।

২ The Report, pp. 7

৩ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১১

৪ State and Government in Ancient India, pp. 262

of a District), প্রদেশে 'সমাহর্তা' (Collector-General) ছিলেন প্রশাসনিক প্রধান এবং সর্বশীর্ষে চূড়ান্ত দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিশেবে ছিল রাজা বা সম্রাটের অবস্থান।

রাজা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষা করতেন এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ বা আগ্রাসন থেকে জনসাধারণকে মুক্ত ও নিশ্চিন্ত রাখতেন; স্বভাবতই রাজার এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে প্রয়োজন হত একটি স্থায়ী প্রশাসনযন্ত্র ও অনুগত সৈন্যসামন্ত। এদের ভরণপোষণে প্রয়োজন হত বিপুল অর্থের। বস্তুত এই অর্থেরই যোগান দিত জনসাধারণ–কখনো 'কর' হিশেবে, কখনো 'চাঁদা', আবার কখনো ভূমি-রাজস্বস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল। তবে যেহেতু 'The soil was the principal source of revenue in all civilised countries in ancient times'[৫] সুতরাং আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা দেখতে পাবো, আবহমান বাংলায় প্রধানত ভূমিকে কেন্দ্র করেই রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন পরিচালিত হয়েছিল।

প্রাচীন বাংলায় জনসংখ্যার তুলনায় ভূমি ছিল অপর্যাপ্ত, জীবিকার্জন সুগম, মানবচাহিদা অপ্রতুল এবং সর্বোপরি জনসাধারণ ছিল শান্তিপ্রিয়। মূলত নিজেদের স্বার্থেই তারা রাষ্ট্রকে ভূমি রাজস্ব দিতে তত কার্পণ্য করত না। অবশ্য পরবর্তীকালে বিশেষ করে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে রাষ্ট্রের উত্তরোত্তর চাপবৃদ্ধি ও সমকালীন বিদগ্ধ ও ঋষিজনদের মত ও রচনা তাদেরকে ভূমি-রাজস্ব প্রদানে বাধ্য রেখেছিল, তা বলা যায়। 'The law-books and the Epics make a serious attempt to explain why the king was entitled to tax the people.'[৬] এই সকল মনীষীগণ শুধু জনসাধারণের ওপর রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমি-রাজস্ব ধার্যের পক্ষেই ওকালতি করেননি, উপরন্তু প্রদেয় রাজস্বের পরিমাণ কি বা কত হবে, তাও নির্দেশ করেছেন। এতদসহ ভূমি-রাজস্বের পরিবর্তে রাষ্ট্রের দায়িত্ব-কর্তব্যও তাঁরা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

মনু[৭], যাজ্ঞবল্ক্য[৮], বিষ্ণু[৯], গৌতম[১০], নারদ[১১] প্রভৃতি মনীষীর মতে রাজা যেহেতু তাঁর প্রজাদের বিদেশি আক্রমণ থেকে রক্ষা ও প্রতিপালন করেন, সেহেতু ভূমি-রাজস্ব বা অন্যবিধ করসমূহ তাঁর প্রাপ্য। বশিষ্ঠ[১২] মনে করেন রাজার শাসন ক্ষমতা তাঁর রাজস্বাধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত। অপর মতে মর্ত্যে রাজা হলেন স্বর্গের প্রতিভূ, সুতরাং জনসাধারণ কর্তৃক তাঁকে রাজস্ব প্রদানের অর্থ এক ধরনের 'ভেট' বা উপঢৌকন প্রদান। রাজ্যশাসনের নামে রাজা প্রজাদের দেখভালের জন্য যে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করেন, প্রজাকর্তৃক রাজস্ব প্রদানই তার উপযুক্ত প্রতিদান। শেষোক্ত এই ধারণা আমরা দেখতে

৫ Famines and Land Assessments in India, R. C. Dutt, pp..
৬ Aspects, pp. 159.
৭ মনুস্মৃতি, ৭ম ১৪৪, ৮ম ৩০৭-৮, ৯ম ২৫৩-৪
৮ যাজ্ঞবল্ক্য, ১ম ৩৩৪-৩৭, ৩৪১-৪৩
৯ বিষ্ণুস্মৃতি, ৩য় ১
১০ গৌতম, ১০ম ২৪-৮
১১ নারদস্মৃতি, ১৮শ ৪৮
১২ ১ম ৪২

পাই মেধাতিথি[১৩], গোবিন্দ[১৪], কুল্লুক ভট্ট[১৫], শুক্রনীতি,[১৬], বৌধায়ন[১৭], আপস্তম্ব[১৮], বৃহস্পতি[১৯] প্রমুখের রচনায়। উল্লেখ্য, কৌটিল্যের সুবিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র', পালি ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ, রামায়ণ-মহাভারত, কালিদাসের লেখনীসহ এই যুগের লিখিত নানা গ্রন্থে আমরা রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমিতে রাজস্ব ধার্যের স্বপক্ষে বক্তব্য খুঁজে পাই। এক্ষণে উপরিউক্ত মনীষীদের রচনা ও তৎকালীন বিরাজমান বাস্তবতার ভিত্তিতে আমরা এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, প্রাচীনযুগে মূলত 'the tax was a price for protection rendered by the king and may, therefore, be regarded as his wage (vetanam).'[২০]

আগেই বলেছি এ যুগের লেখকগণ শুধু রাজার রাজস্ব ধার্যের অধিকারই স্বীকার করেননি, উপরন্তু তাঁরা তার (রাজার) কর্তব্যকর্মও নির্দেশ করতে পিছপা হননি। রাজা নির্ধারিত রাজস্ব নেবেন অথচ জনসাধারণের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অনীহ্ বা উদাসীন হবেন, এটা তাঁরা রাজার জন্যে এক ধরনের গর্হিতকর্ম, ফলত পাপ হিশেবে বিবেচনা করেছেন। মনু বলেন, 'the king who receives land revenue, duties, fine etc., but fails to protect his people takes upon himself all the foulness of his whole people and makes his way to hell clear.'[২১] রামায়ণের একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, 'the king who receives one-sixth of people's income, but fails to give protection in return thereof incurs a great sin.' সত্যি বলতে রাজস্ব-গ্রহণকারী কিন্তু প্রজাসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় অপারগ এই সব রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হতে তাঁরা রাজস্বদাতাদের পরামর্শ দিয়েছেন। অতএব সার্বিক বিচারে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন যুগ থেকে রাজস্ব হিশেবে ভূমির উৎপন্ন শস্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণের ওপর রাজা তথা রাষ্ট্রের ছিল একচ্ছত্র অধিকার, যদিও এই অধিকার ছিল শর্তযুক্ত।

এবার আমরা পূর্ববর্ণিত উৎসগুলি বিশেষ করে কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', মনু প্রভৃতির রচনা ও এ যাবৎ প্রাপ্ত ও আবিষ্কৃত তাম্র-অনুশাসনগুলির ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করবো। মৌর্য যুগেই মূলত ভারতে তথা বাংলায় ব্যাপকভাবে গৃহীত ও অনুসৃত ভূমি-রাজস্ব ইতিহাসের শুরু। যদিও এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে, যে, মৌর্য যুগীয় তথা ভারতবর্ষীয় ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থাকে কেন আমরা প্রাচীন বাংলার ওপর চাপিয়ে দেবো? অন্য কথায় প্রাচীন ভারতের রাজস্ব-ইতিহাসকে কেন প্রাচীন বাংলার রাজস্ব ইতিহাস-হিশেবে গণ্য করবো বা তার আলোকে কোন সিদ্ধান্ত নেবো? মূলত এর দু'টি

১৩ মনু, ৭ম ১২৯, ১০ম ১১৯
১৪ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 250
১৫ Ibid., pp. 250
১৬ শুক্র, ১ম ৩৭৫
১৭ বৌধায়ন, প্রশ্ন ১, অধ্যায় ১০, ১৮-১
১৮ আপস্তম্ব, প্রশ্ন ২, ১০-২৬-৯
১৯ History and Incidents of Occupancy Right, Dr R.R.Mookerjee, pp. 4
২০ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 252
২১ Quoted from 'Economic History of Mithila', Dr. Md. Aquique, pp. 55

কারণ বা উত্তর। এক. প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন স্বতন্ত্র ভূখণ্ডে ও রাজ্যে মানচিত্রে বিরাজমান থাকলেও নানা সময়ে এর শাসনব্যবস্থা তথা রাজনীতি. অর্থনীতিসহ সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হত বাংলার ভূ-সীমাবহির্ভূত ভারতের অপরাপর অঞ্চল থেকে, যেমন অযোধ্যা, দিল্লি, মগধ প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো এই অঞ্চলের রাজাদের কর্তৃত্বও বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যত্র পর্যন্ত বিস্তৃত হত। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন ভারতের সঙ্গে প্রাচীন বাংলার বরাবরই একটা যোগসূত্র ছিল। এটি শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তার চেয়েও বেশি সত্য বৈদেশিক বাণিজ্য ও লেনদেনের ক্ষেত্রে। দুই. প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ করে রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম নীতির লিখিত তথ্যের অভাব। যে কারণে বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট মন্তব্য করেছেন, প্রাচীন (বাংলার) হিন্দু যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সভ্যতার আবিষ্কৃত তথ্য থেকে সংগ্রহ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।[২২] যেহেতু দেশটি বাংলার বাইরে থেকে শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হত, সেহেতু সঙ্গত কারণেই এটা ধরে নেয়া যায়–বাংলার বাইরে বিশেষত মগধ প্রভৃতির ভূমি-রাজস্ব বিষয়ক বিধিবিধানও এখানে অনুসৃত হয়েছিল এবং তারই অনুরূপ রাজস্ব প্রশাসন এখানে কার্যকরী ছিল। এই যুগের বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী কৌটিল্য প্রণীত 'অর্থশাস্ত্রে' মৌর্যদের প্রবর্তিত রাজস্ব-নীতির বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

যা হোক এ কথা অনস্বীকার্য যে, 'For a systematic and comprehensive account of revenue and expenditure pattern in ancient India, the study of Arthasastra is obviously necessary.'[২৩] অর্থশাস্ত্রে 'সমাহর্তা'কে[২৪] রাষ্ট্রীয় আয়ের অর্থাৎ 'ধনোৎপত্তিসম্বন্ধে' যে সাতটি বিষয়ের ('আয়শরীর' নামে অভিহিত) প্রতি সর্বদা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে বলা হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ :

ক. দুর্গ,
খ. রাষ্ট্র,
গ. খনি,
ঘ, সেতু,
ঙ. বন.
চ. ব্রজ ও
ছ. বণিকপথ।

কৌটিল্য এই সাতটি বিষয়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি তালিকা (প্রায় ৬৭টি) দিয়েছেন। এর মধ্যে আবার সাতটিকে তিনি 'আয়ের মুখ' বা প্রধান স্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। এগুলি নীচে উদ্ধৃত হল :

'ক. মূল (ধান্যফলাদির বিক্রয়লব্ধ ধন),

২২ দেখুন, 'বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস', ড. আবদুল্লাহ ফারুক, পৃষ্ঠা ৮৯
২৩ Economic Organisation in Ancient India (200 BC-200 AD), Dr. Shyamsunder Nigam, pp. 275-6
২৪ 'উৎপন্ন আয়ের সমাহরণকারী প্রধান রাজপুরুষ'।

খ. ভাগ (ধান্যাদির ষড়ভাগ),
গ. ব্যাজী (পুনরায় দ্রব্য মাপিলে কম না হয় তজ্জন্য যে বিংশতিভাগ বেশি আদায় করা হয়),
ঘ. পরিঘ (খেয়া ও অন্যান্য ভাড়া),
ঙ. ক্লৃপ্ত (নির্দিষ্ট কর),
চ. রূপিক (লবণাধ্যক্ষ দ্বারা লবণ বিক্রয় হইতে আটভাগ গ্রহণ) ও
ছ. অত্যয় (ধর্ম্মস্থায়ী ও কণ্টক শোধনাদি প্রকরণে বর্ণিত দণ্ডের বা জরিমানার ধন)।'

উল্লেখ্য, 'আয়শরীরের' রাষ্ট্র ভাগে বর্ণিত ১৩টি ক্ষেত্রের মধ্যে সরাসরি ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে জড়িত ছিল চারটি— (১) সীতা (২) ভাগ (৩) বালি ও (৪) কর। এছাড়া তৎকালীন ভূমি রাজস্ব আয়ের আরও যে তালিকা পাওয়া যায় তা হল[২৫] :

ক. পিণ্ডকর,
খ. সদ্‌ভাগ,
গ. সেনাভক্ত,
ঘ. উৎসঙ্গ,
ঙ. পার্শ্ব,
চ. পারিণিক,
ছ. ঔপায়নিক,
জ. কৌস্থেয়ক,
ঝ. সিংহনিকা,
ঞ. অন্যায়জাত ও
ট. উপস্থান।

এখানে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ মধ্যযুগের পূর্বপর্যন্ত সময়ের যে সমস্ত তাম্র অনুশাসন এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রাচীন বাংলার ভূমি-রাজস্বের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাতে মূলত কৌটিল্য নির্দেশিত খাতসমূহেরই প্রাধান্য লক্ষণীয়। ড. কামরুন্নেসা ইসলাম আবিষ্কৃত অনুশাসনগুলির ভিত্তিতে এ যুগের রাষ্ট্রীয় আয়ের মুখ্য খাত হিশেবে তিনটি বিষয়কে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'if we carefully study the land grants..., and examine the exemptions from taxes and dues that went with them, becomes evident that the principal sources of income to the State were three — (a) the king's share of the produce of the land, (b) tolls and customs duties, and (c) fines and forfeitures levied from wrongdoers.'[২৬] তবে সুনিশ্চিত করে বলতে গেলে বলা উচিত মূলত অষ্টম শতক ও তৎপরবর্তী কালের যে সব তাম্র-অনুশাসন এ পর্যন্ত পাওয়া গেছে, সেগুলিতেই ভূমি-রাজস্ববিষয়ক আমাদের আলোচ্য সূত্রসমূহ সর্বাপেক্ষা প্রোক্তভাবে উৎকীর্ণ বা লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা এক-এক করে এখন আলোচনা করা হল।

২৫ Quoted from The Hindu Revenue System, pp. 39.
২৬ Aspects, pp. 163.

ভাগ

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়, ভূমি-রাজস্বের দ্যোতক হিশেবে প্রাচীন বাংলার কোন কোন তাম্রশাসনে 'ভাগভোগকরহিরণ্য', 'ভাগভোগকর' ইত্যাদি শব্দবন্ধ একত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেহেতু 'these terms though known to ancient literature and law-books, are recorded in most inscriptions in a conventional manner and their meaning might have varied to a considerable extent in different regions of Bengal at different periods of its history',[২৭] সুতরাং এগুলির ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষেত্রেও আলোচ্যযুগের মনীষীগণ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এঁদের মতের ওপর ভিত্তি করে আবার আধুনিককালের ঐতিহাসিক-লেখকগণ নানারকম সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন তা বলাইবাহুল্য। ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল[২৮] , কীলহর্ণ[২৯] প্রমুখ একে একটি শব্দরূপে গণ্য করেছেন এবং এর অর্থ নির্দেশ করেছেন উৎপন্ন শস্যে রাজার স্বাভাবিক অংশীদারিত্ব। অপরদিকে ড. এ এস আলতেকর-এর মতে উপরিউক্ত শব্দবন্ধে মূলত দুটি অর্থযোগ বিদ্যমান। এক. 'ভাগকর'—যার অর্থ ভূমি-রাজস্ব, এবং দুই. 'ভোগকর'—তাত্ত্বিকভাবে যার দ্বারা বুঝাত রাজাকে দ্রব্যাকারে প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের ছোটখাট প্রাত্যহিক কর; তবে বাস্তবে এই জাতীয় দ্রব্যাদি কর হিশেবে প্রদান করা হত স্থানীয় রাজ-কর্মচারীকে।[৩০] ফ্লীট 'ভাগভোগ'কে একটি শব্দরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এর দ্বারা বুঝিয়েছেন কর-ভোগ-কে ('Enjoyment of Taxes')। আক্ষরিকার্থে এখানে 'Enjoyment of Taxes' হচ্ছে 'Enjoyment of Shares'। এক দিক থেকে বিচার করলে ফ্লিটের উপর্যুক্ত বক্তব্য সঠিক। 'His interpretation might be correct with regard to some of the references, where the right and privileges accompanying the village granted are enumerated.' কিন্তু 'it would certainly not suit cases where it is mentioned along with other specific dues and objects which the cultivators residing in the village are ordered to bring to the donee.'[৩১] উদাহরণ হিশেবে আমরা এখানে প্রথম মহিপালের বনগড় তাম্রানুশাসন ও মদনপালের মনহলি দানবিষয়ক শাসনের কথা বলতে পারি। উল্লেখ্য চন্দ্র, বর্মণ ও সেন শাসনামলীয় কোন কোন অনুশাসনে পর্যালোচ্য করের ক্ষেত্রে 'ভাগ' শব্দের অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। খালিমপুর ও মুঙ্গের অনুশাসনে প্রচলিত 'ভাগভোগ' শব্দের পরিবর্তে 'কর' শব্দের প্রতিস্থাপন লক্ষণীয়। এ থেকে ধারণা করা অসমীচীন নয় যে, 'all the above mentioned royal grants must have carried with them exemptions from

২৭ Ibid., pp. 168

২৮ 'the bhaga may be rightly taken to be the king's customary share of the produce levied on the ordinary revenue-paying lands'.—The Hindu Revenue System, pp. 45

২৯ Epigraphia Indica. Vol. VII., pp. 160.

৩০ Rastrakutas and Their Times, pp. 214-16.

৩১ Aspects, pp. 168.

the king's share in grain and other things as well.'[৩২] বস্তুত 'From this we may deduce that perhaps in this period bhagabhoga did not always mean 'enjoyment of shares.'[৩৩]

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বিভিন্ন স্মৃতিকারদের রচনা বা বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থাদিতে 'ভাগভোগকর' বা 'ভাগভোগকরহিরণ্য' প্রভৃতির যৌগিক অবস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং কতিপয় তাম্রফলকে উল্লিখিত শব্দত্রয় বা শব্দ-চতুষ্টয়-এর উপস্থিতি সত্ত্বেও আমরা এগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ও তাৎপর্যে বিশ্লেষণ করার পক্ষপাতী।

'ভাগ'-এর আভিধানিক অর্থ 'অংশ' বা 'অংশীদারিত্ব' ; কিন্তু প্রাচীনকালের প্রচলিত রাজস্ব অর্থনীতিতে এর অর্থ ছিল উৎপন্ন ফসলে রাজা বা রাষ্ট্রের অধিকার। ড. মুহম্মদ আকীক বলেন, 'Bhaga is the main item of land revenue and appears to have been the customary royal share of the agricultural produce.'[৩৪] এটি ছিল রাষ্ট্রের নিয়মিত কর।[৩৫] মনুস্মৃতি[৩৬] ও বিষ্ণুস্মৃতি[৩৭] -তেও ভাগের উল্লেখ দেখা যায়। মেধাতিথি এর ব্যাপকার্থ করেছেন। তাঁর মতে, 'Bhaga . . . formed the share of king in cattle, grains, trees and other articles grown in fields or in manufactured goods.'[৩৮] আধুনিককালের পণ্ডিতদের মধ্যে ড. রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৯] ও ভোগেল[৪০] ভাগের আভিধানিক অর্থতেই চিন্তা নিবিষ্ট রেখেছেন। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার ভাগভোগ'কে আলাদা আলাদা গণ্য করেছেন এবং এর মানে করেছেন 'the royal share of the produce.'[৪১] এ যুগের আরেকজন ভারততত্ত্ববিদ ড রমেশচন্দ্র মজুমদার ভাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, এটি হল 'land-revenues paid in kind'.[৪২] ড. মজুমদার, ভাগ শুধু দ্রব্যে পরিশোধযোগ্য ছিল বলে মত প্রকাশ করলেও বাস্তবে তা নগদ অর্থেও পরিশোধ করা যেত।[৪৩]

সাধারণভাবে ভাগের প্রচলিত হার ছিল এক-ষষ্ঠমাংশ[৪৪] (কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের 'ষড়ভাগ' শব্দটি এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য)। কিন্তু মৃত্তিকার গুণাগুণ, জলবায়ুর স্থানীয় প্রভাব,

৩২ Ibid., pp. 169
৩৩ Ibid., pp. 169
৩৪ Economic History of Mithila, pp. 60
৩৫ Social and Rural Economy of Northern India, Dr. A.N.Bose, Vol. I., pp. 126
৩৬ ৮ম ১৩০-৩১
৩৭ ৩য় ২৫
৩৮ Economic History of Mithila, pp. 61
৩৯ Epigraphia Indica, Vol. VII., pp. 160, ff.
৪০ Ancient Chamba State, pp. 167-8
৪১ Select Inscriptions, Vol. I., pp. 372, fn.
৪২ History of Bengal, Vol. I., Dacca University, pp. 277
৪৩ Epigraphia Indica, Vol. I., pp. 75
৪৪ Economic Life in Northern India, Dr. S.K. Maity, pp. 79-80, Aspects, pp. 169, প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রচিন্তা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, ড. নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১২০

শ্রমের সহজ লভ্যতা এবং সর্বোপরি জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে এই হারেরও তারতম্য ঘটত।[৪৫] তবে সাধারণত তা নিম্নে এক-দ্বাদশাংশ $\left(\frac{১}{১২}\right)$ থেকে উর্ধ্বে এক-চতুর্থাংশ $\left(\frac{১}{৪}\right)$ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।[৪৬]

ভোগ

ভোগ-এর অর্থ নির্দেশের ক্ষেত্রেও ঐতিহাসিকগণ মতভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। ব্যুহলরের মতে ভোগ হচ্ছে 'the periodical supplies of fruits, fire-wood, flower and the like which the villages (villagers?) had to furnish to the king as daily presents.'[৪৭] ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার[৪৮], ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার[৪৯], ড. শচীন্দ্রকুমার মাইতি[৫০] প্রমুখও ঠিক অভিন্ন মত পোষণ করেছেন। প্রাচীন যুগীয় স্মৃতিকার-ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে মনু[৫১], মেধাতিথি ও কুল্লুক ভট্টের[৫২] লেখনীই যে উল্লিখিত পণ্ডিতগণকে এই ধারণা তৈরিতে সাহায্য করেছে, তা বলা যায়। অন্যদিকে ড. আর. জে. ত্রিপাঠী বলেন, ভূমি যখন অনাবাদী হত বা শস্যোৎপাদন শেষে বিরাণ তথা পতিত পড়ে থাকত, তখন তা থেকে ঘাস প্রভৃতি হাসিল করা হত, মূলত এটিই ছিল ভোগ।[৫৩] তবে ড. ত্রিপাঠীর এই মত ঐতিহাসিকদের আদৌ সমর্থন পায়নি। কেননা তিনি নিজ মতের স্বপক্ষে কোন তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি। যা হোক, এখন আমরা ব্যুহলরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করব।

ব্যুহলরের সংজ্ঞা 'প্রত্যহ' (daily) শব্দটি আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[৫৪] এটা ঠিক যে, উৎপন্ন শস্যের ওপর ভিত্তিমান ভূমি-রাজস্ব (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) যে কোন বিচারে 'প্রত্যহ' প্রদান করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। ড. আকীক যথার্থই বলেন, 'a critical scrutiny of the evidence taken into account reveals that the king's share in grain does not appear to have been given daily.'[৫৫] আমরা দেখেছি অতিপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা উপলক্ষ্যে রাজাকে ভেট বা উপঢৌকন দেয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। উদাহরণ হিশেবে মহাকবি কালিদাসের 'রঘুবংশ' এর কথা বলা যায়, যেখান থেকে জানা যায় রাজা যখন দেশ ভ্রমণে

৪৫ Hindu Revenue System, pp. 46 & Economic Organisation, pp. 98
৪৬ Economic Organisation, pp. 98
৪৭ Economic History of Mithila, pp. 61
৪৮ Select Inscriptions, Vol. I., pp. 372, fn. 7
৪৯ History of Bengal, Vol. I., pp. 277
৫০ Economic Life in Northern India, pp. 80
৫১ "মনুস্মৃতি'তে 'ভোগ' ঈষৎ ভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়েছে'— 'Aspects', pp. 171
৫২ মেধাতিথি ও কুল্লুকভট্ট 'ভোগ' শব্দের স্থলে 'প্রতিভাগম' ব্যবহার করেছেন, ঠিক প্রায় অনুরূপভাবে সর্বজ্ঞ নারায়ণ ও রাঘবানন্দ ব্যবহার করেছেন 'প্রতিভোগম'। ব্যাখ্যাকার নন্দাচার্য্যও একে 'প্রতিভোগম' নামে অভিহিত করেছেন—'Aspects', pp. 171
৫৩ Indian Historical Quarterly, Vol. IX., pp.128
৫৪ Economic History of Mithila, pp. 62
৫৫ Ibid., pp. 62

বের হতেন তখন গোপগণ তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে সচরাচর সদ্য প্রস্তুতকৃত 'ঘি' নিয়ে যেত তাকে উপহার দেয়ার জন্যে। রাজা এতে খুশী হতেন। কারণ প্রজাদের ভালবাসার ধনের প্রথম প্রাপক হতেন তিনি। তাছাড়া একার্থে এটি ছিল তার একাধিপত্যেরও প্রতীক। স্বর্গীয় দেবতাদের পরে মর্ত্যে প্রজাসাধারণের নৈবেদ্য-ভোগের তিনিই ছিলেন প্রথম ও প্রধান দাবিদার।

সুতরাং এখন প্রশ্ন আসে যে, ভূমি-রাজস্বের নামান্তরে ভোগ যদি রাজাকে প্রত্যহ দেয়া সম্ভব না হয়, তবে 'প্রাত্যহিক উপঢৌকন' বোঝাতে ব্যুহলর আসলে এখানে কী বুঝিয়েছেন? বস্তুত এর উত্তর আমরা দু'ভাবে দিতে পারি।

এক. প্রাচীন অনুশাসনগুলিতে 'ভাগভোগ'-এর একত্র অবস্থান; এ থেকে অনুমান করা যায় যে, পূর্বালোচিত 'ভাগ'-এর পাশাপাশি 'ভোগ'ও সমকালে প্রচলিত ছিল। আগেই বলেছি 'ভাগ' হচ্ছে উৎপন্ন শস্যে রাজা বা রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব। কিন্তু রাজার পক্ষে প্রতি বৎসর সরেজমিনে উপস্থিত থেকে স্বয়ং তা গ্রহণ করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল না। বরং তার হয়ে স্থানীয় রাজকর্মচারীরাই প্রজাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করত। এবং সেটাই ছিল স্বাভাবিক। ফলে 'ভাগ'ই যদি বার্ষিকভাবে স্থানীয় রাজস্ব কর্মচারীরা গ্রহণ করত, তবে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, 'ভোগ' ছিল অন্যরকমের প্রাত্যহিক ভূমি-রাজস্ব।

দুই, 'ভোগ' সম্পর্কিত ব্যুহলরের বক্তব্যের প্রতিপাদ্যকে যদি আমরা সঠিক বলে ধরে নিই (বলাবাহুল্য বেশি সংখ্যক ঐতিহাসিকই তা করেছেন), তা হলে 'ভাগ'-এর প্রায়-সমান্তরালে ভূমি-রাজস্ব হিশেবে 'ভোগ'-এর যথার্থ অবস্থান ও মূল্য নির্ণয় করা সম্ভব বলে মনে হয়। দু'টির মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, উভয়ই ভূমি-রাজস্ব হলেও 'ভাগ'-এর নামে লব্ধ অর্থ সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে নীত হত কিন্তু 'ভোগ'-এর অর্থ বা দ্রব্যাদি মূলত স্থানীয় রাজস্ব কর্মচারীদের দৈনন্দিন জীবিকা ও সরকারি কার্যাদি সম্পাদনের ব্যয়ভার-স্বরূপ প্রদান করা হত। মধ্যযুগে বিশেষত মোগল আমলে ব্যাপকভাবে প্রচলিত লা-খেরাজ ভূমির কথা বলা যায়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে রাজকর্মচারীদের স্থানীয়ভাবে খরচাদি নির্বাহের জন্যে করমুক্ত ভূমি তাদের প্রায়–নিরঙ্কুশ অনুকূলে প্রদানের রেওয়াজ মৌর্য-গুপ্ত যুগে অর্থাৎ সেই প্রাচীনযুগেও আমরা দেখতে পাই।[৫৬] 'মনুস্মৃতি'র অন্যতম ব্যাখ্যাকার মেধাতিথির একটি বর্ণনায়ও আমরা উপরিউক্ত মতের সমর্থন পাই।[৫৭] সুতরাং 'ভোগ' সম্পর্কিত এ যাবৎ আলোচনার সারসংক্ষেপ আমরা টানতে পারি এভাবে, 'These statements evidently give the impression that not the king but the village lords or other officials were the recipients of the articles which have been discussed above.'[৫৮] যা হোক, এখন আমরা ভোগ সম্বন্ধে আরও দু'একটি প্রাসঙ্গিক তথ্যপ্রমাণ উল্লেখ পূর্বক এর আলোচনা শেষ করবো।

প্রথমেই গোপচন্দ্রের মল্লসারুল অনুশাসনের কথা। পাল-পূর্ব যুগের এই অনুশাসনটিতে 'ভোগপতিক' নামের এক ধরনের কর্মাধ্যক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটা

৫৬ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা ১৫৩
৫৭ On Manu, VII., 125, quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 62
৫৮ Economic History of Mithila, pp. 62

অনেকটা পাল, সেন, বর্মণ ও তৎসমসাময়িক ভূ-দানবিষয়ক অনুশাসনগুলিতে উল্লিখিত 'ভোগপতি' বা 'ভোগপতিক'-এর অনুরূপ। মূলত এ থেকে অনেক ঐতিহাসিক ধারণা করেন, 'possibly he was entrusted with the task of supervising the collection of this particular item of revenue (Bhoga).'[৫৯] কীলহর্ণ 'ভোগ' ও 'ভুক্তি' (আধুনিককালের 'প্রদেশ'-এর সমার্থক প্রাচীনযুগীয় অভিধা) -কে সমার্থবাচক গণ্য করেছেন এবং 'ভোগপতিক'কে ভুক্তির একজন শীর্ষস্থানীয় কর্মাধ্যক্ষ বলে চিহ্নিত করেন।[৬০] যদিও ড. দীনেশচন্দ্র সরকার 'ভোগিক' বা 'ভোগপাল'কে আস্তাবলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা[৬১] এবং ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী 'ভোগপতিক'কে 'officer-in-charge of a bhoga or division'[৬২] রূপে উল্লেখ করেছেন।

কর

আসলে সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণের অভাবে যা সচরাচর হয় সেটাই ঘটেছে আলোচ্য যুগের ভূমি-রাজস্ব বিষয়ক প্রতিটা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। 'ভাগ' এবং 'ভোগ'-এর অর্থ নির্দেশ করতে গিয়ে যেমন ঐতিহাসিকগণ পারস্পরিক মতদ্বৈধতা প্রকাশ করেছেন, তেমনি 'কর'-এর সংজ্ঞা প্রদানেও তাঁরা একমত হতে পারেননি—'Divergent views are reflected by ancient writers on the explanation of the term Kara.'[৬৩] ড. শ্যামসুন্দর নিগামের এ উক্তি যেমন প্রাচীন যুগের স্মৃতিকার-ব্যাখ্যাকারদের বেলায় সত্য, তেমনি বর্তমান যুগের লেখকদের ক্ষেত্রেও তা সমানভাবে প্রযোজ্য।[৬৪] মূলত কোন একজন উল্লেখযোগ্য লেখক আর একজন সমান খ্যাতিমান লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে প্রায়শই একমত হননি। তবে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থায় 'কর'-এর প্রচলিত ও প্রকৃতার্থ যাই হোক, বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই মতভিন্নতার প্রধান কারণ হিশেবে আমরা শুধু এতটুকুই বলতে পারি,'that a single authentic meaning of the term is sought to be arrieved at. In real, it so appears that like bali, the term kara has changed several meanings under the forces of time and places affecting economic organisation.'[৬৫] প্রথম দিককার বৈদিক সাহিত্য-রচনাদিতে 'কর' শব্দের উপস্থিতি দেখা যায় না[৬৬], কিন্তু পরবর্তীকালের এ সম্পর্কিত প্রায় সমুদয় বিশিষ্ট সাহিত্যকর্মে বিশেষ করে 'ধর্মশাস্ত্র' ও 'অর্থশাস্ত্রে' এর প্রচলন ভুরি ভুরি।[৬৭] শুধু তাই নয়,

৫৯ Aspects, pp. 171
৬০ Epigraphia Indica, Vol. IV., pp. 255. fn. 6
৬১ Select Inscriptions, pp. 360. fn. 9
৬২ The Gupta Empire, pp. 152
৬৩ Economic Organisation, pp. 101
৬৪ Ibid., pp. 101
৬৫ Ibid., pp. 101-2
৬৬ Economic Life, pp. 81; Agrarian and Fiscal Economy, pp. 297 & Aspects, pp. 171
৬৭ Op. cit. 81, 297 & 171

'The kara is another form of revenue frequently mentioned in our epigraphs.'[৬৮] এই যুগের অনুশাসনগুলিতে 'কর' কখনও একক ও স্বাধীনভাবে, আবার কখনও এবম্বিধ অন্য শব্দের সম্মিলনে (যেমন 'ভাগভোগকর', 'ভাগভোগকরহিরণ্য' ইত্যাদি) উৎকীর্ণ হয়েছে। যা হোক এখন বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন লেখকের রচনায় 'কর' কিভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে তার আলোচনা করে আমরা এর একটি যথাসম্ভব সঠিক ও গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করবো।

সাধারণ ভূমি-রাজস্ব (General Land Tax) হিশেবে 'কর'-এর প্রচলন এককালে খুব ব্যাপক ছিল। 'অমরকোষ', 'বৈজয়ন্তী' প্রভৃতি গ্রন্থে 'বালি', 'ভাগ' এবং 'কর' একার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। খালিমপুর, মুঙ্গের, কমৌলি'র মত তাম্রশাসনগুলিতে ভূমি-রাজস্বের সূচকস্বরূপ শুধু 'কর' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। এই অনুশাসনগুলিতে 'ভাগ' ও 'ভোগ'-এর উল্লেখই নেই।[৬৯] এ থেকে প্রমাণিত হয়, 'It is almost certain therefore that, in these grants at least kara signified the general land tax.'[৭০] উল্লেখ্য, পাল-পরবর্তী যুগের অধিকাংশ অনুশাসনে 'ভাগ'-এর স্থলে 'ভোগ' এবং তার পাশাপাশি 'কর'-এর উৎকীর্ণতা দেখে সহজেই মন্তব্য করা যায় যে, এই যুগে ভূমি-রাজস্বের নব অভিধা হিসেবে 'কর'-এর প্রয়োগ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ছিল এবং তার গুরুত্বও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শাস্ত্রীয় 'শব্দকোষ'সমূহে 'কর'-এর মানে করা হয়েছে 'ভূমি-রাজস্ব'; স্বভাবতই তা ছিল 'বালি', 'ভাগ' প্রভৃতির সমগোত্রীয়। কিন্তু মহাভারত, বশিষ্ঠের 'ধর্মসূত্র', 'মনু-সংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' এর যে সংজ্ঞার্থ লিপিবদ্ধ হয়েছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করেছেন। যেমন 'মনু-সংহিতা', 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' ও মহাভারতে 'কর'-এর একটি প্রচলিত অর্থ হল— 'tax upon merchants' profits'[৭১] মনুস্মৃতি' বা 'সংহিতা'র এই অর্থটিই 'মনুস্মৃতি'র বিভিন্ন ব্যাখ্যাকারের রচনায় বিভিন্ন অর্থ-প্রতীতি লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকজনের ব্যাখ্যা উল্লেখ করা গেল :

মেধাতিথি : 'gift of commodities'[৭২] (দ্রব্যাদিনাম্);

সর্বজ্ঞ নারায়ণ : 'a fixed gold (cash) payment on land'[৭৩] (ভূমিনিয়তম দেবম্ হিরণ্যম্);

রামচন্দ্র : 'contribution in the form of grass, wood etc.'[৭৪] (গুল্মাদায়াদিকম্);

৬৮ Economic Life in Northern India, pp. 81
৬৯ Aspects, pp.172
৭০ Ibid., pp. 172
৭১ Hindu Revenue System, pp. 404
৭২ On Manu. VIII, 307
৭৩ Ibid., pp. 307
৭৪ Ibid., pp. 307

কুল্লুক ভট্ট : '*contribution from villagers and townsmen either monthly or a Bhadrapada and Pausa*'[৭৫] (গ্রামপুরবাসিভ্যহ্ প্রতিমাসম্ বা ভাদ্রপৌষ-নিয়মেন গ্রাহ্যম্);

রাঘবানন্দ : 'a monthly payment by villagers'[৭৬] (গ্রামবাসিভ্যহ্ প্রতিমাসিকম্)।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' 'কর' বলতে বুঝানো হয়েছে : '(1) periodical tax over and above the king's customary grain-share, or general property tax levied periodically (AS. II. 6, 15); (2) emergency tax levied upon the villagers over and above the normal grain share (AS. V. 2);...'[৭৭] আলোচ্য সংজ্ঞার্থের সূত্রধরে 'অর্থশাস্ত্রে'র প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার ভট্টস্বামী 'কর' বলতে বুঝিয়েছেন, 'annual tax paid during the month of Bhadrapada, Vasanta and the like (during the months of April and May).'[৭৮] 'অর্থশাস্ত্রে'র আর একজন খ্যাতনামা ব্যাখ্যাকার ক্ষীরস্বামী; তিনি বলেন, 'কর' হচ্ছে 'a charge upon all movable and immovable articles.'[৭৯]

'কল্পসূত্র'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যাকার হরিভদ্রসূরী 'কর'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'a property tax when describing it as the amount payable every year to the king on every cow and the like.'[৮০] 'অশ্বঘোষ'-এর 'সৌন্দর্য্যানন্দ কাব্যে' 'করে'র অর্থ করা হয়েছে 'taxes in money.'[৮১] 'অবদান শতকে'ও [illegible]য় অনুরূপ অর্থ পাওয়া যায়।[৮২]

এখানে একটা বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ব্যাখ্যাকারদের প্রত্যেকেই যার যার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও অভিজ্ঞতা থেকে 'কর'-এর অর্থ নির্দেশ করেছেন। তবে তার মধ্যে কারও কারও মতের সঙ্গে অন্যের মতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন 'অর্থশাস্ত্রে'র ব্যাখ্যাকার ভট্টস্বামীর মতের সঙ্গে 'মনুস্মৃতি'র ব্যাখ্যাকার কুল্লুক ভট্ট ও রাঘবানন্দের মতের মিল রয়েছে।[৮৩] এ থেকে একটা সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কৌটিলীয় 'অর্থশাস্ত্র' (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩) থেকে 'মনুস্মৃতি' (খ্রিস্টীয় ২০০)-র সময়ের (ন্যূনাধিক ৫০০ বছর) যত পার্থক্যই থাকুক না কেন, এই দুই যুগে অর্থাৎ উল্লিখিত তিন ব্যাখ্যাকারের জীবদ্দশায় 'কর'-এর অর্থগত একটা সামঞ্জস্য ছিল, যা সর্বসাধারণ মোটামুটি একই ভাবে গ্রহণ করেছিল বলা যায়। যা হোক এবার আমরা 'কর'

৭৫ Ibid., pp. 307
৭৬ Quoted from 'Economic Life in Northern India', pp. 82 & Aspects, pp. 172
৭৭ Hindu Revenue System, pp. 404
৭৮ On AS., II, 15; Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna XI, pt. II, pp. 83-4 (Quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 62)
৭৯ On Amarakosh, II, 8, 28
৮০ Quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 63
৮১ Quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 299
৮২ Av. Sat : I. P. 58, foot note 9
৮৩ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 299

সম্পর্কে আধুনিককালের লেখক-ঐতিহাসিকগণের কে, কী বলেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করব।

ড. শ্যামাশাস্ত্রী : 'tax paid in money',[৮৪] অন্যত্র, 'taxes or subsidies that are paid by vassal kings and others.'[৮৫]

ড. গণপতি শাস্ত্রী : 'taxes upon fruits and trees.'[৮৬]

ড. দীনেশচন্দ্র সরকার : 'an additional tax, over and above king's share.'[৮৭]

ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল : 'a general property-tax levied periodically.'[৮৮]

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার : 'A general property-tax levied periodically.'[৮৯]

ড. নরেন্দ্রনাথ খের : 'a periodical cess levied in the country parts over and above the state's share of grain.'[৯০]

ড. শচীনন্দ্রকুমার মাইতি ঃ 'a periodical tax levied more or less universally on villagers.'[৯১] তবে তিনি এ-ও বলেন, 'Kara was not a part of the regular annual land tax, but a special tax which might be remitted by conscientious kings.'[৯২]

ড. Meyer : 'an annual tax.'[৯৩]

ড. Speyer : 'a normal tax.'[৯৪]

উপরিউক্ত মতগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, 'কর'-এর অর্থ প্রতিপন্ন করার ক্ষেত্রে ড. উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার হুবহু একই ভাষায় কথা বলেছেন। আবার এঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ড. বি. পি. মজুমদার।[৯৫] অন্যদিকে ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, ড. শচীন্দ্র কুমার মাইতি ও ড. নরেন্দ্রনাথ খেরের মন্তব্যের মধ্যে ভাষাগত ও পারিপার্শ্বিক কিছু অমিল থাকলেও তাঁদের বক্তব্য যে প্রায় এক, সেটাও বলা যায়। যদিও দুই শাস্ত্রীই অনেকটা ভিন্ন সুরে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন।

পরিশেষে একটা কথা বলা যায়, 'the term kara is used indiscriminately in both general and specific senses in varying contexts and hence it is difficult to ascribe any definite meaning to it. Moreover, it seems to have been some

---

৮৪ AS. Translated by Shastry (3rd Edn), pp. 58
৮৫ Ibid., pp. 98
৮৬ AS. Pt. I, pp. 230
৮৭ Select Inscriptions, Vol. I., pp. 372, foot note 7
৮৮ Hindu Revenue System, pp. 47
৮৯ History of Bengal, Vol. I., pp. 277
৯০ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 300
৯১ Economic Life in Northern India, pp. 82
৯২ Ibid., pp. 82
৯৩ Epigraphia Indica, Vol. VIII, pp. 44
৯৪ Quoted from 'Av. Sat : I.p. 58, fn. 9'
৯৫ Socio-Economic History of Northern India, pp.235

kind of land-revenue, but its exact nature cannot be determined in the present state of out knowledge.'[৯৬] তবে যে কোন বিচারেই হোক, এটা অন্তত বলা যায় যে, 'it is most probable that in cases where it appears as a word in the compound bhagabhogakarahiranya. it can neither be translated as the usual land revenue, nor as a contribution in gold or cash. In these instances, it might have been a periodical tax over and above the grain share. But in land grants where it is mentioned without bhagabhoga or only with bhaga it must be a land tax and might even be identified with the usual grain share of the kind.'[৯৭]

হিরণ্য

পাল, সেন ও তৎসমসাময়িক যুগের প্রাপ্ত ভূমি-দানের অনুশাসনগুলিতে পূর্বালোচিত রাজস্বসংক্রান্ত শব্দনিচয়ের পাশাপাশি 'হিরণ্য'[৯৮] শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায় যা আগেই বলেছি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক এর বিভিন্ন সংজ্ঞার্থ করেছেন। গুপ্ত-পূর্বযুগের লেখকদের মধ্যে অন্যতম কৌটিল্য 'হিরণ্য'কে রাষ্ট্রের একটি আয়-সূত্র তথা রাজস্ব হিশেবে গণ্য করেছেন।[৯৯] পতঞ্জলি মনে করেন হিরণ্য রাজাকে ধনপূর্ণ করে[১০০], যদিও তিনি এটিকে সরাসরি ভূমি-রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত করেননি।[১০১] শাস্ত্রকারদের মধ্যে মনু[১০২], বিষ্ণু[১০৩], গৌতম[১০৪] ও 'মহাভারত'কার[১০৫] একে রাষ্ট্রের একটি বিশিষ্ট রাজস্ব হিশেবে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্যণীয়, তাঁরা 'হিরণ্য'-এর হার নির্ধারণ করেন $\frac{১}{৫০}$। বলাবাহুল্য আধুনিককালে 'হিরণ্য'-এর সঠিক সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করতে গিয়ে লেখকগণ মোটামুটি দু'টি অংশে বিভক্ত হয়েছেন। একদল মূলত 'হিরণ্য'-এর তথাকথিত আভিধানিক অর্থের আলোকে এর সংজ্ঞা দিয়েছেন, অন্যদল বোধগম্য অর্থ-রূপকের বাইরে গিয়ে কিছুটা অনুমান ও বাস্তবতার মিশেলে একটা আপাত গ্রহণযোগ্য স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তবে এই উভয়দল প্রদত্ত মতের কোন্‌টি যে সঠিক ছিল, সেটি আজ আর সুনিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

যা হোক; এখন এক এক করে উভয়পক্ষের মতগুলি ও তাদের সীমিত গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবো।

৯৬ Economic History of Mithila, pp. 63
৯৭ Aspects, pp. 173
৯৮ দ্বিতীয় ধরসেনের মালিয়া তাম্রফলকে 'হিরণ্যে'র মত 'ধান্য' (ধান বা শস্যের অংশীদারিত্বের অর্থে) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি সম্ভবত পূর্বালোচিত 'ভাগে'র ভিন্ন নাম।
৯৯ AS. I, 13
১০০ Quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 64
১০১ Economic History of Mithila, pp. 64
১০২ On Manu, VII, 130
১০৩ On Bisnu, III, 25
১০৪ On Gautam, X, 25
১০৫ শান্তিপর্ব : ৬৭, ২৩

সেনার্ট : 'a kind of tax in money or cash.'[১০৬]
কীলহর্ন : 'payment in money.'[১০৭]
ভোগেল : 'a tax in cash.'[১০৮]
ও
ক্যাম্বেল
ড. শ্যামাশাস্ত্রী : 'cash allowances.'[১০৯]
ড. স্পেয়ার : 'coined money.'[১১০]
ব্যুহলার
ইয়োলী (Jolly)
ড. আর ডি ব্যানার্জী 'tax in gold or gold coins.'[১১১]
ড. ভাণ্ডারকর
ড. সরকার : 'a tax payable in terms of cash.'[১১২]
ড. ঘোষাল : 'king's share of certain crops paid in cash as distinguished from tax in kind (bhaga) levied on ordinary crops.'[১১৩]
ড. আর সি মজুমদার : 'Tax in cash levied upon certain special kinds of crops as distinguished from the tax in kind (bhāga) which was charged upon the ordinary crops.'[১১৪]
ড. নরেন্দ্রনাথ খের : 'Some imposition on land in cash.'[১১৫]

উপরিউক্ত সংজ্ঞার্থসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, যাঁরা 'হিরণ্য'কে আক্ষরিকার্থে অর্থাৎ 'tax in gold or gold coins' বলে বিবেচনা করেছেন, তাঁদের বক্তব্য যে সঠিক নয় তথা 'হিরণ্য' 'স্বর্ণে (ধাতববস্তু) বা স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিশোধেয় ভূমি-রাজস্ব' ছিল না, তা নিম্নোক্ত যুক্তি থেকে প্রমাণ করা যায়।

প্রথমত, 'হিরণ্য'-এর আভিধানিক অর্থ 'স্বর্ণ' এবং 'অবদান-শতক', 'দিব্যাবদান' ও বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থাদিতে[১১৬] 'হিরণ্য' ও 'স্বর্ণ'-এর উল্লেখ পাশাপাশি রয়েছে। এতদসত্ত্বেও ড. নরেন্দ্রনাথ খেরের মন্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে স্বীকার করতে হবে যে, 'Obviously

১০৬ AS. I, 13
১০৭ Epigraphia Indica, Vol. VII., pp. 61
১০৮ Antiquities of the Chamba State, pp.167-69 & AS. Trans., 1.19.12, pp. 52
১০৯ AS : V, 3, Eng. Trans, (5th Edn)
১১০ Av. Sat : II, 74. 14, pp. 234
১১১ The Sacred Books of the East, II, pp. 277; Epigraphia Indica, Vol. XIV, pp. 324, 330; op. cit., pp. 46ff.
১১২ Select Inscriptions, Vol. I. pp. 372, fn 7
১১৩ Hindu Revenue System, pp. 403
১১৪ History of Bengal, Vol. I, pp. 277
১১৫ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 305
১১৬ See 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 304

both cannot be taken as gold metal even.'[১১৭] *অধিকাংশ ভূমিদানের পট্টোলিতে* 'ভাগভোগকর'-এর সহযোগী হিশেবে 'হিরণ্যে'র উল্লেখ থেকে এটা ধারণা করতেই অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের অনুপ্রাণিত করে যে, এটিও 'ভাগভোগকর'-এর মত একটি ভূমি-রাজস্ব; স্বভাবতই প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যে রাষ্ট্রের অংশীদারিত্বের অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ বলা যায় এটি স্বর্ণে বা স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিশোধেয় কোন কর নয়, বরং শস্যজাত এক ধরনের বিশেষ কর বা ভূমি-রাজস্ব।

দ্বিতীয়ত এটিকে স্বর্ণের ওপর বিশেষ করে স্বর্ণখনির ওপর ধার্য রাষ্ট্রীয় কোন করও আমরা বলতে পারি না, যেমনটা ড. বেণী-প্রসাদ মনে করেছেন।[১১৮] এটা স্বীকার্য পর্যালোচ্য যুগের বিশেষত গুপ্তযুগের বিভিন্ন অনুশাসন ও সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে নানা রকমের স্বর্ণালঙ্কার ও স্বর্ণ-নির্মিত বস্তুর উল্লেখ রয়েছে, তারপরও আমরা দেখতে পাবো এ যুগে বাংলায় মূলত স্বর্ণ বাইরে থেকে আমদানি করা হত। নিজস্ব খনিজদ্রব্য হিশেবে বাংলার স্বর্ণের কখনোই বিশেষ খ্যাতি ছিল না—না অতীত কালে, না বর্তমানে। স্থানীয়ভাবে স্বর্ণ সহজলভ্য না হওয়ায় কোন যুগেই (প্রাচীনকালে তো নয়ই) বাংলায় স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। তাছাড়া জন কেনেডি প্রদত্ত একটি তথ্য থেকে জানতে পারি, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত সময়কালে ভারত তথা বাংলায় স্বর্ণের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১৯] এর মুখ্য কারণ ছিল স্বর্ণের দুষ্প্রাপ্যতা, যেটি অব্যাহত ছিল গুপ্ত যুগের পরবর্তীকালেও। যে কারণে আমরা দেখতে পাই, 'gold currency became extremely scarce in Bengal and none of the Pala or Sena rulers is known to have issued any gold coins.'[১২০] সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিকের কথিত[১২১] 'the whole idea of hiranya being a tax in gold paid by ordinary cultivators seems to be unjustifiable.'[১২২] প্রসঙ্গত আরেকটি তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা যায়, এই যুগের ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে আবিষ্কৃত অনুশাসনগুলিতেও 'হিরণ্যে'র উল্লেখ দেখা যায়, যা থেকে প্রমাণিত হয় শুধু স্বর্ণ বা স্বর্ণখনির ওপর করারোপের জন্যই এর প্রচলন হয়নি, বরং তা ছিল অন্য কিছু।

তৃতীয়ত এটি কোন সুস্থ চিন্তা ও যুক্তিবুদ্ধির কথা নয় যে প্রাচীন বাংলায় যে কোন একটি ভূখণ্ডে বা রাজ্যে রাষ্ট্রের সমুদয় রাজস্বের বিশেষ করে ভূমি-রাজস্বের কিছু পরিমাণ আদায় করা হবে উৎপন্ন শস্যে, আবার কিছুটা স্বর্ণে বা স্বর্ণ-মুদ্রায়। কিংবা অন্যভাবে বলা যায় যেমনটা ড. নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন 'it (hiranya) was a tax on hoards of gold or a tax on the capital of the annual income'[১২৩] ; কিন্তু আমরা ড.

১১৭ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 304
১১৮ State in Ancient India, pp. 302
১১৯ Cf. A Comprehensive History of India, Vol. II, pp. 795
১২০ Aspects, pp. 174
১২১ ব্যুহলার প্রমুখের বক্তব্য স্মর্তব্য।
১২২ Aspects, pp.174
১২৩ Kautilya—An Exposition of His Social and Political Theory, Vol. I, pp. 139-140

বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতের সঙ্গে একমত নই। কারণ তাঁর বক্তব্যের মোদ্দা কথাটিকে যদি বিশ্লেষণ করি তা হলে তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে তিনি সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে স্বর্ণসঞ্চয় তথা ব্যক্তিগত জমা বা আয়ের ওপর কর অর্থাৎ আয়করের কথা বলতে চেয়েছেন। কিন্তু এর জবাব একটিই—'it appears to be highly improbable that in such a remote period of Bengal history, taxes on individual income were assessed and collected regularly. Moreover, as his view is not corroborated by other facts, it may at best be regarded as a mere guess.'[১২৪] তাই চূড়ান্ত বিচারে 'হিরণ্য' বলতে আমরা ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল ও ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি, সম্ভবত 'হিরণ্য' ছিল এমন এক ধরনের ভূমি-রাজস্ব যা যে কোন কারণে হোক উৎপাদিত শস্যে সরাসরি প্রদানযোগ্য ছিল না, বরঞ্চ অনির্ণীত শস্যের ওপর বাহ্যভাবে ধার্য মূল্যের নিরিখে নগদ অর্থে পরিশোধ করা হত। ফলত শেষোক্ত বক্তব্যের একটি পরোক্ষ সমর্থন পাই পরবর্তীকালে বিশেষ করে মধ্যযুগে সম্রাট আকবরের শাসনামলে তাঁর স্বনামধন্য রাজস্বমন্ত্রী টোডরমলের প্রণীত ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের সর্বত্র চালু হওয়ার পূর্বে যখন ভূমি-রাজস্ব সাধারণত উৎপন্ন শস্যের পরিবর্ত ব্যবস্থায় প্রদান করা হত তা থেকে। বস্তুত তখনও কোন কোন ভূমির রাজস্ব স্থানীয় বিশেষ অবস্থার কারণে শস্যে প্রদান করা সম্ভব হত না, পরিবর্তে তা আনুমানিক ধার্যকরণ-নীতির ওপর ভিত্তি করে সামান্য অর্থে (Lump-sum) প্রদান করা হত। প্রাচীন বাংলায় 'হিরণ্য'ও ছিল অনুরূপ একটি ভূমি-রাজস্ব।

'হিরণ্য' আদায়ের সঙ্গে জড়িত তৎকালীন একজন রাজস্ব-কর্মকর্তার উল্লেখ করে আমরা এর আলোচনা শেষ করবো। গোপচন্দ্রের 'মল্লসারুল' অনুশাসনে 'হিরণ্যসমুদায়িক' নামক এই কর্মকর্তার নাম পাওয়া যায়। ড. মজুমদার[১২৫] ও ড. আলতেকর[১২৬] মনে করেন তিনি নগদ অর্থে এবং ড. বিনয়চন্দ্র সেন[১২৭] এর মতে, নগদে ও দ্রব্যে—উভয়ভাবেই তিনি 'হিরণ্য'রূপ ভূমি-রাজস্ব আদায় করতেন।

বালি

'বালি' প্রাচীন ভারতীয়-আর্য ভাষার রাজস্ব-সংজ্ঞক আরেকটি বিখ্যাত শব্দ।[১২৮] সত্যি বলতে এটিই হচ্ছে 'The earliest form of taxation in ancient India known to us'।[১২৯] সম্ভবত 'বালি' 'বলি' (বলিদান অর্থে) থেকে জাত।[১৩০] প্রাচীন শাস্ত্রগুলিতে একেবারে গোড়ার দিকে এর দ্বারা বোঝাত সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে বা কোন বিশেষ দেবতার

---

১২৪ Aspects, pp. 174-75
১২৫ History of Bengal, Vol. I, pp. 277
১২৬ Quoted from 'Aspects', pp. 175
১২৭ Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, pp. 498
১২৮ Economic History of Mithila, pp. 59
১২৯ Aspects of Economic History of Bengal, pp.159.
১৩০ 'The usual sense of Bali in Sanskrit is a religious offering or voluntary contribution'—Dr Radha Kumud Mookerji in 'Chandra Gupta Maurya and His Times', pp. 94.

নামে জান্তব কিছু (মানব ও পশুই প্রধানত) আহুতি দেয়া বা হত্যা করা (এখনও অবশ্য হিন্দুসমাজে বলি অর্থ তাই)। পরবর্তীকালে মর্ত্যে স্রষ্টার প্রতিভূ হিশেবে রাজ্যাধিপতিকে দ্রব্যাকারে কিছু প্রদান করাই ছিল বলি বা 'বালি'—'the delivery of the king's share of the produce is described as the 'validan' or the voluntary gift of the 'Vali' to the king.'[১৩১] বলা হয়ে থাকে রাজা যেহেতু প্রজাদের শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিবিধানকারী এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রের রক্ষাকারী, সুতরাং তার সন্তুষ্টি ও প্রশাসনিক ব্যয় ভার বহনের জন্যই 'বালি' রূপ রাজস্বের প্রচলন। 'The king was called the 'Visampati' or the protector of the 'Vis' or the people, and as such the Vali was paid to him at first freely as a contribution for the performance of the onerous duties of his office.'[১৩২] কিন্তু 'বালি'র প্রকৃতার্থ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আধুনিককালের ঐতিহাসিকদের মধ্যে তো বটেই, এমন কি প্রাচীন যুগীয় শাস্ত্র-ব্যাখ্যাকারগণও 'বালি'র উৎপত্তির ইতিহাস ও সংজ্ঞার্থ নিয়ে নানারকম মত প্রকাশ করেছেন। 'বালি'র প্রাচীনতা সম্পর্কিত সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, বেদেও এর উল্লেখ দেখা যায়। বিশেষ করে ঋগ্বেদে (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ বা ১৪০০—১০০০ এর মধ্যে রচিত)[১৩৩] 'বালি' বলতে বুঝানো হয়েছে রাজ্যান্তর্গত প্রজা ও বিজিত রাজাদের কাছ থেকে রাজার প্রাপ্যকে।[১৩৪] বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে একে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে আদায়কৃত অতিরিক্ত কর বলা হয়েছে।[১৩৫] 'অর্থশাস্ত্রে' 'বালি'র অর্থ পাই, উৎপন্ন শস্যে রাজার সাধারণ প্রাপ্যের অতিরিক্ত কিছু প্রাপ্তি' ('petty cess over and above the king's normal share of the produce')। 'মিলিন্দ-পানহো' (খ্রিস্টপূর্ব ১০০) নামক গ্রন্থে 'বালি'কে জরুরি কর হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছে।[১৩৬] মহাভারতে 'বালি'কে উৎপীড়ক কর রূপে গণ্য করা হয়েছে। বৃহস্পতি একে বলেছেন ভূমি-কর।[১৩৭] গুপ্ত যুগে রচিত 'মহাবংশ' নামক গ্রন্থে 'the levy of bali is said to be very essential which may imply that it was perhaps the basic land tax'[১৩৮] হিশেবে পাই। 'অমরকোষ'-এ 'বালি'কে শুল্ক ও করের সমার্থকরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। যা হোক, এখন আধুনিক লেখক-ঐতিহাসিকদের এ সম্পর্কিত মতামত আলোচনা করব।

ড. শ্যামাশাস্ত্রী[১৩৯], ড. স্মিথ[১৪০], ড. টমাস[১৪১] প্রমুখ 'বালি'কে ধর্মীয় কর বলে আখ্যায়িত করেছেন। ড. শচীন্দ্র কুমার মাইতিও এই মতের সমর্থক। তিনি তাঁর 'The Imperial Guptas and Their Times' নামক গ্রন্থে বলেছেন 'Bali—the oldest Indo-Aryan

১৩১ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 11
১৩২ Ibid., pp. 11
১৩৩ ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষালের মতে ঋগ্বেদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৮০০, দেখুন 'The Hindu Revenue System', pp. 7.
১৩৪ Hindu Revenue System, pp. 45.
১৩৫ জাতক ১ম, পৃষ্ঠা ১৯৯; ৩৯৯; ২য়, পৃষ্ঠা ২৪০; ৩য়, পৃষ্ঠা ৯; ৫ম, পৃষ্ঠা ৯৮।
১৩৬ পৃষ্ঠা ১৪৬।
১৩৭ সংগৃহীত 'Quoted from 'Economic History of Mithila', pp.60.
১৩৮ MahaVamsa, XXVIII, 4.
১৩৯ অর্থশাস্ত্র ঃ ২য় ৬, ২য় ঃ ৩৫, ইংরেজি অনুবাদ, ৫ম সং, পৃষ্ঠা ৫৮, ১৫৯।
১৪০ Epigraphia Indica, Vol. I., ff.
১৪১ Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pp. 466-7.

term for royal revenue—was perhaps originally a voluntary payment to the king. But since no state can exist on the basis of voluntary payments, it possibly became a compulsory tax in later times. In the Gupta period, it was possibly a religious tax, since it is always mentioned in the comtemporary literature along with charu and sattra—both the terms being of religious import.'[১৪২] তিনি এটির আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাঁর 'Economic Life of Northern India in the Gupta Period' গ্রন্থে, যেখানে তিনি বলেন, 'The bali like charu is an offering to the gods, comprising clarified butter, grain, rice, fruits, flowers and so on. Even today in Indian villages in common religious festivals these are offered to the gods by collecting general contributions, and in that sense bali can be explained as a sort of religious cess or contribution to the state.'[১৪৩] ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'বালি' বলতে বুঝিয়েছেন, 'Originally a voluntary gift offered as a mark of allegiance to the King, afterwards a compulsory contribution from the subjects and also tributes. Later, tax in general.'[১৪৪] 'অর্থশাস্ত্রে'র ভিত্তিতে তিনি অবশ্য আরও কিছু অর্থ নির্দেশ করেছেন। অশ্বঘোষের 'সৌন্দর্য্যানন্দ কাব্যে'র অনুবাদ ও আলোচনা প্রসঙ্গে ড. জনসন 'বালি'কে ভূমি-রাজস্ব হিশেবে উল্লেখ করেছেন।[১৪৫] Meyer একে 'voluntary contributions of the subjects' এবং ড. গণপতি শাস্ত্রী 'receipts from begging' বলেছেন। তবে ব্যাখ্যাকার ভট্টস্বামীর বক্তব্য অর্থাৎ 'bali was forcibly collected' কে যদি সঠিক বলে ধরে নিই, তা হলে অতিঅবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ড. শাস্ত্রী এবং Meyer -এর মত এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা যা স্বেচ্ছায় প্রদেয়, তা জোরজবরদস্তিমূলকভাবে আদায়ের কোন কারণ থাকতে পারে না। অন্যদিকে ড. এ এন বসু বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থ ও ডায়োডোরাস-স্ট্রাবো'র বর্ণনার ওপর নির্ভর করে 'বালি'কে অনিয়মিত কর হিশেবে আখ্যাত করেছেন। ড. আইয়াঙ্গারের মতে 'বালি' হচ্ছে 'the special tax demanded from land for religious purposes.'[১৪৬] ড. কামরুন্নেসা ইসলাম বলেন, 'this bali, first offered as a voluntary contribution, became an economic obligation, and thus formed the starting point of the system of taxation.'[১৪৭] ড. নরেন্দ্রনাথ খের বিভিন্ন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতামত ও প্রাচীন শাস্ত্রাবলির এতদসম্পর্কিত মত বিশ্লেষণ শেষে মন্তব্য করেন, 'Thus we may conclude

১৪২ pp. 158.
১৪৩ pp. 84.
১৪৪ Hindu Revenue System, pp. 392
১৪৫ Quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 295.
১৪৬ Ancient Indian Economic Thought, Dr K V Rangaswami Aiyangar, pp. 129, Quoted from 'Economic Organisation in Ancient India', p. 100.
১৪৭ Aspects, pp. 159.

that bali seems to be an extra cess besides the normal share of the produce (bhaga). It may have included in itself some religious contribution by the people. ...Similar cesses or abwabs were probably known even in Mediaeval civilization.'[১৪৮] অন্যত্র তিনি বলেন, 'Bali was a contribution on land paid by the agriculturists.'[১৪৯]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, তৎযুগের প্রেক্ষাপটে 'বালি'র প্রকৃত ও সম্প্রসারিত অর্থ যাই হোক না কেন এটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক যে, গুপ্ত ও পরবর্তীকালের বাংলায় অদ্যাবধি প্রাপ্ত অনুশাসনগুলিতে 'বালি'র উল্লেখ প্রায় দেখাই যায় না। এ থেকে একটা ধারণা অবশ্য করা যায়, ভূমি-রাজস্ব হিশেবে 'বালি'র প্রচলন গুপ্ত ও তৎপরবর্তীযুগে বাংলায় ছিল না। বরং অপরাপর ভূমি-রাজস্ব যেমন 'ভাগভোগকরহিরণ্য' ততোদিনে 'বালি'র স্থান দখল করে ফেলেছিল।

উপরি-কর ও উদরঙ্গ

প্রাচীন বাংলায় প্রচলিত নানারকমের অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্বের মধ্যে অন্যতম ছিল 'উপরি-কর' ও 'উদরঙ্গ'। দু'টি দুই ধরনের কর হলেও এদের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সাদৃশ্য ছিল, যে কারণে এখানে এদেরকে একত্রে আলোচনা করা হল।

'উপরি-কর'-এই অভিধাটিকে বিভক্ত করলে আমরা পাই 'উপরি' ও 'কর'। ঐতিহাসিক Fleet ও ড. ঘোষাল মনে করেন 'উপরি' মারাঠী শব্দ, যার অর্থ 'a cultivator not belonging originally to a village, but residing and occupying land in it, either upon a lease for a stipulated term of years, or at the pleasure of the proprietor.'[১৫০] মারাঠী সূত্রের ওপর ভিত্তি করে Fleet 'উপরি-কর'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে : 'a tax levied from the cultivators who had no property right in the soil.'[১৫১] ড. ঘোষালের মতে 'উপরি-কর' (উপস-কর, উপ-কর) হচ্ছে 'tax paid by the temporary tenants; additional levies of occasional nature.'[১৫২] কিন্তু মুখ্যত মারাঠী উৎস-নির্ভর তাঁদের এই বক্তব্য সমর্থনীয় নয় এই কারণে যে, মারাঠী ভাষার উৎপত্তি ন্যূনপক্ষে দশম শতকের দিকে, অথচ যে সমস্ত তাম্রানুশাসনে 'ভাগ', 'উদরঙ্গ' এর পাশাপাশি 'উপরি-কর'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলি দশম শতাব্দীরও অনেককাল আগের। সুতরাং মারাঠী 'উপরি' আলোচ্য করের সূত্র নির্ধারণ করতে পারে না। প্রসঙ্গত ড. এল ডি বার্নেটের উত্থাপিত একটি সূত্রও আমরা এখানে কিছুটা আলোচনা করতে চাই। বার্নেট ড. ঘোষালের বিখ্যাত বই-টির সমালোচনা করতে গিয়ে ঘোষালের মতকে খণ্ডন করেছেন এবং নতুন সূত্রটি দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'uparikara is something like the Tamil mel-varam, i.e. the crown's share of produce (Tamil mel = Skt.

১৪৮ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 297
১৪৯ Ibid., pp. 294
১৫০ Quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 66.
১৫১ Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III., pp. 98. No. 1.
১৫২ Hindu Revenue System, pp. 424.

upari)'[১৫৩] তাঁর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে ড. ভি আর রামচন্দ্র দীক্ষিতর আর একটি তথ্য দেন। তিনি 'Mel-varam'-এর পাশাপাশি এর বিপরীতার্থক আরেকটি তামিল শব্দের উল্লেখ করে বলেছেন, 'Melvaram is opposite to kudivaram as it obtains in South India. Kudivaram is occupancy right. By this right a ryot is entitled to certain share of the produce. Melvaram is the landholder's right. Melvarattar are proprietors or owners of the land. They are entitled to a pro-portion of the produce as owners of lands. The landholder may be the state or may be a private individual. There were crown lands apart from lands owned by private individuals. If they were crown lands the melvaram went to the crown. If they were privately owned lands, the Melvaram went to these private proprietors. Hence melvaram cannot be solely restricted to crown's share of the produce. In the case of crown lands, it was certainly the crown's share.'[১৫৪] ড. বার্নেট বা ড. দীক্ষিতের প্রদত্ত ভাষ্য তামিল ভাষাভাষী অঞ্চলের জন্যে বিশেষ করে ভারতের তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কার জাফনা উপদ্বীপের ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে যে অর্থই বহন করুক না কেন, বাংলার জন্যে যে 'উপরি-কর'-এর সংজ্ঞার্থ নির্দেশের বেলায় এটি প্রযোজ্য নয়, তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কারণ, প্রথমত 'in almost all the Pala and Sena grants, where the term occurs along with bhaga or kara, which more probably imply the standard royal share, this interpretation cannot stand.'[১৫৫] বস্তুত 'ভাগ', 'কর' ইত্যাদির পাশাপাশি একই সঙ্গে এটির ব্যবহারের ফলে স্বভাবতই ধরে নেয়া যায়, 'উপরি-কর' পূর্বালোচিত 'ভাগ' অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যে রাজা তথা রাষ্ট্রের অংশীদারিত্ব বা অংশ ছিল না, বরং তা ছিল ভিন্ন কোন কর বা রাজস্ব। দ্বিতীয়ত বাংলা ভাষার সর্বাপেক্ষা নিকটতম আত্মীয়—সংস্কৃত ভাষায় যেহেতু 'উপরি'-র উল্লেখ পাওয়া যায়, সেহেতু সংস্কৃতের অর্থেই একে গ্রহণ করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও নিরাপদ বলে মনে হয়। আগেই বলেছি সংস্কৃতে 'উপরি'-র আভিধানিকার্থ 'উপরে' বা 'অতিরিক্ত'।[১৫৬] উল্লেখ্য ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার 'উপরি-কর'-এর অর্থ সংস্কৃত ভাষার অর্থে 'Extra-cess' করেছেন।[১৫৭] ড. মাইতি ড. সরকারের মত সমর্থন করেছেন।[১৫৮] ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'নিয়মিত কর ছাড়া সময়ে অসময়ে রাষ্ট্র যে-সব কর নির্ধারণ করিতেন, অথবা ভূমি-রাজস্ব ছাড়া অন্যান্য যে সব অতিরিক্ত কর রাষ্ট্রকে দিতে হইত, তাহাই বোধ হয় উপরিকর।'[১৫৯] আমরাও মনে করি এটি ছিল মূল ভূমি-রাজস্বের

১৫৩ Journal of the Royal Asiatic Society, 1931, pp. 165, quoted from 'Economic Life of Northern India', pp. 85.
১৫৪ The Gupta Polity, Dr V R Ramchandra Dikshitar, pp. 167
১৫৫ Aspects of Economic History of Bengal, pp. 176
১৫৬ Economic Life of Northern India, pp. 85
১৫৭ Select Inscriptions, Vol. I., pp. 266, fn 5.
১৫৮ Economic Life of Northern India, pp. 85
১৫৯ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ১৯৯

অতি ক্ত কোন আদায়, যা সাধারণত জোর করেই অর্থাৎ রাজস্ব-প্রদানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগ্রহ কবা হত।

'উপরি-কর'-এর মত 'উদরঙ্গ'-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়েও ঐতিহাসিকগণ পরস্পরের সঙ্গে মতভিন্নতা প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য তাঁদের মতদ্বৈধতা এত বেশি যে, এর থেকে সঠিক ও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটি সংজ্ঞার্থ লাভ করা প্রকৃতই কঠিন। তবু আমরা বিভিন্ন মতের আলোচনার পাশাপাশি নিজস্ব একটি ধারণা (যেটিকে সমর্থন বলাই শ্রেয়) দেয়ার চেষ্টা করব।

ড. ব্যুহলর সর্বপ্রথম 'শাশ্বতকোষ' নামক বিখ্যাত একটি গ্রন্থের দুটি শব্দের,প্রতি ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যা 'উদরঙ্গে'র সমার্থক। শব্দ দু'টি হল 'উধার' ও 'উদগ্রস্থ'। এদের অর্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে ড. ব্যুহলরের ভাষায়ই ঐতিহাসিক Fleet 'উদরঙ্গ' বলতে বুঝিয়েছেন, 'the share of the produce collected usually for the King.'[১৬০] কিন্তু তাঁর এই সংজ্ঞা বাস্তব কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা 'উপরি-কর'-এর মত কোন কোন অনুশাসনে 'ভাগে'র পাশাপাশি একই সঙ্গে 'উদরঙ্গে'র প্রয়োগ থেকে সহজেই ধারণা করা যায়, এটি রাজার জন্যে উৎপন্ন শস্যের সমন্বিত কোন আদায় ছিল না। যেহেতু 'ভাগ' ছিল রাষ্ট্রের নিয়মিত ভূমি-রাজস্ব (regular land-revenue or tax), সেহেতু 'ভাগ' এবং 'উদরঙ্গ'—উভয়ের একত্র উল্লেখ থেকে আমরা নিঃসন্দেহে ধরে নিতে পারি, 'উদরঙ্গ' ছিল 'ভাগ'-এর অর্থাৎ নিয়মিত ভূমি-রাজস্বের অতিরিক্ত একটি কর।

ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল 'উদরঙ্গে'র অর্থ করছেন, 'Probably a tax on permanent tenants; fixed tax like klpta, paid in grains at least in some regions.'[১৬১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি 'উপরি-করে'র অর্থ করেছিলেন, 'tax paid by the temporary tenants.' ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার ড. ঘোষালের এই মত সমর্থন করে নতুন একটি সূত্রের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি মারাঠী শব্দযুগল 'উধার-জমাবন্দী' (স্মর্তব্য, 'উধার', 'উদগ্রস্থ')-এর উল্লেখ করেছেন, যার অর্থ 'an assessment of the total revenue of a village upon the proprietor, who is entitled to distribute the proportions among the peasants.'[১৬২] ড. সরকার ড. ঘোষালের ভাষায় 'উদরঙ্গে'র সংজ্ঞা দিয়েছেন।[১৬৩] এখানে ড. মাইতির বক্তব্যও উদ্ধার করা যায়। তিনি 'উদরঙ্গে'র সম্ভাব্য দু'টি অর্থের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'Two other suggestions can be offered for the plausible explanation of this fiscal term. If it is the same as dranga,[১৬৪] which, according to the Rajatarangini, is a watch station,

১৬০ Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol, III, pp.97-8, fn 6.
১৬১ Hindu Revenue System, pp. 423
১৬২ Quoted from 'Economic Life of Northern India', pp. 85
১৬৩ Select Inscriptions, Vol. I, pp. 371, fn 5.
১৬৪ এ সম্পর্কে Dr Puspa Niyogi বলেন, 'The term udranga may have been connected with dranga which means a watch-station or militray-station. The tax in question may have in that case been collected from places which were close

it can be taken as a sort of police tax levied on the district for the *maintenance of the local police station. It might also be suggested that it is* an anomalous derivative of the Sanskrit word 'udaka' and thus it may be a water-tax.'[১৬৫]

যা হোক পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক সূত্র ও যুক্তির মাধ্যমে 'উদরঙ্গ'-এর একটি আপাত গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করলেও আমরা তাঁদের অধিকাংশের সঙ্গেই একমত নই। বরং যতক্ষণ না অন্য কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এটা সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, 'উপরি-কর' ও 'উদরঙ্গ'—উভয়টিই ছিল ভূমিতে উৎপাদিত শস্যের সঙ্গে সম্পর্কিত মূল রাজস্বের অতিরিক্ত একটি কর—'It is undoubtedly clear that both stand for charges imposed by the state on the produce of the land and to venture beyond this seems to be audacious.'[১৬৬]

প্রাচীন বাংলায় পূর্বালোচিত রাজস্ব-করগুলি ছাড়াও আরও কতিপয় ভূমি বা তৎসম্বন্ধীয় কর প্রচলিত ছিল মনে করাটা অসঙ্গত হবে না, যদিও এতদবিষয়ক তাম্রানুশাসনিক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। অবশ্য এটাও এখানে অনস্বীকার্য প্রাচীন বাংলার ভূমি-ব্যবস্থা ও ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সংক্রান্ত যে কোন প্রত্যক্ষ দালিলিক প্রমাণের কথা বলতে গেলে আমরা সর্বপ্রথম প্রাপ্ত তাম্রানুশাসনের কথা বলি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অন্যবিধ প্রমাণ বিশেষ করে বাংলা-বহির্ভূত ভারতের অন্যত্র আবিষ্কৃত পট্টোলি, বৌদ্ধ জাতক ও অন্যান্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিতে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে এ বিষয়ে কিছু বলা যাবে না। তাছাড়া বাংলা যেহেতু সেই দূর পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ তথা অঞ্চলের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিশেষ করে ব্যবসায়িক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, এবং বাংলার শাসন ব্যবস্থা প্রায়শ বাংলা-বহির্ভূত দৈশিক কেন্দ্র থেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত, সেহেতু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলায় অনুসৃত ব্যবস্থার একটা মিল থাকা অসম্ভব নয়। অন্তত একটা সম্ভাবনা হিশেবে এ ধারণাকে আমরা একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না। মূলত এই দৃষ্টিকোণ থেকে এখন আমরা আরও কয়েকটি কর সম্বন্ধে নাতি-দীর্ঘ আলোচনা করবো। যদিও এগুলি সরাসরি ভূমি-রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তথাপি এদের উল্লেখ এখানে এই জন্যে জরুরি মনে

to drangas or from drangas themselves. If so, it is not to be regarded as an agricultural tax like bhaga, although it may have been collected from people residing in villages. Another probability may be considered in this connection. The element 'ranga' in the term used may not be devoid of the meaning in which it is generally understood. In that case udranga may have alternatively meant some kind of tax raised to meet the cost of some local festival periodically held.' (Contributions to the Economic History of Northern India : from the ninth to the twelfth century A. D.', pp. 187)

১৬৫ Economic Life of Northern India, pp. 85-6.

১৬৬ The Gupta Polity, pp. 168

করি, পরবর্তীকালে বিশেষত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবার পর যখন জমিদারদের প্রভাব ও প্রতাপ দোর্দণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল, তখন এই সমস্ত নব্য স্বৈরাচারীগণ নিজেদের কঠোর আধিপত্যের মধ্যে এমন সব অবৈধ ও অনৈতিক, ফলত উৎপীড়ক কর ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল, যেগুলির মূল ছিল বর্ণিতব্য করগুলির মধ্যে। এই করগুলির মধ্যে অন্যতম হল—সীতা, উদক-ভাগ বা বিষ্টি ভিস্তি ও উৎসঙ্গ।

সীতা : আগেই দেখিয়েছি বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষে 'The state's income was derived from private lands and royal domains.'[১৬৭] এটা অবশ্য আজকের যুগেও সত্য। আভিধানিক অর্থে 'সীতা' হচ্ছে 'লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা'[১৬৮], কিন্তু ভূমি-বিষয়ক আলোচনায় এটি হল রাজার তথা রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তি। ড. ঘোষালের ভাষায়, 'সীতা' হচ্ছে 'produce of the royal farms similar to khas Mahal lands.'[১৬৯] আজকের প্রেক্ষাপটে 'সীতা'র সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি, মূলত এটি ছিল রাষ্ট্রের নিজ স্বত্বদখলীয় ভূমিতে অস্থায়ীভাবে অন্যের ভোগের ফলে আদায়কৃত ক্ষতিপূরণজাত এক ধরনের ভূমি-রাজস্ব। প্রকৃত প্রস্তাবে 'সীতা' (Crown Lands) প্রায়শ ভাড়াটে মজুর, ক্রীতদাস ও বন্দিদের দ্বারা এবং কখনো কখনো রাজ্যান্তর্গত কৃষি-প্রজাদের মাধ্যমে চাষাবাদ করানো হত এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্র উৎপন্ন শস্যের বা দ্রব্যের অর্ধেক রাজস্ব (ব্যবহারের বা ভোগের ক্ষতিপূরণ হিশেবে) গ্রহণ করত।

উদক-ভাগ ঃ 'উদ' বা 'উদক' বা 'দামদক্ '—অস্ট্রিক ভাষার শব্দের দক্ অর্থ জল, এবং তা থেকে উদক সংস্কৃত শব্দের সৃষ্টি।[১৭০] কৌটিল্য তাঁর বিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্রে' 'উদক-ভাগ' বলতে বুঝিয়েছেন, 'a tax which was generally levied on irrigation,'[১৭১] ড. এম এইচ গোপাল ও ড. এ এন বসু কৌটিল্যের উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ড. লালনজী গোপাল, ড. রামশরণ শর্মা প্রমুখ এই মত সমর্থন করেননি। তাঁদের বক্তব্যের মোদ্দা কথা হল, যেহেতু চাষাবাদে সেচ সুবিধা নিশ্চিত করা তথা প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করা রাষ্ট্রের কর্তব্য এবং প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্র তা মোটামুটি করে আসছে, সেহেতু নদনদীতে, খালে বিলে সহজলভ্য এই জলের জন্য কোন রূপ করারোপ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। যা হোক, এ সম্পর্কে আমাদের মত হচ্ছে সম্ভবত 'উদক-ভাগ' ছিল রাষ্ট্রকর্তৃক কৃত্রিমভাবে কোন ভূমিতে বিশেষ করে কৃষি ভূমিতে জল সেচ ব্যবস্থার ফলে ব্যবহারকারীর কাছ থেকে আদায় যোগ্য কোন জমা বা জলকর। তবে এ ব্যাপারে

১৬৭ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 292.
১৬৮ শব্দবোধ অভিধান, আশুতোষ দেব, পৃষ্ঠা ৮৪৫
১৬৯ Hindu Revenue System, pp. 420.
১৭০ আমাদের পদবীর ইতিহাস, লোকেশ্বর বসু, পৃষ্ঠা ১৫
১৭১ AS. II, 24, quoted from 'Economic History of Mithila', pp. 65

'there is no doubt that Udakabhaga was irrigation tax which formed a source of royal revenue.'[১৭২]

বিষ্টি : সরল কথায় 'বিষ্টি' হচ্ছে 'বেগারি'[১৭৩] , হারি, হালিকাকর ইত্যাদি। ড. নরেন্দ্র নাথ খের বলেন, 'Visti is a compulsory contribution of labour, which the people are made to render to the state.'[১৭৪] বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে এটা অনেক সময়ে দেখা গেছে, 'much and in some civilizations most of the labour was compulsory or forced.'[১৭৫] 'বিষ্টি'ও ছিল এ ধরনের 'forced labour'। অতীতে এটা যদিও রাষ্ট্রের বা জনসাধারণের বৃহত্তর প্রয়োজনে—'for the objects of public utility, in warfare and other establishments of the state'[১৭৬] —প্রযুক্ত হত কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ করে জমিদারির যুগে 'বিষ্টি'র নবতর সংস্করণ হিশেবে 'বেগারি', 'হারি' ইত্যাদি অধিকাংশ সময়েই জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূস্বামীদের নিতান্তই ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিষ্পন্ন হত। প্রসঙ্গত বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'-এর কথা বলা যায় যেখান থেকে আমরা জানতে পারি, 'that peasant women were compelled to perform unpaid work of various kinds, viz., filling of the granaries of the village headman, taking things in and out of the house, cleaning the houses, working in the fields, purchasing of cotton, wood, flax, hem and thread, and the purchase, sale and exchange of various articles.'[১৭৭] ফলত সেই প্রাচীনকালেই 'এর (বিষ্টি) দ্বারা কৃষককে শোষণের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।'[১৭৮] যা হোক, এখানে ড. এম এইচ গোপালের 'বিষ্টি' সম্পর্কিত একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে এর আলোচনা শেষ করবো। ড. গোপাল বলেন, 'visti does not appear to have been in lieu of any taxes that had to be ordinarily paid, but was in the nature of an additional tax.'[১৭৯]

১৭২ Economic History of Mithila, pp. 65

১৭৩ বাংলায় বেগারি যে বিভিন্ন রকমের ছিল তার প্রমাণ পাওয়া পাওয়া প্রাপ্ত পট্টোলি তথা ভূমি দানের শাসনগুলি থেকে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'ভারতের সামন্ততন্ত্র', ড. রামশরণ শর্মা, অনুবাদ শিবেশকুমার চট্টোপাধ্যায়।

১৭৪ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 300

১৭৫ Encyclopedia Britanica, 11th Ed, Vol. XVI, pp. 7, quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 300

১৭৬ কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে জানা যায় ঃ'it was employed in the warfare for cleaning the camp, the roads, the bridges, wells and landing stages, carrying machines, weapons, armour, instruments and provisions, the wounded soldiers from the battle-field.' 'স্কন্দ-পুরাণ' থেকেও প্রমাণিত হয় শত শত লোককে নেহায়েত উৎপাদনের কাজে বেগার খাটতে বাধ্য করা হত।

১৭৭ Economic History of Mithila, pp. 72-3

১৭৮ প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, ড. রণবীর চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১৭৭

১৭৯ Mauryan Public Finance, pp. 105

উৎসঙ্গ ঃ আমরা জানি যে, 'Presents and royalties have always formed a chief source of income to the monarchical states,'[১৮০] 'উৎসঙ্গ' ছিল এই জাতীয় একটি জমা যা সচরাচর রাজ্যাভিষেককালে ও রাজ সমীপে কোন দেনদরবার তথা আবেদন পেশ করার সময়ে অর্থাৎ রাজসন্দর্শনের উপহার সামগ্রী হিশেবে প্রদত্ত হত। ড. শ্যামাশাস্ত্রী 'অর্থশাস্ত্রে'র আলোকে 'উৎসঙ্গে'র একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে, 'tax specially collected on the occasion of the birth of a prince.'[১৮১] প্রসঙ্গত স্ট্রাবো'র এতদসম্পর্কিত ভাষ্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি জানিয়েছেন, 'in a great ceremony of hair washing by the king, the people used to send large presents to him and every one tried to surpass his companion in displaying his wealth.'[১৮২]

'মহাভারতে'র বিভিন্ন সূত্র থেকেও প্রতীয়মান হয় রাষ্ট্রের জনহিতকর কার্যে প্রজাসাধারণ স্বেচ্ছায় স্বপ্রণোদিত হয়ে রাজসমীপে অর্থসম্পত্তি দান করেছেন। মূলত এটিও ছিল এক ধরনের 'উৎসঙ্গ' কর। ড. আকীক তাই যথার্থই বলেন, 'all these offerings were really a tribute paid by the subjects, and utsanga, therefore, appears to have been a tax collected only occa sionally.'[১৮৩]

পরিশেষে দ্বিরুক্তি জেনেও আমরা একটি কথা নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আর তা হল, পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিক যুগে বিশেষ করে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত জমিদারি ব্যবস্থায় বাংলার আপামর কৃষক-রায়তের ওপর যে সকল রাষ্ট্র-অননুমোদিত এবং অনৈতিক, ফলত উৎপীড়নধর্মী কর আরোপ করা হয়েছিল, তার বীজ প্রচ্ছন্ন ছিল প্রাচীন যুগের এই জাতীয় রাজস্ব বা কর ব্যবস্থায়।

১৮০ Agrariam and Fiscal Economy. pp.337.
১৮১ AS : 11 : 15, Eng Trn, pp. 99 (5th Edn).
১৮২ Strabo XV, 1.69, quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 337.
১৮৩ Economic History of Mithila, pp. 73.

তৃতীয় অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব প্রশাসন (প্রাচীন যুগ)

এ পর্যায়ে আমরা মূলত দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। প্রথমত প্রাচীন বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসন অর্থাৎ যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থা ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ভূমি-রাজস্ব আদায় করত সেগুলি নিয়ে। দ্বিতীয়ত এদের আদায়কৃত রাজস্বের হার বা পরিমাণ সম্পর্কে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূমি রাজস্বের প্রকৃত মাত্রা কী হওয়া উচিত ছিল, সেটাও তৎকালীন বিভিন্ন যশস্বী লেখক ও তাঁদের লভ্য গ্রন্থাদির আলোকে বিশ্লেষণ করে দেখানোর চেষ্টা করবো। তবে বরাবরের মত অবিভক্ত ভারত তথা বাংলার পটভূমিতেই এটি আলোচনা করে আমাদেরকে বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপনীত হতে হবে, যা বলাইবাহুল্য।

প্রাচীন বাংলার ভূমি-রাজস্ব আদায়ী সংগঠন বা প্রশাসনযন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার শুরুতে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নেয়া দরকার, তা হচ্ছে : 'We hardly know of any machinery created for revenue collection during theVedic period. It is very doubtful whether the term bhagadugha used in later Vedic texts can be understood in the sense of milcher of the share or tax-collector. Most probably, in view of the distributive functions of tribal societies, the bhagadugha distributed the spoils, cattle, cereals, etc., received by the later Vedic chieftain, commonly called rajan. But in post-Vedic northern India,especially in the middle Gangetic basin, we come across half a dozen officers who worked as tax-collectors.'[১]

বর্তমানের মত প্রাচীন বাংলার ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনকে প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক কেন্দ্রীয় রাজস্ব প্রশাসন (বাংলাদেশ যেহেতু একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র এবং এখানে প্রদেশের অস্তিত্ব নেই, সেহেতু ভূমি মন্ত্রণালয়কে আমরা এক্ষেত্রে কেন্দ্রের মর্যাদা দিতে পারি), এবং দুই. প্রাদেশিক রাজস্ব প্রশাসন (আধুনিককালের বিভাগ ও তৎনিম্ন পর্যায়ের রাজস্ব প্রশাসনকে এর সমগোত্রীয় বিবেচনা করা যায়)। মূলত এই উভয় স্তরের

১ Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, Dr. Ram Sharan Sharma, pp. 209.

মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন পদ ও পদবির রাষ্ট্রীয় আধিকারিক বা রাজকর্মচারীগণ ভূমি রাজস্ব আদায় ও তার হার বা পরিমাণ এবং পদ্ধতি নির্ধারণের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রসঙ্গত এটাও এখানে স্মরণ রাখা দরকার, পর্যালোচ্য পদসমূহ প্রাচীন বাংলা ও ভারতে রাজত্বকারী বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে সংকুচিত (স্থিত পদের সংখ্যা কমিয়ে বা বিলুপ্ত করা অর্থে) বা প্রসারিত (স্থিত পদের পাশাপাশি অতিরিক্ত তথা নতুন পদ সৃষ্টি অর্থে) হত এবং পদের নাম—পদবিও পরিবর্তিত হত।

মৌর্য যুগে যখন শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তখন তার অধীনে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যে সব রাজস্ব প্রশাসনিক কর্মচারী ছিল তাদের পরিচিতি সম্পর্কিত বর্ণনা মোটামুটি দু'টি উৎস থেকে পাওয়া যায়। প্রথমত বৈদেশিক উৎস, যার মধ্যে প্রধান হল গ্রীক ও ল্যাটিন লেখকদের রচনা ও ভ্রমণপঞ্জি; দ্বিতীয়ত কৌটিল্যের বিখ্যাত 'অর্থশাস্ত্র' ও সমকালীন অপরাপর রচনাবলী। বলাবাহুল্য 'অর্থশাস্ত্র'কেই আমরা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বলে মনে করি।

গ্রীক-ল্যাটিন লেখক-ঐতিহাসিকদের মধ্যে ডায়োডোরাস সিকিউলাসের 'Bibliotheke', মেগাস্থিনিস ও অ্যারিয়ানের 'The Indika', স্ট্রাবোর 'Geography' প্রভৃতি গ্রন্থের বিক্ষিপ্ত প্রক্ষেপসমূহে মৌর্য শাসনকালীন রাজস্ব প্রশাসনের যে চিত্র বিধৃত হয়েছে, তা একত্রিত করলে নিম্নোক্ত রাজপুরুষদের অস্তিত্ব ও ধারাক্রম লক্ষ করা যায়।

"(1) 'The Councillors', 'Assessors' and 'Deliberators' or 'Advisors'.
(2) The 'Treasurers of the State' and 'Superintendents of treasury'.
(3) Agronomoi (District Officials).
(4) Astynomoi (City or town officials).
(5) The 'Inspectors' and 'Overseers'."[২]

প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপদেষ্টবৃন্দ সম্ভবত ছিলেন রাষ্ট্রের সচিব বা অমাত্যবর্গ যাঁদের পদমর্যাদা ছিল মন্ত্রী বা তদূর্ধ পর্যায়ের। ধারণা করা হয় এঁরা 'অর্থ', 'ধর্ম', 'কাম' প্রভৃতি ইহজাগতিক লোভ-লালসার ঊর্ধে ছিলেন। মূলত ব্যক্তিসত্তার ঊর্ধে উঠে একমাত্র রাষ্ট্রের হিতের জন্যেই যেন তাঁরা কাজ করতে পারেন এবং নিজেদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানবুদ্ধি-বিবেচনা জনস্বার্থে ব্যয়িত করতে পারেন—এদের নিয়োগকালে এটাই মুখ্য বিবেচ্য হত। স্বভাবতই রাষ্ট্রীয়-দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা ও রাজস্ববিষয়ক নীতি নির্ধারণে উপদেষ্টাবৃন্দের পরামর্শকে সম্রাট কতোটা গুরুত্ব দিতেন, তা সহজে অনুমেয়। এখন গ্রীকসূত্র ধরে এঁদের ক্ষমতা ও কার্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, 'the Ministers and Councillors were the great forces to guide the king on all financial matters in normal or in an emergent period... (they) had extensive powers of appointing all the high officers of the state such as governors, chiefs of provinces, deputy governors, superintendents of the treasury or the treasurers of the state, admirals of the navy, generals of the army, controllers of expenditure and the chief Magistrates etc., etc.'[৩]

২ Quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy in the Mauryan and post-Mauryan Age (324BC–320AD)', pp. 271

৩ Ibid., pp. 273.

রাষ্ট্রীয় কোষাগারের প্রধান অধ্যক্ষ বা তত্ত্বাবধায়ক বলতে ডায়োডোরাস ও অ্যারিয়ান এক কথায় বুঝিয়েছেন কেন্দ্রীয় কোষাগারের মুখ্য আধিকারিককে। 'অর্থশাস্ত্রে' একে 'সন্নিধাতা', যিনি 'সমাহর্তা'র অধীনে ছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে। 'অর্থশাস্ত্র' ও অন্যান্য-সমসাময়িক সূত্র থেকে জানতে পারি, যে সকল উচ্চস্থানীয় অমাত্য দুর্নীতি ও এবম্বিধ অনৈতিকতা থেকে মুক্ত ছিলেন, একমাত্র তাঁরাই এই পদ অলঙ্কৃত করতেন। এঁর প্রধান কাজ ছিল, 'to receive various articles into the royal treasury both in kind as well as in cash'.[৪] এ ব্যাপারে রাজ্যব্যাপী বিস্তৃত অধীন সহযোগীদের সহায়তা তিনি লাভ করতেন। মৌর্য পরবর্তী যুগে একই পদবির অন্য যে সমস্ত নামের প্রচলন হয়েছিল তার কয়েকটি যেমন 'গঞ্জভর', 'কোষ্ঠাগারিক', 'ভাণ্ডাগারিক' প্রভৃতি।

স্ট্রাবো মৌর্য যুগের আরও যে তিন ধরনের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর নামোল্লেখ করেছেন— 'under the general designation of the Magistrates',[৫] এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন 'অগ্রনময়'। এঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখনীয় কাজ ছিল, 'to keep the rivers improved and the land remeasured, ..and inspect the closed canals from which the water is distributed into the conduits, in order that all may have an equal use of it. The same men... also collect the taxes and superintendend the crafts connected with the land... they make roads, and at every ten stadia place pillars showing the by-roads and the distances.'[৬] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, অশোকলিপি ও বিভিন্ন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে বর্ণিত 'রজ্জুক' বা 'রজ্জুগাহক অমাক্কা' তথা 'রাজুক' (Rajukas)* -দের সঙ্গে স্ট্রাবো কথিত 'অগ্রনময়'দের দায়িত্ব-কর্তব্যের সাদৃশ্য পাওয়া যায়।[৭]

৪ Ibid., pp. 274.
৫ Ibid., pp. 275.
৬ Strabo XV, 1.50., quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', pp. 276
* 'রাজুক' বা 'রজ্জুক'দের পরিচয় সম্পর্কে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কথা বলেছেন। ড. ভি. এ. স্মিথ এর মতে, 'Rajuka was a governor next below the rank of a kumara'. তিনি আরও বলেন, 'the word Rajuke or Raju (Mansehra Rock Edict) is etymologically connected with Raja.' ('Asoka', pp. 94)। ড. কাশীপ্রসাদ জয় সোয়াল বলেন, 'রাজুক'রা ছিল, 'the rulers or Ruler-ministers, the committee of the parisa vested with real executive powers over the empire.' ('Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Patna,' 1918, pp. 42).। ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী, ড. ভি. আর রামচন্দ্র দীক্ষিতর, ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল এঁদের সঙ্গে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, 'রাজুক'রা ছিল, 'ordinary provincial governors'। 'রাজুক'দের উৎপত্তি ও ভূমিকা সম্বন্ধে ড. ঘোষাল বলেন, 'In the period of small states preceding the unification of Northern India into a single Empire, the Rajjuka was the title of a petty land-surveyor entrusted with the task of measuring the fields for Government revenue... With the rise of the Magadhan Empire and the consequent expansion of the administrative machinery, the Rajjuka was evidently entrusted with a wide jurisdiction, and was given high judicial functions probably in addition to his older duties as revenue or settlement officer.' ('The Beginnings of Indian Historiography and other Essays', pp. 62).
৭ Agrarian and Fiscal Economy, pp. 276

স্ট্রাবো বর্ণিত 'অস্ত্যনময়' (Collector of the City or Town; ছয়টি অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান) এর অপরাপর কাজের মধ্যে একটি ছিল বিক্রীত জিনিসের ওপরে কর আদায় করা। এছাড়া অন্য দু'টি বিভাগের কাজ ছিল সুনির্দিষ্ট করারোপের লক্ষ্যে জন্ম-মৃত্যুর তদন্ত ও তার পরিসংখ্যান সংরক্ষণ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য, ওজন ও পরিমাপ-এর ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা।

স্ট্রাবো'র উল্লিখিত শেষোক্ত শ্রেণীর রাজকর্মচারী অর্থাৎ Inspectors ও Overseers —এঁরা যদিও ভূমি-রাজস্ব ও অন্যবিধ কর আদায়ের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না, কিন্তু তারপরও রাজস্ব আদায়ের যথাযথ ব্যবস্থাপনার ওপর তাঁদের একটা গোপন খবরদারি ছিল, যে কারণে আদায় প্রক্রিয়ায় ফাঁকি বা কম দেখানোর প্রবণতা কর্মচারীদের মধ্যে সহজে পরিলক্ষিত হত না। কারণ এই জাতীয় অনিয়মের শাস্তি ছিল নির্মম ও অবধারিত। অন্যদিকে রাজস্ব-প্রদাতাগণ যেন উপযুক্ত সময়ে (যেমন ফসলের মৌসুমে) এবং সুনির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করে সেটাও তাঁরা পর্যবেক্ষণ করতেন। 'অর্থশাস্ত্রে' এই কারণে এঁদেরকে 'গূঢ়পুরুষ' ও 'চর' নামে অভিহিত করা হয়েছে। কৌটিল্যের অনুসরণে এঁদের ভূমিকা সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর 'Chandra Gupta Maurya and His Times' গ্রন্থে। তিনি বলেন, 'The Revenue Minister also enforced the working of this administrative system by appointing Inspectors to go about the country in disguise as Informers to inspect the Records and Accounts kept by the District and Village Officers regarding the cultivated fields, homesteads (griha) and families (kula); (a) fields under the heads of area and output (mana-sanjatabhyam kshetrani); (b) households under the heads of revenue assessed (bhoga) and remmissions (parihara); and (c) families under the heads of caste, occupation, number of members (janghagra, counted as per pair of feet and not per head), income and expenditure.'[৮] এখানে একটা বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'the institution of spies was a novel innovation of espionage to minimise embezzlement of revenue collections.'[৯] এখন সমসাময়িক যুগে এতদ্দেশীয় লেখকদের প্রণীত গ্রন্থ বিশেষ করে 'অর্থশাস্ত্র' ও অন্যান্য ভারতীয় সূত্রের ওপর ভিত্তি করে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি রাজবংশের শাসনামলে ভারত তথা বাংলার রাজস্ব প্রশাসনের একটা সাধারণ রূপরেখা দাঁড় করাবার চেষ্টা করবো এবং তৎপর বিস্তারিত আলোচনায় ব্রতী হবো।

কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' আমরা প্রধানত নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীর রাজস্বসংযুক্ত রাজপুরুষের অস্তিত্ব দেখতে পাই। যথা :

ক. গোপ;

খ, স্থানিক বা স্থানীয়;

গ. সমাহর্তা ও তাঁর অধীন বিভিন্ন অধ্যক্ষ।

৮ pp. 129

৯ Agrarian and Fiscal Economy, pp.282

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কৌটিল্যবর্ণিত রাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সঙ্গে সমসাময়িক বাংলায় প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার যে সাদৃশ্য ছিল, তারই বা প্রমাণ কী? যদিও এ কথা ঠিক যে, চুল-চেরা বিশ্লেষণে আমরা বাংলার তৎকালীন এবং বিশেষত পাল ও সেনযুগের রাজস্ব ব্যবস্থার যথাযথ ও স্পষ্ট বর্ণনা পাই না—'though we are unable to define the nature and scope of various departments into which the administration was divdided', তথাপি ড. মজুমদারের ভাষায় বলতে পারি, 'The list of officials mentioned in the Pala records points to a similar organisation' (as described in the Kautily's Arthasastra).[১০]

মৌর্যশাসক মহামতি অশোকের রাজত্বকালে কৌটিল্য নির্দেশিত ব্যক্তিগণ ছাড়াও আরও তিন ধরনের রাজকর্মচারী ছিল যাদের প্রধান কাজ ছিল অর্থ ও রাজস্বসংক্রান্ত। এরা হলেন :

ক. অন্ত-মহামাত্র (সীমান্তবর্তী এলাকার রাজস্ব সংগ্রাহক);
খ. প্রাদেশিক ও
গ. যুত।

মৌর্য পরবর্তীকালের লিপি-অনুশাসন ও অন্যান্য সূত্রগুলিতে আরও যে সব রাজস্ব কর্মচারীর বিক্ষিপ্ত উল্লেখ দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল :

ক. গৌল্মিক;
খ. গ্রামপতি;
গ. দশগ্রামিক;
ঘ. বিশগ্রামিক ও
ঙ. শতাধ্যক্ষ প্রভৃতি।

যা হোক, এ যাবৎ বর্ণিত বিভিন্ন পদ ও পদবির রাজস্ব অমাত্য-কর্মচারীদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার লক্ষ্যে আমরা এখন দু'টি প্রধান তথা এক. কেন্দ্রীয় এবং দুই. প্রাদেশিক (বিভাগ, জেলা ইত্যাদি স্তরবিশিষ্ট) ধারায় বিভক্ত করে অগ্রসর হতে চেষ্টা করবো।

কেন্দ্রীয় রাজস্ব প্রশাসনের শীর্ষবিন্দু ছিলেন রাজা বা সম্রাট; তাঁকে কেন্দ্র করেই দেশের সামগ্রিক প্রশাসনযন্ত্র আবর্তিত হত। 'The main powers and responsibilities of the government must have been in the hands of a central executive body acting directly under the supervision of the king.'[১১] সম্রাটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে প্রধান নির্বাহী রাজস্বসংক্রান্ত কার্যাদি পরিচালনা করতেন তিনি ছিলেন 'সমাহর্তা'[১২]

১০ History of Bengal, Vol. I., pp. 276. ড. নীহাররঞ্জন রায়ও অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেন, 'বাঙলার সমসাময়িক (প্রাচীনকালীন) রাষ্ট্র-বিন্যাসে কৌটিল্য রাষ্ট্রনীতির প্রভাব অনস্বীকার্য।' (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

১১ History of Bengal, Vol. I., pp. 276-77.

১২ 'অর্থশাস্ত্রে' কখনো এঁকে 'রাজকরাদির সংগ্রহকারী প্রধান অধ্যক্ষ' (দ্বাদশ অধ্যায়); কখনো 'উৎপন্ন আয়ের সমাহরণকারী প্রধান রাজপুরুষ' (ষষ্ঠ অধ্যায়); কখনো 'সর্বপ্রকার আয়স্থান হইতে রাজার্থের সম্যক্ আহরণকারী মহামাত্র' (পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়) বলা হয়েছে।

—'Collector-general of revenue in all its brances.'[১৩] আধুনিককালের একজন Cabinet Minister-এর পদমর্যাদার রাজপুরুষ ছিলেন তিনি।[১৪] কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে 'সমাহর্তা' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। সমাহর্তা প্রথমত দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, সেতু, বন, ব্রজ ও বণিকপথ—এই সাতটি বিষয়ের দেখাশুনা করতেন; তিনি এগুলি থেকে ধনাগম কিভাবে ঘটতে পারে সে সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ পূর্বক নীতি নির্ধারণ করতেন। দ্বিতীয়ত যেটি 'সমাহর্তা'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল বলে মনে হয়, তা কৌটিল্যের ভাষায়, 'সমাহর্ত্তা (সর্ব্বপ্রকার আয়স্থান হইতে রাজার্থের সম্যক্ আহরণকারী মহামাত্র) জনপদকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, (প্রত্যেক বিভাগস্থিত) গ্রামসমূহকেও উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপে কল্পনা করিয়া ভাগ করিবেন, এবং সেগুলির প্রত্যেকটির ও গ্রামমণ্ডলীর পরিমাণ নিবন্ধপুস্তকে লিপিবদ্ধ করাইয়া রাখিবেন, এবং কোন্ কোন্ গ্রাম পরিহার (অর্থাৎ রাজকর-মুক্তি) ভোগ করে, কোন্ গ্রাম (প্রতি বৎসর) কতসংখ্যক আয়ুধীয় (আয়ুধধারী সৈনিক) পুরুষ প্রদান করে, আবার কোন্ কোন্ গ্রাম রাজকরের পরিবর্ত্তে কত পরিমাণ ধান্য, (গবাদি) পশু, হিরণ্য (নগদ টাকা), কুপ্য (কাষ্ঠাদি দ্রব্য) ও বিষ্টি (রাজকীয় কার্য্য করার জন্য কর্ম্মকর) নিয়তভাবে প্রদান করে—তাহাও পৃথক পৃথক নিবন্ধ-পুস্তকে লিখাইয়া রাখিবেন।'[১৫]

'সমাহর্তা'র সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীনে বেশ কয়েকজন অধ্যক্ষ ছিলেন যারা এক-একটি রাজস্ব বিভাগ তত্ত্বাবধান করতেন। কৌটিল্য এদের যে তালিকা গ্রন্থিত করেছেন তা নিম্নরূপ :

১. শুল্কাধ্যক্ষ;
২. সীতাধ্যক্ষ;
৩. অরণ্যকৃত্;
৪. গোধ্যক্ষ;
৫. বিবীতাধ্যক্ষ;
৬. মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি।

শুল্কাধ্যক্ষের মূল কাজ ছিল 'কোন পণ্যের উপর কতখানি শুল্ক দিতে হইবে ইহার ব্যবস্থা' এবং 'নতুন ও পুরাতন পণ্যের উপর বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন জাতির আচারানুসারে শুল্ক' নির্ধারণ করা। এতদসহ রাষ্ট্রের মধ্যে 'সেই সব পণ্যজনিত (শুল্কারোপিত) কোন অপকার সম্ভাবিত হইলে তজ্জন্য অত্যয় বা দণ্ডেরও ব্যবস্থা' করা।[১৬]

সীতাধ্যক্ষ ছিলেন রাজার নিজস্ব ভূ-সম্পত্তির দেখভালকারী (Superintendent of the Crown-lands). তাঁর অন্যতম কর্তব্য ছিল, 'to cultivate them (crown-lands) either directly through labourers or indirectly through tenants by leasing them

১৩ Contributions to the History of the Hindu Revenue System, pp. 419.
১৪ State and Government in Ancient India, pp.198.
১৫ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, ড. রাধা গোবিন্দ বসাক অনূদিত, পৃষ্ঠা ২১৮-২১৯
১৬ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৩

out.'[১৭] অরণ্যকৃত্ বা আটবিক রাষ্ট্রের সমুদয় বনজঙ্গল বা অরণ্যের দেখাশুনা করতেন—'It was his duty to develop the forest resources of the state.'[১৮]

গোধ্যক্ষ মূলত ৮ প্রকার কাজের সমন্বয় করতেন। যথা–'(১) বেতনোপগ্রাহিক, (২) করপ্রতিকর, (৩) ভগ্নোৎসৃষ্টক, (৪) ভাগানুপ্রবিষ্টক, (৫) ব্রজপর্য্যগ্র, (৬) নষ্ট, (৭) বিনষ্ট ও (৮) ক্ষীরঘৃতসঞ্জাত।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'Superintendents of the state herds (godhyaksha) consisting of cows, buffaloes and elephants, for whose grazing a portion of the state forests was assigned, must have worked in close cooperation with the superintendent of forests.'[১৯]

বিবীতাধ্যক্ষ হল 'গোচারণার্থ তৃণযুক্ত প্রদেশের আবেক্ষণকারী অধ্যক্ষ'।[২০] তাঁর আর একটি পরিচয় ছিল পতিত ও অনাবাদী ভূমির দেখভালকারী হিশেবে। তাঁর মুখ্য দায়িত্ব ছিল, 'to develop and sell them (waste-lands), and also to prevent them from being use by undesirable persons for their nefarious ends.'[২১]

মহাক্ষপটলিক হলেন, 'The superintendent of land records, ... who kept an accurate record of the different fields and their boundaries, ... Officers working under this superintendent are known as simakaramakaras in Bihar, Pramatris in Bengal and simapradatris in Assam.'[২২] বলা যায় মহাক্ষপটলিক ও পুস্তপালদের প্রাচীনযুগীয় বিভাগটিই বিবর্তিত হয়ে আধুনিককালে জেলা মহাফেজখানা (District Record Room) এবং মাঠ পর্যায়ে তহসিল অফিসে (আংশিক) রূপান্তরিত হয়েছে।

প্রাদেশিক পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত রাজস্ব প্রশাসন যে সব স্তর নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল ভুক্তি, বিষয়, পৌর ও গ্রাম। এর বাইরেও কিছু স্তর (বিভাগ) ছিল। কিন্তু সেগুলির সংখ্যা বিভিন্ন যুগে অর্থাৎ মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন প্রভৃতি শাসনামলে বিভিন্ন রকম হওয়ায় সেগুলিকে আমরা এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছি না। তা সত্ত্বেও প্রাচীন বাংলার পূর্ণাঙ্গ রাজস্ব প্রশাসনিক চিত্র তুলে ধরার জন্যে আমরা এখানে মোটামুটি সব বিষয়েই আলোচনা করবো।

মৌর্যোত্তর পর্বে বাংলার সর্বাপেক্ষা আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ শাসনকাল হল গুপ্ত সম্রাটদের আমল (খ্রিস্টীয় ৩০০-৫৫০)। পূর্ববর্তী শাসকদের বিশেষ করে মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও অশোকের শাসনামলের রাজস্ব প্রশাসনের একটা ছায়াবশেষ গুপ্তযুগে লভ্য ছিল ধরে নিলেও এর আপাত প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল এ যাবৎ প্রাপ্ত গুপ্তামলীয় বিভিন্ন তাম্রানুশাসন বা লিপি। এগুলি বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গেছে। বিক্ষিপ্তভাবে এর পাঠোদ্ধার থেকে যে তথ্যসমূহ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ এখন পর্যন্ত সন্নিবেশ

১৭ State and Government in Ancient India, pp. 198.
১৮ Ibid., pp. 199
১৯ State and Government in Ancient India, pp. 199.
২০ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২১৭
২১ State and Government in Ancient India, pp. 199.
২২ Ibid., pp. 199.

করতে পেরেছেন, তাতে গুপ্তযুগের প্রশাসনের একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র পাওয়া যায়। এতে দেখা যায়—'For purposes of efficient administration the Gupta empire was divided into a number of administrative units which themselves, in their turn, were sub-divided into small ones, which may, for purposes of convenience, be called provinces, districts and villages. With regard to the formation of such territorial divisions for administrative purposes, it must be pointed out, it was not based on any scientific principle such as linguistic affinity or geographical contiguity, but largely on historical and political accidents. Hence as regards their size, resources and importance there appear to have existed much variation from province to province and from time to time. Further in the formation of provinces no novel or original procedure was adopted. The older geographical and political units were accepted as such by the Guptas and allowed to continue in the framework of the territorial divisions under them. Thus the territorial divisions that obtained under the Mauryas and the Kusans were also current in Gupta empire. Further no attempt appears to have been made by the Gupta emperors to give even a uniform name to the different administrative units in the empire. Hence we find in existence during the period different types of divisions with different names in the several parts of the empire.'[২৩]

দেশ, প্রদেশ, জনপদ

প্রজা হিতৈষণা ও শাসন কার্যের সুবিধার জন্যে প্রাচীন বাংলায় প্রায় প্রতিটা রাজবংশের শাসনামলে সমগ্র রাজ্য বা সাম্রাজ্যকে মোটামুটি কয়েকটি বৃহত্তর অংশে বিভক্ত করা হয়েছিল। সাধারণভাবে এগুলি 'প্রদেশ' নামে অভিহিত হত। প্রদেশের শাসক বা অধিকর্তাকে বলা হত 'প্রাদেশিক', 'প্রদেশকর্তা', 'প্রদেষ্ট', 'প্রদেশপাল' প্রভৃতি। 'প্রদেষ্ট' সরাসরি সম্রাট কর্তৃক বিশেষ একটি ক্যাডার (Official cadre)[২৪] থেকে নিযুক্ত হতেন এবং প্রায়শ এঁরা হতেন 'princes of the blood royal'[২৫]। রাজরক্তের প্রদেশপালদের উপাধি হত 'মহারাজপুত্র দেবভট্টারক'[২৬]। প্রদেশপালগণ স্বীয় কর্ম সম্পাদনে একটি অভিজ্ঞ অমাত্য-পরিষদ[২৭] বা রাজকর্মচারীযুত[২৮] -এর সহযোগিতা লাভ করতেন। প্রাচীন বাংলার প্রদেশগুলি যেহেতু ছিল, 'the largest administrative units' এবং আগেই

২৩ The Gupta Polity, pp. 229-30.
২৪ State and Government in Ancient India, pp. 321.
২৫ Age of the Nandas and Mauryas, Ed. by Dr. K.A. Nilakanta Sastri, pp. 182.
২৬ The Classical Age: The History and Culture of the Indian People, Vol. III., Bharatiya Vidya Bhavan, pp. 350.
২৭ State and Government in Ancient India, pp. 321.
২৮ 'The Head of the Province was attended by a staff of private secretaries to act as intermediaries between him and the administration, and communicate his orders to them.' (The Gupta Empire, pp. 152).

বলেছি যে, সর্বত্র এ গুলির নামে মিল ছিল না, সেহেতু আধুনিকালের অনেক ঐতিহাসিক একে 'দেশ' ও 'জনপদ' হিশেবেও চিহ্নিত করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। অবশ্য এঁদের ধারণার পক্ষেও লিপি বা অনুশাসনগত প্রমাণ বিদ্যমান। গুপ্ত শাসনামলীয় 'দেশ' সম্বন্ধে ড. ভি. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর বলেন, 'It is difficult to say anything definite about the size and importance of the desa during the period. The term which is a technical one ordinarily means a region, country, province etc., the exact meaning and bearing of which it is not possible to determine.'[২৯] মৌর্যযুগের প্রদেশকে 'জনপদ'রূপে গণ্যকারীদের অন্যতম হলেন ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী (Chandra Gupta Maurya and His Times p. 128) প্রমুখ। এঁরা সম্ভবত বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক ও বৈয়াকরণ পাণিনির এতদবিষয়ক মত দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। পাণিনির রচনা থেকে জানা যায়, পুরাকালে সমগ্র রাষ্ট্র তথা দৈশিক ভূখণ্ডকে কয়েকটি 'জনপদে' বিভক্ত করা হত—'Panini writes that the country was divided into 'Janapadas.' The derivative meaning of the term 'Janapada'* points to the early state of land taking by the 'Jana' for a settled way of life. ... The Janapadas which were originally named after the peoples settled in them, dropped their tribal significance and figured as territorial units and regions.'[৩০] সত্যি বলতে, 'A janapada broadly comprised of both urban and rural areas and was at once a geographical, political and cultural unit. These political units could be mainly classified under monarchical or ekaraja and republican or samgha polity.'[৩১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একই সম্রাট বা মহারাজাধিরাজের অধীন ভূখণ্ডগত বৃহত্তর প্রশাসনিক বিভাগ (Administrative unit) সূচনায় 'দেশ', 'জনপদ' ইত্যাদি যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, পরবর্তীকালে তা 'প্রদেশে'ই সংগঠিত হয়েছিল।[৩২] অবশ্য

২৯ The Gupta Polity, pp. 230
* ড. কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল 'জনপদ' বলতে—'Collective body' (Hindu Polity, pp. 270); ড. ভাণ্ডারকর—'Population' (Some Aspects of Hindu Polity, pp. 65); ড. রামচরিত প্রসাদ সিংহ 'People'—(Kingship in Northern India, pp. 7); ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় 'একাধারে ভূখণ্ড ও জনগোষ্ঠী' (ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা : প্রাচীন যুগ, পৃষ্ঠা ১৪৭)—বুঝিয়েছেন। 'মহাভারতে' ও কামন্দক প্রমুখ প্রাচীন শাস্ত্রীয় লেখকদের রচনায়ও 'জনপদ', 'জনগণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৩০ The Republican Trends in Ancient India, Dr Shobha Mukerji, pp. 9

৩১ Ibid., pp. 54. ড. ভি. আর. ভাণ্ডারকর 'জনপদ'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'the territory which was under the direct sway of the king is called janapada.' (Asoka, pp. 57).

৩২ ড. আলটেকর প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি মৌর্য যুগে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত বাংলায়ও সম্ভবত একজন প্রদেষ্টৃ বা প্রদেশপাল ছিল। (State and Government in Ancient India, pp. 321) প্রাদেশিক শাসকদেরও অনেক সময় 'মহাসামন্ত' বা 'মহামণ্ডলেশ্বর' বলা হত। সাধারণত তারা 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করতেন বলে ড. রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন (ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা ৭৮)। বাংলায় বিভিন্ন যুগে বিশেষত পাল ও সেন যুগে রাজপুরুষদের পদনামের উপসর্গ হিশেবে 'মহা' শব্দটির সংযোজনার ফলে প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত রাজকর্মচারীরাও ক্রমশ 'মহা-সামন্ত' ও

এখানে নতুন একটা তথ্য আমরা পাচ্ছি ড. নীহাররঞ্জন রায়ের বিখ্যাত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব' গ্রন্থ থেকে, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, মূলত 'জনপদ' ছিল সামন্ত নরপতি শাসিত[৩৩] ভূ-ভাগ। এই জনপদ বহির্ভূত, তাঁর ভাষায়, 'জনপদ ছাড়া বাকী দেশখণ্ড ছিল খাস রাষ্ট্রের অধিকারে'।[৩৪] প্রদেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা জরুরি, যেটা সাধারণত 'জনপদে' লভ্য নয় অর্থাৎ জনপদের ক্ষেত্রে শহর এবং গ্রাম—দুটো একই সঙ্গে সংযুক্ত থাকলে তথা একত্রে বেড়ে উঠলেও প্রদেশের বেলায় দু'টির ভিন্নতা ছিল খুব স্পষ্ট ও লক্ষণীয়—'The distinction between rural and urban administration must have prevailed in the provinces.'[৩৫] অন্যভাবে বলা যায়, রাজস্ব প্রশাসনের অন্যান্য স্তরগুলো ছিল প্রদেশেরই অন্তর্ভুক্ত ও নিম্নবর্তী, যেটা আজও আমরা দেখতে পাই।

এ পর্যায়ে প্রদেশপালের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করবো। প্রদেশপালের মূল কাজ ছিল 'to maintain law and order, collect the taxes for the central government, cooperate in the work of its different departments and keep a watch over the feudatories and frontier people. It reported the general situation to the centre and received instructions from the latter, which it used to transmit to the district headquarters, ...They were to develop their provinces by constructing and repairing works of public utility like tanks and roads and strengthen the foundations of the empire by promoting public confidence by their good and efficient administration. They could appoint their subordinate officers.'[৩৬] তবে 'What amount of local autonomy was enjoyed by the provinces is not disclosed by the available evidence.'

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করব। বিষয়টি হল, কেউ কেউ যেমন ড. উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল[৩৭], ড. নীহাররঞ্জন রায়[৩৮], ড. দীনেশচন্দ্র সরকার[৩৯] প্রমুখ জানান যে, গুপ্তযুগে 'প্রদেশে'র স্থলে রাষ্ট্রের প্রধান প্রশাসনিক বিভাগ

'মহারাজা'র শ্রেণীভুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন। শুধু তাই নয়, সত্যি বলতে এই যুগে 'মহা' উপসর্গযুক্ত পদাধিকারীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে বিভিন্ন অনুশাসন থেকে জানা যায় (ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা ১৬৫)।

৩৩ পৃষ্ঠা ৩২১

৩৪ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২১। তবে প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ্য যে, 'অর্থশাস্ত্র'-এর ভাষ্য মতে শহর ও গ্রাম নিয়ে 'জনপদ' গড়ে উঠলেও বস্তুত রাজধানী ছিল জনপদ-বহির্ভূত (The Mauryan Polity, Dr. V.R. Ramchandra Dikshitar, pp. 136)

৩৫ Age of the Nandas and Mauryas, pp. 182.

৩৬ State and Government in Ancient India, pp. 321-2, 346.

৩৭ The Classical Age, pp. 350.

৩৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২১

৩৯ Studies in the Political and Administrative Systems in Ancient and Medieval India, Dr. Dinesh Chandra Sircar, pp. 76.

(Administrative unit) ছিল 'ভুক্তি', যার মুখ্য আধিকারিক ছিলেন 'উপরিক'*, 'উপরিক মহারাজ' প্রভৃতি। কিন্তু ড. আলটেকর এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন, 'Provinces of the Gupta empire were known as Desas or Mandalas.'[৪০] তিনি নিজ মতের সমর্থনে কিছু অনুশাসনভিত্তিক তথ্যপ্রমাণও উপস্থাপন করেন। তবে আমরা এক্ষেত্রে ড. রাধাকুমুদ মুখার্জীর বক্তব্যটিকেই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। ড. মুখার্জী তাঁর বিখ্যাত 'The Gupta Empire' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৫১) প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, গুপ্ত-যুগে প্রদেশ (Province)-কে যেমন 'ভুক্তি' বলা হত, তেমনি 'প্রদেশ' এবং 'ভোগ'ও বলা হত।** 'ভোগ'-এর অধিকর্তাকে বলা হত 'ভোগিক'[f] (Bhogika), 'ভোগপতি' (Bhogapati), 'গোপ্তা' (Gopta), 'রাজস্থানীয়' প্রভৃতি।

ভুক্তি

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'ভুক্তি' বলতে বুঝায় 'to cut, to enjoy, to possess'; কিন্তু প্রায়োগিকার্থে প্রাচীন শাসনতান্ত্রিক কাঠামো বিচারে 'ভুক্তি'র অর্থ ছিল আরও ব্যাপক, আরও প্রত্যক্ষ। ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার বলেন, 'bhukti means primarily 'enjoyment of possession' and finally 'a province or a small district of a kingdom'. In Eastern India, the word bhukti indicated a bigger territorial or administrative unit which included several districts, though elsewhere (especially in South India) it was a smaller unit...'[৪১]

'ভুক্তি' বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই বলতে হয়, 'An equally important but probably smaller division than the desa was the bhukti which obtained in some parts of the empire.'[৪২] গুপ্ত শাসনামলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্দেশনার্থে সাধারণভাবে এ উক্তি করা হলেও ড. দীক্ষিতর-এর উক্ত বক্তব্যের শেষাংশটুকু অর্থাৎ

* সম্ভবত 'উপরি' নামক কর আদায় করতেন, তাই এই উপাধি। সম্রাট অশোকের যুগে 'উপরিক'গণ 'প্রাদেশিক' ও সাতবাহনদের রাজত্বকালে প্রদেশের প্রধান হিশেবে 'অমাত্য' নামে অভিহিত হতেন (The Classical Age, pp. 350). ডক্টর Chhabra 'উপরিক'দের ভূমিকা সম্বন্ধে বলেন, 'It is obvious that an Uparika was invested with two-fold authority, judicial and administrative. His office may, therefore, correspond to that of a Magistrate.' (Quoted from 'Ancient India' by Dr Vidya Dhar Mahajan, pp. 442-43).

৪০ State and Government in Ancient India, pp. 345.

** ড. প্রভাতাংশু মাইতিও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'The usual names of the provinces were Bhuktis, Desas and Bhogas.' (Studies in Ancient India, pp. 412)

f সম্ভবত 'ভোগ'-কর আদায় করতেন তাই এই উপাধি।

৪১ Studies in the Political and Administrative Systems in Ancient and Medieval India, pp. 166.

৪২ The Gupta Polity, pp. 231.

'which obtained in some parts of the empire'—কথাটি আলোচ্য ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি। কেননা পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি, প্রদেশ এবং ভুক্তিকে কোন কোন ঐতিহাসিক সমার্থক বলে দাবি করেছেন, কেউ কেউ ভিন্নার্থক তথা ভুক্তি অপেক্ষা প্রদেশ বৃহত্তর, এ মতও প্রকাশ করেছেন। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, যারা মূলত ভুক্তিকে প্রদেশের সমার্থক বলে মনে করেছেন, তাঁদের দাবি বা যুক্তির সমর্থন ছিল পূর্বোদ্ধৃত বাক্যের শেষাংশের তদানীন্তন বাস্তবতায়। এতে স্পষ্টত উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সম্পর্কিত অনুশাসনভিত্তিক প্রমাণাদিও রয়েছে যে, গুপ্ত যুগে সমগ্র সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ যেমন প্রদেশ নামে অভিহিত হত, তেমনি কোন কোন অংশ আবার ভুক্তি হিশেবেও গণ্য হত। এদের গঠন-কাঠামো বা শাসনতান্ত্রিক বিন্যাস ও প্রকৃতি প্রায় একই রূপ ছিল। এই হিশেবে কোন কোন ঐতিহাসিক প্রদেশ এবং ভুক্তিকে একার্থ বলে ধরে নিয়েছেন যা আপাত দৃষ্টিতে ভ্রমাত্মক মনে করার কোন কারণ নেই। তথাপি আমরা মনে করি যে, প্রাচীন বাংলায় ভুক্তি ছিল প্রদেশাপেক্ষা আয়তনে ছোট ও প্রদেশ বা দেশ-এর নিম্নস্তর কিন্তু অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের একটি প্রশাসনিক অঙ্গ বা বিভাগ। আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে একে 'বিভাগ' (Division)-এর সমস্থানীয় ধরা যায়। যদিও তৎকালীন বিভাগরূপী ভুক্তির প্রকৃত আয়তন ও চারিত্র্য সম্বন্ধীয় সঠিক কোন পরিসংখ্যান ও তথ্য আমাদের কাছে নেই—'it is difficult to say anything definite about the size and importance of the above (bhukti) territorial division,'[৪৩] তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার্য, 'It cannot however be doubted that it was bigger than a visaya which was in all likelihood the ancient proto-type of a modern district.'[৪৪] ভুক্তির আয়তনের ছোটবড় ছিল। উদাহরণস্বরূপ পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ও বর্ধমানভুক্তির নাম করা যায়। বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় প্রাপ্ত দামোদরপুর অনুশাসন থেকে জানা যায়, বর্তমান উত্তর বাংলাই ছিল পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি, এটি বর্ধমান ভুক্তি অপেক্ষা বৃহত্তর ছিল।[৪৫] কারও কারও মতে, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল তিনটি 'বিষয়' (জেলা); ভুক্তির প্রধান প্রশাসনিক অধিকর্তা ছিলেন 'উপরিক'[৪৬], তিনি মহারাজাধিরাজ কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন।[৪৭] ভুক্তির শাসনযন্ত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যায় না। তবে ধারণা করা যায় একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর শাসনযন্ত্রের অধীনে থেকে সুনির্দিষ্ট ও সীমাচিহ্নিত ক্ষেত্রে প্রদেষ্টৃ তথা প্রদেশপালের পূর্বালোচিত কর্মকাণ্ডের অনুরূপ দায়িত্ব-

৪৩ Ibid., pp. 231.

৪৪ The Gupta Polity, pp. 231.

৪৫ সুধীরকুমার মিত্র ও অন্যান্যদের প্রদত্ত তথ্য থেকে জানা যায়, পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি ব্যাঘ্রতটি মণ্ডল, নাবা মণ্ডল, খাড়ি মণ্ডল, বরেন্দ্র মণ্ডল, সমতট মণ্ডল প্রভৃতি মোট ২৪টি মণ্ডলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল, কিন্তু বর্ধমানভুক্তি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় মণ্ডল, পশ্চিম খাড়ি মণ্ডল ও দণ্ডভুক্তি মণ্ডল—এই চারটি মণ্ডলের সমষ্টি ছিল। (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪১)।

৪৬ বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২১-২২

৪৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২২

কর্তব্য নির্বাহ করতে হত ভুক্তি-প্রধান 'উপরিক'কে। ভূমি ক্রয়-বিক্রয় ও দানবিষয়ক লিপিমালা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক গ্রন্থাদির সূত্রে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রাজস্ব প্রশাসনের নিম্নস্তরে কেন্দ্র নির্ধারিত রীতিনীতির বাইরে স্বাধীন কোন ধ্যানধারণা অনুপ্রবিষ্ট করবার কোন ক্ষমতা 'উপরিকে'র ছিল না।

আগেই বলেছি যে, প্রধানত শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই প্রাচীন বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা হয়েছিল। সমগ্র সাম্রাজ্যকে যেমন 'প্রদেশ' বা 'দেশে', প্রদেশকে 'ভুক্তি'তে, তেমনি ভুক্তিকে আবার কয়েকটি (সাধারণত তিন বা ততোধিক) ক্ষুদ্রতর খণ্ডে[৪৮] শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল, যেগুলির সাধারণ অভিধা ছিল 'বিষয়'[৪৯] — 'For the betterment of administration the provinces were again divided into districts called, Vishayas.'[৫০] 'বিষয়' শব্দের প্রচল অর্থ 'ভূ-সম্পত্তি'[৫১], কিন্তু ব্যুৎপত্তিগতভাবে প্রখ্যাত সংস্কৃত ভাষা-পণ্ডিত Monier Williams 'বিষয়' এর আভিধানিক অর্থ করেছেন, 'the sphere of influence or activity'[৫২]। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার উপরিউক্ত ব্যুৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে এর সংজ্ঞার্থ নির্দেশ করেছেন—'The meanings 'dominion, kingdom, territory, district, country, abode' (for visayah in the singular) and 'lands, possessions' (for visayah in the plural) plainly developed out of the above... sense.'[৫৩] বলাবাহুল্য আধুনিক যুগের মত 'বিষয়' বা জেলাই ছিল প্রাচীন বাংলা ভারতের 'the most popular and stable administrative unit'[৫৪], যার নিঃসন্দেহে 'long historical antecedents'[৫৫] ছিল অর্থাৎ পূর্বাপর ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রশাসনিক বিভাগ ছিল এটি। অন্যভাবে বিচার করলে দেখা যাবে প্রাচীন বাংলার প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য রাজবংশ, বিশেষ করে গুপ্ত প্রভৃতির শাসনামলে সমগ্র শাসনমণ্ডলকে যে কয়টি প্রধান ভাগে (প্রদেশ বা ভুক্তি) ভাগ করা হত, তার প্রত্যেকটিতেই দুই বা ততোধিক 'বিষয়' অন্তর্ভুক্ত ছিল- 'it (vishaya) appears to have been in existence in all parts of it (the empire)'[৫৬]। সাধারণত 'বিষয়'-এর

৪৮ সাধারণত এক থেকে দু'হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত হত। (State and Government in Ancient India, pp. 215)

৪৯ চন্দেলদের সময়ে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে 'বিষয়', 'পত্তলা' নামে অভিহিত হত। ('ভারতের সামন্ততন্ত্র', ড. রামশরণ শর্মা, পৃষ্ঠা ২৪৬)। মৌর্যযুগের 'আহাল' (সংস্কৃত 'আহার'জাত) (Mauryan Polity, pp. 202), খ্রিস্টপূর্ব সময়ের পাঞ্জাবের কাথিওয়াড় অঞ্চলের 'আহরণী' বা মধ্যপ্রদেশ ও তামিলদেশীয় 'রাষ্ট্র' (State and Government in Ancient India,p. 215) প্রভৃতি নামবাচক শব্দে 'বিষয়' বা অধুনাতন জেলা বুঝাত। গুপ্ত যুগে 'বিষয়'কে 'মণ্ডল'ও বলা হত। (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা ৫৭)। 'ভুক্তি'র মত 'মণ্ডল'ও কখনো কখনো একাধিক 'বিষয়' নিয়ে গঠিত হত। (The Gupta Polity, pp. 236)

৫০ The Imperial Guptas and Their Times (cir. AD 300-550), Dr. Sachindra Kumar Maity, pp. 98

৫১ পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা ৫৭।

৫২ Studies in the Political and Administrative Systems..., p. 166

৫৩ Ibid., pp. 166

৫৪ The Gupta Polity, pp. 232.

৫৫ Ibid., pp. 232.

৫৬ Ibid., pp. 232.

প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা মুখ্যাধিকারিক'কে বলা হত 'বিষয়পতি'[৫৭], কখনো কখনো 'বিষয়িক'[৫৮]। তিনি সাধারণত 'ভুক্তি'-প্রশাসক (Governor of the Bhukti) কর্তৃক নিযুক্ত হতেন।[৫৯] উদাহরণত পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত 'কোটিবর্ষ'[৬০] বিষয়ের কথা বলা যায়। বেত্রবর্মণ নামীয় জনৈক রাজপুরুষ এই বিষয়টির কুমারামাত্য হিশেবে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্তি লাভ করেছিলেন।[৬১] তবে সম্রাট নিজেও 'বিষয়পতি' নিয়োগ করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[৬২] কখনো কখনো সামরিক বাহিনীর নিয়মিত ক্যাডার থেকে 'বিষয়পতি' নিয়োগ করা হত।[৬৩] চৌলুক্য, পাল, সেন প্রভৃতি রাজত্বকালের প্রাপ্ত লিপিতে উৎকীর্ণ 'দণ্ডনায়ক'[৬৪] নামীয় এক শ্রেণীর বিষয়াধিকারীর পদবি থেকে প্রতীয়মান হয়, এঁরা ছিল 'probably military officers of the status of colonels and were often in charge of the administration of the Vishayas as also of the Mandalas.'[৬৫] 'বিষয়পতি'র কর্মস্থল বা জেলা-সদরকে বলা হত 'অধিষ্ঠান'

৫৭ একেবারে প্রথম দিকে 'বিষয়পতি' বা 'বিষয়াধ্যক্ষ'-এর পদবি ছিল 'কুমারামাত্য'। (Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, pp. 330)

৫৮ The Political Institutions and Administration.., Dr Udgaonkar, p. 152.

৫৯ The Imperial Guptas and Their Times, pp. 98.

৬০ বর্তমান বাংলাদেশের উত্তর বাংলার অন্তর্গত একটি সুপ্রাচীন ও সমৃদ্ধ জেলা-শহর ছিল এটি। 'বায়ু পুরাণে'ও এর উল্লেখ দেখা যায়। (The Gupta Polity, pp. 232).

৬১ The Imperial Guptas and Their Times, pp. 98.

৬২ State and Government in Ancient India, pp. 346. সম্ভবত রাজা বা সম্রাটই ছিলেন 'বিষয়পতি'র মূল নিয়োগকর্তা এবং ভুক্তিপতি ছিলেন সেই নিয়োগাদেশের হস্তান্তরকারী বা আনুষ্ঠানিক নিয়োগ-দাতা। কেননা আমরা পরবর্তী আলোচনায় দেখবো যে, একেবারে নিম্নস্তরে গ্রাম প্রশাসনের প্রধান ব্যক্তি তথা গ্রামিক বা গ্রামণীর নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজার মনোনয়ন ক্রিয়াশীল। সেক্ষেত্রে মূল ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক অঙ্গ হিশেবে 'বিষয়'-এর প্রধান রাজা বা রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত হবে না, এটা শুধু অযৌক্তিকই নয়, বরং অসম্ভবও। তবে ব্যতিক্রম যে ছিল না (যেটা পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে দৃষ্ট) তা বলা যায় না।

৬৩ The Political Institutions and Administration, pp. 152.

৬৪ 'দণ্ডনায়ক' সম্পর্কে ড. ভি. আর. রামচন্দ্র দীক্ষিতর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'Generally speaking the term dandanayaka admits of two different interpretations. It may either be taken as a military title meaning 'leader of the forces' or 'administrator of punishments' or magistrate, for the word danda means both army and justice. But puzzlingly enough we get reference to three different officers, the baladhikarana, dandapasadhikaranika and the mahadandanayaka whose exact functions are very much left to our guess. It has been said above that the baladhikaranika was the head of the Military Department and that the dandapasadhikaranika was probably the head of the Police Department. Though the word danda admits of two meanings, namely the army and justice, in view of the fact that there was an officer in charge of the Military Department who was called the baladhikaranika, it is reasonable to assume that the dandanayaka was the head of the department of justice. If he occupied a higher position than the other heads of departments in the provincial administration he was probably called a mahadandanayaka.' (The Gupta Polity, pp. 246-7).

৬৫ The Political Institutions and Administration, pp. 152

এবং তাঁর অফিসকে 'অধিকরণ'[৬৬]। প্রসঙ্গত বলা দরকার 'the term adhikarana means a department or a court,'[৬৭] সচরাচর এটি হত একটি 'মণ্ডপ' বা 'সভাগৃহ'।[৬৮] দামোদরপুর, ধনাইদহ, পাহাড়পুর, ফরিদপুর প্রভৃতি অনুশাসন (প্রাক মধ্য-চতুর্থ থেকে মধ্য-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত) থেকে 'we get a few striking glimpses into the constitution of the district head-quarters.'[৬৯] অধিকন্তু দামোদরপুর তাম্রানুশাসন থেকে এ-ও জানা যায়,. 'the office of the Vishayapati was well organised and used to keep careful records and files.'[৭০] উত্তর-বৈদিক যুগীয় প্রখ্যাত সংস্কৃত নাট্যকার শূদ্রক (খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক)-এর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের নবমাঙ্কে 'বিষয়াধিকরণ'-এর উল্লেখ দেখা যায়। এ থেকে ড. নীহাররঞ্জন রায় ধারণা করেন, সম্ভবত 'অধিকরণিক, অধিকরণ-ভোজক, শ্রেষ্ঠী এবং কায়স্থদের লইয়া অধিকরণ গঠিত হইত এবং এই সব অধিকরণের উপর ভূমি দান-বিক্রয় কর্ম শুধু নহে, বিষয় শাসন-সংক্রান্ত সর্বপ্রকার রাষ্ট্রকর্মের দায়িত্বও ন্যস্ত ছিল এবং তাহার মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বিচার, দণ্ড-পুরস্কার, দানকর্মও বাদ পড়িত না।'[৭১] বলা বাহুল্য বিষয়পতির দপ্তরে বিভিন্ন ধরনের কর্মচারী ছিলেন। এদেরকে নিয়েই তিনি 'শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন'। রাজস্ব, বিচার ও দৈনন্দিন প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য বিষয়পতি যে ধরনের রাজকর্মচারীদের সহযোগিতা লাভ করতেন তাঁদের একটি বিস্তারিত তালিকা দিয়েছেন ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী তাঁর 'The Gupta Empire' গ্রন্থে। সেখানে তিনি বলেন, 'The District Magistrate was helped in his administration by a representative body of officers mentioned as follows : (1) Mahattaras (Village Elders) (2) Ashtakuladhikaranikas (probably officers in charge of groups of 8 kulas or families in the local area) (3) Gramika (Village-Headman) (4) Saulkika (Collector of customs and tolls) (5) Gaulmika (in charge of forests and forts) (6) Agrabarika (in charge of the agrabaras, settlements dedicated to gods or Brahmins) (7) Dhruvadhikaranika (in charge of land revenue) (8) Bhandagaradhikrita (Treasurer) (9) Talavataka* (Village Accountant) (10) Utkhetayita (Collector of Taxes) and (11) Pustapala (the Notary and Keeper of Records).'[৭২]

৬৬ Ibid., pp. 153. যুগ্মভাবে 'অধিষ্ঠান-অধিকরণ'-এর অর্থ বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে করেছেন। একে ড. রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন, 'an administrative board of the district'; ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'the royal tribunal in a city'; ড. বেণী প্রসাদ, 'the office and probably the court of a district officer' and 'a secretariat and advisory council'; ড. উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'the district town'.

৬৭ The Gupta Polity, pp. 246.

৬৮ বাঙ্গালীর ইতিহাস ঃ আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩

৬৯ The Age of the Guptas and Other Essays. Dr. R.N. Dandekar, pp.19.

৭০ State and Government in Ancient India, pp. 347.

৭১ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩

* Mr Wilson 'তলাবাটক'-এর অর্থ করেছেন — 'Village watchman rather than village accountant'. (Quoted from 'Ancient Indian History and Civilization', Dr Sailendra Nath Sen, pp. 188).

৭২ pp. 153.

রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার্থ বিষয়পতি 'যুক্ত', 'আয়ুক্ত', 'নিযূত', 'ব্যাপৃত' প্রভৃতি পদবির কর্মচারীদের সহায়তা লাভ করতেন। এদের প্রধান কাজ ছিল সঠিকভাবে বার্ষিক রাজস্ব-দাবি নির্ধারণ করা এবং দৈনন্দিন আদায়সহ যথাসময়ে সমুদয় রাজস্ব পাওনা উসুল নিশ্চিত করা। রাজস্ব সংক্রান্ত কাজের পাশাপাশি 'বিষয়'-এর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার্থে বিষয়পতি একদিকে যেমন পুলিশ ও সি. আই. ডি-র সহযোগিতা লাভ করতেন[৭৩], তেমনি অন্যদিকে সীমিত শক্তির সামরিক বাহিনীও নিজের অধীনে রাখতে পারতেন বলে জানা যায়।[৭৪] জরুরি প্রয়োজনে বিশেষ করে বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ কল্পে এদের তিনি ব্যবহার করতেন— 'Perhaps every district (Vishaya) had a strong military contingent to back civil authority in times of need.'[৭৫] গুপ্তামলীয় বিভিন্ন অনুশাসন থেকে অনুমান করা হয় নিজ অধিক্ষেত্রের মধ্যে বিষয়পতি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে সরকারি পতিত ভূমির ক্রয়-বিক্রয়সহ নানাবিধ অধিকার ও পর্যাপ্ত ক্ষমতা ভোগ করতেন।[৭৬] অনেকটা ভুক্তি-প্রধানের মতই ছিল তাঁর ক্ষমতা— 'His functions were similar to those of the head of Bhukti; but were confined to his smaller charge.'[৭৭] শুধু তাই নয়, কোথাও কোথাও এরা প্রাদেশিক শাসকদের মত সামন্ত রাজাদের সমুদয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন বলে ড. রামশরণ শর্মা জানিয়েছেন।[৭৮] ফলত মৌর্য যুগের 'রাজুক', গুপ্ত যুগের 'বিষয়পতি' বা চেদী শাসনের 'মহাকরণিক'দের বিচার, রাজস্ব ও দৈনন্দিন শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করে অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে বর্তমান কালের 'কালেকটর'[৭৯], 'জেলা ম্যাজিস্ট্রেট'[৮০] এর পূর্বসুরী হিশেবে বর্ণনা করেছেন। তবে 'বিষয়'-এর যে কোন বা সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিষয়পতি সর্বময় ক্ষমতার অধিকার ছিলেন কি-না, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত গুপ্তামলীয় লিপি-প্রমাণের ভিত্তিতে কেউ কেউ মনে করেন বিষয়পতির ক্ষমতা ও অধিকার ছিল সর্বময় ও চূড়ান্ত; আবার অন্য দিকে কতিপয় ঐতিহাসিক মনে করেন, বিষয়পতি তাঁর এই ক্ষমতা 'বিষয়'-এর অপরাপর রাজপুরুষ যেমন—নগরশ্রেষ্ঠী[৮১], প্রথম সার্থবাহ[৮২], প্রথম কুলিক[৮৩] ও প্রথম কায়স্থ[৮৪]

৭৩ The Political Institutions and Administration, pp.152.
৭৪ State and Government in Ancient India, pp. 215.
৭৫ Aspects of Political Ideas and Institutions.., pp. 331.
৭৬ The Political Institutions and Administration, pp. 152.
৭৭ Ibid., pp. 152.
৭৮ ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা ৭৮
৭৯ State and Government in Ancient India, pp.322.
৮০ The Gupta Empire, pp. 153. The Gupta Polity, pp. 255.
৮১ বণিক সমাজের প্রতিনিধি (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩); 'the guild-president' (The Age of the Guptas and Other Essays, pp. 19); (representative of the various guilds or corporations of the town or the rich urban population' or 'the President of the town-guild of bankers' (Dr Radha Govinda Basak, Epigraphia Indica, Vol. XV)। অবশ্য ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার এ সম্বন্ধে ভিন্ন কথা বলেন, 'There is, again, no proof that the Nagarasresthin represented the interests of certain guilds or corporations or of the rich urban population, as has been supposed by some writers.' (Studies in the Political and Administrative Systems in Ancient and Medieval Inda, pp. 80)।
৮২ ব্যবসায়ী সমাজের প্রতিনিধি (বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩); 'the chief (The Classical Age, Vol, III, pp 351) or leading (The Age of the Guptas and Other

প্রভৃতি উপদেষ্টামণ্ডলীর সহযোগে (যদিও সমান্তরালে নয়) তথা তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে নির্বাহ করতেন।[৮৫] অবশ্য শেষোক্ত এই উপদেষ্টৃশ্রেণী 'বিষয়'-এর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, নাকি সম্রাটের মনোনীত ব্যক্তি ছিলেন, সে সম্বন্ধে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৮৬] তবে নির্বাচিত হোক, চাই মনোনীত, কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিষয়পতি'র কাজের ওপর এঁদের যে বেশ প্রভাব ছিল, সে কথা অনস্বীকার্য।

বীথী বা স্থানীয় প্রভৃতি

'বিষয়'-এর অধস্তন প্রশাসনিক বিভাগ সম্পর্কে আলোচনার আগে উল্লেখ করা দরকার যে, 'Between the district and the village there were some administrative divisions, whose nature and dimensions varied widely from age to age.'[৮৭] সত্যি বলতে এই মধ্যবর্তী প্রশাসনিক স্তরগুলো ছিল এক-এক অঞ্চলে এক-এক সময়ে এক-এক নামের, আকার এবং গঠন প্রকৃতিতেও বিভিন্ন। এতদসত্ত্বেও এগুলির মধ্যে মোটামুটি একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়, আর তা হল, এর প্রায় সব ক'টিই ছিল 'বিষয়' (ক্ষেত্রবিশেষে 'ভুক্তি')-এর অধীন। আধুনিক যুগের মহকুমা'র সম-স্থানীয় ছিল 'বীথী'। এখন পর্যন্ত গুপ্ত শাসনামলীয় যে সমস্ত তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে প্রতীয়মান হয়, এ যুগে 'বিষয়'-এর অধঃস্তরে বেশ কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগ ছিল[৮৮]; যদিও এগুলি

Essays, pp. 19) merchant'; (representive of the various trade-guilds and other merchantile professions of the visaya' (R. G. Basak)।

৮৩ শিল্পী সমাজের প্রতিনিধি। (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩); 'the leading banker' (Age of the Guptas and Other Essays, pp. 19); 'the chief artisan' (The Classical Age, pp. 351); 'representative of the artisan classes or craft guilds' (R. G. Basak)।

৮৪ সম্ভবত ইনি ছিলেন 'বিষয়পতি'র কর্মসচিব এবং সেইহেতু রাজকর্মচারী (বাঙ্গালীর ইতিহাসঃ আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩)। এক কথায় এদেরকে 'বিষয়-মহত্তর' বলা হত। (The Political Institutions and Administration, pp. 153)

৮৫ ড. নীহাররঞ্জন রায় তো এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট এবং সরাসরি বলেছেন (যদিও তাঁর এই মতের সঙ্গে আমরা একমত নই) যে, 'লিপিগুলির প্রসঙ্গ-সাক্ষ্য এবং মৃচ্ছকটিকের বিবরণ একত্র করিলে মনে হয়, ইঁহারা শুধু সহায়ক বা উপদেষ্টা মাত্র ছিলেন না, বিষয়পতির সঙ্গে ইঁহারাও সমভাবে শাসনকার্যের দায়িত্ব নির্বাহ করিতেন এবং অধিকরণের ইঁহারা অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলেন'। (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩২৩)।

৮৬ The Age of the Guptas and Other Essays, pp. 20.

৮৭ State and Government in Ancient India, pp. 217.

৮৮ অবশ্য গুপ্তযুগের এই মধ্যবর্তী বিভাগগুলির অস্তিত্ব সম্বন্ধে ড. আলটেকর পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত নন। তাঁর ভাষায়, 'It is difficult to state whether in the Gupta empire there were any administrative divisions intervening between the Vishaya and towns and villages comprised within it. They are not mentioned in Gupta inscriptions, but figured in later records. We have already seen that they existed in the Mauryan administration. Their non-occurrence in Gupta records is probably accidental.' (State and Government in Ancient India, pp. 346)। ড. আলটেকরের এই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করবে আমাদের পরবর্তী আলোচনা।

আকারে-প্রকৃতিতে ছিল প্রচুর সাদৃশ্যপূর্ণ, শুধু নামে বিভিন্ন। যেমন—'বীথী', 'স্থলী'[৮৯], 'পথক'[৯০], 'খণ্ড'[৯১], 'পেঠ'[৯২] প্রভৃতি। তবে এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার্থে 'বীথী'কেই আমরা 'বিষয়'-এর সরাসরি পরবর্তী স্তর হিশেবে ধরে নেবো, অর্থাৎ অন্যভাবে বলতে গেলে বলবো যে, 'The visaya was divided into vithis....consisted of villages, which formed the lowest units of administration.'[৯৩] সুপ্রাচীন কাল থেকেই যে 'গ্রাম' ছিল প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং জনসাধারণের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী ও প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণে সমৃদ্ধ বিভাগ, সে সম্বন্ধে আদৌ কোন বিভেদ নেই। বিভেদ রয়েছে যেখানে সেটা হল এই 'গ্রাম' ও 'বিষয়'-এর মধ্যবর্তী প্রশাসনিক স্তরগুলো নিয়ে। অবশ্য এই মতবিভক্তির মুখ্য কারণও কোন সুদৃঢ় ও সর্বজনগ্রাহ্য একক লিপি-প্রমাণের অভাব। বরঞ্চ প্রাপ্ত লিপিগুলিতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রমাণাদি বিদ্যমান। রাজা গোপচন্দ্রের 'মল্ল-সারুল'[৯৪] তাম্রানুশাসনে বীথী-বিভাগের নিজস্ব অধিকরণ সম্বন্ধে কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে 'বাঙলার কোনও পাল লিপিতে কিংবা চন্দ্রদের কোনও লিপিতে বীথী–বিভাগের কোনও উল্লেখ নাই, কিন্তু বিহারের প্রাপ্ত অন্তত দুইটি লিপিতে আছে।'[৯৫] 'In Bihar we know of Nandavithi, whose headquarters lay 2 miles to the north-west of Surajgarha in south Munger.'[৯৬] এছাড়া 'কম্বোজ-বর্মণ-সেন আমলে বাঙলাদেশে বীথী-রাষ্ট্রবিভাগের সাক্ষাৎ মেলে;'... ।'[৯৭] ড. নীহার রায় অনুমান করেন, পাল এবং চন্দ্র বংশের রাজত্বকালেও বাংলাব্যাপী বীথী-বিভাগের কোথাও না কোথাও অস্তিত্ব ছিল, যদিও এ সম্পর্কিত কোন লিপিপ্রমাণ পাওয়া যায়নি এখন পর্যন্ত।

৮৯ 'স্থলী' সম্ভবত 'স্থল' বা জায়গা অর্থে ব্যবহৃত এবং সেই হিশেবে 'বিষয়' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কোন প্রশাসনিক বিভাগকে বুঝাত। 'স্থলী'র নিদর্শন পাওয়া যায় রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেন (৫৭১ খ্রিঃ) ও দ্বিতীয় ধরসেনের যথাক্রমে পলিতান ও ঝর দানবিষয়ক অনুশাসনে। ড. দীক্ষিতর বলেন, 'But one thing is evident from the inscription referred above, namely, it was the territorial division which was larger than the petha and the grama.' (The Gupta Polity, pp. 237).

৯০ সম্ভবত এটি ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় কোন প্রশাসনিক বিভাগ—'smaller than the visaya'. (The Gupta Polity, p 237). রাজা দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের কোন কোন অনুশাসনে এর উল্লেখ দেখা যায়।

৯১ রাজা মহাভবগুপ্তের অপ্রকাশিত দানবিষয়ক লিপিতে এর উল্লেখ রয়েছে। উক্ত লিপি থেকে জানা যায়, কোশল দেশের অন্তর্গত 'তুলুম্ব খণ্ড' নামীয় একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ছিল।

৯২ Kittel -এর ভাষায় 'পেঠ' বা 'পেথ'-এর অর্থ 'a market town, a place of sale or a long street of shops in town'. ড. দীক্ষিতর অনুমান করেন, সম্ভবত, 'the market town was the centre or the nucleus of a group of adjoining village for purposes of the administration of local affairs.' (The Gupta Polity, pp. 238). উল্লেখ্য, 'পথক' ও 'পেঠ' বা 'পেথ' একই বিভাগের একাধিক নাম হওয়াও বিচিত্র নয়।

৯৩ Aspects of Political Ideas and Institutions... pp. 331.

৯৪ আলোচ্য অনুশাসনে বাকাটক বীথী নামক বর্ধমান-ভুক্তি'র অন্তর্গত একটি বিভাগের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় যা দামোদর নদের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল।

৯৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩৩৪

৯৬ Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, p. 331.

৯৭ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩৩৪।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, একেবারে গোড়ায় অর্থাৎ সেই প্রাচীনকালে 'vithi appears to have denoted a tract of land that was immediately bordering on a river.....This division appears to have continued even in later times.'[৯৮] বলা যায় মৌর্যযুগে বীথী'র সমস্থানীয় প্রশাসনিক বিভাগ চিল 'স্থানীয়', যার মুখ্যাধিকারিক ছিলেন 'স্থানিক'। অবশ্য এ যুগে 'স্থানিক' ছিলেন মূলত 'নগর' (City) বিভক্তির একটি শাখার প্রধান, যার কর্মব্যাপ্তি ছিল নিজস্ব ওয়ার্ডের ওপর এবং 'He was entrusted with large police powers. He was the intermediate official between the gopa and nagaraka.'[৯৯] যা হোক, 'স্থানীয়' কমবেশি প্রায় ৮০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত, যাতে থাকত ৪০০ গ্রামের সমন্বয়ে একটি করে 'দ্রোণমুখ', প্রত্যেকটি 'দ্রোণমুখ' বিভক্ত ছিল 'খার্বটিক'-এ (২০০টি গ্রাম নিয়ে গঠিত) এবং 'খার্বটিক', 'সংগ্রহণ'-এ। এক-একটি 'সংগ্রহণে' থাকত ১০টি করে গ্রাম, এরূপ ২০টি সংগ্রহণে গঠিত হত 'খার্বটিক'।[১০০] তবে মৌর্য পরবর্তীকালে বিশেষ করে গুপ্তযুগে 'স্থানীয়'-এর সমপর্যায়িক 'বীথী'-বিভাগে এই জাতীয় কোন ক্ষুদ্র-বিভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত 'মল্লসারুল' অনুশাসন থেকে জানা যায় বীথী-বিভাগের নিজস্ব অধিকরণ বা অফিস ছিল।[১০১] তবে এই অধিকরণ স্থানীয় বিভিন্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে সাময়িক প্রয়োজনে গঠিত হত, নাকি একটি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান হিশেবে এর সূচনা ও ব্যাপ্তি ঘটেছিল, সে সম্বন্ধে স্থির কিছু বলা সম্ভব নয়।[১০২] কারণ একই সময়ে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে 'ভুক্তি'র অধীনে 'বিষয়' বা 'মণ্ডল', আবার বিষয় বা মণ্ডলের অধীনে 'বীথী', 'স্থলী', 'খণ্ড' প্রভৃতির অবস্থিতি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু ধারণা দেয়ার প্রণোদনা দেয় না, তা বলাইবাহুল্য। তবে সমগ্র গুপ্ত সাম্রাজ্যব্যাপী বা পাল, সেন, চন্দ্র, বর্মণ প্রভৃতির সময়কার 'বীথী' বা অনুরূপ বিভাগ, দেশের দৈনন্দিন প্রশাসন বিশেষত রাজস্ব ও বিচার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তা অস্বীকার করা যায় না— 'The head of these divisions exercised the revenue, the judicial and executive functions.'[১০৩] পরিশেষে বলা যায় যে, যদিও বীথী-বিভাগের প্রশাসনিক অধিকর্তার নাম আমরা অদ্যাবধি সঠিকভাবে জানি না, তথাপি তাঁর যে কয়েকজন সহযোগী ছিল তাদের নাম বিভিন্ন অনুশাসন থেকে উদ্ধার করা যায়, যেমন 'মহত্তর', 'খাড়্গী'[১০৪], 'বাহ-নায়ক' ইত্যাদি। মূলত এদের কার্যকর সহযোগিতার ফলেই বীথী-অধিকর্তার পক্ষে

৯৮ The Gupta Polity, pp. 233.
৯৯ The Mauryan Polity, pp. 238.
১০০ ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ), ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯২। State and Government in Ancient India, pp. 323.
১০১ 'বিষয়-অধিকারণ'-এর 'বিষয়পতি'র মত বীথী-অধিকরণের অধিপতি'র কোন উপাধি সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। যদিও ড. ভি. আর. আর. দীক্ষিতর বীথী-শাসকের উপাধি 'আয়ুক্তক' ছিল বলে জানিয়েছেন (The Gupta Polity, p. 263); কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকই তাঁর এই মতের সঙ্গে একাত্ম নন। (দেখুন 'বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব', পৃষ্ঠা ৩৩৪)।
১০২ Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, p. 331.
১০৩ State and Government in Ancient India, 323; The Political Institutions and Administration, pp.153.
১০৪ সম্ভবত ইনি ছিলেন খড়্গধারী প্রহরী, স্বভাবতই শান্তিরক্ষা বিভাগের রাজকর্মচারী (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩৩৪)।

প্রশাসনযন্ত্র সক্রিয় রাখা বিশেষ করে ভূমি ক্রয়-বিক্রয় বা দানবিষয়ক কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হত

নগর বা পুর

এ পর্যায়ে আমরা প্রাচীন বাংলার 'নগর' বা 'পুর' (পৌর) প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করবো। মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-চন্দ্র-বর্মণ প্রভৃতি শাসনামলে সমগ্র বাংলাব্যাপী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিশেবে বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগ-উপবিভাগ (বিভিন্ন নামে ও আকারে) প্রচলিত ছিল ধরে নিলেও অনেক সময় দেখা গেছে এগুলির কোন কোনটির লিপি প্রমাণ অনুপস্থিত। কখনো কখনো একটি বিভাগ বা উপরিভাগ বিশেষ কোন বংশের রাজত্বকালে সমূহ অস্তিত্ব জাহির করলেও ঠিক অব্যবহিত পরবর্তী শাসকদের সময়ে দেখা যায় এর ঘটেছে অবলুপ্তি অথবা নামান্তর। অবশ্য আমরা একথা বলছি লিপি প্রমাণের ভিত্তিতে। ফলে কোন লিপিতে একটি বিভাগের উল্লেখ নেই বলে যেমন আমরা সেই বিভাগটি ঐ সময়ে ছিল না বলতে পারি না, তেমনি একটি বিভাগ বা উপবিভাগ এককালে যে নামে ছিল পরবর্তীকালে তার নামান্তর ঘটলেও যে তার চরিত্র ও আকৃতি একই ছিল তা-ও বলা যায় না। উদাহরণস্বরূপ মৌর্য যুগের 'নগর' (City) ও গুপ্ত যুগের 'পুর' (Town or Municipality)-এর কথা বলতে পারি। আধুনিকযুগে নগর ও পুর-এর মধ্যে পার্থক্য যতটা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়, ঠিক ততটা সূক্ষ্ম বিভেদরেখা প্রাচীনকালের নগর ও পুরের ক্ষেত্রে টানা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ প্রাচীন বাংলার নগর-বন্দর-পুরগুলির বেড়ে ওঠার পশ্চাদভূমি, যা মূলত ছিল 'ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভর'। শুধু তাই নয়, 'অন্তত ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাঙলার সব কয়টি নগরেরই অবস্থিতি ও বিবরণ যতটুকু জানা যায়, তাহাতে মনে হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য বিবেচনার উপরেই ইহাদের অস্তিত্ব ও মর্যাদা প্রধানত নির্ভর করিত।'[১০৫] দ্বিতীয়ত সত্যি বলতে আধুনিক মানুষের মন ও মনন, শিক্ষা ও রুচি একটি সমৃদ্ধ বা পরিপূর্ণ নগরী বা পুর বলতে মনের গহনে যে ধরনের ধারণা তৈরি করে, বলাবাহুল্য, সেই জাতীয় নগরীর অস্তিত্ব প্রাচীন বাংলায় আদৌ ছিল কি-না, তা বলা মুশকিল। এছাড়া সেই দূর অতীতে যখন জনসংখ্যা ছিল খুবই সীমিত এবং জনচাহিদা ও তার প্রাপ্যতা ছিল স্বল্প, তখনকার প্রেক্ষাপটে যে ধরনের নগর ও পুর গড়ে ওঠা সম্ভব, তারও স্থানবিশেষে রূপের ছিল বিভিন্নতা। যেমন মৌর্যদের বিখ্যাত শহর পাটলীপুত্র নগর ও পুর হিসেবে যতটা-বিশাল ও প্রসিদ্ধ ছিল, ততটা বিশালতা ও প্রসিদ্ধি ছিল না গুপ্তদের বর্ধমানভুক্তি বা তীরভুক্তি (তীরহুত)-র অন্তর্গত কোন নগর বা পুরের। অবশ্য রাজধানী বা বৃহৎ নগর ও বন্দরের পার্থক্য এখনও বর্তমান। যা হোক আমাদের এতক্ষণের এই দীর্ঘ বিবৃতির একটাই উদ্দেশ্য, আর তা হল ছোট-বড়, প্রসিদ্ধ-অপ্রসিদ্ধ যা-ই হোক, পরবর্তী আলোচনা দ্বারা আমরা বস্তুত এটাই বলার চেষ্টা করবো যে, প্রাচীনকালে বাংলায় মোটামুটি আলোচ্য ধরনের নগর ও পুর শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

১০৫ বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩০৮

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের 'মহাস্থান' অভিলেখে উল্লিখিত পুণ্ড্রনগর বা পুণ্ড্রবর্ধন[১০৬] (আধুনিক বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়), সম্ভবত খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের দিকে লিখিত চিনা গ্রন্থে বর্ণিত গঙ্গানদীর মোহনাবর্তী তাম্রলিপ্তি[১০৭] বন্দরনগরী, বাইগ্রাম অনুশাসনে খোদিত পঞ্চনগরী (বর্তমান দিনাজপুরের হিলি অঞ্চল)[১০৮], রাজশাহির অন্তর্গত প্রাচীন সোমপুর শহর[১০৯] , বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত বর্ধমান নগর[১১০], প্রাচীন বঙ্গ, গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী[১১১] ,

১০৬ পুণ্ড্রবর্ধন, পৌণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্র-ভুক্তি প্রভৃতি নামাঙ্কিত আলোচ্য নগরটিকে ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী বুধগুপ্তের সময়ের অনুশাসনের ভিত্তিতে প্রাচীন বাংলার একটি নগর হিশেবে উল্লেখ করেছেন যার বিস্তৃতি ছিল উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সুন্দরবনের খাড়ি অঞ্চল পর্যন্ত। কিন্তু তাঁর মতের সঙ্গে ভিন্নতা প্রকাশ করে অনেকে এর অন্তর্ভুক্ত করেন ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল ব্যতীত বাংলার মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ অংশকে। ড. নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, 'পুণ্ড্র-পুণ্ড্রবর্ধন নগর (ছিল) উত্তর বাঙলার সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন নগর। ....শুধু শাসনাধিষ্ঠানরূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে এবং আন্তর্ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থলপথ-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্ররূপেও এই নগরের বিশেষ খ্যাতি ও মর্যাদা বহু শতাব্দী ধরিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।'

১০৭ ড. নীহার রায়ের ভাষায় এটি 'বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম নগর.....মহাভারত, পুরাণ হইতে আরম্ভ করিয়া টোডরমল্ল পর্যন্ত নানাগ্রন্থে নানা নামে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়'...। ড. সুকুমার মাইতি বলেন, 'সুদূর অতীতকালে তাম্রলিপ্ত একটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বন্দররূপে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছিল' (তাম্রলিপ্তিক উপভাষা : জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯)। ড. রায়ের মতে সামুদ্রিক বন্দর হিশেবে তাম্রলিপ্তির এই খ্যাতি 'সপ্তম-অষ্টম শতক পর্যন্ত' অক্ষুণ্ন ছিল (আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ২৯৫)। বলাবাহুল্য, বাংলার বর্তমান ভৌগোলিক সীমানায় তাম্রলিপ্তি বন্দর নগরীর সঠিক অবস্থান আজ আর নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব না হলেও ভারতীয় উপমহাদেশে আগত প্রাচীন চৈনিক পরিব্রাজক ও অন্যান্য গ্রীক সূত্রের ওপর নির্ভর করে এর যে অবস্থান স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম নির্ণয় করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করা হল : 'The Kingdom of Tan-mo-li-ti, or Tamralipti is described as 1400 to 1500 li, or about 250 miles, in circuit. It was situated on the sea-shore, and the surface of the country was low and wet. The capital was in a bay, and was accessible both by land and water. ...situated on a broad reach or bay of the Rup narayan river, 12 miles above its junction with the Hugli.' (The Ancient Geography of India, pp. 425).

১০৮ ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেন, 'পঞ্চম শতকে পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্যতম বিষয় ছিল পঞ্চনগরী এবং পঞ্চনগরীতেই বিষয়ের শাসনাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল।' (আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩০১)। তাঁর মতে বর্তমান দিনাজপুর জেলাতেই প্রাচীন পঞ্চনগরী অবস্থিত ছিল, তবে ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতো তিনি এর সঠিক অবস্থান 'হিলি', কি একই জেলার অন্যত্র, তা নির্দিষ্ট করে বলেননি। ড. সরকার অবশ্য আর একটি সম্ভাবনার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'সংস্কৃত পঞ্চনগরী থেকে প্রাকৃত 'পংচুনঅরী' এবং তা থেকে 'পঞ্চনারী' হওয়া অসম্ভব নয়। হয় তো মুসলমানদের কাছে সেটা 'পাঁচবিবি' (বগুড়া জেলা) হয়ে দাঁড়িয়েছে।' (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ৬১)।

১০৯ এটি একটি প্রাচীন তীর্থস্থান— মূলত 'অষ্টম শতাব্দীর বৌদ্ধস্তূপ-বিহারাদির জন্য বিখ্যাত ছিল'। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে এই অঞ্চলে জৈন শ্রমণাচার্য গুহনন্দীর একটি বিহার ছিল, পরবর্তীতে ধর্মপালের আমলে এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় বৌদ্ধদের সুপ্রসিদ্ধ সোমপুর মহাবিহার, ড. রায়ের ভাষায় যা, 'সমসাময়িক বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ নগর ছিল।' (আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ৩০২)।

১১০ প্রাচীন বাংলায় বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত বর্ধমান নগরীরও যে একটি ব্যাপক বিস্তৃতি ও পরিচিতি ছিল তার প্রমাণ জৈন কল্পসূত্র, বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা, সোমদেবের কথাসরিৎ-সাগর প্রভৃতি গ্রন্থে এবং খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকীয় মল্লসারুল শাসন, দশম শতকের ইরদা এবং দ্বাদশ শতাব্দীর নৈহাটি ও গোবিন্দপুর অনুশাসনে এর উল্লেখে। যদিও এটা ঠিক যে, 'তাম্র শাসন ও পুরাণোক্ত বর্ধমান জনপদের বিস্তৃতি ছিল হাল-আমলের বর্ধমান (বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা) জেলা অপেক্ষা বৃহত্তর' (বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১২৭), তথাপি

সমতট[১১২] (রাজধানী সম্ভবত দেবপর্বত), কর্ণসুবর্ণ নগরী[১১৩] প্রভৃতির প্রকৃত শাসনব্যবস্থা কী ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও, কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতে পাটলিপুত্র[১১৪]

নগরটি দামোদর নদীর তীরে, বিশেষত উত্তর তীরব্যাপী বিস্তৃত ছিল, সে কথা অধিকাংশ ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন। দেখুন, বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ২৯৭; ড. দীনেশ সরকার বর্ধমান-ভুক্তি'র দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ৫৬)।

১১১ ড. দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে সম্ভবত 'গুড়' উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল বলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল গৌড় নগর হিশেবে পরিচিতি পেয়েছিল (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ৩৯)। তাঁর মতে, 'মধ্যযুগের শেষ দিকের একটি পৌরাণিক কিংবদন্তী অনুসারে, পদ্মানদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমানের উত্তরে গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ মালদা, উত্তর বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মূল গৌড়দেশের অবস্থান অনুমান করা যায়।' (ঐ, ৩৯)। বিভিন্ন বৈদেশিক পরিব্রাজক নগরটির সীমা-চৌহদ্দি বিষয়ে উল্লেখ করলেও মধ্যযুগে তথা মুসলিম শাসনামলে এর যে অবস্থান ও সীমা জানা যায়, তা, 'The site of Gaur lies on a narrow strip of land near the former junction of the old Ganges and the Mahananda rivers, (Latitude 24°53′ N,—Longitude 88°14′ E.)... was at least $12\frac{1}{2}$ miles in length from north to south, and about two miles in breadth from east to west, giving a total area of 25 square miles;' (Memoirs of Gaur and Pandua, Khan Sahib M. 'Abid Ali Khan, pp. 41-2). আলোচ্য নগরটি বাংলার তদানীন্তন সেন বংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর থেকেই তা 'লক্ষ্মণাবতী' নামেও পরিচিতি লাভ করে। (তবকাত-ই-নাসিরী, মূল মীনহাজ-ই-সিরাজ, অনূদিত ও সম্পাদিত আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃষ্ঠা ২১)। মুসলমান শাসনামলে এটি 'জান্নাতাবাদ' হিশেবেও খ্যাত ছিল (Contributions to the Geography and History of Bengal : Muhammedan Period, H. Blochmann, pp. 7.).

১১২ প্রাচীন বাংলার সমতট রাজ্য তথা নগরটির অবস্থান নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, ড. মমতাজুর রহমান তরফদার, ড. অজয় রায় প্রমুখের ভাষ্যে প্রাচীন সমতট নগরীর বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা যায় মোটামুটি এভাবে : 'সমতটদেশ আধুনিক কুমিল্লা জেলা এবং নিকটবর্তী অঞ্চল (ত্রিপুরা, নোয়াখালি প্রভৃতি) জুড়ে অবস্থিত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলও এর মধ্যে ছিল বলে মনে হয়।' (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুরিত, পৃষ্ঠা ৪৭)। ড. অজয় রায় বলেন, 'ভাগীরথীর পূর্বতীর থেকে শুরু করে মেঘনা মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী ভূখণ্ডকেই খুব সম্ভবত বলা হয় সমতট'। '(বাঙলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৫৪)। স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম এর মতে এটি সম্ভবত ছিল বর্তমান যশোর বা হরিণঘাটা নদী ও বাকেরগঞ্জের মধ্যবর্তী সুন্দরবনের কোন অংশ বা অঞ্চল। (The Ancient Geography of India, pp. 423).

১১৩ প্রাচীন বাংলার আর একটি সুপ্রসিদ্ধ নগরী, যদিও এর সঠিক অবস্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ পুরোপুরি একমত নন। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের অনুসরণে স্যার কানিংহাম মনে করেন এটি ছিল বর্তমান সুবর্ণরেখা নদীর তীরবর্তী এবং সিংহভূম ও বীরভূম জেলার অন্তর্বর্তী কোন অঞ্চলে। (Ancient Geography of India, pp. 426). ড. নীহাররঞ্জন রায়, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি ও কানসোনা গ্রাম (বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ২৯৭), ড. অজয় রায় মুর্শিদাবাদ-বীরভূমের উত্তরাঞ্চল ও মালদহের কিছু অংশ (বাংলাদেশ : বাঙালি আত্মপরিচয়ের সন্ধানে, পৃষ্ঠা ২৯), ড. সুধীর রঞ্জন দাস একই জেলার ভাগীরথীর তীরবর্তী রাঙামাটি অঞ্চল (কর্ণসুবর্ণ-মহানগরী, পৃষ্ঠা ৬৭), সুধীরকুমার মিত্র, 'হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান জেলার উত্তর ও মধ্যভাগ এবং মুর্শিদাবাদ জেলা' (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯) প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন। বলাবাহুল্য এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত তথ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে এটা নিশ্চিন্তে বলা যায় যে, মুর্শিদাবাদ জেলা ও তার আশেপাশের কিছু অংশ নিয়ে তা গড়ে উঠেছিল ।

১১৪ প্রাচীন গ্রীক পরিব্রাজকদের বিশেষ করে মেগাস্থিনিস প্রমুখের বহু প্রশংসোধন্য মৌর্য শাসকদের অন্যতম রাজধানী নগর। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু, তৎপুত্র উদয়ী কর্তৃক নগরটি প্রতিষ্ঠিত হয় (আ. ৪৬২-৪৪৩ খ্রিস্টপূর্ব) বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা (পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত, পৃষ্ঠা ৭০)।

(বর্তমান বিহারের পাটনা) এবং এ যাবৎ আবিষ্কৃত বিভিন্ন গুপ্ত-পাল-সেন শাসনামলীয় লেখমালার সাহায্যে সমকালীন নগর-পুর শাসনব্যবস্থার একটি গ্রহণযোগ্য রূপরেখা দাঁড় করাবার চেষ্টা করব।

মৌর্যযুগের পাটলিপুত্র নগরীর প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইঙ্গিত যেমন 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়, তেমনি গ্রীক লেখকদের বিশেষ করে মেগাস্থিনিসের রচনায়ও এ সম্পর্কিত বর্ণনা সুলভ। মেগাস্থিনিসের 'Indika' থেকে জানা যায় নগরটি ছয়টি বিভাগ (প্রতি বিভাগে পাঁচজনের একটি দল) সমন্বিত একটি ব্যাপক ক্ষমতাশালী 'পরিষদ' (Council)-এর মাধ্যমে শাসিত হত। সরকারি রাজস্বাদি আদায়সহ এর প্রতিটি বিভাগের সুস্পষ্ট কর্মবিন্যাস ছিল। শুধু পাটলিপুত্র নয়, 'অর্থশাস্ত্র' ও সমসাময়িক অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায় তৎকালীন নগরগুলির শাসকের উপাধি ছিল 'নাগরক'[১১৫] বা 'নগর-ব্যবহারক'[১১৬]। সচরাচর এঁরা হতেন কুমারামাত্য এবং 'was the chief official of the city, possibly a nominee of the Imperial Government.'[১১৭] । প্রশাসনিক 'চেইন-অভ-কমাণ্ডে' তাঁর অবস্থানের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী বলেন, 'Nagarika stands in the same relation towards the city as the Samaharta towards the province (Samahartri-vannagariko nagaram chintayet).'[১১৮] যেহেতু নগর-অধিপতি কেন্দ্রীয় সরকার তথা সম্রাট কর্তৃক সরাসরি নিযুক্ত হতেন, সেইহেতু 'He..was responsible to the Imperial Government for the conduct of the civil administration.'[১১৯] 'নাগরক'-এর কর্মকৃতির একটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ড. ভি. আর. আর. দীক্ষিতর তাঁর 'Mauryan Polity' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩৬-২৩৮)। আমরা এখানে তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃত করছি :

'1. He was to preserve the peace of the city by keeping watch over the movement of strangers and new-comers into the city.

2. He was to maintain an elaborate census of the houses and the residents therein noting their total income and items of expenditure.

7. He was to hold a supervising control over the antapalas at the military frontiers and the official in charge of the toll house. Perhaps they had to remit their collections through him.

10. He was also responsible for the public morals of the city.'

প্রাচীনকালে এটি ভারতের বৃহত্তম নগর ছিল বলে মেগাস্থিনিসের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়। তিনি বলেন, 'শহরটা যেদিকে সর্বাপেক্ষা বেশী লম্বা, সেইদিকের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ৯ ১/২ মাইল এবং প্রস্থ হচ্ছে ১ [illegible]/৪ মাইল। ৬০৬ ফুট প্রস্থ ও ৩০ হাত গভীরতা বিশিষ্ট এক পরিখা দ্বারা শহরটাকে বেষ্টন করা আছে। এর প্রাচীর ৫০৭টি গম্বুজ ও ৬৪টি তোরণ সম্বলিত।' (উদ্ধৃতি সংগ্রহ, 'প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস', ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা ২৫৩)। এ থেকেই বোঝা যায় নগরটির গাঠনিক সৌকর্য এবং সমৃদ্ধি কত ছিল!

১১৫ The Mauryan Polity, pp. 236.

১১৬ State and Government in Ancient India, pp. 348.

১১৭ The Mauryan Polity, pp. 236.

১১৮ ChandraGupta Maurya and His Times, pp. 133

১১৯ The Mauryan Polity, pp. 236.

'নাগরক' তাঁর বিস্তৃত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে যে সমস্ত রাজকর্মচারীর সহযোগিতা লাভ করতেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল 'স্থানিক' (পূর্বে আলোচিত) ও 'গোপ' (যথাস্থানে আলোচিতব্য)।

গুপ্তদের রাজত্বকালে নগর বা পুর-প্রধানকে 'পুরপাল'[১২০], 'পুরপতি'[১২১], 'নগরপতি'[১২২], 'নগর-রক্ষক[১২৩], 'পুরপাল-উপরিক'[১২৪] প্রভৃতি আখ্যা দেয়া হত। এছাড়া সমকালে (প্রাচীনকালে) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নগর বা পুর-প্রধানদের যে সকল নামে অভিহিত করা হত তার দু'একটির উল্লেখ এখানে করা হলো। যেমন কাশ্মিরে 'নগরাধিপ'[১২৫], দাক্ষিণাত্যে বিশেষ করে রাষ্ট্রকূট ও শীলাহারদের আমলে 'পুরপতি' ও 'নগরপতি'[১২৬] ইত্যাদি। সম্রাটকর্তৃক সরাসরি নিয়োগের আগে 'পুরপালে'র যে সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যাচাই করা হত সেগুলির একটি তালিকা তৈরি করেছেন ড. দীক্ষিতর, যেমন— 'patience, lordship, modesty, good behaviour, heroism without too great an estimation of his prowess, eloquence, self-control, liberty and high spiritedness, civility, the acquittance of debts, obligations, and freedom from empty-headedness, beauty, reprobation of things that are not right, absence of astonishment, firmness and generosity,'[১২৭] যদিও একটি বিশেষ নগরের (গিরিনগর) 'পুরপতি' (চক্রপালিত)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে উপরিউক্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তথাপি আমরা মনে করি, সে যুগে যেহেতু প্রশাসনের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব (অনভিপ্রেত অর্থে) ও আজকের মত তদ্বিরবাজি প্রায় ছিল না, সেইহেতু প্রতিটা 'পুর' বা 'নগরপতি'র মধ্যেই আলোচিত চরিত্রগুণের সমাহার ঘটত অর্থাৎ কোন রাজকর্মচারী বা অমাত্যের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যাবলি অনুপস্থিত থাকলে তাকে 'পুরপতি' নিয়োগ করা হত না। অবশ্য 'বিষয়পতি'র মত 'পুর' বা 'নগরপতি'ও কখনো কখনো সামরিক বাহিনীর সদস্যমণ্ডলী থেকে নিযুক্তি লাভ করতেন।[১২৮] এক্ষেত্রে সাধারণত যে সব নগরে 'দুর্গ' বা সামরিক-কিল্লা (মধ্যযুগেও এই প্রবণতা খুব ব্যাপক ছিল) অবস্থিত ছিল, সেখানেই 'কোট্টপাল' ও 'পুরপাল' একই ব্যক্তি এবং সামরিক বাহিনী থেকে হত। দুর্গবিহীন নগরীর প্রশাসক হিশেবে 'পুরপাল' অ-সামরিক ব্যক্তি হতেন। অর্থাৎ এককথায় আমরা বলতে পারি যে, 'All (the) evidence clearly shows that the Purapati was sometimes selected for military ability, sometimes for administrative experience and sometimes for their learning.'[১৩০]

১২০ Aspects of Political Institutions in Ancient India, pp. 334; State and Government in Ancient India, pp. 348.
১২১ The Political Institutions and Administration, pp. 153.
১২২ Ibid., pp. 153.
১২৩ The Gupta Empire, pp. 153.
১২৪ Ibid., pp. 153.
১২৫ The Political Institutions and Administration, pp. 153.
১২৬ Ibid., pp. 153.
১২৭ The Gupta Polity, pp. 266
১২৮ The Political Institutions and Administration, pp. 154.
১৩০ Ibid., pp. 154.

নগর-রক্ষক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিভূ হিশেবে 'পুরপতি'র নানাবিধ দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে প্রধানতম ছিল, 'to maintain the internal peace and to collect the royal revenue.'[১৩১] এ কাজে তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য একটি 'পরিষদ' থাকত যা কখনো 'গোষ্ঠী'[১৩২], কখনো 'পঞ্চমণ্ডলী'[১৩৩], কখনো 'পঞ্চকুল'[১৩৪], আবার কখনো 'চৌখাড়িক'[১৩৫] প্রভৃতি নামে অভিহিত হত। তবে এই 'পরিষদ'-এর সদস্যমণ্ডলী কী স্থানীয় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল, নাকি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত হত, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা সম্ভব নয়। কারণ লিপিগুলিতে এই ধরনের কোন স্পষ্ট বা প্রচ্ছন্ন উল্লেখ নেই। তবে ধারণা করা অসমীচীন নয় যে; 'Very probably elderly persons, who had earned the regard of the residents by their experience, character and ability, must have been sent to the council by a general consensus of public opinion.'[১৩৬]

গ্রাম

সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলা মাঠ প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হল গ্রাম ও গ্রাম পরিষদ।

যে বিশাল পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থার সুস্থিত ভিত্ গড়ে উঠেছে, তার অন্তর্মূলে আজও গ্রামের অস্তিত্ব যেমন প্রথম ও প্রধান, তেমনি এই ভূখণ্ডে সভ্যতা বিকাশের সেই ঊষা লগ্নে মানবের রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তখন থেকেই গ্রাম ছিল তার অনিবার্য বিবেচনার প্রাথমিক ক্ষেত্র। প্রাচীন, মধ্য এবং আধুনিককালের প্রশাসন ব্যবস্থায় গ্রাম তাই বরাবরই একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভ করেছে। গ্রামের উন্নয়ন বলতে যেমন দেশের উন্নয়ন বুঝায়, তেমনি গ্রাম প্রশাসনের উন্নয়নও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রেরই উন্নতির সমতুল্য। যা হোক এখন আমরা প্রাচীন বাংলার গ্রাম প্রশাসন সম্পর্কে বিশেষ করে রাজস্ব ও ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে গ্রাম ও গ্রাম পরিষদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করবো।

বস্তুত বৈদিক যুগ থেকে গ্রাম প্রশাসনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিশেবে স্বীকৃত।[১৩৭] বিভিন্ন বেদ বিশেষত ঋগ্বেদ, স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ ও জাতক গ্রন্থাদিতে এর রাজনৈতিক উল্লেখ

১৩১ Ibid., pp. 155.
১৩২ Social, Cultural and Economic History of India : Ancient Times, pp. 147.
১৩৩ ঐতিহাসিক Fleet 'পঞ্চমণ্ডলী' বা 'পাঁচালী' বা ' 'পাঁচালিকা' প্রভৃতি দ্বারা ৫ বা ততোধিক সদস্য সমন্বিত পর্ষৎ-এর কথা বলেছেন, যা মূলত আধুনিক যুগীয় 'পঞ্চায়েত' ব্যবস্থার মতই ছিল বলে তাঁর অনুমান। (The Age of The Guptas and Other Essays, pp. 21)
১৩৪ অনুরূপ সভ্য-পর্ষৎ, যা মূলত চন্দেল ও চালুক্যদের শাসনামলে উক্ত নামে পরিচিত ছিল।
১৩৫ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বিশেষত রাজস্থানে এর অস্তিত্ব ছিল বলে জানা যায়।
১৩৬ State and Government in Ancient India, pp. 221.
১৩৭ Corporate Life in Ancient India, Dr. R. C. Majumdar, pp. 124.

পাওয়া যায়।[১৩৮] পরবর্তীকালে আরও নির্দিষ্ট করে বললে মৌর্য ও গুপ্তদের সময়ে যখন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের একটা পূর্ণাঙ্গ এবং সর্বব্যাপী রূপ সমাজের একেবারে নিম্নস্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল, তখন থেকেই এটি ছিল—'The lowest territorial unit'[১৩৯], 'smallest administrative unit'[১৪০] অথবা অন্য কথায়, 'the smallest political unit in the State fabric'[১৪১] এবং অবশ্যই 'the pivot of administration.....since earliest times'.[১৪২]

এ পর্যায়ে প্রথমেই যেটা বলা দরকার তা হল প্রাচীন বাংলার গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করার প্রবণতা বা তার বিভাজনের নীতি, যার বিশেষ ভিত্তি ছিল মূলত, এক. গ্রামগুলির আকার, এবং দুই. এগুলির শাসন-প্রকৃতি ও বিন্যাস।

প্রথম প্রবণতার সূত্র ধরে বলতে গেলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, 'In ancient India (also in ancient Bengal) a 'grama' was traditionally composed of different parts, such as the habitat (Vastu-bhumi), the pasture (go-chara), the cultivable and fallow land (kshetra), paths (patha), drains (gartta), parks and gardens (vatika), forests (aranya), etc.'[১৪৩] যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিক যেমন ড. প্রাণনাথ প্রমুখ ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রামগুলিকে ইংরেজি 'Village'-এর প্রচলিত অর্থে বিবেচনা না করে তাকে বরং 'an estate of survey village'[১৪৪] বলতেই অধিক উৎসাহী এবং একই দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যূনাধিক পাঁচটি পরিবার ও ১৫ থেকে ২০ একর শস্যক্ষেত্র সমন্বিত 'survey village'-কেই গ্রাম রূপে কল্পনা করেছেন।[১৪৫] কিন্তু বেশিরভাগ পণ্ডিতের মতো আমরাও তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত নই। বরঞ্চ সত্যি বলতে, 'In inscriptions the word grama is found used generally to denote a village irrespective of its size, population or revenue. A very small village may have comprised, only a cluster of huts, small and large often grouped round a well or pond near which was a small open space with a few trees. Some villages were inhabited by people belonging to different castes and occupations.... Neighbouring villages were demarcated from one another either by natural or artificial barriers, and intercommunications between

১৩৮ Ibid., pp. 124

১৩৯ Aspects of Political Institutions and Administration in Ancient India, pp. 299.

১৪০ The Gupta Polity, pp. 233

১৪১ Corporate Life in Ancient India, pp. 131. ঐতিহাসিক কে. এম. পানিক্কর বলেন, 'The gramikas or the village headmen formed the lowest rung in the ladder.' (A Survey of Indian History, K. M. Panikkar, pp. 55)

১৪২ Social, Cultural and Economic History of India:Ancient Times, pp. 147.

১৪৩ Contributions to the Economic History of Northern India, pp. 1.

১৪৪ A Study in the Economic Condition of Ancient India, pp. 26-40.

১৪৫ Ibid., pp. 26-40.

them were maintained through roads. In fact, villages were not isolated units but very often interconnected and vitally linked up from economic and administrative points of view.'[১৪৬]

গ্রাম সমাজের প্রশাসনিক বিন্যাস বা গড়নের ওপর ভিত্তি করে Baden-Powell বাংলাসহ ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রামমণ্ডলীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।[১৪৭] এর একটি হচ্ছে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা যাতে, 'Each man owns his own holding, which he has inherited, or bought, or cleared from the original jungle. The waste surrounding the village is used for grazing and wood-cutting, but no one in the village claims it as his, to appropriate and cultivate without leave; still less do the whole group claim it jointly, to partition when they please.'[১৪৮] গ্রাম-প্রধানই ছিল এই ব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক পুরোধা।[১৪৯]
অন্যদিকে ছিল যৌথ গ্রামসমাজ। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে সমাজ শাসনের ভার ন্যস্ত হত একটি শক্তিশালী গ্রাম পরিষদের ওপর। পাওয়েলের ভাষায়, 'a strong joint-body, probably descended (in many cases) from a single head, or single family, has pretensions to be of higher caste and superior title to the 'tenants' who live on the estate.'[১৫০] বলাবাহুল্য, 'The same body claim jointly (whether or not they have separate enjoyment of portions) the entire area of the village, both the cultivated land and the waste.'[১৫১] যা হোক প্রাপ্ত তাম্রলিপি ও অন্যান্য সূত্র থেকে আমরা এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'বাঙলার আদি গ্রামসমাজের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তার সঙ্গে রায়তওয়ারী টাইপটির সাযুজ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।'[১৫২] উল্লেখ্য, যৌথ গ্রাম সমাজ ব্যবস্থা ছিল মুখ্যত উত্তর ভারতীয়। কৃষিজীবী সাধারণ মানুষের সহজাত উদ্যোগ ও প্রেরণায় আগে থাকতেই গড়ে ওঠা এই সমাজের ওপর তথাকথিত অভিজাত একটি অ-কৃষক সুবিধাভোগী শ্রেণী তাদের প্রভুত্বের ধ্বজা কায়েম করেছিল।[১৫৩] মূলত গুপ্ত যুগ থেকেই বাংলার আদি গ্রাম সমাজের ওপর উত্তর ভারতীয় এই রীতি চেপে বসেছিল।[১৫৪]

গ্রাম শ্রেণীকরণের আর একটি পদ্ধতি ছিল, যাকে আমরা কৌটিলীয় রীতি বলতে পারি। প্রশাসনিক সহযোগিতা ও রাজস্ব সংশ্লিষ্টতার দিক বিবেচনা করে কৌটিল্য মৌর্য যুগের গ্রামসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।[১৫৫] এক. সম্পূর্ণ কর বা

১৪৬ Contributions to the Economic History of Northern India, pp. 1.
১৪৭ The Indian Village Community, pp. 12-15.
১৪৮ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 107
১৪৯ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, ২৮
১৫০ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 107
১৫১ Ibid., pp. 107.
১৫২ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৮
১৫৩ Indian Village Community, pp. 12-15
১৫৪ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৮
১৫৫ The Mauryan Polity, pp. 206.

রাজস্বমুক্ত ('পরিহার') গ্রাম; দুই. করযুক্ত (নগদে বা দ্রব্যে প্রদেয়) গ্রাম ও তিন. রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীতে সেনা সরবরাহের উপযোগী (আয়ুধীয়) গ্রাম। অবশ্য মৃত্তিকার গুণাগুণ বিচারেও কৌটিল্য গ্রামকে বিভক্ত করেছিলেন। এগুলির তিনটি রূপ ছিল—উত্তম বা প্রথম শ্রেণী, মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং নিম্ন বা তৃতীয় শ্রেণীর গ্রাম। এ সম্পর্কে ড. দীক্ষিতর বলেন, 'Apparently such considerations weighed with the settlement officers in regard to the assessment of the revenue.'[১৫৬] এখন বাংলার প্রাচীন গ্রাম প্রশাসনের প্রকৃত রূপটি তুলে ধরার জন্যে আমরা এখানে সামগ্রিক বিষয়ের আলোচনা করব।

মূলত কৃষিকে কেন্দ্র করেই প্রাচীন বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। গ্রামে যারা বাস করত সাধারণত তাদের মধ্যে ছিল 'কৃষিনির্ভর ভূম্যধিকারী, মহত্তর, কুটুম্ব, কৃষক বা ক্ষেত্রকর, সমাজ-শ্রমিক, ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিক, এবং কিছু কিছু কৃষি ও গৃহস্থ কর্মসম্পৃক্ত শিল্পী। ইঁহাদের জীবনের কামনা-বাসনা, ভাবনা-কল্পনা ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সমস্তই কৃষিকর্ম এবং গ্রাম্য গার্হস্থ্য ধর্মকে আশ্রয় করিয়াই গড়িয়া উঠিত।'[১৫৭] কৃষিনির্ভর এই সমাজ-শ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে শাসন, গ্রামের সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধে নেতৃত্ব দান এবং এর রাজস্ব ব্যবস্থাপনা তদারকির জন্য প্রতি গ্রামেই থাকত একজন করে গ্রাম-প্রধান বা মোড়ল। তিনি বিভিন্ন সময়ে ও স্থান বিশেষে বিভিন্ন নামে অভিহিত হতেন। ঋগ্বেদের অনুসরণে অধিকাংশ স্থানেই তাকে 'গ্রামণী' বলা হত।[১৫৮] তাছাড়া, যেমন গুপ্তদের বেশ কিছু অনুশাসনে তাকে 'গ্রামিক'[১৫৯], 'গ্রামেয়ক' বা 'গ্রামাধ্যক্ষ'[১৬০] ; পালদের সময়ে 'গ্রামপতি'[১৬১], পরমারদের যুগে 'পট্টকিল'[১৬২] বা 'পাটিল', উত্তর প্রদেশে গাহড়বালদের রাজত্বকালে 'মহট্টক'[১৬৩], দাক্ষিণাত্যের পূর্বাঞ্চলে 'মুনুণ্ডা'[১৬৪], মহারাষ্টে 'গ্রামকূট'[১৬৫], কর্ণাটকে 'গাবুণ্ড'[১৬৬], মধ্যযুগীয় ওড়িশায় 'মহত্তর'[১৬৭], 'গ্রামাধিপ'[১৬৮], 'গ্রামেশ বা গ্রামস্যাধিপতি'[১৬৯], 'গ্রামস্বামিন্' বা 'গ্রাম-মুখিয়া'[১৭০], 'গামসামিকা', 'মুলুড়'[১৭১] ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জাতকের যুগে এর উপাধি ছিল 'গামভোজক' (Gamabhojaka)[১৭২]। অনেক সময় পাঁচ

১৫৬ Ibid., pp. 206
১৫৭ . বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদিপর্ব, পৃষ্ঠা ২৮২
১৫৮ তাম্রলিপ্তিক উপভাষা : জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮
১৫৯ Gupta Polity, pp. 272.
১৬০ State and Government in Ancient India, pp. 348.
১৬১ The Political Institutions and Administration, pp. 159.
১৬২ Ibid., pp. 159.
১৬৩ Ibid., pp. 159.
১৬৪ তাম্রলিপ্তিক উপভাষা : জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৮
১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮
১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪৮
১৬৭ ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা ২৩৩
১৬৮ Corporate Life in Ancient India, pp. 144.
১৬৯ ভারতের সামন্ততন্ত্র, পৃষ্ঠা ৯০
১৭০ History of the Hindu Revenue System, pp. 200.
১৭১ Agrarian and Fiscal Economy, pp.17.
১৭২ Corporate Life in Ancient India, pp. 144

থেকে দশটি গ্রামের প্রশাসনিক দায়িত্ব ভার ন্যস্ত হত 'গ্রামণী'র ওপর।[১৭৩] যে কারণে মৌর্য যুগের অনুসরণে 'গ্রামণী'-কে কখনো কখনো 'গোপ'ও (অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত 'সংগ্রহণ'=১০টি গ্রাম প্রসঙ্গ স্মর্তব্য) বলা হত।[১৭৪] অবশ্য একটি গ্রামের প্রধানকেও 'গোপ' বলার নজির বর্তমান।[১৭৫]

'গ্রামণী' ছিলেন রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের একজন নিম্নস্থ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী। যদিও, 'Originally he derived his right to the office through his descent from the founder of the village'[১৭৬] এবং Rhys Davids-এর ধারণায়, 'he was at first elected by the village council or a hereditary officer'[১৭৭] ; কিন্তু তথাপি আমরা বলতে পারি যে, 'later on he was more or less reduced to the position of a petty government official, just as a small wheel in the huge bureaucratic machinery.'[১৭৮] রাজা তথা রাষ্ট্রই ছিল তার নিযুক্তি বা মনোনয়ন কর্তা[১৭৯] এবং সে হিশেবে, 'The headman...was regarded as the representative of the king in the village.'[১৮০] যেহেতু প্রায়শই পদটি ছিল উত্তরাধিকারযোগ্য (hereditary), সেহেতু সঙ্গত কারণেই ধরে নেয়া যায় যে, রাজার এই নিযুক্তি বা মনোনয়ন ছিল আনুষ্ঠানিকতা (formality) মাত্র; বস্তুত জনসাধারণের পছন্দকেই তিনি রাষ্ট্রীয় অনুজ্ঞায় আইনসিদ্ধ করে দিতেন। অবশ্য এটাও এখানে স্বীকার্য যে, 'The king could replace him if he was an incompetent person in his work and appoint some other member of his family to the post.'[১৮১] তবে রাষ্ট্রীয় নিয়োগ সত্ত্বেও 'গ্রামণী' রাজ বেতনভোগী ছিলেন, নাকি 'জায়গির'[১৮২] অথবা আদায়কৃত রাজস্বের অংশবিশেষ ভোগ করতেন, সে সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু জানা যায় না।[১৮৩]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে 'গ্রামণী' সচরাচর তিন ধরনের কাজ করতেন। তার প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল প্রশাসনিক (Executive) বিশেষত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, দ্বিতীয়ত রাজস্ববিষয়ক (Revenue) ও তৃতীয়ত বিচারকার্য সংক্রান্ত (Judicial)। ড. পদ্ম বি.

---

১৭৩ Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India, p. 285.
১৭৪ History of Ancient India, Dr. Ram Shankar Tripathi, pp.156.
১৭৫ The Mauryan Polity, pp. 206
১৭৬ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 30.
১৭৭ Buddhist India, pp. 48.
১৭৮ The Age of the Guptas and Other Essays, pp. 21.
১৭৯ Corporate Life in Ancient India, pp. 144.
১৮০ Cultural History of Ancient India, Dr P. S. Joshi, pp.117.
১৮১ Ibid., pp. 117.
১৮২ প্রাচীনকালে বাংলাসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জায়গির প্রথা প্রচলিত ছিল তা আমরা চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের রচনা ছাড়া বিভিন্ন তাম্রানুশাসন থেকেও জানতে পারি। তবে এ কালে জায়গিরের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এতে অর্থাৎ 'জায়গিরে কর্মচারীর স্বত্ব থাকত না। কিন্তু ভূমিতে স্বত্ব থাকলেও তা নিষ্কর করাতে হলে রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ জমা দিতে হত।' (সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ড. দীনেশ চন্দ্র সরকার, পৃষ্ঠা ১৫৪)।
১৮৩ ড. বিদ্যাধর মহাজন বলেন, 'He (Gramika) was not a paid servant of the Crown but an elected official of the village.' (Ancient India, pp. 285). ড. শচীন্দ্রকুমার মাইতিও ঠিক হুবহু একই ভাষায় অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। (The Imperial Guptas and Their Times, pp. 98).

উদগাওনকর বলেন, 'The most important duty of the village headman was to preserve law and order in the village; for this purpose he used to have a local militia under him... The next duty of the village headman was to collect the village revenues and to pay them into the royal treasury....Settlement of village disputes was also another important duty of the village headman.'[১৮৪] মৌর্য আমলের 'সংগ্রহণ'-প্রধান হিশেবে 'গোপ'দের ক্ষমতার যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন ড. ভি. আর.আর. দীক্ষিতর তাঁর 'The Mauryan Polity' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২০৭), তার উল্লেখ এখানে করা হল, যা থেকে মূলত 'গ্রামণী'র রাজস্ব ও ভূমিবিষয়ক দায়িত্ব-কর্তব্যের একটা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। 'primarily a revenue official' হিশেবে 'গোপ' বা 'গ্রামণী' যে ব্যাপক ও সম্প্রসারিত ক্ষমতা নির্বাহ করতেন তা হল :

'(1) He maintained proper records of the accounts relating to the village or villages under his jurisdiction.
(2) He set up boundary limits of villages, fields, forests and roads.
(3) He numbered the plots of ground under respective heads; cultivable and non-cultivable, dry lands and wet lands, number of gardens including fruit, flower and vegetables.
(4) He also kept a note of the grounds covered by temples and altars, cremation grounds, rest-houses where food and water were supplied, pasture grounds and roads.
(5) He maintained another register wherein were noted down gifts, sales, charities and the cultivable lands remitted of revenue.
(6) He kept yet another register showing the number of houses in his charge, both tax-paying and tax-free. In this he further noted the number of inhabitants, their castes and professions, their income and expenditure besides the head of cattle in each household, as well as other domestic animals.'

'গ্রামণী'কে তার এই বিশাল দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে দুই, তিন, পাঁচ বা ততোধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি (এরা সম্ভবত বে-সরকারি কর্মচারী ছিল; এদের মধ্যে অন্যতম ছিল একজন হিসাবরক্ষক, একজন চৌকিদার ও একজন রাজস্ব সংগ্রাহক[১৮৫]) সহযোগিতা করতেন। এ ছাড়া ছিল 'কুটুম্বিন্' (কুটুম্বিক), 'মহত্তর'[১৮৬] প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্রাম পরিষদ

১৮৪ The Political Institutions and Administration, pp. 161-62.
১৮৫ Cultural History of Ancient India, pp. 117.
১৮৬ The Imperial Guptas and Their Times, pp. 98. প্রশাসনের বিভিন্ন অঙ্গবিভাগে বে-সরকারি প্রতিনিধি হিশেবে 'মহত্তর'দের সংশ্লিষ্টতা থেকে ড. অমিতা চক্রবর্তী তাদেরকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। ড. অমিতার ভাষায়, 'They were of three different classes namely, Visaya-Mahattara, Vithi-Mahattara and Grama-Mahattara.' (History of Bengal : c. 550AD to c. 750AD, pp. 174). তিনি এটাও উল্লেখ করেছেন যে, 'The

যারা নিয়মিত বৈঠকে[১৮৭] বসত এবং 'গ্রামণী'কে পরামর্শ প্রদানসহ ক্ষেত্রবিশেষে নিয়ন্ত্রণও করত। উল্লেখ্য, 'গ্রামণী'র উপাধির মত গ্রাম পরিষদের নামেরও ছিল স্থানিক বিভিন্নতা। কখনো এগুলি 'উর'[১৮৮], কখনো 'নগর',[১৮৯] আবার কখনো 'সভা'[১৯০] নামেও অভিহিত হত। উক্ত অভিলেখ থেকে জানা যায় সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই, 'beyond all doubt that the village corporation had reached a very high state of perfection. They were looked upon as part and parcel of the constitution of the country and were entrusted with the entire management of the village.'[১৯১] শুধু তাই নয়, যৌথ গ্রামসমাজ ব্যবস্থায়, 'The village corporation practically exercised all the powers of a State within its narrow sphere of activity,.....It possessed corporate property which it could sell or mortgage for public purposes,.....could regulate the market, impose taxes, and even levy extra tolls for specific objects of utility. ..The corporation possessed absolute authority over the village lands and..., were, however, responsible for the payment of taxes due from the village.'[১৯২] বাস্তবে এই সমস্ত গ্রামের ক্ষেত্রে আমরা দেখি, 'The royal officers supervised their (of corporation) accounts from time to time and they were liable to fine for dereliction of duty.'[১৯৩]

যা হোক উপরের এই দীর্ঘ আলোচনার প্রেক্ষিতে এখন বলা যায় যে, আজ থেকে শত শত বছর পূর্বে প্রাচীন বাংলার গ্রাম সমাজের সর্ব কর্তৃত্বে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হিশেবে 'গ্রামণী', 'গোপ' বা 'গ্রামিক' (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন)-এর প্রতিষ্ঠা ও অবস্থানের অর্থ একদিকে যেমন রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বব্যাপকতার লক্ষণ বলে মনে করা যায়, তেমনি প্রভূত ক্ষমতাশালী গ্রাম পরিষদে স্থানীয় প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ জনমণ্ডলীর প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিনিধিত্ব তার গণতান্ত্রিক জীবনচর্যারই প্রতিভাস বললে আদৌ অত্যুক্তি হবে না। ফলত, 'The existence of the democratic institutions at the lowest level encouraged the communal life of the people and developed among them a sense of civic duty and love for liberty. It also contributed a great deal to the efficiency and purity of administration.'[১৯৪]

participation of the Mahattaras as non-official members of the council to advise...seems to be significant.'

১৮৭ এই বৈঠক ধনী-দরিদ্র সকলেই উপস্থিত থাকতে পারত। সাধারণত ধনীরা তাতে জাঁকজমকের সাথে উপস্থিত হতেন। (Corporate Life in Ancient India, pp. 124)

১৮৮ 'উর' নামক পর্ষদে কৃষক, শিল্পী, কুমোর, ধোপা, চিকিৎসক প্রভৃতির অংশীদারিত্ব ছিল।

১৮৯ 'নগর' নামক পর্ষদে প্রাধান্য ছিল বণিকশ্রেণী ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর।

১৯০ 'সভা'য় শীর্ষস্থানীয় ছিল ব্রাহ্মণ তথা সমাজের পুরোহিতশ্রেণী ও তাদের গ্রামসমূহের কৃষকগণ।

১৯১ Corporate Life in Ancient India, pp. 179.

১৯২ Corporate Life in Ancient India. pp. 421-22.

১৯৩ Ibid., pp. 422.

১৯৪ Social, Cultural and Economic History of Andia: Ancient Times, p. 148.

আগেই বলেছি ভূমি-রাজস্ব হল ভূমির ওপর রাজস্বত্বের স্বীকৃতি। রাজা বা রাষ্ট্র মূলত দু'টি কারণে ভূমি-রাজস্বের প্রাপ্যাধিকার দাবি করে। এক. রাষ্ট্র মনে করে যে, রাজ্যস্থিত প্রতিটি ভূমি খণ্ডেই এর মৌলিক একটা স্বত্ব রয়েছে, যে কারণে মূল মালিক হিশেবে বাস্তব ভূম্যধিকারীর কাছে তার এই পাওনা। দুই. রাজা প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যে বিশেষত ভূমিজ ফসলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 'ভাগ'-এর অধিকারী, 'কারণ তিনি প্রজার জীবন ও সম্পত্তি সুরক্ষিত রাখেন।'[১৯৫] এখন এই যে ভূমি-রাজস্ব, যা সুপ্রাচীনকাল থেকে বর্তমান শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত শুধু বাংলা বা ভারত নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রের আয়-সম্পদের মুখ্য উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোষাগার পরিপূরণের অন্যতম ভিত্তি হিশেবে গণ্য হয়ে আসছিল, পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে প্রাচীন বাংলায় ভূমি-রাজস্বের হার বা মাত্রা কী ছিল, সেটাই আমরা এখানে বিভিন্ন উৎস ও সূত্রের প্রেক্ষিতে আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করব।

অবিভক্ত বাংলা ও ভারতে রাষ্ট্রীয় সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজস্ব ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রচলন ঘটেছিল প্রাক ৩২৫ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে।[১৯৬] তবে প্রথম মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের আমল (৩২৫-৩০০ খ্রিঃপূঃ) থেকে যেহেতু এখানে প্রথমবারের মত একটি সুবিন্যস্ত ও সুসংহত বৃহদায়তন শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, সেহেতু আমাদের আলোচ্য রাজস্ব ব্যবস্থায় প্রচলিত ভূমি-রাজস্ব-এর হার আলোচনা করতে আমরা প্রথমত কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', গ্রীক লেখকদের বিশেষ করে মেগাস্থিনিসের বর্ণনা ও সমকালীন বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রকারদের রচনা, এবং দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত লিপিপ্রমাণকে অনুসরণ করব।

বর্তমান পুস্তকের শুরুতেই আমরা দেখিয়েছি যে প্রাচীনকালে রাজস্ব প্রথা ছিল নানা নামে নামাঙ্কিত। মৌর্যদের সময়ে যেমন ছিল বালি, ভাগ, কর, শুল্ক, বিষ্টি, প্রণয় প্রভৃতি, তেমনি গুপ্তদের সময়ে আমরা পাই উদরঙ্গ, উপরি-কর, বাটা, ভূত, ধান্য, হিরণ্য, অদেয়, বিষ্টিকা, দশপ্রদ, ভাগ-ভোগ ইত্যাদি।[১৯৭] বিভিন্ন রাজবংশের রাজত্বকালে মূল ভূমি-রাজস্ব ও ভূমিসম্পর্কিত অন্যান্য অতিরিক্ত রাজস্বের নামের যেমন পরিবর্তন হয়েছিল তেমনি স্থান ও সময় বিশেষে এর হারেও ঘটেছিল উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। তা ছাড়া দেখা গেছে কেন্দ্রীয় রাজস্ব ব্যবস্থায় ভূমি-রাজস্বের যে সাধারণ হার নির্দিষ্ট করা ছিল, পরবর্তীকালে একই ভূমি বা ভূমিখণ্ডের হস্তান্তর যখন মধ্যস্বত্বে চলে যায় বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের আদায়ী স্তরে রাজকর্মচারীগণ বেতনের পরিবর্তে জায়গির প্রাপ্ত হলে, উক্ত জায়গির ভূমিতে তারা ইচ্ছে মত ভূমি-রাজস্ব ধার্য করত, এবং প্রজা তা দিতে অস্বীকৃত হলে জোরপূর্বক তা আদায় করত। পাল ও সেন যুগের কোন কোন তাম্র পট্টোলিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৯৮] বস্তুত এই সব স্বার্থান্বেষী রাজকর্মচারীদের ধার্যকৃত রাজস্বের হার হত অত্যধিক, বলা যায় প্রজার সাধ্যাতিরিক্ত। ফলে এই সীমাতিরিক্ত তথা রাষ্ট্র অনিয়ন্ত্রিত বা তার জ্ঞান-বহির্ভূত রাজস্বের হার আমাদের এখনকার আলোচ্য নয়। আমরা বস্তুত এখানে বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক ধার্য ও প্রচলিত নিয়মিত-অনিয়মিত রাজস্বের হার নিয়ে আলোচনা করব।

১৯৫ প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃষ্ঠা ১১৫
১৯৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫
১৯৭ Indian Land System, Dr R.K. Mookerjee, pp. 14-15.
১৯৮ বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৯

প্রাচীন যুগে বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্রকার প্রচলিত ভূমি-রাজস্বের বিভিন্ন হারের কথা উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম মনু। তাঁর মতে, 'Of cattle, of gems, of gold and silver, added each year to the capital stock (the king's share is) a fiftieth part, of grain an eighth part, or a sixth or a twelfth, according to the difference of the soil and the labour necessary to cultivate it.'[১৯৯] রাষ্ট্রীয় জরুরি অবস্থায় যেমন যুদ্ধ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধকা প্রয়োজনে রাষ্ট্র ভূমি-রাজস্বের হার এক-চতুর্থাংশে বৃদ্ধি করতে পারত।[২০০]

প্রাক-মৌর্য যুগীয় স্মৃতিকার গৌতম বিধান দেন, 'Cultivators (must) pay to the king a tax (amounting to) one-tenth, one-eighth, or one-sixth of the produce.'[২০১] শাস্ত্রকার বশিষ্ঠের মতে, 'But a king who rules in accordance with the sacred law may take the sixth part of the wealth (of his subjects)'.[২০২]

বৌধায়ন বলেন, 'Let the king protect his subjects receiving from them a sixth part (of their income).'[২০৩] স্মৃতিকার বিষ্ণুও অনুরূপ বিধান দেন। তাঁর ভাষায়, 'He (the king) must take from his subjects as tax a sixth part of every year of the paddy.'[২০৪] এছাড়া তৎকালীন বিখ্যাত স্মৃতিকারদের মধ্যে আপস্তম্ব, নারদ, শুক্রাচার্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মনীষীও রাষ্ট্রের প্রাপ্য আয়স্বরূপ ভূমি-রাজস্বের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করে দিয়েছেন। বৃহস্পতি যে বিধান দেন তা গৌতমের অনুরূপ।[২০৫] 'মহাভারতে'র 'শান্তি-পর্বে'[২০৬] তথা 'রাজধর্ম' অধ্যায়ে[২০৭] ভূমি-রাজস্বের হার নির্দিষ্ট হয়েছে $\frac{১}{৬}$, 'অগ্নি-পুরাণে'[২০৮] $\frac{১}{৬}$ ও $\frac{১}{৮}$, মহাকবি কালিদাসের রচনায়ও $\frac{১}{৬}$ অংশ।[২০৯] কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' রাজস্বের হার বিভিন্ন নির্ধারিত হলেও মোটামুটি তিনি ধান্য ইত্যাদি ফসলের ওপর যে হার নির্দিষ্ট করেছিলেন তা হল 'ষড়্‌-ভাগ' অর্থাৎ উৎপন্নের ষষ্ঠ ভাগের এক অংশ।[২১০] মেগাস্থিনিসের সূত্র অবলম্বনে ডায়োডোরাস মৌর্য যুগের ভূমি রাজস্ব সম্বন্ধে বলেন, জনসাধারণ, 'besides the land tribute, they pay into the royal treasury, a fourth part of the produce of the soil.'[২১১]

১৯৯ Quoted from 'The Land Systems of British India' Vol. I., p. 265.
২০০ Ibid., p. 265.
২০১ Quoted from 'Famines and Land Assessments in India', p. 226.
২০২ Ibid., p. 226.
২০৩ Baudhayana, Prasna 1, Adhyaya 10, Kandica 18, Verse 1, Buhler 192.
২০৪ Quoted from 'History and Incidents of Occupancy Right', p. 8,
২০৫ Dr. D. N. Jha in 'Land Revenue in India', Ed. by Ram Sharan Sharma, p. 4.
২০৬ Mahavarata, Santi Parva, Chapter LXIX.
২০৭ See, The Hindu Revenue System, pp. 71.
২০৮ See, Economic History of the Deccan, Dr Dipak Ranjan Das, p. 55.
২০৯ See, Economic Life of Northern India, p. 77.
২১০ কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২, ৮৩
২১১ Quoted from 'Agrarian and Fiscal Economy', p. 263.

এক্ষণে উপরিউক্তি আলোচনা থেকে আমরা একটা জিনিস খুবই স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, আর তা হল 'the authorities are not unanimous as to the extent of this share (share of the produce)' বা অন্যভাবে বললে বলা যায়, 'The king's share of the produce varies from $\frac{1}{4}$ to $\frac{1}{12}$ in the Smritis, and the Dharmasastras.'[২১২] তবে এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, প্রায় সব স্মৃতিকার-লেখকই রাষ্ট্রকর্তৃক ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের সময় কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের প্রতি নজর রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনায় যে অনেক সময় ভূমি-রাজস্বের হারে তারতম্য হওয়া উচিত, এটাই তাঁদের বক্তব্যে ফুটে উঠেছে।

ভূমিতে কর বা রাজস্ব নির্ধারণের বেলায় রাষ্ট্রের প্রধান যে বিবেচ্যগুলির দিকে নজর রাখা প্রয়োজন তা হল :

১. ভূমির গুণাগুণ ও উর্বরতা শক্তি;
২. সেচ সুবিধা;
৩. উৎপাদন ব্যয় (যার মধ্যে শ্রমের লভ্যতা-অলভ্যতা অন্যতম);
৪. প্রজার আর্থিক অবস্থা ও সঙ্গতি।

ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা তথা উর্বরতা শক্তি যে সর্বত্র সমান নয় এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। কোন ভূমি বৎসরে একবার মাত্র চাষযোগ্য অর্থাৎ একটি ফলনশীল, কোনটা দো-ফসলি (এমন কি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় একটি ভূমিতে তিনটি ফসলও উৎপাদন করা সম্ভব)। আধুনিক ব্যবস্থায় চাষাবাদ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় মোটামুটি সকল চাষযোগ্য ভূমিই বছরে হয় একবার উৎপাদনক্ষম অথবা দু'টি ফসলের চাষোপযোগী ছিল।[২১৩] আবার বিভিন্ন ভূমিতে এক বা একাধিক ফসলের উৎপাদন-সীমারও ছিল বিভিন্নতা। কোনটিতে যদি বিঘা প্রতি ১২ থেকে ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হত, তো পার্শ্ববর্তী অনুরূপ ভূমিখণ্ডে হত ১৮ থেকে ২০ মণ বা তারও বেশি। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদনের আনুষঙ্গিক সকল ব্যবস্থা যেমন শ্রম, সার, বীজ ইত্যাদি একই মাত্রায় প্রয়োগ করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র মাটির স্থানীয় গুণাগুণের কারণে উৎপন্ন ফসল যা পাওয়া যাচ্ছে, তা একজন ভূম্যধিকারী থেকে আরেক জনে কমবেশি হচ্ছে। অথচ মৃত্তিকার গঠন ও বৈচিত্র্যের ওপর কারো হাত নেই। সুতরাং অনুরূপ অবস্থায় এই জাতীয় ভূমির রাজস্ব এক না হওয়াই সঙ্গত। সত্যি বলতে প্রাচীন ও মধ্য বাংলায় এটাই ছিল ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণে রাষ্ট্রের মৌল নিরিখ, যার প্রমাণ পাওয়া যায় কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' ও আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে। তাঁরা উভয়ই ভূমির স্থানীয় গুণ-বৈচিত্র্যের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রের সকল রাজস্বযোগ্য ভূমিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন—উত্তম, মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর, এবং সেই অনুসারে ভূমি-রাজস্ব নিরূপণে রাষ্ট্রকে পরামর্শ দিয়েছেন। কৌটিল্যের শ্রেণী বিশেষ করে এর দুটি সম্পর্কে ড. উপেন্দ্র নাথ ঘোষাল চমৎকার একটি মন্তব্য

২১২ Contributions to the Economic History of Northern India, p. 179.
২১৩ Megasthenes indicates the fertlity of India by the fact of the soil producing two crops every year both of fruits and grain,' (Strabo, Ancient India as Described in Classical Literature, John W. McCrindle, p. 25).

করেছেন। তিনি বলেন, 'This would be meaningless if the two classes of soils (sthala or upland and kedara or low land)....mentioned were not assessed for the land-revenue at different rates.'[২১৪] আমরা মনে করি ভূমির এই স্থানিক বৈচিত্র্য ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবশ্যই বিবেচ্য, নতুবা গড়পরতা যে কোন সমহারই হয়ে দাঁড়াবে শুধু 'Meaningless'-ই নয়, উপরন্তু অন্যায়, অন্যায্য ও উৎপীড়নমূলক।

প্রাচীনকালে ভূমিতে সেচ সুবিধার সহজ প্রাপ্যতা-অপ্রাপ্যতাও ভূমি-রাজস্বের মাত্রা নির্ধারণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করত। যে ভূমি নদী-তীরবর্তী (অবশ্যই লবণাক্ত পানিবহুল নদী নয়), তা যতটা সহজে ও প্রচুর পরিমাণে পানি সেচের সুবিধা পেত, ঠিক ততটা সুবিধা পেত না বৃহৎ পুকুর বা জলাশয়ের নিকটবর্তী ভূমি। উপরন্তু এই দুই সুবিধা বঞ্চিত ভূমি বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীর ভূমি যা মূলতই নির্ভরশীল ছিল বৃষ্টির পানির ওপর (সেটাও কখনো কখনো অনিয়মিত) অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, সেচ সুবিধাবঞ্চিত ভূমি এবং পতিত বা টিলাস্থানীয় ভূমি,...এই তিন ধরনের ভূমির উৎপাদনশীলতা এক হলেও (না হওয়াই স্বাভাবিক) তাতে উৎপাদন ব্যয় যে সমান ছিল না বা হত না, তা অনস্বীকার্য। সুতরাং এগুলির ওপর ধার্য রাজস্বও যে সমান হত না তা ধরে নেয়া যায়। ফলত 'শুক্রনীতিসারে' তাই বিধান দেওয়া হয়েছে, এই জাতীয় ভূমিতে রাষ্ট্রের নির্ধারিত ভূমি-রাজস্ব হবে নিম্নরূপ :[২১৫]

নদী থেকে সেচ সুবিধা প্রাপ্ত ভূমির রাজস্ব হবে........$\frac{১}{২}$

পুকুর বা অন্য জলাশয় থেকে প্রাপ্ত ভূমির...........$\frac{১}{৩}$

বৃষ্টির পানি দ্বারা স্নাত ভূমির...................$\frac{১}{৪}$

পতিত বা টিলাস্থানীয় ভূমির.............$\frac{১}{৬}$

অধিক উৎপাদনের জন্যে বর্তমান কালের মত প্রাচীন যুগেও ভূমিতে সারের প্রয়োগ করা হত। যদিও এই সার ছিল প্রাকৃতিক, আজকের মত কৃত্রিম বা রাসায়নিক নয়। ফলে যদি ধরে নেয়া যায় যে, প্রাকৃতিক সার ব্যবহারের দরুণ ভূমিতে সকল ভূম্যধিকারীরই ব্যয় ছিল একরূপ বা সমান, কিন্তু শ্রমের সহজ লভ্যতা যে সর্বত্র সমান ছিল না, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। সুতরাং মূলত কৃষিশ্রমিকের সহজ প্রাপ্যতা ও দুষ্প্রাপ্যতার কারণেও ভূমির উৎপাদন ব্যয়ের কমবেশি হত। যে কারণে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণের সময় আলোচ্য যুগে রাষ্ট্র এদিকটাও বিবেচনায় নিত।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ জরুরি, ভূমি-রাজস্ব প্রদানে প্রজা বা ভূম্যধিকারীর আর্থিক অবস্থা ও সঙ্গতি। শেষোক্ত বিষয়টিকে আমরা ড. পুষ্প নিয়োগীর উল্লিখিত 'Regional' বা 'অঞ্চলগত' কারণও বলতে পারি। এটা ঠিক যে, ভূমি অধিকার করলে বা ভোগে রাখলে, তা থেকে রাষ্ট্রকে কর দিতে হবে। কিন্তু এই স্বতঃসিদ্ধি প্রজা স্বীকার করলেও অনেক সময় নানা বাহ্যিক কারণে তার পক্ষে রাষ্ট্রকে রাজস্ব প্রদান সম্ভব হয়ে উঠত না। তাছাড়া এই অবস্থা রাষ্ট্রের সর্বত্র একই সময়ে বিরাজ করত না, বা কোন

২১৪ Quoted from 'Economic History of the Deccan', p. 55.

২১৫ The Economic History of Northern India, pp. 180.

অঞ্চলে এ বছর করলেও ঠিক অব্যবহিত পরবর্তী বছরে সেই অবস্থা যে অব্যাহত থাকত তা-ও নয়। মূলত এটা ছিল একান্তই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনাজাত। যেমন খরা বা অনাবৃষ্টির দরুণ কোন কোন বছরে ফসলের উৎপাদন কম হত, বা ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদিতে উঠতি ফসলের ব্যাপক বা সমূহ ক্ষতির ফলে উৎপাদন একেবারেই হত না। বস্তুত এই উভয় বা অন্যবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগে সৃষ্ট ফসলের ক্ষতি পরিপূরণের জন্যে রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ভূমির এক বা উপর্যুপরি কয়েক বছরের রাজস্ব মওকুপ করে দিত, ক্ষেত্রবিশেষে আনুপাতিক হ্রস্ব হারে রাজস্ব ধার্য করত, যা অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়ানুগ হত। এই প্রবণতা যে এখনো একেবারে নেই, তা নয়।

যা হোক, প্রাচীন বাংলায় ভূমি-রাজস্বের হারের বিভিন্নতা ও তা নিরূপণের প্রেক্ষিত যা-ই হোক না কেন, এখন প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তৎকালে আদৌ কোন সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন হার (Fixed and Universal) তথা 'Standard rate' ছিল কি-না? এক কথায় এর উত্তর, না। যদিও আমরা জানি প্রাথমিক যুগের মুখ্য ভূমি-রাজস্ব 'বালি'র নির্দিষ্ট কোন হার ছিল না[২১৬], অথবা থাকলেও তার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ সম্বন্ধে ইতিহাস নিশ্চুপ। দ্বিতীয়ত স্মৃতিকার ও অন্যান্য প্রাচীন লেখকদের রচনায় ভূমি-রাজস্বের যে হার লিপিবদ্ধ হয়েছে, 'The rate varies from one-twelfth, one-tenth, one-eighth, and one-sixth in normal times, to as much as one-fourth and even one-third of the produce, in times of emergency,'[২১৭] তথাপি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও স্থানে ভূমি-রাজস্বের প্রচলিত সাধারণ হার ছিল এক-ষষ্ঠমাংশ।[২১৮] পালদের সময়কার বিশেষত ধর্মপালের রাজত্বকালে নবম শতকের গোড়ার দিকে রাজস্ব কর্মচারী হিশেবে 'ষষ্ঠাধিকৃত'-এর পদবি থেকেও এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, 'the rate $\frac{1}{6}$ was the normal rate in his kingdom.'[২১৯] পরবর্তীকালেও এই হার মোটামুটি চালু ছিল। তবে এটা সর্বত্র প্রচলিত ছিল তা বলা যায় না— 'From the few typical cases, ...it appears that actually there was no uniform rate fixed throughout the land; it was subject to changes, depending very much on variable factors including

২১৬ We have no idea about the traditional and customary rate of bali, coming down from the Vedic period; it may have varied from 1/16 to 1/10.' (Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India,) p. 207.

২১৭ Aspects of Economic History of Bengal, p. 163.

২১৮ Land Revenue in India : Historical Studies, Ed. by Dr Sharma, p. 4; The Economic History of Northern India, Dr Niyogi, p. 180; Economic History of the Deccan, Dr Das, p. 55; প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, ড. রণবীর চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা ১১৫; 'Economic Organisation in Ancient India,' Dr Nigan, p. 278. অবশ্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, এই সময় অর্থাৎ প্রাচীন যুগে পৃথিবীর অন্যত্র যেমন ইরান (প্রাচীন পারস্য), চিন, বার্মা, গ্রীস, রোমান সাম্রাজ্যসহ অধিকাংশে দেশে— 'one-tenth of the produce of the soil was regarded as a proper contribution to the public exchequer.' (Famines and Land Assessments in India, p. 225).

২১৯ The Economic History of Northern India, pp. 181.

temperaments and policies of kings.'[২২০] অবশ্য মৌর্য যুগের চেয়ে গুপ্ত যুগের ভূমি রাজস্বের হার তুলনামূলক কম ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন।[২২১]

এ পর্যায়ে আমরা আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করবো। এক. সাম্রাজ্যব্যাপী ভূমি-রাজস্বের কমবেশি যে হার নির্ধারিত হত, তা কি মোট (Gross) উৎপন্নের ওপর, নাকি 'নেট' (Net) আয়ের ওপর ধার্য হত? বস্তুত আজ অবধি এ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয়—'the share.....claimed must have been of the gross produce.'[২২২] মেধাতিথি, গোবিন্দ বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে রঘু নন্দন স্পষ্ট বলেন, 'In every case, the share is on profit made after deducting expenses.'[২২৩] কিন্তু এটা হল শাস্ত্রকারদের ন্যায়নীতির কথা। বাস্তবে যা দেখা যেত তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, 'the cost was not taken into consideration in fixing the taxes in question.'[২২৪] মধ্যযুগে তো এটা হরহামেশাই ঘটত। তখন অনেক সময়, 'taxes were to be paid even before any expenses had been defrayed.'[২২৫] তবে 'gross' হোক, বা 'net', ড. আলটেকর এক্ষেত্রে উভয়ের একটা সুন্দর সমীকরণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'the share claimed by the state would be about 16% of the gross produce and 25% of the net income.'[২২৬]

দ্বিতীয়ত প্রাচীনকালে ভূমি-রাজস্ব নগদ অর্থে, নাকি উৎপাদিত দ্রব্যে (in cash or in kind) পরিশোধিত হত—তারও দুটো ধারণা পাওয়া যায়। কখনো তা নগদ অর্থে পরিশোধিত হত, আবার কখনো উৎপন্ন দ্রব্যে। ভূমিতে রোপনকৃত শস্য কাটার উপযুক্ত হয়ে এলে তার অব্যবহিত পূর্বে বা অনেক সময় শস্য রোপন থেকে কর্তনের সময়ের মাঝামাঝি যে কোন উপযুক্ত সময়ে রাজস্ব কর্মচারীগণ সংশ্লিষ্ট ভূমিতে যেত এবং নজর-আন্দাজে (eye-estimation) সম্ভাব্য উৎপন্নের পরিমাণ নির্ধারণ করত। পরে ফসল কর্তনকালে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে নির্দিষ্ট 'ভাগ' ফসলে গ্রহণ করে স্থানীয় রাষ্ট্রীয় ধনাগারে (Granary) সংরক্ষিত করত। আবার যে ক্ষেত্রে অর্থমূল্যে ভূমি-রাজস্ব আদায় করা হত, তা পূর্বোক্ত প্রকারে পরিমাপ শেষে আনুমানিক মূল্য নিরূপণ করা হত এবং সেই অনুপাতে প্রজা সাধারণের কাছ থেকে নগদে উশুল করা হত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উৎপন্ন দ্রব্যে প্রদেয় এবং একাধিক ফসল উৎপাদনক্ষম ভূমির ক্ষেত্রে রাজস্ব বছরে একাধিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যেত। কেননা দো-ফসলি ভূমির ফসল ফলত বছরে দু'বার এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে। ফলে ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বেলায়ও অনিবার্য কারণে দু'টি সময় নির্ধারণ

২২০ Ibid., pp. 181.

২২১ The king's normal grain share was realised at lower rates in Gupta times than in the Mauryan days.' Dr Jha, 'Land Revenue In India', pp. 5.

২২২ State and Government in Ancient India, pp. 271.

২২৩ Dr Jha, 'Land Revenue in India', p. 5-6. ড. এ এন বসুও মনে করেন, 'the old average rate of land revenue was 'most probably levied on profit.' (Social and Rural Economy, Vol. I., pp. 155).

২২৪ The Economic History of Northern India, pp. 182.

২২৫ Ibid., pp. 181-82.

২২৬ State and Government in Ancient India, pp. 271.

করা হত। তাছাড়া দ্রব্যে বা নগদে যেভাবেই হোক, ভূমি-রাজস্ব প্রদানে অনিচ্ছুক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে ব্যর্থ ভূম্যধিকারীর ভোগদখলি ভূমি অন্যত্র বিক্রি করত রাষ্ট্র নিজ প্রাপ্য উশুল করে নিত।[২২৭] তবে যেহেতু মাটির উর্বরতা শক্তি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেচ সুবিধা ও ক্ষেত্রত আঞ্চলিক অবস্থা বৈগুণ্যে রাষ্ট্রীয় নীতির উদারতা ইত্যাদির জন্য বর্ষভিত্তিক ভূমি-রাজস্বের মাত্রা অনেক সময় ওঠানামা করত অর্থাৎ এক কথায় দীর্ঘকালব্যাপী একই এবং সর্বত্র সমহার স্থিতিশীল রাখা আদৌ সম্ভব হত না, সেহেতু আমরা নির্দ্বিধায় ধরে নিতে পারি, প্রাচীন বাংলায় স্থায়ীভাবে রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন সুযোগ ছিল না—'There was no permanent settlement of the land tax.'[২২৮]

পরিশেষে রাজস্ব বর্ষকাল সম্বন্ধে বলে আমরা এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো। মূলত প্রাচীন বাংলায় রাজস্ববর্ষের শুরু ও শেষ সম্বন্ধীয় তথ্যোদ্‌ঘাটনে নির্দিষ্ট ও সর্বগ্রাহ্য লিপিপ্রমাণের অভাব হেতু আমরা এ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে সমর্থ না হলেও বাংলার বাইরে প্রাপ্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তথ্য নির্দেশিত লিপিপ্রমাণের ভিত্তিতে দু'একটি ধারণা করতে পারি।

দক্ষিণ ভারতীয় বেশ কিছু লিপিপ্রমাণ থেকে জানা যায়, এতদঞ্চলে রাজস্ব বর্ষ শুরু হত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি-মার্চে।[২২৯] কিন্তু উত্তর ভারতে ছিল অন্যরকম ব্যবস্থা। চাহমান বংশীয় রাজা কীর্তিপালের নদোল অনুলিপিতে দেখা যায় এখানকার গ্রামবাসীরা বাংলা সনের 'ভাদ্রপদে' (আগস্ট-সেপটেমবর) বার্ষিক রাজস্ব পরিশোধ করত। কুল্লুক ভট্টের রচনায়ও ভাদ্রপদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[২৩০] তবে তিনি এর সঙ্গে যোগ করেছেন 'পৌষ'-কেও। দ্বিতীয় মহেন্দ্রপালের প্রতাপগড় অনুশাসন থেকে প্রতীয়মান হয় কোন কোন অতিরিক্ত ভূমি-কর চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল) মাসেও সংগৃহীত হত। অর্জুন অনুশাসনে বাস্তু-কর চৈত্রসংক্রান্তির উৎসবকালে প্রদানের নিদর্শন দেখা যায়।[২৩১]

এক্ষণে সার্বিক বিবেচনায় আমরা মোটামুটি এটা বলতে পারি যে, সম্ভবত প্রাচীন বাংলায় রাজস্ববর্ষ মার্চ-এপ্রিলে শুরু হত এবং এর সমাপ্তি গিয়ে দাঁড়াত জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে তথা উত্তর-শরতে।

২২৭ Ibid., pp. 273.
২২৮ State and Government in Ancient India. pp. 272.
২২৯ A. Appadorai, Economic Conditions of Southern India, Vol. II., p. 690; Also see, 'The Economic History of Northern India', p. 219.
২৩০ Cf, Kane, Dharmasastra, III, p. 191 ff.
২৩১ The Economic History of Northern India, pp. 220.

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (সুলতানী আমল)

১২০৩-৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের (১২০৬-২১) সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি (১২০৩-১২০৬)-র অতর্কিত আক্রমণে বাংলার তৎকালীন সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫) 'নওদিয়া'[১] ছেড়ে যেদিন পূর্ববঙ্গের পথে পা বাড়ান, মূলত সেদিন থেকেই বাংলায় সুদীর্ঘ হিন্দু শাসনের সূর্য অস্তমিত হয়। এরপরও লক্ষ্মণ সেন কিছুদিন রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু সে শাসনে ছিল না স্বাধীন ও পরাক্রমশালী রাজদণ্ডের বিক্রম ও ঔজ্জ্বল্য। তাই বলা যায় বখতিয়ারের হঠাৎ আগমন সূচিত করেছিল বাংলায় তুর্কি বা আরও নিশ্চিত করে বললে সুলতানি শাসনের গোড়াপত্তন। শুরু হলো মধ্যযুগের ইতিহাস, অন্য কথায় ভারতে মুসলমানদের ইতিহাস। এটা ঠিক যে একটা স্থিহিশীল শাসনের অকস্মাৎ অবসানে নতুন যে রাজনৈতিক পট-পরিবর্তন ও পালাক্রম শুরু হয়েছিল তাতে করে বাঙালির বিশেষত তৎকালীন হিন্দু সমাজ তথা জনজীবন ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে একটি অনিবার্য বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল[২] , কিন্তু

বখতিয়ার খলজি কর্তৃক রাজা লক্ষ্মণ সেনের বিতাড়ন-রাজ্য তথা একটি স্থাননাম হিশেবে সমকালীন ঐতিহাসিক মীনহাজ-ই সিরাজ এই নাম ব্যবহার করেছেন। তবে এর আদত নাম ও ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে পণ্ডিতমহলে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রমুখ একে প্রাচীন রাঢ় অঞ্চলের 'নবদ্বীপ' বলে ধারণা করেছেন। সম্ভবত তারা বিখ্যাত 'আইন-ই আকবরী'র লেখক আবুল ফজল কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তবে তাঁদের মত যে ঠিক নয় এ সম্বন্ধে সপ্রমাণ বিস্তারিত আলোচনা করে দেখিয়েছেন স্বনামধন্য ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ (গৌড় রাজমালা), কাজী মোহাম্মদ মিছের (রাজশাহীর ইতিহাস), ড. আবদুল করিম (বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল), অধ্যাপক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (তবকাত-ই-নাসিরী, বাংলা একাডেমী), অধ্যাপক নাজিরুল ইসলাম মোহাম্মদ সুফিয়ান (বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস)। উল্লেখ্য এঁরাও সকলে একমত নন। রমাপ্রসাদের মতে মীনহাজের 'নওদিয়া' আধুনিক রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া শহরের ১০ মাইল পশ্চিমে এক সময়কার কুমার রাজার রাজধানী 'কুমারপুরের' নিকটবর্তী 'বিজয়নগরে' অবস্থিত ছিল (ঐ, ১১)। নাজিরুল ইসলামের মতে, 'নওদিয়া......দুর্গ লখনৌতি ও বঙ্গের মধ্যবর্তী অঞ্চলে' (ঐ, ৪৩)। আবুল কালাম যাকারিয়ার মতে, 'মীনহাজ বর্ণিত নওদীহ্ ছিল খুব সম্ভব রাজশাহী বা মালদহ জেলার কোন স্থানে অর্থাৎ বরেন্দ্রভূমিতে, রাঢ় অঞ্চলে নয়' (ঐ, ২৭৩)। অন্যদিকে ড. করিম মনে করেন, 'বখতিয়ার খলজি যেই নদীয়া জয় করেন, তাহা ভাগীরথী তীরের নদীয়া, উত্তর বঙ্গের কোন স্থান নয়' (ঐ, ৭৮)।

বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষকসমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ৩৬।

তারপরও বলতে হবে সেটা ছিল একটি নতুন শাসনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যে প্রক্রিয়ার সুদূরপ্রসারী ফল হিশেবে আমরা পাই পরবর্তী কয়েকশ' বছরের তাৎপর্যপূর্ণ মুসলিম শাসন। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেন, 'খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে বাংলার ইতিহাসে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হল। নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, নতুন ধর্ম, নতুন ভাষা ও সংস্কৃতির পতাকা বহন করে বখ্‌তিয়ার খলজি বাংলার পুণ্যভূমি নবদ্বীপে প্রবেশ করলেন।'[৩] তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একটি কেন্দ্রীয় সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অধীনে বাংলাব্যাপী মুসলিম শাসন সম্প্রসারণ করতে মুসলমানদের আরও প্রায় পঁচিশ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বস্তুত এই ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে যখন দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন ইলতুতমিশের (১২১১-১২৩৬) জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ (১২২৭-১২২৯) লখনৌতির তৎকালীন শাসক গিয়াস উদ্দিন ইওয়াজ খলজি (১২১২-১২২৭)-কে যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা দখল করেন। বস্তুত 'অতঃপর বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্য দিল্লির অধীনস্থ প্রদেশে পরিণত হয়।'[৪]

এই সময় থেকে শুরু করে বাংলায় মোগল শাসনের সূচনাকাল পর্যন্ত (১৫৭৫-৭৬) বিভিন্ন সময়ে (অন্তর্বর্তী কাল হিশেবে রাজা গণেশের সময় ১৪১৫-১৪১৮ ব্যতীত) কমবেশি পঞ্চান্ন জন মুসলিম সুলতান এদেশ শাসন করেন। তবে দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব সুবিশাল এবং পথঘাট দুর্গম ও স্থানীয় জলবায়ু ও লোকের জীবনচর্যা দিল্লির শাসক ও তাঁদের পদস্থ প্রতিনিধিদের কাছে সবসময়ই অপছন্দের হওয়ায় এবং নিয়ন্ত্রণ শৈথিল্যের কারণে কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণী সর্বদা স্থানীয় শাসনকর্তাদের নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার ও বার্ষিক রাজস্ব প্রাপ্তির (তাও কোনও কোনও সময় অনিয়মিত ও অনির্ধারিত) নিশ্চয়তা পেয়েই অনেকটা সন্তুষ্ট থাকতো। যে কারণে বাংলার এই সময়ের কেন্দ্রের প্রতিনিধি-শাসকগণ প্রায় স্বাধীন নরপতির মতোই রাজত্ব করে গেছেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আর ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দু'শত বছর ইলিয়াসশাহি ও তৎপরবর্তী সুলতানগণ তো দিল্লির সুলতানদের মতোই স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছেন। তারপরও বলবো এই পঞ্চাশোর্ধ সংখ্যক শাসকের মধ্যে হাতে গোণা কয়েক জন মাত্র বাংলায় বলিষ্ঠ ও প্রকৃতার্থ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯), সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৭), সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৯৩-১৪১১), সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ (১৪৩৬-১৪৫৯/৬০), সুলতান রুকন উদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪), সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখ্য বাংলার এ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক হোসেন শাহী বংশের পূর্বোক্ত আলাউদ্দিন হোসেন শাহ যদিও 'constitutes a brilliant epoch in the history of medieval

---

৩ মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১।

৪ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ১০৭

Bangal'[৫] এবং তাঁর রাজত্বকাল—'witnessed the territorial extension of the kingdom of Bengal on every side as is evident from literary, epigraphic and numismatic sources.'[৬], এতদ সত্ত্বেও এই সকল সুলতানদের বর্ণাঢ্য শাসনকাল আমাদের পর্যালোচ্য ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার নির্ভরযোগ্য ও বিস্তারিত তথ্য দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। এর মুখ্য কারণ 'ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব বন্দোবস্তের কোন প্রামাণিক বিবরণ পাওয়া যায় না।'[৭] তবে বাস্তব অবস্থা যাই হোক, এ থেকে আমরা তিনটি ধারণা করতে পারি।

এক, এঁরা শ্রেণীগতভাবে যেহেতু 'despotic' ছিলেন এবং এঁদের কথা বা নির্দেশই তৎকালে আইন হিশেবে গ্রাহ্য হতো, যে কারণে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সহজেই এঁরা ভূমিরাজস্ব আদায় করতে পারতেন (জোরজবরদস্তি ছাড়াও), সেহেতু একটি স্বতন্ত্র ও বিস্তৃত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রয়োজন এঁরা তেমন অনুভব করেননি; দুই. এঁদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যকই যেহেতু ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাৎ দিল্লির সুলতানদের স্থানীয় প্রতিনিধি এবং অন্যদের সামনে ছিল দিল্লির প্রচলিত শাসনব্যবস্থার মোটামুটি একটি রূপরেখা, সেহেতু নতুন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন তেমন হয়নি; তিন. এমন হতে পারে, বাংলার স্বাধীন সুলতানগণ সুদীর্ঘকালব্যাপী যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিলেন কালচক্রে তার লিখিত প্রমাণ বা লিপিপঞ্জি বিলুপ্ত হয়েছে অর্থাৎ আমাদের কাল পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। অবশ্য রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যস্ততার নিগড়ও এঁদেরকে এদিকে প্রত্যাশিত দৃষ্টি দিতে দেয়নি এটাও একটা কারণ হতে পারে। যা হোক, সুলতানী শাসনামলের প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কোন সুস্পষ্ট চিত্র যেহেতু আমাদের কাছে নেই সেহেতু এ বিষয়ে বর্তমান আলোচনা মুখ্যত দিল্লির তৎকালীন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার আদলে এবং ক্ষেত্রত বাংলার সুলতানদের অদ্যাবধি প্রাপ্ত মুদ্রা, শিলালিপি ও তৎযুগীয় সাহিত্য-রচনাদিতে উল্লিখিত ছিটেফোঁটা নিদর্শনের ভিত্তিতে এগিয়ে নিতে হবে বলে মনে করি।

এই সময়কালে দিল্লিতে যে ক'জন নরপতি দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন তাঁদের মধ্যে খলজি বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬), তুগলক বংশীয় সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১) ও সুলতান ফিরোজ শাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)—মোটামুটি বিস্তৃত ও উল্লেখযোগ্য ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোগল তথা আকবর পূর্ব যুগে সুর-আফগান বংশের বিখ্যাত শেরশাহসূরির (১৫৪০-১৫৪৫) ব্যবস্থাও এখানে উল্লেখযোগ্য। মূলত এঁদের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের যে প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছিল তাই-ই আমরা এখানে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। এবং আগেই যেহেতু বলেছি যে, বাংলার তৎকালীন সুলতানগণ

---

৫ Husain Shahi Bengal: A Socio-Political Study, Dr. Momtazur Rahman Tarafdar, pp. 68.

৬ Ibid. pp. 38.

৭ বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ২৫৬।

নিজেরা বিশেষ কোন ব্যবস্থা গড়ে তোলেননি, বা তুললেও তার কোন প্রামাণ্য দলিল আমাদের হাতে নেই, এবং যেহেতু প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁরা দিল্লির শাসকদের অনুসৃত পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন, ফলে এ আলোচনা থেকে এটা ধরে নেয়া সঙ্গত হবে যে, প্রাক-মধ্য বাংলায় মোটামুটি এ ধরনের (হুবহু না হলেও অন্তত অনেকটা) একটি ভূমিরাজস্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।

মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে এখানে মুসলিম রাষ্ট্রনীতিতে ভূমিরাজস্বের ধর্মীয় ও নীতিগত দিক সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা জরুরি। এতে করে সুলতানি শাসনামলের ও পরবর্তীকালের মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌল দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বরূপ অনুধাবন করা সহজ হবে।

প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ও আইনজ্ঞ আবু ইউসুফ ইয়াকুব যিনি অষ্টম শতাব্দীতে খলিফা হারুন-অর-রশিদের রাজত্বকালে বাগদাদের প্রধান কাজি পদে আসীন ছিলেন, তিনি তাঁর বিখ্যাত 'কিতাব-উল খারাজ'[৮] নামক গ্রন্থে কতকগুলি প্রধান নীতি-আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন, যা প্রাথমিক যুগের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কদের ভূমিরাজস্ব নীতির মৌল ভিত্তি হিশেবে গণ্য হতো। এগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ[৯] :

১. রাষ্ট্রের চাহিদা হবে ন্যায়সঙ্গত, অতিরিক্ত কিছু নয়। কোন ক্রমেই তা প্রজার উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেকের বেশি হবে না।
২. খাজনা ধার্যের ব্যাপারটা হয় সরকার ও চাষীদের মধ্যে উৎপাদিত ফসল ভাগাভাগির দ্বারা, নতুবা ভূমি পরিমাপের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হবে।
৩. রাষ্ট্র ও প্রজাসাধারণের পক্ষে অসুবিধাজনক এবং মুসলিম আইনের পরিপন্থী বলে বিবেচিত না হলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সাধারণত স্থানীয় প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি অনুসৃত হবে।

আবু ইউসুফ আরও যে বিশেষ বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন তা Moreland-এর ভাষায়—'the maintenance of direct relations between the Governor (wali) and the peasants, and he tells us little about Intermediaries.'[১০] এখানে বলে রাখা দরকার যে, বিখ্যাত এই মুসলিম চিন্তানায়কের নির্দেশিত নীতি-আদর্শ ভারত তথা বাংলায় মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে কমবেশি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়েছিল, তা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ড. মুহম্মদ

৮ খলিফা হারুন-অর রশিদের নির্দেশে ইমাম ইয়াকুব ইবনে ইবরাহিম আল-আনসারি আল-কুফি (সংক্ষেপে আবু ইউসুফ), জন্ম. ৭৩১/২-৭৯৮, এই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। এটি মূলত 'সাধারণ অর্থনীতি, ভূমিরাজস্ব ও ফৌজদারী বিচারবিধি এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত' (ইসলামি বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১) একটি আকর-গ্রন্থ। Moreland একে, 'The most authoratative account of the early Islamic system.' বলেছেন (The Agrarian System of Moslem India, pp. 14.)।

৯ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, পৃষ্ঠা ৯৮।

১০ Op. Cit. pp. 15.

আবদুর রহিম বলেন, 'এই উপমহাদেশের ও বাংলার মুসলমান শাসকগণ এই (আবু ইউসুফের) রাজস্ব নীতির ঐতিহ্য অনুসরণ করেছেন। তারা প্রজাদের স্থানীয় রীতি ও প্রথার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তারা রাষ্ট্র ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু সবসময় তাদের পক্ষে এই আদর্শ পুরাপুরি কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই; তার কারণ, তাদেরকে স্থানীয় প্রথাগুলি মানতে হ'ত এবং স্থানীয় প্রজাদের বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হ'ত। বাংলার রাজস্ব পদ্ধতি সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল।'[১১]

মধ্যযুগের মুসলিম শাসনামলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় আবুল ফজলের বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী'তে। এতে মূলত মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের সাম্রাজ্যব্যাপী অনুসৃত ও প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ফিরিস্তি বিদ্যমান। উল্লেখ্য এই বিশাল পুস্তকে সুলতানি যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে মধ্যকালীন বাংলার জনসাধারণের ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির একটি চমৎকার ধারণা পাওয়া যায়। আবুল ফজলের উক্তিতে।—'The people are submissive and pay their rents duly. The demands of each year are paid by instalments in eight months, they themselves bringing mohars and rupees to the appointed place for the receipt of revenue, as the division of grain between the government and the husbandman is not here customary. The harvests are always abundant, measurement is not insisted upon, and the revenue demands are determined by estimate of the crop. His Majesty (Emperor Akbar) in his goodness has confirmed this custom.'[১২]

আকবর-পূর্ব মধ্যযুগের অস্থির রাজনৈতিক অবস্থা, জনমানুষের দৈনন্দিন জীবনাচার ও অর্থনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে এই উক্তির সত্যতা কতোটুকু ছিল সেটা জানা না গেলেও আবুল ফজলের উদ্ধৃত বর্ণনার শেষাংশ পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও দিক-নির্দেশক বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা আমরা জানি, এবং অধিকাংশ প্রখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিকই যেটা একবাক্যে স্বীকার করেছেন তা হল এই যে, সম্রাট আকবর ভারত তথা বাংলায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল প্রবর্তক (Innovator) ছিলেন না—'It is not true to say that the Mughals introduced a new revenue system. They adopted the pre-existing one, which was essentially based on Hindu institutions and generally consistent with Islamic law. In fact there is a continuity in land revenue administration, inherited from ancient times, continued and modified by the Delhi Sultans and reformed by Sher Shah.'[১৩] বস্তুতপক্ষে বলা যায় 'মুগল-পূর্ব যুগে বাংলাদেশে প্রচলিত রাজস্ব প্রথাসমূহ' প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ 'সম্রাট আকবর

১১ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯।
১২ The Ain-I-Akbari, Vol II., Colonel H. S. Jarrett, pp. 134.
১৩ Mughal Polity, Dr. Jagadish Narayan Sarkar, pp. 261.

প্রদেশের রাজস্ব শাসন ব্যবস্থায় বজায়'[১৪] রেখেছিলেন। সেই হিশেবে ধরলে স্বীকার করতে হবে যে, সম্রাট আকবর ছিলেন প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একজন সংস্কারক (Reformer) মাত্র। অবশ্য তাঁর সংস্কার ভূমি-রাজস্ব পদ্ধতি ও প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে যে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করে এনেছিল তাতে করে তাঁর অবস্থানও হয়ে দাঁড়িয়েছিল যুগ-প্রবর্তকের। Powell যথার্থই বলেছেন, 'Practically useful history of land-revenue begins with the reign of Akbar.'[১৫]

ফলে পরবর্তীকালে প্রথমত আকবরের স্বনামখ্যাত রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমলের ও দ্বিতীয়ত আকবরের উত্তরসূরী আর এক জগদ্বিখ্যাত মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুযোগ্য প্রাদেশিক শাসনকর্তা (প্রথমে দিওয়ান ও পরে সুবাদার) নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমলে বাংলার যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সমকালীন ভারত তথা বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা আলোচিত অধ্যায় হিশেবে সকল মহলে গণ্য হয়েছে, তার বীজ প্রাক-মোগল পর্বে অর্থাৎ সুলতানি যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় প্রচ্ছন্ন ছিল, এ কথা আজ সুস্পষ্ট। তাই দেখা যায় মধ্যযুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূলে যে দৃঢ় পাদপীঠের পত্তন করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি ও সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক, শেরশাহ সেটাকেই আরও সুদৃঢ় ও উন্নত রূপ দিয়েছিলেন, আর আকবর তাকে করেছিলেন অধিক সুসংহত, বিস্তৃত ও স্থানীয় অবকাঠামোপযোগী।

মোগল (প্রকৃতার্থে আকবরের) ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনা আমরা যথাস্থানে করবো, এবং তা থেকে সুলতানি যুগের প্রচলিত ব্যবস্থার অনেক তথ্য ও ইঙ্গিত আমরা পাবো, তথাপি সমগ্র মধ্যযুগের ভূমিরাজস্ব পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনার একটি চিত্র আমরা এখানে খাড়া করার চেষ্টা করবো। এতে একদিকে যেমন অখণ্ড ভারতে মুসলমান শাসনামলে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠবে, তেমনি অন্যদিকে কার আমলে কোন্ ধরনের পদ্ধতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, এবং তৎসহ এক যুগে অন্য যুগের অনুসৃত ব্যবস্থার কতো খানি গ্রহণ-বর্জন ও সংস্কার হয়েছিল, সেটাও জানা যাবে।

প্রাচীনকালের মতো মধ্যযুগের সকল শাসকই ছিল মূলত একনায়ক। এদের শাসনতান্ত্রিক চারিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এগুলি ছিল প্রথমত সামরিক (Military by nature) এবং শেষত প্রজাহিতৈষী। মূলত সমরশক্তির জোরেই এগুলি গড়ে উঠতো, সামরিক বিস্তৃতিই দিতো এদের স্থায়িত্ব, আবার অপেক্ষাকৃত প্রবল শক্তিধর প্রতিপক্ষের সামরিক আঘাতেই ঘটতো এগুলির অবলুপ্তি। ড. শ্রীরাম শর্মার ভাষায় বলা যায়, 'Government was thus a personal acquisition. A ruler acquired the right to

১৪ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৯।
১৫ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 268-69.

rule when he succeeded in driving out the occupant of the throne and enjoyed it as long as he had the strength of arms to do so.'[১৬]

এ যুগের শাসকদের সর্বদাই একটি বিশাল ও কার্যকর সামরিক বাহিনী প্রতিপালন করতে হতো। কারণ, আমরা জানি 'No schemes of conquest or defence were possible without a large and efficient army. For the maintenance of a large army a sound financial system was necessary.'[১৭] ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অনুসরণ বা আরও নিশ্চিত করে বললে সৈন্যদের বেতন-ভাতা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম প্রভৃতি প্রয়োজন নির্বাহার্থে শাসককুলকে প্রজাদের কাছ থেকে নিয়মিত ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু প্রজাসাধারণের প্রতি যেহেতু শাসকশ্রেণীর কিছুটা নৈতিক তথা ধর্মীয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল, সেহেতু বাহ্যত জনকল্যাণধর্মী একটি শাসন ব্যবস্থাও এদের প্রবর্তন করতে হতো তা বলাইবাহুল্য। বাস্তবে এই প্রজাহিতৈষণা তাদের শাসন ঐতিহ্যের দীর্ঘায়ুর প্রতীক হয়ে দাঁড়াতো। সুলতানি আমলের শাসন ব্যবস্থাও এই নীতির পরিপন্থী কিছু ছিল না।

মূলত চারটি কার্য-অনুষঙ্গের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল দিল্লির সালতানাত। ড. কিশোরী সরণ লালের ভাষায় সেই চারটি কার্য-অনুষঙ্গ হল : '(1) to conquer independent kingdoms to bring the country under a unified administration, (2) to defend the country against foreign invasion, (3) to maintain law and order, and (4) to collect revenue.'[১৮]

সুলতানি শাসনামলে ভূমিরাজস্ব নীতির প্রথম ও প্রধান ভিত্তি ছিল শরীয়তের নির্দেশ ও আব্বাসীয় খলিফা, গজনির শাসক ও ঘোরি সুলতানদের অনুসৃত ঐতিহ্য।[১৯] এর সঙ্গে ছিল বাস্তব পরিস্থিতির চাপ।[২০] সুলতানি আমলে অনেক সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে বিশেষত সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহতকরণে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সুলতানদেরকে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করতে হতো। এই বৃদ্ধি প্রাথমিক সুলতানদের রাজত্বকালে ততো বেশি না হলেও[২১] কখনও কখনও তা প্রজাসাধারণের বহনের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। প্রসঙ্গত মুহম্মদ বিন তুগলকের সময়কার দোয়াবে অত্যধিক হারে কর বৃদ্ধির কথা বলা যায়। এর ফলে সেখানে ব্যাপক প্রজা অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল[২২], যা প্রকারান্তরে তাঁর শাসনের ভিত্কেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। এ সম্বন্ধে সমসাময়িক ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি মন্তব্য করেন, 'ঐদিন

১৬ The Religious Policy of the Mughal Emperors, pp. 13

১৭ History of the Khaljis, Dr. K.S. Lal, pp. 177.

১৮ Ibid., pp. 177.

১৯ Life and Culture in Medieval India, Dr. B.N. Luniya, pp. 40.

২০ ড. অসিত কুমার সেন, প্রবন্ধ 'সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুঘলকের কর-নীতি নির্ধারণের পটভূমি', সংগৃহীত 'ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, সম্পাদিত ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৪৪।

২১ ড. রাধারমণ মুখার্জী বলেন, 'As to the scale of the land tax it was not very heavy under the early Sultans,..' (History and Incidents of Occupancy Right, pp. 40).

২২ দোয়াবের বিদ্রোহগুলি ছিল সত্যি 'খুবই ব্যাপক, দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তাক্ত' (ড. কুমুদরঞ্জন দাস, ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, পৃষ্ঠা ১৪৯)।

থেকে সুলতান মুহম্মদের সরকার ও সাম্রাজ্য নিষ্প্রভ ও গৌরবহীন হয়।'[২৩] বারানির *অনেক বক্তব্যে অতিরঞ্জন থাকলেও এ উক্তি একেবারে অমূলক নয়।*

যা হোক, এখন ধারাবাহিকভাবে সুলতানি যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্র এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬)

আগেই বলেছি প্রাথমিক যুগের দিল্লির সুলতানদের অনুসৃত ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত আমাদের জ্ঞানের উৎস খুবই সীমিত।[২৪] এ যুগের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭) যিনি বাংলা জয় করে লখনৌতিতে নিজ পুত্র বুগরা খানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং অন্যান্য 'ইক্তা'য় 'মুকতি' নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর শাসনকাল সম্পর্কে যদিও ঐতিহাসিকগণ বলেন, 'Balban's government was a fine example of benevolent despotism in which the king had the sole resporsibility of safeguarding the interests of the people.'[২৫] এবং তাঁর অধীনে, 'the peasants were encouraged to settle down to a peaceful life' 'and trade and agriculture improved.'[২৬] তথাপি সত্য যে, বলবনের সময়কার ভূমিরাজস্ব বিষয়ক তথ্য বিশেষ পাওয়া যায় না। ফলত সংখ্যাল্প হলেও ভূমিরাজস্ব ও কৃষিবিষয়ক সুস্পষ্ট বিবরণাদি পাওয়া যায় এই পর্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শাসক সুলতান আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালের। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অস্থিতিশীল সাম্রাজ্যে স্বীয় অবস্থান নিরঙ্কুশ, দৃঢ় ও স্থায়ী করণার্থে আলাউদ্দিন অন্যান্য রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনেতিক সংস্কারের পাশাপাশি কৃষি ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছিলেন। তাই এ কথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, প্রকৃতার্থে সুলতানি যুগের ভূমিরাজস্বের ইতিহাস তাঁর আমল থেকেই শুরু। দিল্লির সুলতানদের মধ্যে আলাউদ্দিনই প্রথম একটি মজবুত ভিত্তির ওপর ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন।

সত্যি বলতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি নিজের প্রয়োজনেই ভূমিরাজস্ব সংস্কার করেছিলেন। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণে প্রতিনিয়ত যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের দরকার ছিল। বলাবাহুল্য যে, মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে এ অর্থের প্রথম ও প্রধান উৎস ছিল ভূমিরাজস্ব। আলাউদ্দিন এ সম্পর্কে তাঁর কতিপয় অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ অমাত্যের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও পরামর্শ করেন। প্রসঙ্গত বলা দরকার এ আলোচনায় তাঁর সামনে ছিল প্রাচীন যুগের বিভিন্ন হিন্দু শাসনামলের ভূমিরাজস্বের বিস্তৃত ইতিহাস, যদিও জানা যায় না তা থেকে তিনি কতোটুকু গ্রহণ ছিলেন। তবে তাঁর পূর্ববর্তী দিল্লির সুলতানদের অনুসৃত

২৩ 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', পৃষ্ঠা ৪৭৩।
২৪ ড. আবদুল মমিন চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাস, নওরোজ কিতাবিস্তান, পৃষ্ঠা ২৩৩।
২৫ A Short History of The Sultanate of Delhi, Dr. Syed Moinul Haq, pp. 91
২৬ The Wonder That Was India, Vol. II., Dr. S. A. A. Rizvi, pp. 32.

ব্যবস্থা তাঁকে বিশেষ আকৃষ্ট করেনি তা ধরেই নেয়া যায়। কারণ আমরা দেখেছি, 'The *experience of the founders of the Delhi Sultanat in financial matters was practically nothing. They were primarily soldiers and were more interested in wars and conquests than in the details of government. They, however, had* for general guidance the Muslim theory of finance and the policy followed by the Ghaznavides whom they had supplanted.'[২৭] সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে আলাউদ্দিনের উজ্জ্বলতম পূর্বসূরী সুলতান জালালুদ্দিন ফিরোজ খলজি (১২৯০-১২৯৬) পর্যন্ত দিল্লির সকল শাসকই মূলত 'had utilized the existing machinery'[২৮] বলা যায়। ফলে আলাউদ্দিনকে একটি অপেক্ষাকৃত নতুন ব্যবস্থা গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। আর এ কাজে তিনি সবচেয় বেশি ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা লাভ করেছিলেন তাঁর সুযোগ্য 'নায়েব-ই-উজির' শরিফ কায়ানি বা শরিফ কাঈ-এর।

সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। সে গুলি নিম্নরূপ :

(১) তিনি সাম্রাজ্যের সকল প্রকার ভূমিখণ্ড যেমন 'খালিশা' ও 'জায়গির' ইত্যাদির ওপর রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ মালিকানা ও অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। এ উপলক্ষ্যে প্রচলিত অবৈধ ও অপ্রয়োজনীয় মধ্য-স্বত্বের বিলোপ ঘটিয়েছিলেন।

(২) জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর রায়তকে ভূমিরাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে একই স্তরে এনেছিলেন অর্থাৎ হিন্দু-মুসলিম, উচ্চ-নীচ সকলের কাছ থেকে একই হারে তা আদায় করেছিলেন।

(৩ ভূমিরাজস্ব নিরূপণে শরীয়তানুমোদিত চূড়ান্ত সীমা তিনি স্পর্শ করেছিলেন। অন্যভাবে বললে তাঁর রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্নের $\frac{১}{২}$ অংশ।

(৪) ভূমিরাজস্ব ধার্যের জন্য তিনি মোটামুটি চলনসই একটি জরিপ চালিয়েছিলেন। এটি মূলত চাষযোগ্য ভূমি ওপর চালানো হয়েছিল।

(৫) তাঁর আমলে ভূমিরাজস্ব যদিও নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে পরিশোধ করা যেতো, কিন্তু আলাউদ্দিন শস্য মাধ্যমে আদায়ের প্রতিই জোর দিয়েছিলেন বেশি। এর অবশ্য কারণও ছিল।

এগুলির পাশাপাশি আলাউদ্দিন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের জন্যে এর ওপর কঠোর ও নিয়মিত খবরদারি চালু করেছিলেন। সেই সঙ্গে ছিল কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা। সত্যি বলতে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে কর্মচারীদের কোন প্রকার গাফিলতি ও দুর্নীতির প্রতিবিধানে আলাউদ্দিন এত কঠোর ও নৃশংস প্রকৃতির ক্ষমাহীন হৃদয় ছিলেন যে এ বিষয়ে তাঁর আগে-পরের তুলনা তিনি নিজেই।

২৭ Some Aspects of Muslim Administration, Dr. R. P. Tripathi, pp. 239.
২৮ History of the Khaljis, pp. 177.

আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী মুসলিম সুলতানদের আমল থেকেই সাম্রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন ধরনের ভূমিস্বত্বের প্রচলন ছিল। এই সকল ভূম্যধিকারীদের সংশ্লিষ্ট ভূমিতে কোন মালিকানা-স্বত্ব ছিল না, তবে এক ধরনের ভোগ-দখলাধিকার থাকতো। শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে সুলতানগণ নিত্য নতুন ভূখণ্ড জয় করতেন, সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করতেন এবং পরক্ষণেই তা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহ প্রভৃতির মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। শর্ত থাকতো এই সকল ভূম্যধিকারীগণ সুলতানকে হয় একটি থোক অঙ্কের বার্ষিক রাজস্ব দেবে, অথবা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যসামন্ত সরবরাহ করবে। যা হোক, এভাবে সাম্রাজ্যের প্রায় সমুদয় ভূমি কখনও 'ইকতা' (শুরুতে 'ইকতা' ছিল এক ধরনের জায়গির, কিন্তু পরবর্তীকালে তা একটি প্রশাসনিক একক হয়ে দাঁড়ায়; এ সম্পর্কে যথাস্থানে আলোচনা করা হবে), কখনও 'মিলক'[২৯], 'ইনাম'[৩০] , ইদরারাত'[৩১] , আবার কখনও 'ওয়াকফ' ইত্যাদি নামের স্বত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। লক্ষণীয়, এগুলির সবই ছিল উচ্চপদস্থ মুসলিম আমির-ওমরাহ ও জ্ঞানীগুণীসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দখলে এবং তার চেয়েও সত্য কথা এর অধিকাংশ থেকেই রাষ্ট্রের কোন অর্থাগম হতো না।

সুলতান আলাউদ্দিনের নিত্য নতুন রাজ্য জয়ের উচ্চাভিলাষ ও তজ্জনিত একটি বিশাল সামরিক বাহিনীর লালন—তাঁর রাজকোষকে সর্বদাই অতিরিক্ত চাপের মুখে রাখতো। বস্তুত রাজকোষ কদাচিৎ শূন্যতা বা অর্থ ঘাটতির মধ্যে পড়ুক বা থাকুক, আলাউদ্দিনের মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসক কখনই তা চাইতেন না। ফলে যেনতেন প্রকারে হলেও তিনি এটি পরিপূর্ণ রাখতেন। এ লক্ষ্যে প্রথমেই তিনি পূর্ববর্ণিত সকল ধরনের ভূমিস্বত্ব বাতিল ঘোষণা করেন। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী বলেন, 'Alauddin after long discussions with his high officials, and hard thinking had made up his mind to bring them under state control and make them a source of profit to the exchequer. Undeterred by communal considerations and unlike Balban he revoked most of these grants.'[৩২]

এইভাবে লব্ধ ভূমি সুলতান খালিশার অন্তর্ভুক্ত করেন।[৩৩] তবে তিনি সব ধরনের স্বত্ব সমূলে বাতিল করেননি বা আরও স্পষ্ট করে বললে সেটা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি[৩৪], যদিও কোনও কোনও ঐতিহাসিক তেমনটা ধারণা করেছেন।[৩৫] আমাদের এ বক্তব্যের সপক্ষে যুক্তি হিশেবে বলা যায়, 'More probably he asserted the right of

২৯ রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত এক জাতীয় রায়তিস্বত্ব যার দ্বারা ভূম্যধিকারী মূলত এক বা একাধিক গ্রামে ভূমি-রাজস্ব ভোগ করতো।

৩০ রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহ ও সামাজিকভাবে সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে তাঁদের ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রদত্ত করমুক্ত ভূমিস্বত্ব।

৩১ রাষ্ট্রীয় কাজে সন্তোষজনকভাবে চাকুরিকাল নির্বাহ করার অব্যবহিত পরে কোন কর্মচারীকে প্রদত্ত করমুক্ত ভূমিস্বত্ব; আধুনিককালের বিবেচনায় একে এক ধরনের 'পেনশন' বলা যায়।

৩২ Some Aspects...pp. 255

৩৩ History of the Khaljis, pp. 179.

৩৪ জানা যায় মালিক কাবুল উলুগ খান শস্য-বাজারের 'শাহানা' (সম্ভবত তত্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত হবার পর তার ভরণপোষণের জন্য সুলতান তাকে করমুক্ত ভূমি (জায়গির) দিয়েছিলেন। এই জাতীয় আরও জায়গির ছিল ধারণা করা অমূলক হবে না।

৩৫ The Wonder That was India, Vol. II., pp. 38.

the State to deal with all classes of lands, cancelled all such grants of which he did not approve and bestowed others on his own terms.'[৩৬] অবশ্য আলাউদ্দিন শুধু মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত স্বত্ব বা জায়গির বাতিল করেছিলেন তা নয়, হিন্দুদের মধ্যেও পূর্ব থেকে চলে আসা অনুরূপ স্বত্ব তিনি রাষ্ট্রের বরাবরে বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তিনি যে মনে-প্রাণে একজন মধ্যযুগীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসক ছিলেন, এবং তাঁর কাছে জাতিধর্মবর্ণের কোন বাছ-বিচার ছিল না, আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব নীতিতে সেই মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। স্বধর্মের অনুসারীরাই তাঁর কাছে সহজে পাত্তা পেতো না, সেক্ষেত্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তো প্রশ্রয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ড. ত্রিপাঠী যথার্থই বলেছেন, 'When Alauddin has not spared the Muslims or hesitated to deprive them of peculiar privileges, there was no reason why he should have shown any favour to the Hindu officials.'[৩৭]

আলাউদ্দিন হিন্দু অভিজাত শ্রেণী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বিশেষ করে 'খুট'[৩৮] , 'মুকাদ্দাম'[৩৯], 'চৌধুরি'[৪০] প্রভৃতি সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত ভূম্যধিকারীদের মধ্যে স্থিত প্রায় সকল ধরনের ভূমিস্বত্ব বাতিল করে তা সরাসরি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। উল্লেখ্য হিন্দু উচ্চবিত্তদের মধ্যে উল্লিখিত শ্রেণীটি সেই প্রাচীন হিন্দু আমল থেকেই এগুলি নিষ্কর ভোগ করতো। প্রাথমিক যুগের মুসলিম সুলতানরাও তাদের এই প্রায় নিরঙ্কুশ অধিকারে হাত দেননি, যদিও মুসলিম আমির-ওমরাহদের মতো এদের অধীনেও রাষ্ট্রের কম ভূমি ছিল না। অবশ্য এ থেকে এরা রাষ্ট্রকে কিছু নগদ রাজস্ব দিতো। তার পরিমাণ ছিল খুবই অপ্রতুল, ভোগদখলি ভূ-সম্পত্তির অনুপাতে কিছুই না বললে চলে। কিন্তু আলাউদ্দিন চাইছিলেন এ থেকে সমুদয় আয় সরাসরি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে আসুক। তাঁর এই উদ্দেশ্যের পিছনে আরও একটি কারণ ছিল। প্রথমত 'খুট', 'মুকাদ্দাম', 'চৌধুরি' প্রভৃতির ভোগদখলে যে বিশাল পরিমাণ ভূমি থাকতো তা থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় বাবদ তারা প্রচুর আয় করতো। এ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের বশ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ নগণ্য কিছু ভেট বা নজরানা প্রদান করে যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত থাকতো তা ছিল অঢেল, অপর্যাপ্ত। ফলত এই প্রাচুর্য এদের সামাজিক অবস্থান এতো বাড়িয়ে দিয়েছিল যে, এরা প্রায় স্বাধীন রাজার মতো জীবনযাপন করতো। এদের বিলাস-ব্যসনের কোন অন্ত ছিল না। জিয়াউদ্দিন

৩৬ Some Aspects, pp. 256.
৩৭ Ibid., pp. 258.
৩৮ প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক হিন্দু গ্রাম্য-প্রধান। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'The Agrarian System of Moslem India', Moreland, Appendix C & 'The Administration of the Sultanate of Dehli', Dr. Ishtiaq Hussain Qureshi, Appendix L.
৩৯ মূলত মধ্যযুগের ভূমিরাজস্ব আদায় ও তার হিসাব রক্ষণের সঙ্গে জড়িত গ্রামের মোড়ল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'মোগল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা' ড. ইরফান হবিব, ৪র্থ অধ্যায়/৩।
৪০ পরগণা-স্তরে ভূমিরাজস্ব বিভাগের একজন বেশ গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ২য় খণ্ড', ড. এম. এ. রহিম, পৃষ্ঠা ৮৪-৫; 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৭৮-৯।

বারানির ভাষায়, 'They chewd pan, dressed in white, rode on horses, and moved among the Musalmans with comfort and case.'[৪১] আলাউদ্দিন চাননি তাঁর সাম্রাজ্যে বাস করে আর কেউ রাজার মতো আচরণ করুক। দ্বিতীয়ত এদের অঢেল অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এদেরকে শুধু বিলাস-ব্যসনেই গা এলিয়ে দেয়ার সুযোগ দেয়নি, বরং তা প্রায়শই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাদেরকে বিদ্রোহ সংঘটনের প্রণোদনা ও সামর্থ্য যোগাতো। তাছাড়া স্থানীয় সরকারি কর্মচারীদের সঙ্গে তারা দুর্ব্যবহার করতো বলে সুলতানের কাছে অভিযোগ ছিল—'they did not care for the summons of the Divan, never called at his office and paid no heed to the revenue officials.'[৪২]

ফলে এই সব কিছু বিবেচনা করে ও ঘনিষ্ঠ অমাত্যদের পরামর্শে আলাউদ্দিন শেষ পর্যন্ত মনস্থ করেন, 'to break the power of the rural leaders, the chiefs and the headmen of parganas and villages.'[৪৩] বস্তুত এইভাবে হিন্দু-মুসলিম উচ্চবিত্ত ও সামাজিকভাবে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী ভূম্যধিকারী শ্রেণীর উদ্‌বৃত্ত আয়ের সকল পথ বন্ধ করে তাদেরকে জীবিকার কঠোর সন্ধানে ব্যাপৃত রেখে আলাউদ্দিন মূলত স্বীয় সাম্রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। ড. লাল বলেন, 'Alauddin, who had crushed the nobility ruthlessly, would not leave other "refractory" elements unsubdued, and he took measures to see that nobody in his dominions continued to be so rich or powerful as to be a source of danger to the State.'[৪৪] প্রাচীনকাল থেকে 'খুট', 'মুকাদ্দাম', 'চৌধুরি' প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করতো। আলাউদ্দিনের সময়েও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ফলত তাদের এই কাজের পারিশ্রমিক হিশেবে তাদের ন্যূনতম জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে রক্ষণযোগ্য নিষ্কর ভূমি তিনি তাদের দিয়েছিলেন। কিন্তু এর অতিরিক্ত ভূমি তারা রাখতে চাইলে অন্যান্য সাধারণ রায়তের মতো তাদেরও তার জন্যে নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব দিতে হতো। বস্তুত এখানেই পূর্ববর্তী সুলতানদের সঙ্গে আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব নীতির পার্থক্য। আগে যেমন রাজস্ব নিরূপণের বেলায় সমাজে প্রজাদের শ্রেণী অবস্থান বিবেচনা করা হতো, 'মিল্কিদার', 'খুট' প্রভৃতি ধার্য খাজনা রেয়াত পেতো কিন্তু আলাউদ্দিন প্রজাদের মধ্যকার এই বিভাজন-রেখা তুলে দেন এবং সকলকে একটি সর্বজনীন ও একক নীতির আওতায় নিয়ে আসেন। ড. ত্রিপাঠীর ভাষায়, 'He abolished all distinctions between different classes of landholders and tried to introduce uniformity.'[৪৫] খাজনার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম দুই-ই ছিল তাঁর কাছে এক, সমান—'Neither the Muslims nor the Hindus were allowed to enjoy any

৪১ Barani, pp. 216-17, quoted from History of the Khaljis, pp. 181.
৪২ Ibid., pp. 291, quoted from History of the Khaljis, pp. 180.
৪৩ The Agrarian System of Moslem India, fn, pp. 32.
৪৪ History of the Khaljis, pp. 181.
৪৫ Some Aspects, pp. 258.

special privileges in the matter of Kharaj.'[৪৬] সুলতান আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক শতকরা ৫০ ভাগ। মুসলিম রাষ্ট্রে এই পরিমাণ ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ শরীয়তসম্মত। এই হারের নিম্নগামিতা সে যেই পরিমাণ হোক, তা নিয়ে ধর্মের মাথা ব্যথা নেই। কারণ রাষ্ট্র তার প্রয়োজন ও যুগোপযোগিতা দিয়ে সচরাচর এটি নির্ধারণ করবে এটাই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে ধর্মের কিছু বলার থাকতে পারে না। কিন্তু এই পরিমাণ-সীমার কোন প্রকার লঙ্ঘন, তার পিছনে যত যুক্তিই থাক না কেন, ইসলাম তা অনুমোদন করে না। প্রসঙ্গত বলা দরকার ব্যক্তিগত জীবনাচারে আলাউদ্দিন ইসলামি বিধিবিধানের পুরোপুরি পাবন্দি না হলেও[৪৭] এই একটি বিষয়ে অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে তিনি ধর্মকে পুরোপুরি ব্যবহার করেছিলেন। বলাবাহুল্য ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত সীমা তিনি স্পর্শ করতে কার্পণ্য করেননি।

এখন আমরা মুসলিম দৃষ্টিকোণ থেকে খাজনারোপযোগ্য ভূমির শ্রেণীবিভাগ নিয়ে আলোচনা করবো এবং দেখাবার চেষ্টা করবো আলাউদ্দিনের বা আরও ব্যাপক অর্থে, পুরো মুসলিম শাসনামলে ভারত তথা বাংলায় কোন্ শ্রেণীর ভূমির ওপর রাজস্ব ধার্য করা হতো।

শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম রাষ্ট্রের সকল করারোপযোগ্য চাষের ভূমিকে ৩টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি বলেন, 'In Muslim states all cultivated land was legally classified for the purposes of assessment of land revenue. The main classifications were (i) 'ushri, (ii) kharaji and (iii) sulhi; other classifications have not received such universal recognition.'[৪৮]

'উশরি'র অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েক ধরনের ভূমি রয়েছে। এর মধ্যে প্রধান হলো খোদ রসুল (সঃ) এর জন্মভূমি আরব ভূখণ্ড বা 'জাজিরাতুল আরব' (আরব উপদ্বীপ)। অন্যগুলির মধ্যে যেমন স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী নও-মুসলিমদের ভূমি। উল্লেখ্য ইসলাম ধর্ম

৪৬ Ibid., pp. 258.

৪৭ বারানি তাঁকে একজন ঘোরতর অত্যাচারী মধ্যযুগীয় শাসক হিশেবে চিত্রিত করেছেন যিনি স্বীয় যুদ্ধবাজ নীতি ও সামাজিক লাভালাভের কারণে যে কোন কাজ করতে সক্ষম। বস্তুত তাঁর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে সমকালীন এই ঐতিহাসিক যদিও অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছেন, তারপরও আমাদের মনে হয় সব-কিছুই তিনি মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত বলেননি। তিনি প্রথম জীবনে প্রচণ্ড মদ্যপায়ী ছিলেন, পরে অবশ্য এই বদভ্যাস অনেকখানিই ত্যাগ করেছিলেন। ড. লালের ভাষায়, 'In matters of women, wine and song 'Alauddin was neither an uncompromising moralist nor a slave of the senses.' (History of the Khaljis, pp. 281). তবে আলাউদ্দিন ধর্মীয় গোড়াপন্থী না হওয়ায় তাঁর পক্ষে সুযোগসন্ধানী ধর্মান্ধ মোল্লাশ্রেণীকে রাষ্ট্রীয় দৈনন্দিন কার্যকলাপ থেকে পুরোপুরিভাবে দূরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। বলা যায় তিনিই প্রথম মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। ড. সৈয়দ মইনুল হক বলেন, 'He has been credited with having secularized the state and freed it from the influence of ecclesiastical authorities.' (A Short History of the Sultanate of Delhi., pp. 117).

৪৮ Administration of the Sultanate of Dehli, Dr. Ishtiaq Husain Qureshi., pp. 101.

গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত এদের অধিকৃত ভূমি করারোপযোগ্য হতো, কিন্তু যেই মাত্র তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে চলে আসতো তন্মুহূর্ত থেকে তাদের ভোগদখলাধীন ভূমি করের আওতামুক্ত বলে গণ্য হতো। অবশ্য এই নীতি ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল। পরে বাস্তব কারণেই তা আর বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। আর এক ধরনের ভূমি ছিল যা সাধারণত যুদ্ধ জয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হতো। যুদ্ধ শেষে এই নবলব্ধ ভূমি যখন মুসলমানদের মধ্যে বণ্টিত হতো তখন তা করমুক্ত বলে স্বীকৃত হতো। যা হোক 'উশরি' ভূমি সম্বন্ধে এখানে দীর্ঘ আলোচনা না করে আমরা পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে এটুকু বলতে পারি যে, প্রাথমিক সুলতানদের সময়ে ভারতে এ জাতীয় ভূমির ছিটেফোঁটা অস্তিত্ব থেকে থাকলেও[৪৯] প্রকৃতপক্ষে 'Later writers on the agrarian system under the Sultans of Dehli do not mention the existence of 'ushri lands.'[৫০]

'সুল্‌হি' হলো সেই জাতীয় ভূমি লিখিত চুক্তির মাধ্যমে যা থেকে প্রথম যুগের মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা ভূম্যধিকারী ব্যক্তির কাছ থেকে বার্ষিক ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন। 'সুল্‌হি' ভূমির সবই ছিল ভারত তথা বাংলা বহির্ভূক্ত।[৫১] সুতরাং আমাদের আলোচ্য নয়।

এবার 'খরাজ' ভূমির আলোচনা।

আরব দেশে 'খরাজ' শব্দটি মুহম্মদ (সঃ) এর জন্মের অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।[৫২] প্রাথমিক যুগের মুসলিম শাসকেরা যে কোন ধরনের করের আরবি প্রতিশব্দ হিশেবে 'খরাজ' অভিধা ব্যবহার করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে এটি শুধু ভূমিরাজস্বের জন্যেই প্রযুক্ত হয়।[৫৩] এক কথায় 'খরাজ' বা 'খরাজ' বলতে বুঝায়, 'A tax, or tribute on land.'[৫৪] । অন্যদিকে 'খরাজি' ভূমির পরিচয় দিতে গিয়ে প্রখ্যাত আর্থনীতিক-ঐতিহাসিক Dr. N. P. Aghnides বলেন, 'All lands conquered by force and not divided among the Muslim soldiers but left to their non-Muslim owners or given to non-Muslim settlers from elsewhere are Kharaji lands.'[৫৫] এছাড়া অন্যভাবেও খরাজি ভূমি সৃষ্টি হতে পারতো।

৪৯ ড. কোরেশি বলেন, 'It is true that the extent of these areas ('ushri lands) was not great, but there can be no doubt about their existence (under the sultans of Dehli).' Ibid., pp. 101.

৫০ Ibid., pp. 101.

৫১ Ibid., pp. 102 & Ain-I-Akbari, Vol. I., pp. 293-94.

৫২ Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 102. প্রাচীন পারস্যেও এর প্রচলন ছিল। (Ancient Persia & Iranian Civilization, C. Huart, pp. 157-8).

৫৩ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 102.

৫৪ Dictionary of Islam, Thomas Patrick Hughes, pp. 269. Hughes আরও বলেন, 'This (Kharaj) was originally applied to a land tribute from non-Muslim tribes, but it is now used for a tax, or land-rent due to the State. La-kharaj is a term used for lands exempt from any such payment.' (pp. 269).

৫৫ Mohammedan Theories of Finance. Nicolas P. Aghnides, pp. 366-68.

খরাজি ভূমি ছিল দু'ধরনের। এক. 'খরাজ-ই ওজিফা' বা নির্দিষ্ট করযোগ্য খরাজি ভূমি, এবং দুই 'খরাজ-ই মুকাসিমাহ্' বা আনুপাতিক হারে কর নিরূপণযোগ্য খরাজি ভূমি।

প্রথমোক্ত খরাজি ভূমির রাজস্ব শস্য রোপনের আগেই নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো এবং দেয় অর্থ নগদে প্রদান করা যেতো। অন্যদিকে 'খরাজ-ই মুকাসিমাহ্র ভূমিরাজস্ব নির্ণীত হতো ফসল কর্তনের সময়ে, সরেজমিনে উৎপন্ন শস্যে। কারণ প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে কোন ভূমিখণ্ডের উৎপাদন ফি-বছর একই রকম হতো না। বরং উৎপাদন কমবেশি হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। ভূমিরাজস্ব আদায়কালে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কেরা প্রাকৃতিক অবস্থার এই বাস্তবতাকে খুবই গুরুত্ব দিতেন। তারা চাইতেন রায়ত শস্য-প্রাপ্তি অনুপাতে রাষ্ট্রকে রাজস্ব প্রদান করুক। আর এ উপলব্ধি থেকেই 'খরাজ-ই মুকাসিমাহ্'র প্রচলন। 'খরাজ-ই মুকাসিমাহ্' থেকে তাই দেখা যায় কখনও উৎপাদিত ফসলের $\frac{১}{২}$ অংশ, কখনও $\frac{১}{৩}$ অংশ, কখনও $\frac{১}{৪}$ অংশ, আবার কখনও $\frac{১}{৫}$ অংশ[৫৬] অর্থাৎ উৎপাদনের কম বেশির ওপর আনুপাতিক হারে (At proportional rate) ভূমিরাজস্ব আদায় করা হতো। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, এই দুই ধরনের খরাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও কিছুটা ভিন্নতা ছিল। 'খরাজ-ই ওজিফা' বছরে এক কিস্তিতেই পরিশোধ করতে হতো, কিন্তু 'খরাজ-ই মুকাসিমাহ্' এক বছরে একের অধিক কিস্তিতেও পরিশোধের সুযোগ থাকতো।[৫৭]

Aghnides এর 'খরাজি ভূমি' সংক্রান্ত পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এতে মূলত অ-মুসলমান প্রজাদেরকেই খরাজের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। আদপেও ব্যাপারটি ছিল সে রকম। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিম রায়তদের ওপর ভূমিরাজস্ব ধার্যের নিয়ম ছিল না।[৫৮] কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম জনসংখ্যা যখন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, রাষ্ট্রের প্রচুর আবাদি ভূমি তাদের ভোগদখলে চলে যায়, অথচ আয়ের তুলনায় রাষ্ট্রের ব্যয় দিনকে দিন বাড়তেই থাকে, তখন আর মুসলমান প্রজাদের খরাজের আওতামুক্ত রাখা সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে—'By the time of the classical jurists Kharaj was considerd due from both the Muslims and non-Muslims.'[৫৯] অধিকন্তু, 'No person holding Kharaji land was exempted from the payment of the tax on it irrespective of his being either minor or major, man or woman, free or slave, infidel or Muslim.'[৬০] এক্ষেত্রে শস্যে প্রদেয় খরাজের হার ছিল সর্বনিম্ন এক-দশমাংশ থেকে ঊর্ধে উৎপন্নের অর্ধেক।[৬১] যা হোক এখন আমরা দেখবো খরাজি ভূমির রাজস্ব আলাউদ্দিন কিভাবে নিরূপণ করেছিলেন।

৫৬ The Government of the Sultanate, Dr. Upendra Nath Day, pp. 74.
৫৭ Some Aspects, pp. 343.
৫৮ Ibid., pp.343.
৫৯ Ibid., pp.343.
৬০ The Government of the Sultanate, pp. 74.
৬১ Mohammedan Theories of Finance, pp.378 & The Admn. of the Sultanate, pp. 103

আগেই বলেছি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে খরাজ বা ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্নের ১/২ অংশ। এই হার সচরাচর নিরূপিত হতো প্রত্যেক রায়তের ব্যক্তিগত জোতের ওপর এবং পৃথকভাবে।[৬২] এ কথা ঠিক যে, ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা থেকেই ভূমিরাজস্বের হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কিন্তু আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী কোন মুসলিম সুলতান ভারতে বা বাংলায় এতো অধিক হারে তথা উৎপন্নের শতকরা ৫০ ভাগ ভূমিরাজস্ব বাবদ ধার্য করেছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন কি প্রাচীন হিন্দু আমলেও না। হিন্দু যুগে বিশেষ করে মৌর্য ও গুপ্তদের সময়ে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের মোটামুটি এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-ষষ্ঠমাংশ।[৬৩] অথবা খুব বেশী হলে এক-তৃতীয়াংশ।[৬৪] ফলে যে কোন বিচারেই সুলতান আলাউদ্দিনের এই হার ছিল নজিরবিহীনভাবে সর্বোচ্চ। বলা যায় ভারতে তিনিই ছিলেন এটির প্রবর্তক ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের পথ-প্রদর্শক। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবও তাঁর রাজত্বকালে এই পরিমাণ হার (সর্বত্র নয়) ভূমিরাজস্বের ক্ষেত্রে ধার্য করেছিলেন। তিনি (সুলতান) সাম্রাজ্যব্যাপী জুয়ার আড্ডাগুলো তুলে দিয়েছিলেন, মদ্য ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের পরিবহনের ওপর জারি করে ছিলেন নিষেধাজ্ঞা। এতে করে ভূমিরাজস্ব বহির্ভূত কর থেকে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের আয় স্বভাবতই কমে গিয়েছিল। ফলে তাঁর সুবিশাল সামরিক বাহিনীর[৬৫] ব্যয় মিটানোর মতো অর্থের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এটা স্বীকার করতে হবে। বস্তুত ভূমিরাজস্বের হার ৫০% করার পিছনে এটিও একটি অন্যতম কারণ।

আলাউদ্দিনের ১/২ ভূমিরাজস্ব তাঁর সাম্রাজ্যের আমির-গরিব, উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমান, নারী-পুরুষ তথা সকল শ্রেণীর প্রজাসাধারণের জন্যেই খুব চড়া ও দুর্বিষহ হয়েছিল। তাদের এ যাবৎ কালের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা একেবারে ধুলায় মিশে গিয়ে ছিল। সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির ভাষায় উচ্চবিত্ত শ্রেণীর রায়তদের অবস্থাই

৬২ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, ড. ইরফান হবিব সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪৫। ড. আশীর্বাদি লাল শ্রীবাস্তবও স্বীকার করেন, 'Ala-ud-din fixed the State's share at fifty percent of the gross produce of the land; (The Sultanate of Delhi, Dr. Ashirbadi Lal Srivastava, pp. 159)

৬৩ History of the Khaljis, pp. 182. প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃষ্ঠা ১১৫ এবং বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষক সমাজ ও সাহিত্য, পৃষ্ঠা ২৮। বলাবাহুল্য এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬৪ সাধারণত 'যন্ত্রের সাহায্যে নদী বা পুকুর থেকে জল সংগ্রহ করলে' প্রজাদের এই হারে ভূমি-রাজস্ব দিতে হতো (প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, পৃষ্ঠা ১১৫)। তবে আপৎকালীন বা জরুরি অবস্থায়ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে ১/৩ হারে কর দিতে হতো।

৬৫ 'তারিখ-ই-ফিরিশতা'র লেখকের মতে আলাউদ্দিনের সৈন্যবাহিনীতে প্রায় ৪,৭৫,০০০ অশ্বারোহী ছিল। এই উক্তির সঠিকতা নিরূপণ করা সম্ভব না হলেও এটা নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায় যে, অশ্বারোহী, পদাতিক, দেহরক্ষী ('জানদার' নামে পরিচিত ছিল) প্রভৃতি মিলিয়ে এদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হবে। এদেরকে সচরাচর তুর্কি, খাত্তাদেশীয়, ইরানীয় ও ভারতীয় জনগোষ্ঠী থেকে রিক্রুট করা হতো। সুলতান এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের নগদ বেতন-ভাতা প্রদান করতেন বলে রাজকোষ সর্বদাই পূর্ণ রাখতে হতো।

দাঁড়িয়েছিল, 'Consequently the chiefs, who had been accustomed to a life of comfort and ease, were reduced to a deplorable position....... (Those) who had the monopoly of agriculture, were impoverished to such an extent that there was no sign of gold or silver left in their homes....'[৬৬] এ থেকে সাধারণ রায়তশ্রেণীর অবস্থা কি হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। আসলে এতো কিছু করার পিছনে আলাউদ্দিনের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সাম্রাজ্যের উচ্চ-নীচ, নারী-পুরুষ, সরকারি-বেসরকারি সকল শ্রেণীর সকল পেশার লোকজনকে দৈনন্দিন জীবিকার্জনের পথে এমন ভাবে ব্যাপৃত রাখা যেন তারা সামান্যতম অবসরের সুযোগও না পায়, যাতে বিলাসের ফাঁকে সকলে একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করতে (না) পারে। বলাবাহুল্য আলাউদ্দিনের এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয়েছিল। কারণ উত্তরকালে আমরা দেখেছি, 'the success of the King's policy seems to be established by the fact that, six years after its adoption, his kingdom was at peace, and he was able to detach strong armies for his longmeditated project of the conquest of the Deccan. Nor is there any record of serious internal revolt during the remainder of his reign.'[৬৭] অবশ্য আলাউদ্দিনের এই আত্মসর্বস্ব ভূমিরাজস্ব নীতির একটি সদর্থক ফলও আমরা দেখতে পাই। এযাবৎ মাঠ পর্যায়ে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ে গ্রামীণ প্রভাবশালী শ্রেণী হিশেবে 'খুট', 'মুকাদ্দাম', 'চৌধুরি' প্রভৃতির একটা কার্যকর ভূমিকা ছিল, তারা তাদের কাজের বিনিময়ে উল্লেখযোগ্য উদ্‌বৃত্ত ভোগ করতো, কিন্তু সুলতানের নতুন নীতি তাদেরকে শুধু সেই ভূমিকা পালন থেকেই নিরত করেনি অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীর বিলুপ্তি ঘটায়নি উপরন্তু তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত করে তাদের সামাজিক দৌরাত্ম্যও কমিয়ে দিয়েছিল। সত্যি বলতে ভারতেতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ভূমিরাজস্ব আদায়ে মধ্যস্বত্বভোগীর বিলোপ ঘটে রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। Moreland বলেন, 'the Administration was brought into direct relations with the peasants throughout a large part of the kingdom.'[৬৮]

আলাউদ্দিন শুধু ভূমিরাজস্ব বাড়িয়েই ক্ষান্ত হননি, তিনি এক সঙ্গে সরেজমিনে ভূমি পরিমাপের ব্যবস্থাও চালু করেছিলেন। তিনি এর নাম দিয়েছিলেন 'মাসাহাত'।[৬৯] সঠিকভাবে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের জন্যে ভূমি জরিপের প্রেরণা তিনি সম্ভবত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর থেকে লাভ করেছিলেন। ইসলামি রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম উমরের রাজত্বকালেই ভূমি জরিপ করা হয়।[৭০] পরে তা মুসলিম জাহানের অন্যত্র সম্প্রসারিত হয়। তবে ভারতে আলাউদ্দিনই প্রথম মুসলমান শাসক যিনি তাঁর সাম্রাজ্যে

৬৬ Quoted from 'History of the Khaljis', pp. 182.
৬৭ The Agrarian System..., Moreland, pp. 34.
৬৮ Ibid., pp. 34.
৬৯ The Government of the Sultanate, pp. 80, 82.
৭০ A Short History of the Saracens, Syed Ameer Ali, pp. 62, & Some Aspects, pp. 260, 342.

সরেজমিনে পরিমাপের কাজ চালু করে ছিলেন। ড. কিশোরী সরণ লাল যথার্থই বলেন, 'Alauddin was the first Muslim king in India who fixed the revenue on the actual measurement of land.'[৭১] ড. জে. এল. মেহতা-ও বলেন, 'Alauddin Khalji was the first muslim ruler of Delhi who introduced measurement of land as the basis for the assessment of the state demand—one of the well-established ancient Indian customs.'[৭২] তিনি এটি যাতে ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত ও গৃহীত হয় সে বিষয়েও জোর দিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের 'মাসাহাত' বা ভূমি-জরিপ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ কিছু জানা যায় না। তাছাড়া পরিমাপের 'একক' কি ছিল এবং ভূমিতে শস্য রোপনের আগে কি পরে তা জরিপ করা হতো, সে সম্বন্ধে সমকালীন ঐতিহাসিকগণ প্রায় নীরব। তাঁরা শুধু জানান তাঁর আমলে ভূমিরাজস্বের পাশাপাশি 'ঘরি' বা গৃহ-কর (House tax), 'চরাই' বা গো-চারণ (Grazing tax) প্রভৃতি আদায় করা হতো।[৭৩] জিয়াউদ্দিন বারানির মতে, সকল ধরনের দুগ্ধদায়ী গৃহপালিত পশু যেমন গরু মহিষ ছাগল ইত্যাদির ওপর পশু-চারণ করে (Grazing tax) ধার্য করা হয়েছিল। তবে তিনি অব্যাহতি প্রাপ্ত পশুদের কথা না বললেও এটি জানা যায় সমকালীন আর একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ফিরিশতার 'তারিখ-ই ফিরিশতা' থেকে। এতে লেখক বলেন, 'Alauddin exempted two pairs of oxen, two buffaloes, two cows and ten goats from taxation.'[৭৪] এখানে মনে রাখা দরকার যে, তিনি চারণ-বহির্ভূত গবাদি পশুর ওপর থেকে 'প্রচলিত' কর প্রত্যাহার করেছিলেন বিধায় রাজকোষে যে ঘাট্তি দেখা দিয়েছিল তা পুষিয়ে নেয়ার জন্য মূলত পশু-চারণ কর প্রচলন করেন। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল দুগ্ধদায়ী সাধারণ পশুর ওপর করারোপ করলে রায়তগণ গোচারণ ভূমির ব্যবহার কমিয়ে দেবে। কেননা দুগ্ধ উৎপাদনের অনুকূল গোচর ভূমির চাহিদা সর্ব যুগেই বেশ ব্যাপক, তখনও ছিল। লোকে অনেক সময়ে চাষযোগ্য ভূমিকেও অর্থনৈতিক কারণে গোচারণ ভূমিতে পরিণত করতে অধিক উৎসাহিত বোধ করতো। ফলে আলাউদ্দিন তাদের এই প্রবণতা রোধ করার জন্য দুগ্ধোৎপাদক গবাদি পশু যেগুলি 'খালিশা' ভূমিতে চরে বেড়াতো (বলাবাহুল্য এগুলি তাদের মালিকের জন্যে অবশ্যই অর্থকরী তথা আয়ের উৎস ছিল), তাদের ওপর কর ধার্য করেন। তবে আগেই বলেছি 'চারণ-বহির্ভূত' তথা সকল ধরনের গবাদি পশুর ওপর তিনি করারোপ করেননি। ফলে এই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁর আমলে ধার্যকৃত 'গোচারণ কর' (Grazing tax)-কে আমরা অযৌক্তিক বলতে পারি না। বিশেষ করে তাঁর মতো সাম্রাজ্যবাদী অর্থপিপাসু শাসকের জন্যে তো নয়ই।

৭১ History of the Khaljis, pp. 181.
৭২ Advanced Study in the History of Medieval India, Vol, III., pp. 105.
৭৩ The Sultanate of Delhi (711-1526 A.D.), Dr. Ashirbadi Lal Srivastava, pp-159.
৭৪ Translated by John Briggs in 'History of the Rise of Mahommedan Power in India', Vol. I., pp. 109.

এখন আমরা আলাউদ্দিন খলজির ভূমি জরিপ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে পারি। ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের জন্য আলাউদ্দিনের পূর্ববর্তী মুসলিম সুলতানদের সময়ে ভূমি পরিমাপ যে একেবারে হতো না, তা নয়। তবে তা ছিল খুবই অনিয়মিত, খণ্ডিত ও অপরিকল্পিত। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক থেকে সুলতান জালালউদ্দিন ফিরোজ খলজি পর্যন্ত দিল্লির সালতানাতের অধীনে মূলত দু'ধরনের করারোপযোগ্য ভূমি ছিল। এক. প্রত্যক্ষ করারোপযোগ্য ভূমি বা 'খালিশা' ভূমি (Crown Lands)। এটি সরাসরি 'দিওয়ান-ই ওয়াজিরাত' বা প্রধান উজিরের নিয়ন্ত্রণে থাকতো এবং এর 'খরাজ' বা ভূমিরাজস্ব আদায় করতো 'আমিল', 'আমিন' প্রভৃতি নামধারী সরকারি কর্মচারীরা। 'খালিশা' ছিল কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রশাসনের ও খোদ সুলতানের আয়ের প্রধানতম উৎস। দুই. পরোক্ষ করারোপযোগ্য ভূমি বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে 'মুকতি' বা 'মুকুতা' নামক প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শাসক ও জায়গিরদারদের অধীন ভূমি। এগুলি থেকে লব্ধ আয়ের একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগারে প্রেরিত হতো (অধিকাংশ সময়ই হতো না), অবশিষ্ট বৃহদাংশ (যার মূল অংশই ছিল ভূমিরাজস্ব বাবদ প্রাপ্ত) আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক শাসক ও জায়গিরদারগণ নিজেদের, কর্মচারীদের ও সুলতানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহযোগ্য ও নিজস্ব অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা প্রভৃতির জন্য প্রতিপালিত সৈন্যবাহিনীর বেতন-ভাতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য সংরক্ষণ করতো। এ যুগে এই উভয় প্রকারের ভূমি থেকে 'খরাজ' প্রধানত (একমাত্রত নয়) উৎপাদিত ফসলের ভাগাভাগি (Crop Sharing System)-এর মাধ্যমে সংগৃহীত হতো। স্বভাবতই এ ক্ষেত্রে প্রচলিত ভূমি জরিপের প্রয়োজন ছিল না। তবে ভাগাভাগি পদ্ধতির বাইরে যখন খাজনা নির্দিষ্ট করা হতো তখন শস্য কর্তনের পূর্বভাগে নজর-আন্দাজে সামান্য পরিমাপের প্রচলন ছিল বলে মনে করার কারণ রয়েছে। এই অবস্থা সুলতান আলাউদ্দিন খলজির পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে তাঁর আমলেই এটি সুনির্দিষ্ট, পদ্ধতিগত ও অপেক্ষাকৃত উন্নত আকার লাভ করে। সুতরাং বলা যায়, 'Alauddin Khalji did not invent the method, but made a general practice of what had existed side by side with other methods.'[৭৫] তিনি শস্য ভাগাভাগি একেবারে উঠিয়ে দেননি, তবে যেহেতু এই পদ্ধতিতে ঝুঁকির পরিমাণ ছিল বেশি, স্থানীয় কর্মচারীরা রায়তদের সঙ্গে আঁতাঁত করে খাজনা নিরাপণে ফাঁকি দিতে পারতো, উপরন্তু রাষ্ট্রের আয় পূর্বাহ্নে নির্দিষ্টভাবে জানা যেতো না, সেহেতু তিনি ভূমি পরিমাপের মাধ্যমে নির্দিষ্ট 'খরাজ' নির্ধারণেই অধিক আস্থাশীল ও উৎসাহী ছিলেন। সে অনুযায়ী ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন।

আলাউদ্দিনের অনুসৃত ভূমি জরিপ পদ্ধতিতে মূলত সরেজমিনে প্রতি 'বিসওয়া'[৭৬] পরিমাণ ভূমির বিগত কয়েক বছরের উৎপাদনের সমষ্টির গড় নিরূপণ করা হতো। অতঃপর তার প্রেক্ষিতে সন্নিহিত ভূমির বা এলাকার ব্যাপকাংশের ভূমিরাজস্ব অনুমান-অঙ্কের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হতো যা রায়তগণ শস্যোৎপাদন শেষে সরকারি সংরক্ষণাগারে পৌঁছে দিতো এবং কর্মচারীরাও ক্ষেত্র বিশেষে তা আদায় করতো। এ ক্ষেত্রে চলতি

৭৫ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 106-7.
৭৬ এক কাঠার সম পরিমাণ।

সনের উৎপাদন যা-ই হোক না কেন, তা আদৌ হিসাবে নেয়া হতো না। অন্যদিকে যে সব অঞ্চলে শস্য ভাগাভাগির প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে ফসল কর্তনের সময়ে সরেজমিনে উপস্থিত থেকে কর্মচারীরা উৎপন্ন শস্যের (সেটা যা-ই হোক) মোট পরিমাণের অর্ধেকাংশ খাজনা বাবদ গ্রহণ করতো। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, তাঁর আমলে ভূমি জরিপ পদ্ধতি প্রধানত সাম্রাজ্যের মধ্য এবং উত্তর ও পশ্চিমাংশে মোটামুটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল এবং এর ফলে ভূম্যধিকারী রায়তের সঙ্গে সরকারের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়কালে এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় কর্মচারী ও রায়তের মধ্যে অন্য কোন সুবিধাভোগী তৃতীয়পক্ষ তথা মধ্যস্বত্বের উপস্থিতি অস্বীকার করা হয়েছিল। উপরন্তু পক্ষ সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় সরকারও এদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয়েছিল। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী বলেন, 'By adopting the system of measurement on a large scale the government could keep a close eye on the land-holders, the cultivators, and the revenue collectors.'[৭৭] সরেজমিনে ভূমিরাজস্ব ধার্য কালে রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীরা যাতে এলাকাভিত্তিক কৃষি উৎপাদন তথা জলবায়ু ও স্থানীয় কারণ যেমন মাটির গুণাগুণ, সেচ সুবিধা, শ্রমের লভ্যতা ইত্যাদি বিচার করে 'খরাজ' নির্ধারণ করে সে বিষয়ে তিনি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। আদায় কালে রায়তের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত কারণে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, প্লাবন প্রভৃতির ফলে ফসল হানি বা উৎপাদন কম হলে সেক্ষেত্রে রায়ত যাতে অতিরিক্ত বা অহেতুক চাপের সম্মুখীন না হয়, সুলতান সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়। ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রায়তদের দুর্যোগ মোকাবিলা ক্রমে যাতে অব্যবহিত পরবর্তী বছরে পুনরায় চাষাবাদ করতে পারে সে জন্য 'তাকাবি' ঋণ দেয়া হতো, যদিও তা যথাসময়ে উসুল করতে সরকার কসুর করতো না।

আলাউদ্দিনের আমলে ভূমি পরিমাপের সঠিক যন্ত্র কী ছিল তা জানা যায় না। তবে ধারণা করা অমূলক হবে না, প্রাচীন যুগের মতো একালেও সম্ভবত 'রজ্জু' ও সরু বাঁশের নল ব্যবহৃত হতো।

আগেই বলেছি যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির সময়ে ভূমিরাজস্ব দু'ভাবে পরিশোধ করা যেতো—নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে। তবে তিনি অর্থের পরিবর্তে শস্যে খাজনা গ্রহণেই অধিক উৎসাহী ছিলেন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কেননা আলাউদ্দিনের ব্যাপক অর্থনৈতিক সংস্কার বিশেষ করে বাজারে দ্রব্য মূল্যের উর্ধগতি রোধ তথা দীর্ঘকালীন স্থিতিশীলতা ও বিভিন্ন স্থানে পূর্বের তুলনায় অধিক হারে শস্যাগার নির্মাণ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয়।[৭৮] ঐতিহাসিকগণ প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন তাঁর সময়ে

৭৭ Some Aspects, pp. 261-62.

৭৮ জিয়াউদ্দিন বারানি ও ফিরিশতার সূত্রে ড. আর পি ত্রিপাঠী বলেন, 'As to the system of payment, 'Alauddin was not very particular about payments in cash. On the other hand he preferred payments in kind as he was anxious to see that his regulations of prices were well carried out. It is said that while enforcing his

বাজারে দীর্ঘকালব্যাপী দ্রব্য মূল্য বাড়েনি। এর প্রধান কারণ বাজারে খাদ্য ঘাটতি ছিল না। তিনি যেহেতু ভূমিরাজস্ব উৎপাদিত শস্যে গ্রহণ করতেন এবং প্রধান শহরের কেন্দ্র স্থলে ও বাজারের সন্নিকটবর্তী শস্যাগারে তা সংরক্ষণ করা হতো, সেহেতু কখনও কোনও কারণে রাজ্যের কোথাও খাদ্য ঘাটতি দেখা দিলে ও ক্রান্তিকালে শস্যাগার থেকে দ্রুত খাদ্য সরবরাহ করে সেই চাহিদা মিটানো হতো। এতে করে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো। অবশ্য তাঁর কঠোর নীতির জন্য জনসাধারণের আর্থিক দুরবস্থা তথা ক্রয় ক্ষমতার হ্রাসও বাজারে দ্রব্য মূল্যের নিম্নগামিতা ও স্থিতিশীলতার মূলে ভূমিকা রেখেছিল বললে ভুল হবে না।

এ পর্যায়ে আমরা আলাউদ্দিন খলজির সময়ে প্রাক-নজিরবিহীন হারে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তার আদায়করণে তাঁর চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনের বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করবো। প্রসঙ্গত আমরা মনে করি যে, ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত যে কোন ধরনের নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আলাউদ্দিনের অনুসৃত পন্থাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালিত হওয়া উচিত। আপাত দৃষ্টিতে বা প্রকৃত প্রস্তাবেও, যদ্যপি সেই নীতি বা সংস্কার অত্যন্ত কঠোর হয়, তথাপি তা বাস্তবায়নে দুর্নীতি রোধ করা গেলে এ থেকে উদ্ভূত খাজনা-প্রদায়ী সমাজের ভোগান্তি অনেকটা কম হবে। তবে এটাও ঠিক যে, পর্যালোচ্য সময়ে ভূমিরাজস্বের হার প্রকৃতই অত্যন্ত চড়া ছিল, যে কারণে রাজস্ব প্রশাসনে সচরাচর বিরাজমান দুর্নীতি আলাউদ্দিনীয় কঠোর ব্যবস্থায় প্রায় নির্মূল করেও প্রজাসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্গতি কমানো যায়নি। সম্ভবত আলাউদ্দিনও সেটা চাননি।

ভূমিরাজস্ব সংস্কারের পাশাপাশি সুলতান ভূমিরাজস্ব প্রশাসনেও বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে গতি আনার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি একদিকে যেমন রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিশেষ করে নিম্ন পর্যায়ে রায়তের উদ্‌বৃত্তভোগী মধ্যস্বত্বের বিলোপ ঘটিয়েছিলেন, তেমনি ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে জড়িত সরকারি কর্মচারীদের ওপর কঠোর ও নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। রাজস্ব প্রশাসনে কর্মচারীদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা বলা যায় তাঁর আমলেই প্রথম চালু হয়েছিল। গ্রাম পর্যায়ে 'পাটওয়ারিরা[৭৯] যাতে সঠিকভাবে 'জমা' ও 'হাসিল' রাজস্বসংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ-খতিয়ানে লিখে রাখে ও সংরক্ষণ করে এবং পরিদর্শনকালে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তা নিয়মিত যাচাই-বাছাই করে 'দিওয়ান-ই ওয়াজিরাত'-এর দপ্তরে মন্তব্য সহকারে প্রেরণ করে, সে সম্পর্কে তিনি নির্দেশ জারি করেছিলেন।[৮০] যথাযথ দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে কর্মচারীদের সামান্যতম ফাঁকি বা অবহেলা ধরা পড়লে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিতে দ্বিধা করতেন না। ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদির কারণে কর্মচারীদের চাকুরি থেকে অব্যাহতি দান, তাদের সয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে নিরেট ভিক্ষুকে পরিণত করা, এমন কি মৃত্যুদণ্ড প্রদান পর্যন্ত তাঁর আমলে খুব সহজ

---

market laws he had issued an order that in the Khalsa (Crown Lands) of the Doab and Shahri Nau the share of the government be taken in kind and the grain be stored up in state granaries. (Some Aspects, pp. 263).

৭৯ গ্রাম পর্যায়ে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজ, পরিসংখ্যান, আদায় ইত্যাদির হিসাব-রক্ষক।

৮০ নিম্নস্তরের কর্মচারীদের ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়সংক্রান্ত কায়-কারবার তদারকি ইত্যাদির জন্য আলাউদ্দিন 'দিওয়ান-ই-মুস্তাখরাজ' নামক একটি বিভাগের সৃষ্টি করেছিলেন। এরা বকেয়া ভূমি-রাজস্ব-এর হিসাব ও তা আদায়ের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতো।

ঘটনা ছিল। ড. ত্রিপাঠী বলেন, 'On one charge or the other about ten thousand men—'Amils and clerks—were extremely humiliated and severely punished.'[৮১] ফল এমন দাঁড়িয়েছিল যে, বারানি বলেন, 'it was no longer possible for any one to take even a tanka from either a Hindu or a Musalman by way of bribe or extortion.'[৮২] অন্যদিকে সম্রাটের যখন-তখন খবরদারি ও নির্মম শাস্তির ভয়ে ভূমিরাজস্ব দপ্তরে সহজে কেউ কাজ করতে চাইতো না। এখানে কাজ করাকে লোকে প্লেগের মতো মহামারীর আক্রমণের চেয়েও বেশি ভয়ানক মনে করতো।[৮৩] এ প্রসঙ্গে কিছুটা রসাত্মক ভঙ্গিতে হলেও জিয়া বারানি শ্লেষ প্রকাশ করেছেন এভাবে, 'that one would not give his daughter in marriage to a revenue official, while the office of the superintendent (Mutsarrif) was only accepted by one who had no regard for his life, for these officials passed most of their days in jail frequently receiving blows and kicks.'[৮৪]

অবশ্য আলাউদ্দিন ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত তদারকি আর তাদেরকে শাস্তি দানেই স্বীয় কর্তব্য সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং কর্মচারীরা যেন স্বল্প বেতনের অজুহাতে বা নিতান্ত প্রয়োজনের তাড়নায় কোনরূপ দুর্নীতির আশ্রয় না নেয় তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি রাজস্ব বিভাগীয় বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের প্রয়োজনানুপাতে বেতন-ভাতা, সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বাড়িয়েছিলেন। কারণ আলাউদ্দিন জানতেন এবং অনুভব করতেন, 'that low salaries of revenue officials exposed them to temptation ...He, therefore, raised their salaries so as to enable them to live in respectability and comfort without resorting to corruption.'[৮৫] তারপরও ঘুষ, দুর্নীতি সমূলে উৎপাটিত হয়েছিল তেমন বলা যাবে না। কারণ এটি ছিল এই বিভাগের বনেদি উত্তরাধিকার। তবে অবশ্যই, 'The strict vigilance of Alauddin over the conduct of the Amils and Patvaris, the inspection of their revenue books (bahis) by superior officers and the Sultan himself, and the ruthless punishments with which they were visited for accepting bribes or falsifying accounts, brought the lower offices of the revenue department into disrepute.'[৮৬] চূড়ান্ত বিচারে আলাউদ্দিনের গৃহীত ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় রাজকোষের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল— (it) 'enriched the exchequer.'[৮৭]

এখন দেখা যাক আলাউদ্দিনের আমলে তাঁর অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপকতা কতোটুকু ঘটেছিল।

৮১ Some Aspects, pp. 262.
৮২ History of the Khaljis, pp. 188.
৮৩ Ibid., pp. 188.
৮৪ Tarikh-I-Firozshahi, Barani, pp. 289.
৮৫ Some Aspects, pp. 262.
৮৬ History of the Khaljis, pp. 188.
৮৭ Some Aspects, pp. 262.

এ বিষয়ে সকল আধুনিক ঐতিহাসিকই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, এই ব্যবস্থা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র অনুসৃত ও গৃহীত হয়নি।[৮৮] *বস্তুত সমকালীন বাস্তবতায় সেটা সম্ভবও ছিল না। যেমন বাংলায় এর কোনও প্রচলন ঘটেনি। কারণ* হিশেবে বলা যায় এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, জনমানুষের প্রবৃত্তি ও আর্থ-রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল আলাউদ্দিনীয় ভূমিরাজস্ব-নীতি গ্রহণের প্রতিকূল। তাঁর সমসাময়িক বাংলার সুলতান ছিলেন রুকনুদ্দিন কায়কাউস (১২৯১-১৩০১) ও শামসুদ্দিন ফিরোজ দেহলভি (১৩০১—১৩২২)। এঁরা প্রায় স্বাধীন শাসকের মতোই রাজত্ব করেছিলেন।[৮৯] ফলে এঁরা দিল্লি সালতানাতের এতো কঠোর নিয়মনিগড়বদ্ধ ভূমিরাজস্ব-নীতি অনুসরণ করবেন তেমনটা মনে হয় না। তাছাড়া এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায়নি। তবে বাংলার সুলতানরা যে আলাউদ্দিন খলজির ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এটা মনে না করার কারণ নেই।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে আলোচ্য যুগের 'সংস্কৃত' ('Reformed' অর্থে) ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল প্রকৃতপক্ষেই খাজনা-প্রদায়ী রায়তশ্রেণীর জন্য উৎপীড়ন-ধর্মী—'truly oppressive';[৯০] সম্রাট আলাউদ্দিন তাঁর বিপুল ব্যয়সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা ও নীতির দায় বহনের জন্য প্রজাদের কাছ থেকে সামর্থ্যের অতিরিক্ত খেসারত আদায় করেছিলেন। তারপরও ঐতিহাসিকের সঙ্গে একমত হয়ে বলবো, 'Personally, Alauddin was neither unusually extravagant nor reckless, nor has been believed to possess any morbid love for treasure. But he was anxious to strengthen the fighting power and the treasury of the empire, and did it as best as his empirical knowledge and opportunities permitted.'[৯১]

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক (১৩২০-১৩২৫)

আলাউদ্দিন খলজির মৃত্যুর পর দিল্লির খলজি শাসন মাত্র বছর পাঁচেক স্থায়ী হয়েছিল। এই স্বল্প সময়ে অর্থাৎ তাঁর পুত্র সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহের (১৩১৬-১৩২০)

৮৮ Some Aspects, pp. 265; The Agrarian System of Moslem India, pp. 34 & The Government of the Sultanate, pp.81.

৮৯ মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, ৬২; বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০৩; বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ১৪০; মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী ড. অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, যদিও ড. ত্রিপাঠী এই সময়কার বাংলা সম্বন্ধে বলেছেন, 'Bengal was practically independent' (265), তথাপি আমরা বলতে চাই যে, মধ্যযুগের বাংলার মুসলিম সুলতানদের 'প্রকৃত' স্বাধীনতা শুরু হয়েছিল আরও পরে, ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে—'The Independent Sultanate in Bengal actually began in AD. 1338, when after the death of Bahram Khan (Muhammad bin Tughluq's governor at Sunargawn), his sitadar Fakhra took the insignia of royalty of Sunargawn with the title of Sultan Fakhr al-Din Mubarak Shah.' (Social History of the Muslims in Bengal, Dr. Abdul Karim, pp. 26.).

৯০ History of the Khaljis, pp. 189.

৯১ Some Aspects, pp. 266.

রাজত্বকালে পূর্ববর্তী শাসনামলের স্মৃতিটুকুই কেবল অবশিষ্ট ছিল। বলাবাহুল্য দৈনন্দিন *প্রশাসনের ন্যায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায়ও দেখা দিয়ে ছিল শৈথিল্য ও স্থবিরতা। বস্তুত রাজস্ব প্রশাসনের এই অবশ্যম্ভাবী নৈরাজ্যের বীজ আলাউদ্দিনের কঠোর ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল। কারণ এখানে যে অপ্রতিরোধ্য নিয়ম-শৃঙ্খলা ও উপর-থেকে-নীচ তথা কেন্দ্র থেকে* শুরু করে একেবারে নিম্নপর্যায় পর্যন্ত যে কঠোর নিয়ন্ত্রণ তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাকে সুচারুভাবে এগিয়ে নেয়ার মতো যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীর ছিল না। ফলে সম্রাটের মৃত্যুর অনতি পাঁচ বছরের মধ্যে দেখা যায় খলজি শাসন শুধু দুর্বলতর ও ক্ষীয়মাণই হয়নি, পরন্তু দিল্লি শাসনের অধিকারও খলজিদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সত্যি বলতে সাম্রাজ্যের এই প্রতিকূলতার সময়ে সামান্য সীমান্ত শাসক (Frontier Veteran) থেকে দিল্লির মসনদের সর্বময় কর্তার পদে আরোহণ করেছিলেন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক; প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দিল্লি সালতানাতের আর এক উল্লেখযোগ্য রাজবংশের—তুগলক বংশ (১৩২০—১৪১৩)।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত নীতি-আদর্শ আলোচনার আগে আমাদেরকে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, 'Ghiyasuddin Tughluq had no radical changes to introduce in this (revenue or agrarian) system, except to propound moderation.'[৯২] বস্তুত তিনি যা করেছিলেন তা হ'ল পূর্বের প্রচলিত ব্যবস্থার অপেক্ষাকৃত সরলীকরণ ও যুগোপযোগিতা সৃষ্টি, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন, 'tried to modify 'Alauddin Khalji's system by giving certain concessions to khots and muqaddams.'[৯৩] যা হোক, এখন তাঁর শাসনামলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা হলো।

প্রথমত সুলতান ভূমিরাজস্বের হার উৎপন্নের অর্ধেক থেকে কমিয়ে প্রজাসাধারণের সহনশীল ক্ষমতার মধ্যে আনয়ন করেছিলেন, তবে এই হার কতো ছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না;

দ্বিতীয়ত তিনি উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানের একক ব্যবস্থা চালু করেন;

তৃতীয়ত 'জমা' নির্ধারণে জমি জরিপের প্রচলিত ব্যবস্থা শিথিল ও ক্ষেত্রত তা লোপ করেন;

চতুর্থত ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক শ্রেণী হিশেবে 'খুট', 'মুকাদ্দাম', 'চৌধুরি' প্রভৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রিক হৃত অবস্থা অনেকটা ফিরিয়ে দেন; এবং

পঞ্চমত ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর থেকে আলাউদ্দিনের আমলীয় নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কড়াকড়ি প্রত্যাহার করেন।

৯২ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., Ed. by Dr. Tapan RayChâudhuri & Dr. Irfan Habib, pp. 71.

৯৩ Ibid., pp. 63.

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক সিংহাসনে আরোহণের পর ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত যে *সংস্কার কাজটি সর্বপ্রথম করেন তা হ'ল ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার কমানো। এ সম্পর্কে তাঁর নীতি-আদর্শের কথা বলতে গিয়ে 'তবকাত-ই-আকবরী'র লেখক মধ্যযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ বলেন, 'শাসনকার্যের ব্যাপারে তিনি (গিয়াসউদ্দিন) সংযমের সহিত কাজ করিতেন এবং সর্বপ্রকার চরম ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলিতেন।.....বিভিন্ন দেশের রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি সংযমের সঙ্গে কাজ* করেন; ।'[৯৪] আগেই দেখিয়েছি যে, আলাউদ্দিনের যুগে ভূমিরাজস্বের হার ছিল এ যাবৎ সর্বোচ্চ এবং তা ইসলামি শরীয়তানুমোদিত চূড়ান্ত সীমা স্পর্শ করেছিল। স্বভাবতই আলাউদ্দিনের উচ্চাভিলাষী মানসিকতার দায় বহন করতে গিয়ে বলা যায় সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের লোকেরই নাভিশ্বাস উঠেছিল। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের ন্যায় অপেক্ষাকৃত (আলাউদ্দিনের তুলনায়) কোমলমতি সুলতানের পক্ষে রায়তের এই অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করা প্রকৃতই পীড়াদায়ক ছিল। তাই তিনি ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে শুরু থেকেই চেয়েছিলেন একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে যা 'তবকাত-ই-আকবরী'র লেখকের ভাষায় ছিল 'সংযমী ব্যবস্থা'। তবে বলাবাহুল্য যে, এই সংযমী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সুলতান আদতে ভূমিরাজস্বের হার কী পরিমাণ নির্ধারণ করেছিলেন, কোন সূত্র থেকেই তা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না।[৯৫] ফলত বিভিন্ন ঐতিহাসিক তাই বিভিন্ন হারের কথা বলেছেন। অবশ্য তাঁদের এই ধারণা পোষণে সমকালীন ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির একটি মত বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে বললে অত্যুক্তি হয় না। বারানির মতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল $\frac{১}{১০}$ অংশ।[৯৬] আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকদের মধ্যে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ[৯৭], ড. রাধারমণ মুখার্জী[৯৮] প্রমুখ এই মত সমর্থন করেছেন। ড. মুখার্জী তো উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেই ফেলেছেন, 'Never before in the history of the Country was land revenue assessed at such a low scale.'[৯৯] ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশির মতে সুলতান প্রচলিত ভূমিরাজস্বের হারকে পুরোপুরি পরিবর্তিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'Ghiyathu'ddin Tughluq, who took a more liberal view of agrarian problems, reversed the order.'[১০০] ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সম্রাট একটি উদার নমনীয় নীতি গ্রহণ করেছিলেন—এ উক্তি স্বীকার করেও আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, তা কোন বিবেচনাতেই বারানির কথিত উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{১০}$

৯৪ ১ম খণ্ড, অনুবাদ আহমদ ফজলুর রহমান, বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ২৩০।
৯৫ The Agrarian System of Moslem India, pp. 40.
৯৬ বারানি $\frac{}{১১}$ অংশের কথাও বলেছেন। দেখুন, 'Some Aspects', pp. 271.
৯৭ Medieval India, pp. 231.
৯৮ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 41. Also see. A Short History of the Sultanate of Delhi, Dr. S. Moinul Haq, pp. 123.
৯৯ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 41.
১০০ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 107.

বা ১/১১ অংশ ছিল না। বস্তুত নজিরবিহীনভাবে ভূমিরাজস্বের হার এই বিশালাকারে কমিয়ে (তুলনা করুন আলাউদ্দিন বা তৎপূর্ববর্তী মুসলিম ও হিন্দু শাসকদের সময়কার ভূমিরাজস্বের হার) একটি বিশাল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী (বংশসূত্রে নয়), রাজ্যবিস্তারে সদা উৎসাহী[১০১] ও একটি বিশাল সৈন্যবাহিনীর রক্ষক-প্রতিপালনকারী মধ্যযুগীয় শাসকের পক্ষে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান আয়ের উৎসমূলে অবিবেচকের মতো কুঠারাঘাত করা গিয়াসউদ্দিনের ন্যায় বিচক্ষণ সম্রাটের[১০২] পক্ষে সম্ভব ছিল—এটা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত ড. আর. পি. ত্রিপাঠীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'Surely a Sultan who of necessity was bound to maintain a large army and keep the military leaders satisfied could hardly afford to allow the revenue to fall so low.'[১০৩] তাছাড়া, 'Ghayasuddin did not usher a millenium; no one could.'[১০৪] আর তাই যদি হতো তবে একটি নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা থেকে পরবর্তী ৯৩ বছর পর্যন্ত তাকে টেনে নেয়া তাঁর ও পরবর্তী তুগলক বংশীয় শাসকদের পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না, বরং তা অচিরেই রাজকোষ শূন্যতায় বিলীন হয়ে যেতো। যা হোক, এ পর্যায়ে আমাদের এ ধারণার পক্ষে আরও কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপন করবো।

প্রথমত সেই প্রাচীনকাল থেকেই ভূমিরাজস্ব যে ছিল ভারতবর্ষের যে কোন সাম্রাজ্যের বা রাষ্ট্রের আয়ের সর্বপ্রধান উৎস ও অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থায় আদায়যোগ্য,—পূর্ববর্তী যে কোন শাসকের চাইতে গিয়াসউদ্দিন তা কম জানতেন না। তাছাড়া এটাও নিশ্চয়ই তাঁর অবিদিত ছিল না যে, রাজকোষের স্ফীতি ও সচ্ছলতার ওপরই নির্ভর করবে তাঁর প্রশাসনযন্ত্র ও সৈন্যবাহিনীর সচলতার চাকা। সুতরাং সুলতান ভূমিরাজস্বের হার পূর্বাপর যে কোন যুগের তুলনায় সর্বাপেক্ষা নিম্ন ও প্রকৃতই কম গ্রহণ করে রাজকোষকে সর্বক্ষণ চাপের মুখে রাখবেন—এটা মনে হয় না। অন্যদিকে যদি ধরেও নেয়া যায় যে, বারানির প্রদত্ত তথ্য সঠিক, তথাপি প্রশ্ন উঠবে রাজকোষের এই বিপুল ঘাট্‌তি তিনি কিভাবে পূরণ করেছিলেন? কারণ ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্য কোন শুল্ক বা কর বাড়িয়ে সুলতান এই ঘাট্‌তি মিটিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

১০১ সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক তাঁর পাঁচ বছর স্থায়ী শাসনকালে বরাঙ্গল, বাংলাসহ বেশ কিছু দেশ ও অঞ্চল জয় করেন। অধিকন্তু ড. মীরা সিংহের ভাষায়, 'A brave warrior, Ghiyas-ud-din Tughlaq was determined to annex all those states which were under Khusrau's feeble rule had renounced their allegiance to the Delhi Sultanate.' (Medieval History of India, pp. 95).

১০২ মধ্যযুগীয় এই সুলতানের কৃতিত্ব বর্ণনায় ড. সৈয়দ মইনুল হক বলেন, 'Ghiathuddin's reign lasted for less than five years. But during this short period he gave ample proof of his administrative capacity......He was a brave soldier, an able general, a shrewd statesman and a benevolent monarch,' (History of the Sultanate of Delhi, pp. 125).

১০৩ Some Aspects, pp. 270

১০৪ Ibid., pp. 270

এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, তাঁর আমলে প্রশাসনের স্বাভাবিক ব্যয় কিন্তু কমেনি। বরং তা বেড়েই ছিল। কেননা তাঁর সময়ে দরবারের জাঁকজমক বেড়েছিল, খুট, মুকাদ্দাম প্রভৃতি শ্রেণী পূর্বের স্বমূর্তিতে আবির্ভূত হওয়ায় অর্থাৎ মধ্যস্বত্বভোগীর পুনঃউপস্থিতিতে আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব থেকে রাষ্ট্রের আয় কমেছিল, অন্তত আলাউদ্দিনের সময়ের তুলনায়, সেটা ধারণা করা অসঙ্গত নয়। সেই সঙ্গে স্বর্তব্য দানের ব্যাপারে সুলতানের 'দিল' ও হাত ছিল অত্যন্ত দরাজ।[১০৫] অধিকন্তু তিনি বেশ কিছু ব্যয়বহুল জনহিতকর কাজ করেছিলেন।[১০৬] সবকিছু বিবেচনায় এবং মাত্র পাঁচ বছরের রাজত্বকালে একটি নতুন রাজবংশকে সুদৃঢ় ভিত্তি প্রদান থেকে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক ভূমিরাজস্বের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিশেষ করে বারানির নির্দেশিত হারে হ্রাস করেননি। হয়তো সে ইচ্ছা তাঁর ছিল, কিন্তু সমকালীন বাস্তবতা ও যুগ ধর্ম তাঁকে সে সুযোগ ও আনুকূল্য দেয়নি।

দ্বিতীয়ত জিয়াউদ্দিন বারানির মতটিকে অন্যদিক থেকে বিবেচনা করে বরং আমরা আপাত সঠিক বলে ধরে নিতে পারি। তবে আগেই বলে রাখি যে, এটি আমাদের একটি ধারণা বা অনুমান মাত্র।

প্রথমেই ড. উপেন্দ্র নাথ দে-র বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'It seems that the mention of one-tenth and one-eleventh as state demand from district and provinces means that provincial governors were to send one-tenth, or one-eleventh to the Central treasury while with the remaining portion they were to disburse their own expenses, i. e., their won pay and pay of soldiers and officials etc.'[১০৭] উল্লেখ্য, 'Ghiyasuddin ordered the governors to pay their

১০৫ তিনি (সুলতান গিয়াসউদ্দিন) সুলতান আলাউদ্দিন ও সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহের পরিবারের অবশিষ্ট লোক ও বংশধরদের ভাতা ও বৃত্তি দান করেন। খাজা নিযামউদ্দীন আহমদ বলেন, 'বহুবার তিনি সম্ভ্রান্ত লোক এবং সাধারণ লোকদের ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং তাহাদের অবস্থা এবং ন্যায্য দাবী অনুযায়ী তাহাদের প্রত্যেককে পুরস্কার দান করিতেন। যখনই তাঁহার রাজ্যের কোন স্থান হইতে কোন জয় লাভের সংবাদসহ কোন পত্র আসিত অথবা যখনই শাহাযাদাদের কাহারও বিবাহ সংঘটিত হইত অথবা তাঁহার পরিবারে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করিত, তখনই তিনি সকল বিচারক এবং উচ্চপদস্থ অফিসারদের এবং ওলামাদের এবং শেখগণকে এবং আমিরগণকে তাহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী পুরস্কার দান করিতেন। যাহারা অবসর জীবনযাপন করিতেন তিনি তাহাদের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেকে অবহিত রাখিতেন এবং তাহাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করিতেন; আর যখনই তিনি শুনিতেন যে রাজ্যের কোন লোক দরিদ্রতা এবং দুর্দশা ভোগ করিতেছে, তখনই তিনি তাহা দূর করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন।' (তবকাত-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১)। সুতরাং দেখা যায় এই আমলে পূর্ববর্তী সুলতানদের সময়কার চেয়ে দান-খয়রাত খাতে প্রচুর ব্যয় বেড়েছিল।

১০৬ ড. মীরা সিংহ বলেন, 'The Sultan lay special emphasis on improving the means of communication. An efficient net work of roadways, together with proper bridges, canals and forts was built, which resulted in the growth of an unprecedented efficient postal system, that relayed the news from all over the empire to the Sultan in the shortest possible time.' (Medieval History of India, pp. 94).

১০৭ The Government of the Sultanate, pp. 87.

soldiers and others, which shows, that they were not paid by the Central Government.'[১০৮]

ড. দে-র উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে যদি আমরা ধরে নিই যে, সুলতান গিয়াসউদ্দিন ভূমিরাজস্বের বৃহদংশের মূল সংগ্রাহক হিশেবে 'ইক্তাদার', 'ওয়ালিয়াত' বা জায়গিরদারদের কাছ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রশাসনের ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য এদের সংগৃহীত ভাগ থেকে প্রেরিত যে অর্থ পেতেন, বারানি সেটাই উল্লেখ করেছেন, তাহলে $\frac{১}{১০}$ বা $\frac{১}{১১}$ হারের একটা যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বস্তুত এটি যথার্থ বিবেচিত হলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে যে সুলতান গিয়াসউদ্দিন, সুলতান আলাউদ্দিনের অনুসৃত হার হুবহু অনুসরণ না করলেও তা থেকে খুব একটা সরে আসতে পারেননি। বাস্তবে তিনি এই হারে ভূমিরাজস্ব আদায় না করলেও তাঁর অধীন ইক্তাদার প্রভৃতি তা আদায় করতো না, এ কথা জোর করে বলা যাবে না।

ইক্তাদার-জায়গিরদাররা কী হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করতো তা জানা যায় না। তবে তাঁরা যে হারেই আদায় করুক না কেন, তাতে যে সুলতানের প্রচ্ছন্ন অনুমোদন বা অনুমতি থাকতো সেটা ধারণা করা অমূলক নয়। কেননা 'তবকাত-ই-আকবরী'র সূত্রে আমরা জেনেছি তাঁর সাম্রাজ্যে কোন জায়গিরদার স্বীয় জায়গির থেকে বলপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক ভূমিরাজস্ব আদায় করলে তিনি তাতে আপত্তি উত্থাপন করতেন এবং সংশ্লিষ্ট আদান-প্রদান বাতিল করে দিতেন।[১০৯] শুধু তাই নয়, খাজা নিযামউদ্দীন আরও বলেন, 'যদি কেহ তাহার দেয় রাজস্ব হইতে, তাহার অনুচরদের অর্থ প্রদান করিবার ফলে কোন অংশ কাটিয়া রাখিত, আর ঐ পরিমাণ অর্থ শেষোক্ত জনের নিকট না পৌঁছিত, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইত এবং তাহার নিকট হইতে ঐ অর্থ আদায় করিয়া লওয়া হইত।'[১১০] সুতরাং আমরা মন্তব্য করতে পারি, সুলতানের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের অভিপ্রায় ও মর্জির বাইরে যে কোন স্তরের রাজস্ব সংগ্রাহকগণ ভূমিরাজস্ব আদায় করতো না বা অন্তত করার সাহস দেখাতো না। তবে তাদের এই আদায়ের হার কী ছিল, সেটা বলা দুষ্কর। Moreland মনে করেন এটি ছিল প্রতিষ্ঠিত বা প্রচলিত হারের অনুরূপ। তাঁর ভাষায়, 'The proportion claimed by Ghiyasuddin is not stated elsewhere in the authorities, and we can only infer that he did not alter the figure which he found established, but this figure again is not on record.'[১১১] সম্রাট আলাউদ্দিনের পুত্র ও সিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সুলতান কুতুবউদ্দিন মুবারক শাহ (১৩১৬–১৩২০) যেহেতু দুর্বল শাসক ছিলেন, স্বভাবতই ধরে নেয়া যায় তাঁর রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছিল। Moreland-এর ভাষায় বলা যায়

১০৮ Ibid., pp. 87.
১০৯ পৃষ্ঠা ২৩০।
১১০ পৃষ্ঠা ২৩০-৩১।
১১১ The Agrarian System, pp. 44.

সেটিই সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক 'established' পেয়েছিলেন। তবে সেটি উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৪}$ অংশের কম বলে মনে হয় না।

গিয়াসউদ্দিনের আগে ভূমিরাজস্ব উৎপন্ন শস্যে ও নগদ অর্থে প্রদান করা যেতো যা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আলাউদ্দিন নগদের পরিবর্তে শস্যে গ্রহণেই অধিক উৎসাহী ছিলেন। এটি তাঁর সময়ে প্রায় অলিখিত সাধারণ প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে প্রথাটি উল্টে যায়। কারণ প্রথমত ভূমিরাজস্ব প্রদানের কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রতি সুলতানের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের একক প্রীতি বা পক্ষপাতিত্ব ছিল না। দ্বিতীয়ত আলাউদ্দিনের যুগের মতো এই আমলে কঠোর কোন অর্থনৈতিক সংস্কারও হয়নি।

ফলত বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্যে সুলতানের সক্রিয় দায় ছিল না। যে কারণে শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব গ্রহণ করাকেই তিনি বেশি প্রাধান্য দিতেন।[১১২] এর অন্য একটি কারণও ছিল। তা হলো তিনি আলাউদ্দিনের মতো ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রশাসনকে সরাসরি সম্পৃক্ত করায় উৎসাহী ছিলেন না, এবং করেনওনি। তাঁর আমলে বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রশাসক যথা ইক্তাদার, জায়গিরদার, খুট, মুকাদ্দাম, চৌধুরি প্রভৃতি স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের খাজনা আদায় করতেন এবং আদায় শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের দায় বাবদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ হিস্যা যথা-সময়ে প্রয়োজনীয় সৈন্য-প্রহরাধীনে পাঠিয়ে দিতেন। স্বভাবতই এই সমস্ত আঞ্চলিক রাজস্ব সংগ্রাহকগণের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চল থেকে কেন্দ্রে শস্যের পরিবর্তে অর্থ প্রেরণই অধিকতর সুবিধাজনক ছিল। এতে একদিকে যেমন শস্য পরিবহনের খরচ বেচে যেতো, তেমনি অন্যদিকে দূরবর্তী বা সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলি থেকে অতিসহজে ও স্বল্প সময়ে রাজস্ব কেন্দ্রে নীত হতো। অবশ্য এই সময়ে ভূমিরাজস্ব যে আদৌ শস্যে প্রদান করা হতো না, তেমন নয়। তবে এর প্রচলন অনেক কমে গিয়েছিল সেটা ধারণা করা যায়।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তাঁর স্বল্পকালীন শাসনকালে ভূমিরাজস্ব ধার্যের বেলায় অন্য যে উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, Moreland-এর ভাষায় তা হলো, 'he discarded Measurement in favour of Sharing.'[১১৩]

শস্য ভাগাভাগি বা 'হাসিল' (প্রকৃত উৎপন্ন শস্য) পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে এখানে প্রচলিত ভূমি পরিমাপ প্রথার অসুবিধাগুলি জানা দরকার। বস্তুত এই প্রথায় প্রত্যেক রায়তের জোতজমি পৃথক পৃথকভাবে পরিমাপ করা হতো, যদিও সেটি সম্পূর্ণ ভূমিখণ্ডের মাপ ছিল না। শুধু চাষযোগ্য সমগ্র ভূমির একটি ক্ষুদ্র অংশ বা 'বিসওয়া' জরিপ করে তাতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদিত হতো, তার ভিত্তিতে সমুদয় ভূমির রাজস্ব নির্ণয়

১১২ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'নগদ অর্থে খাজনার ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল ১৪শ শতাব্দীতে......।' (মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, ড. ইরফান হবিব, পৃষ্ঠা ৪৬)। সুলতান সেই ঐতিহ্যই আবার ফিরিয়ে এনেছিলেম সম্রাট আলাউদ্দিনের সময়ে যা প্রায় চাপা পড়ে গিয়েছিল।

১১৩ The Agrarian System, pp. 40.

করা হতো। বলা যায় এটি হতো একটি অনুমাননির্ভর হিসাব বা সম্ভাব্য পাওনা। সত্যি বলতে এতে রায়তের বিভিন্ন ভূমিখণ্ডে স্থানীয় কারণ যেমন জলবায়ু, মৃত্তিকার গুণাগুণ, সেচ সুবিধা বা শ্রমের লভ্যতা ইত্যাদির প্রভাবে উৎপাদনের তারতম্য ঘটলেও, 'জমা' নিরূপণে তা তেমন ধর্তব্যের মধ্যে আনা হতো না। আর হলেও তাতে রায়তগণ প্রায়শই রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের হয়রানি ও দুর্নীতির শিকার হতো। অন্যদিকে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল এতে রোপিত শস্যের চূড়ান্ত পরিণতির কথা চিন্তা করা হতো না। বরং ভূমিতে শস্য বপনের পূর্বে অর্থাৎ বছরের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট ভূমির রাজস্ব নির্দিষ্ট করা হয়ে যেতো, অনেক সময়ে একাধিক সনের জন্য। পরে সে অনুযায়ী রায়তকে খাজনা দিতে হতো। অথচ রোপিত শস্য চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে কখনও যদি নষ্ট হতো বা উৎপাদন আশানুরূপ না হয়ে কম হতো, সে ক্ষেত্রে দায় বহন করতে হতো রায়তকেই অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত হারেই তাকে ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করতে হতো। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল। অনেক সময় রাষ্ট্র সম্পূর্ণ ও ব্যাপক ভাবে উৎপাদন-ক্ষতিগ্রস্ত রায়ত-পরিবারকে সম্পূর্ণ বা আনুপাতিক হারে খাজনা রেয়াত দিতো। ড. কোরেশির ভাষায়, 'As a matter of fact, the Sultanate did make allowances for a complete or partial failure of crops.'[১১৪] তবে অনেক ক্ষেত্রে এই ক্ষতিপূরণ 'allowances' রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্য দায় হয়েও দাঁড়াতো। কেননা যে কর্মচারীরা রায়তের প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের দায়িত্ব লাভ করতো তাদের পরিপক্কতা ও ন্যায্যতার অভাব ও ব্যক্তিস্বার্থ খাজনা-প্রদাতাশ্রেণীর সঙ্গে এদের অবৈধ আঁতাত গড়ে তুলতো এবং রাষ্ট্রের কোষাগার থেকে মিথ্যা ক্ষয়ক্ষতির অজুহাতে অর্থ হাতিয়ে নিতো। W. H. Moreland প্রকৃতই বলেন, 'It is matter of common knowledge that such allowances for crop-failure require an administration both honest and efficient.'[১১৫] কোন অঞ্চলে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে নিরূপণের জন্য যেমন একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল, দক্ষ ও সংগঠিত জনশক্তির প্রয়োজন হতো, তেমনি ঠিক কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বা আদৌ হয়েছে কি-না, তা যাচাই করার জন্য দরকার হতো সৎ ও নির্লোভ কর্মচারীগোষ্ঠীর। বস্তুত যেহেতু যে কোন বিচারে এই ক্ষতিপূরণ প্রদান ছিল রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ওপর একটি অতিরিক্ত চাপ, সেহেতু কর্মচারীদের সামান্য অসততা-অদক্ষতা রাষ্ট্রের জন্য দায়রূপে গণ্য হতো। অন্যদিকে এই অসৎ প্রবণতা রোধ করার দু'টি বিকল্প ছিল। এক. ক্ষতি-নির্ধারক রাজকর্মচারীদের ওপর কঠোর খবরদারি আরোপ, যেমনটা করেছিলেন সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, এবং দুই. জরিপ প্রথার বিলোপ করে প্রকৃত উৎপন্ন ফসলের আনুপাতিক ভাগাভাগি। উল্লেখ্য চতুর্দশ শতাব্দীর বাস্তবতায় Moreland এই শেষোক্ত বিকল্পটিকেই অধিক কার্যকর বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, 'In the conditions which prevailed in the fourteenth century, it seems to me to

১১৪ The Administration of the Sultanate, pp. 107.
১১৫ The Agrarian System, pp. 41.

be quite certain that Measurement must have involved a large amount of extortion and corruption of this kind, and it is possible that the alternative method of Sharing was open to less objection in practice;.'[১১৬] বিচক্ষণ সুলতান গিয়াসউদ্দিন শস্য ভাগাভাগিকেই তাঁর সময়ে ভূমিরাজস্ব ধার্যের প্রধান পন্থা হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া ভুলে গেলে চলবে না যে, সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো সমগ্র রাজস্ব প্রশাসনযন্ত্র সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল না। বরং এই ক্ষমতা তিনি স্পষ্টত ছেড়ে দিয়েছিলেন বিভিন্ন আঞ্চলিক শাসনকর্তা ও ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহকদের ওপর। ফলে এদের মাধ্যমে খাজনা আদায় প্রক্রিয়ায় সকল প্রকার দুর্নীতি রোধ ও রায়তদের অধিকতর মঙ্গলের জন্য প্রকৃত উৎপাদিত শস্য বণ্টন পদ্ধতিই তাঁর কাছে উপযুক্ত ও আপাত-অবিকল্প বলে মনে হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে সুলতানের নীতি যে ঠিক ছিল তার প্রমাণ এই পরিবর্তিত ব্যবস্থার অনুকূলে ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন। ড. আর.পি. ত্রিপাঠী বলেন, 'The policy of Ghayasuddin to rely on hasil (actual turnover) was indeed wise and equitable. It was calculated to rationalize the accounts of the Central Government, save the Muqt' from worries and indirectly minimize exactions from the people.'[১১৭] সত্যি বলতে এই আমলে ফসল ভাগাভাগি প্রথার ব্যাপক প্রচলন ঘটলেও ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব নির্ধারণ-পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেনি[১১৮], যদিও এটি দোর্দণ্ড প্রতাপে পুনঃআবির্ভূত হয়েছিল দুই শত বছর পরে—শেরশাহের সময়ে।[১১৯]

ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের নিম্নস্তরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি খুট, মুকাদ্দাম, চৌধুরিদের তাদের হৃত অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। গ্রাম পর্যায়ে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ে তাদের যুগ যুগ লালিত বনেদি যে উত্তরাধিকার ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত, তা আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে চরমভাবে ভূলুণ্ঠিত হয়। শুধু তাই নয়, সাধারণ রায়ত বিশেষ করে 'বলাহার' (গ্রাম্য চৌকিদার?) ও খুট, মুকাদ্দাম, চৌধুরি প্রভৃতির অর্থনৈতিক অবস্থা প্রায় একই সমান্তরালে এসে পৌঁছেছিল, তা থেকে নতুন সুলতান তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি দেন। এ সম্বন্ধে সুলতানের বক্তব্য ছিল খুবই সুস্পষ্ট; ড. ত্রিপাঠীর ভাষায়, 'His reason for this consideration was that they had great responsibilities and deserved some remunaration for their trouble. If he treated them like common r'yat, they would feel no interest in the work imposed on them.'[১২০] তিনি এদের ভোগদখলীয় ভূমির খাজনা মওকুফ করেন,

১১৬ Ibid., pp. 41
১১৭ Some Aspects, pp. 271-72
১১৮ ড. উপেন্দ্র নাথ দে বলেন, 'The system of measurement was not ruined.' (The Government of the Sultanate, pp. 86).
১১৯ The Agrarian System, pp. 42.
১২০ Some Aspects, pp. 273.

গোচারণ করের দায় থেকেও অব্যাহতি দেন।[১২১] এক কথায় বলতে পারি সুলতান এই মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীটিকে নতুনভাবে সামাজিক জীবন দান করেন। তবে উচ্চ স্থানে পুনর্বাসিত হলেও তাদের সামাজিক প্রভাব ও অর্থনৈতিক বৈভবকে এমন পর্যায়ে কখনই যেতে দেননি যা তাদের কোন কারণে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটনের শক্তি ও সামর্থ্য যোগায়।[১২২] সুলতান খুট, মুকাদ্দাম প্রভৃতিকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রত্যর্পণ করলেও এর একটি সীমারেখা তিনি টেনে দিয়েছিলেন। ভূমিরাজস্ব বাবদ যে পরিমাণ অর্থ তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে বাধ্য ছিল ঠিক ততোটুকুই তারা রায়তদের কাছ থেকে আদায়ের অধিকারী ছিল।[১২৩] সুলতান শুধু এ বিষয়ে ফরমান জারি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তাদেরও তাদের ওপর প্রয়োজনীয় খবরদারি চালু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন—'the Governors were to take measures to prevent them from levying any additional revenue from the peasants.'[১২৪] এতদ সত্ত্বেও কেউ অতিরিক্ত আদায় করলে তিনি তা বাতিল করে দিতেন। নিযামউদ্দীন বলেন, 'যদি কেহ তাহার জায়গীর হইতে বলপূর্বক নির্ধারিত পরিমাণের অধিক পরিমাণ আদায় করিতেন, তবে সুলতান তাহাতে আপত্তি করিতেন এবং ঐ আদান-প্রদান বাতিল করিয়া দিতেন।....কোন লোক এই অর্থ (রাজস্ব সংক্রান্ত যে কোন পাওনা) ফেরৎ দিতে বিলম্ব করিলে সে তাঁহার ক্রোধ এবং কঠোরতার ফল ভোগ করিত।'[১২৫] ফলে সার্বিক বিচারে আমরা বলতে পারি সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের গৃহীত ব্যবস্থা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা রাজস্বপ্রদাতা রায়তশ্রেণী ও রাজস্ব সংগ্রাহক ক্ষুদ্রতর শক্তি বিশেষত মধ্যস্বত্বভোগী—এই উভয়কুলের মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নীতির প্রবর্তনে সক্ষম হয়েছিল। এতে একদিকে রাজকোষের আয় কমে ছিল সত্য, কিন্তু অন্যদিকে সাম্রাজ্যের সর্বস্তরের জনমণ্ডলীর মধ্যে সুলতানের গ্রহণযোগ্যতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আলাউদ্দিনের যুগে তাঁর কঠোর নজরদারি ও নির্মম শাস্তির ভয়ে ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের সর্বক্ষণ তটস্থ থাকতে হতো। ধারণা করা যায় তাদের অবস্থা চোর-ডাকাতের চেয়েও শোচনীয় ছিল। কেননা চোর-ডাকাতেরা শাস্তি এড়ানোর ভয়ে বনেজঙ্গলে পালিয়ে বেড়াতে পারতো, কিন্তু রাজস্ব কর্মচারীদের পরিবার-পরিজন নিয়ে সমাজে বাস করতে হতো। ফলে তারা ইচ্ছে করলেই শাস্তি থেকে রেহাই পেতে যখন তখন ফেরার হতে

১২১ Ibid., pp. 273.

১২২ W. H. Moreland বলেন, 'In this way it was hoped to enable the Chiefs (Khots, Muqaddams etc.) to live in comfort, but not in such affluence as might lead to rebellion.' (The Agrarian System, pp.41).

১২৩ 'Certainly they were not allowed to realize more from the peasantry than they were to deposit in the treasury.' (The Government of the Sultanate, pp. 87).

১২৪ The Agrarian System, pp. 41.

১২৫ তবকাত-ই-আকবরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩০-৩১।

পারতো না। তাই দেখা গেছে তাঁর আমলে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের গুণগত মান ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা (স্বচ্ছতার কারণে) বাড়লেও এর সর্বাপেক্ষা খারাপ দিক ছিল দিন দিন এই বিভাগ কর্মচারী শূন্য হয়ে পড়ছিল। বলাবাহুল্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মানসম্মান ও জীবন খোয়ানোর ভয়ে সহজে কেউ এখানে চাকুরি করতে চাইতো না। কিন্তু সুলতান গিয়াসউদ্দিনের রাজত্বকালে এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল।

প্রথমত তিনি কর্মচারীদের মানবিক দোষত্রুটির জন্য অনেকটা নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি আমিন, কারকুন, মুতাশররফ প্রভৃতির ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত হিসাবের খাতায় যোগফলের শতকরা ১/$\frac{১}{২}$ ভাগ গরমিল উপেক্ষা করার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং সে অনুযায়ী আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শাসকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ড. ইরফান হবিব বলেন, 'The muqti's were warned not to ill-treat any of their officials for small amounts (0.5 or 1 percent of the receipts), taken over and above their salaries.'[১২৬] অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে সুলতান একেবারে লাগাম ছেড়ে দিয়ে এদেরকে যা খুশি করতে দিয়েছিলেন, 'This, however, did not mean that he permitted them to embezzle the assessed jam', or deduct any larger amount as their own share. In such cases of course he declared them as robbers, deceivers, and permitted physical coercion.'[১২৭] তেমনি একইভাবে, 'the Amirs and Maliks were not molested if from the revenue they appropriated four and a half or five percent.'[১২৮]

দ্বিতীয়ত ভূমিরাজস্ব বিভাগের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীদের জন্য আলাউদ্দিনের যুগীয় কঠোরতম শাস্তি হিশেবে মৃত্যুদণ্ড সম্ভবত তিনি পরিহার করেছিলেন। কেননা 'তবকাত-ই-আকবরী'র লেখকের বর্ণনায় তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল, তিনি 'সর্বপ্রকার চরম ব্যবস্থা পরিহার করিয়া চলিতেন।'[১২৯]

পরিশেষে আমরা বলবো সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের শাসনকাল ছিল তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেই সংক্ষিপ্ত সময় পরিসরে ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে যা কিছু তিনি করেছিলেন তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল প্রজাকল্যাণ ও একটি শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য শাসন। Moreland-এর ভাষায়, 'His ideal was that his peasants should maintain the existing cultivation, and should effect a steady, if gradual, extension as their resources increased; and he realised that progress in this direction depended very largely on the quality of the administration. Sudden and heavy enhancements were, in his judgment, disastrous : "when kingdoms are

১২৬ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 71.
১২৭ Some Aspects, pp. 272.
১২৮ Ibid., pp. 272.
১২৯ পৃষ্ঠা ২৩০।

obviously ruined, it is due to the oppressiveness of the revenue and the excessive royal demand; and ruin proceeds from destructive governors and officials."[১৩০]

গিয়াসউদ্দিন এই সব কিছুর মধ্যবর্তী অবস্থানে ছিলেন।

সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১)

মধ্যযুগের ইতিহাসে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক ছিলেন সত্যিই প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। একদিকে যেমন তাঁর চরিত্রে পরস্পরবিরোধী গুণাবলীর সংমিশ্রণ ঘটেছিল,—Moreland তাঁকে বলেছেন, 'a more complex character, his conduct was a mass of inconsistencies,...'[১৩১] ড. আগা মাহদী হুসেন বলেন, 'of all the Muslim rulers of India, Muhammad bin Tughluq was a mixture of opposites; he was at once the wisest and the most foolish, the most courteous and the most discourteous, the most humane and humiliating and the most tyrannical and arrogant, the most merciful and lenient and yet the most ruthless and cruel.'[১৩২] ড. আর. পি. ত্রিপাঠীর মতে, 'Muhammad Tughlaq was far above the average ruler of his day in intellectual gifts.'[১৩৩] তেমনি অন্যদিকে আমাদের মনে হয় মধ্যযুগের বিশেষত সুলতানি শাসনামলের অন্য সকল শাসকের তুলনায় তিনি সবচেয়ে বেশি সমালোচিত। বলা যায় তাঁর সময় ও চরিত্র আলোচনা মধকালীন ভারতীয় ইতিহাসের এক অতি আকর্ষণীয় অধ্যায়। উপর্যুপরি কৃষক বিদ্রোহ, খরা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি তাঁর শাসনকালের মতো অন্য কোন মুসলিম সুলতানের শাসনকে আক্রমণ ও ক্ষতবিক্ষত করেনি। বস্তুত মুহম্মদ বিন তুগলকের ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থার মূল প্রকৃতি অনুধাবন করতে হলে উপর্যুক্ত বিষয়াবলি মনে রাখা একান্ত জরুরি। সঙ্গে সঙ্গে এটাও জানা দরকার যে, তাঁর রাজত্বে এই প্রথম বারের মতো বাংলার ৩টি ঐতিহাসিক ভূখণ্ড—'লখনৌতি' বা লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও ও সোনারগাঁও অঞ্চলে দিল্লির সুলতানি শাসন বেশ পোক্তভাবে জেঁকে বসেছিল।[১৩৪] ড. আবদুল করিম বলেন, 'গিয়াস-উদ-দীন তুগলক বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা উন্নত করেন, মোহাম্মদ বিন তুগলক তাহা আরও দৃঢ়ীভূত করেন।'[১৩৫] তিনি বাংলাদেশকে একাধিক প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত ও

১৩০ The Agrarian System, pp. 45.
১৩১ Ibid., pp. 45-6.
১৩২ The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 96.
১৩৩ Some Aspects, pp. 278.
১৩৪ প্রকৃতার্থে এগুলি সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সময়ে বিজিত হয় ও দিল্লির অধীনে আসে। সুলতান মৃত্যুর (১৩২৫) আগেই সেখানকার শাসনব্যবস্থা মোটামুটি পুনর্গঠিত করেছিলেন। (বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ১৫৯, মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ৬৫)।
১৩৫ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ১৬০।

যখন তখন শাসনকর্তা পরিবর্তন করে এই দৃঢ়ীকরণের শক্তি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যদিও এর পরিণতি ভালো হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁর সময়েই (১৩৩৮) প্রথমে সোনারগাঁও, পরে অন্যান্য অঞ্চলগুলিও দিল্লির অধীনতা মুক্ত হয়ে যায়।[১৩৬] যা হোক, এখানে এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তৎকালে বাংলায় দিল্লির শাসনের সুদৃঢ় স্থাপনা ছিল, সেহেতু কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, কেন্দ্রে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অনেকখানিই এখানে ক্রিয়াশীল ছিল। প্রসঙ্গত 'তবকাত-ই আকবরী'র লেখক খাজা নিযামউদ্দীন আহমদের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'নূতন প্রদেশ বিজয় এবং তাঁহার রাজ্যের শাসনকার্য নির্বাহে তিনি (মুহম্মদ বিন তুগলক) এত অধিক পরিশ্রম করিতেন যে অল্পকালের মধ্যেই গুজরাট এবং মালব এবং দেওগীর এবং তিলাঙ্গ এবং কম্পিলা এবং ধোর সমুন্দ এবং মাবার এবং তিরহুত এবং লক্ষ্মণাবতী এবং সাতগ্রাম এবং সোনারগ্রাম সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা হয়; আর রাজস্ব এবং এই সমস্ত প্রদেশের আয় এবং ব্যয়ের মোটামুটি হিসাব দোয়াবের শহরগুলির হিসাবের ন্যায়ই দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিত। আর গভর্ণর এবং অন্যান্য অফিসারগণের কর্তৃত্ব এত দৃঢ়ভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ঐ সব স্থানের কোন একজন গ্রাম-প্রধান বা অন্যান্য দুর্দান্ত লোক লুকাইয়া অথবা একগুঁয়েমি করিয়া সরকারের রাজস্ব হইতে একটি দিরহামও রাখিতে সক্ষম হইত-না।[১৩৭] সুতরাং তৎকালীন দিল্লির ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে যে সমকালীন বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থার হুবহু না হলেও (কোনকালেই তা ছিল না) কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ছিল তা অনস্বীকার্য। তবে দুঃখজনক বিষয় এই যে, এই জাতীয় সাদৃশ্যের কোন তাৎক্ষণিক প্রমাণ অদ্যাবধি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেনি।

পিতা গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক প্রথম কয়েক বছর বেশ শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করেন। অতঃপর এতো বেশি নতুন নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ও যুদ্ধবিগ্রহ-বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হয়ে পড়েন যে তাঁর পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন জনকল্যাণধর্মী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। আর করলেও সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিশেষ করে জিয়াউদ্দিন বারানির কাছে তা তেমন সমাদর পায়নি। বারানি মুহম্মদের বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপের (দোয়াবে ভূমিরাজস্বের হার বৃদ্ধি, দিল্লি থেকে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর, তাম্র মুদ্রার প্রচলন, খুরাসান ও কারাচিল প্রভৃতি অভিযান) যতোটা কড়া সমালোচনা করেছেন তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'তে, তার যৎসামান্য অংশও ব্যয় করেননি সুলতানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনায়। ফলত তাঁর আশ্চর্য নীরবতা সত্ত্বেও বিভিন্ন সূত্রে সুলতান মুহম্মদ বিন

১৩৬ বাংলাদেশে নিযুক্ত সুলতানের শাসনকর্তাগণ প্রায় ৩ বছর নির্বিঘ্নে শাসন কাল অতিবাহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অতঃপর ১৩৩৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ কর্তৃক সোনারগাঁও, আলি মুবারক সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ কর্তৃক লক্ষ্মণাবতী ও হাজি ইলিয়াস কর্তৃক সাতগাঁও মূলত স্বাধীন ও দিল্লির কর্তৃত্বরহিত হয়ে যায়।

১৩৭ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৮-৩৯।

তুগলকের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও নীতির যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দু'টি বিষয়—এক. গরিব রায়তদের চাষাবাদ-পূর্ব 'তাকাবি' ঋণ প্রদান, ও দুই. শস্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনকে সম্পৃক্তকরণ, সমকালীন প্রেক্ষাপটে খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। নীচে এ যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মোটামুটি একটা পরিচয় দেয়া গেল।

মুহম্মদ বিন তুগলক তাঁর উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সঙ্গত কারণে পিতা গিয়াসউদ্দিনের পরিবর্তে সুলতান আলাউদ্দিনের ভূমিরাজস্ব নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত করণ, নতুন মুদ্রা প্রচলন, বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের মাধ্যমে নতুন নতুন রাজ্য জয়ের স্বপ্ন পূরণের জন্য ভূতপূর্ব সুলতানের অপেক্ষাকৃত নমনীয় নীতির চাইতে আলাউদ্দিনের কঠোর নীতিতে অধিক রাজস্ব আয় সম্ভব, সেটা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই একদিকে ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার বৃদ্ধি করে উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{২}$ বা প্রায় সম-পরিমাণ করা এবং অপরদিকে 'ইক্তা' প্রভৃতি জায়গির ব্যবস্থা থেকে রাজস্ব আয় সরাসরি কেন্দ্রীয় দপ্তরের নিয়ন্ত্রণে আনা—এই দু'টিই তাঁর জন্য জরুরি ছিল। তিনি তা করেও ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁর সে পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়নি। ড. উপেন্দ্রনাথ দে বলেন, 'Muhammad Tughlaq tried to revive the system of 'Alauddin Khalji but he could hardly achieve any success and reverted back to the system of granting revenue assignments.'[১৩৮] সুলতান দোয়াবের (গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ) গ্রামগুলিতে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিশেষ করে গুজরাট, মালব, দাক্ষিণাত্য, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন।[১৩৯] দোয়াব ছিল সালতানাতের 'অতিশয় উর্বর ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল এবং এখানকার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা ছিল বেশ সচ্ছল।'[১৪০] বারানির মতে, 'সুলতান মুহম্মদের মনে হয়েছিল যে দোয়াবের ভূমিরাজস্ব এক থেকে দশ এবং এক থেকে বিশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা উচিত।'[১৪১] ফলত 'এই প্রকল্পটি কার্যকরী করার জন্য তাঁরা (তাঁরা অফিসাররা) ফলপ্রসূ পরিকল্পনাসমূহ তৈরি করেন এবং এমন এমন সব কর আরোপ করেন যা রায়তদের পিঠ ভেঙে দেয়। ঐসব পরিকল্পনা এমন কঠোরভাবে কার্যকরী করা হয় যে রায়তদের মধ্যে যারা দুর্বল ও সহায়হীন তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অপরদিকে, যারা ধনী এবং অর্থ ও সম্পদের অধিকারী তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ফলে শহর ও গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষিকাজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়। দোয়াবের রায়তদের ধ্বংস ও অবলুপ্তির কথা শুনে এবং পাছে তাদের উপরও অনুরূপ আদেশ জারী করা হয় এই ভয়ে দূরাঞ্চলের কৃষকরাও বিদ্রোহ করে ও জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।'[১৪২] যা হোক, এখানে

১৩৮ The Government of the Sultanate, pp. 83.

১৩৯ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp.63.

১৪০ ড. কুমুদরঞ্জন দাস, প্রবন্ধ 'মুহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে কৃষক বিদ্রোহ', ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, সম্পাদনা ড. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৫৩।

১৪১ 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী', পৃষ্ঠা ৪৭৩, সংগৃহীত ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, পৃষ্ঠা ১৪৯।

১৪২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৩, সংগৃহীত ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০

দোয়াবের বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল, বারানির উক্তির প্রামাণিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য নয়। আমরা শুধু দেখাতে চাই যে সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক একটি কঠোর ভূমিরাজস্ব নীতি অবলম্বন করেছিলেন। সত্যি বলতে তা আলাউদ্দিন খলজির অনুসৃত নীতির চেয়েও কঠিনতর ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু যে কঠোর নীতি ও নিয়ন্ত্রণ, ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর তীক্ষ্ণ খবরদারি ও রায়তের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থার সম্যক জ্ঞান আলাউদ্দিনের ছিল, বা অন্য কথায় সময়কালে তিনি দেখাতে পেরেছিলেন, মুহম্মদের সেটা ছিল না, আর থাকলেও তিনি তার কার্যকর রূপায়ণ ঘটাতে সক্ষম হননি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে সম্রাট আলাউদ্দিন যে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সফল হয়েছিলেন সেখানে মুহম্মদ বিন তুগলক চরমভাবে ব্যর্থ হলেন কেন? এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমরা নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় দেখতে পাই।

যে সময়ে দোয়াবে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির মহাপরিকল্পনা কার্যকর করা হয়েছিল সে সময়টা দোয়াবের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এর অনুকূল ছিল না। ড. কুমুদরঞ্জন যথার্থই বলেছেন, 'রাজস্ব বৃদ্ধি করার সময়ে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং দোয়াবের কৃষকদের মেজাজ ও মনোভাবের কথা বিবেচনা করা উচিত ছিল।'[১৪৩] উল্লেখ্য দোয়াবের সম্পন্ন কৃষকদের অধিকাংশই ছিল খুট, মুকাদ্দাম, চৌধুরি প্রভৃতি ও এদের বংশধর। প্রকৃতিগতভাবেই এরা ছিল সাহসী, পরিশ্রমী ও স্বাধীনচেতা। 'এরা সরকারি কর্তৃত্ব সহজে মেনে নিতেন না এবং সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগে প্রায়ই বিদ্রোহ করতেন।'[১৪৪] বস্তুত দোয়াবের বিদ্রোহী মনোভাবসম্পন্ন কৃষক ও প্রকৃত বিদ্রোহীদের দমনে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন যে বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং তচনচ করে দিয়েছিলেন গ্রামের পর গ্রাম, সুলতান আলাউদ্দিনও স্বীয় নীতি বাস্তবায়নে অব্যাহত রেখেছিলেন একই ধারা, কিন্তু সত্য বলতে প্রথম থেকে এই ধরনের কোন পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা মুহম্মদ বিন তুগলক গ্রহণ করেননি। যখন করেন তখন আর সময় ছিল না। কারণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র তখন দোয়াবের বিদ্রোহের আগুন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। ড. মাহদী হুসেন বলেন, 'The rebellions which arose in the Doab spread to almost every other province.'[১৪৫]

সম্রাট আলাউদ্দিনের চরিত্রের কাঠিন্য, শাস্তি প্রদানের দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুরতা, যে কোন নীতি বাস্তবায়নে নিরাপোষ মনোভাব এবং সর্বোপরি তুলনাহীন নজরদারি মুহম্মদ বিন তুগলকের ছিল না। আলাউদ্দিনের সময়ে ভূমিরাজস্বের হার $\frac{১}{২}$ তথা সর্বোচ্চ থাকলেও রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের ওপর তাঁর নিয়মিত খবরদারি তাদেরকে দুর্নীতিগ্রস্ত হতে ও জনগণকে নানা ছুঁতোয় হয়রানি করতে বারিত করেছিল তা বলাইবাহুল্য। রাজস্ব ধার্য ও আদায় প্রক্রিয়ায় খুট, মুকাদ্দাম, চৌধুরি প্রভৃতির অ-সম্পৃক্তির ফলে জনসাধারণের ওপর

১৪৩ ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, পৃষ্ঠা ১৫৩।
১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫৩।
১৪৫ The Rise and Fall, pp. 148.

এদের নিপীড়ন ও পারস্পরিক শ্রেণীবিদ্বেষ অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল। সর্বোপরি ছিল আলাউদ্দিনের ব্যাপক ও যুগান্তকারী অর্থনৈতিক সংস্কার যার ফলে বাজারে দ্রব্য মূল্য কমে গিয়েছিল এবং প্রজার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই শুধু সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং দীর্ঘদিন যাবৎ তা স্থিতিশীলও ছিল। বলা যায় কঠোর অর্থনৈতিক সংস্কার ও মূল্য নিয়ন্ত্রণই ছিল তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতির সাফল্যের মূল নিয়ামক ও প্রজা দ্রোহ অবদমনের চাবিকাঠি। ড. মাহদী ঠিকই বলেছেন, 'Ala-ud-din had met the crisis by controlling markets and fixing prices of all commodities.'[১৪৬] আলাউদ্দিনের বিশাল ব্যক্তিত্বও এ ব্যাপারে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। তাই দেখা যায় আলাউদ্দিন 'যখন দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধি করেন তখন তিনি নতুন নতুন রাজ্য জয়, বিভিন্ন বিদ্রোহ দমন এবং একাধিকবার মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করে সাফল্য ও জনপ্রিয়তার প্রায় শীর্ষে অবস্থান করছিলেন'[১৪৭] ; অথচ অন্যদিকে দোয়াবে রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে রায়তের অবস্থা যখন চরম দুর্দশায় নিপতিত তখন আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কারের অনুরূপ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করে মুহম্মদ তুগলক নতুন নতুন নিপীড়নধর্মী ফরমানসমূহ (new but oppressive legislation)[১৪৮] জারি করে রায়তদের পরিণতি আরও ধ্বংসোন্মুখ করে তুলেছিলেন। এ পর্যায়ে আমরা আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করবো যে, যে কোন নীতি বা পরিকল্পনা তা যতো কঠোরই হোক না কেন, তা বাস্তবায়নের জন্য যদি যথেষ্ট পূর্ব পরিকল্পনা, উপযুক্ত প্রেক্ষাপট ও সমন্বিত উদ্যোগ তথা সমগ্র প্রশাসনযন্ত্রের ইতিবাচক সক্রিয়শীলতা অনুপস্থিত থাকে, তাহলে সেই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। যেমনটা ঘটেছিল মুহম্মদ বিন তুগলকের বেলায়।

প্রথমেই উল্লেখ্য, দোয়াবে অত্যধিক ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পরীক্ষামূলকভাবেই করা হোক, যেমনটা ড. আর. পি. ত্রিপাঠী[১৪৯] ও ড. উপেন্দ্রনাথ দে[১৫০] বলেছেন, অথবা তদঞ্চলের বিদ্রোহী কৃষক ও উচ্ছৃঙ্খল জনসাধারণকে শায়েস্তা করার মানসে হোক, যেমনটা ড. কোরেশি বলেছেন[১৫১] , কি না করা হোক, তবে বাস্তবে সাম্রাজ্যের অন্যত্র মুহম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের মোটামুটি হার ছিল উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{৫}$ অংশ।[১৫২] পূর্বে প্রচলিত 'গৃহকর' (ঘরহি) ও 'গোচারণ কর' (চরাই) আদায়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে ঐতিহাসিক ইয়াহিয়া বিন আহমদ সিরহিন্দি জানান।[১৫৩] তিনি রায়তের করারোপযোগ্য

১৪৬ Ibid., pp. 151.
১৪৭ ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, পৃষ্ঠা ১৫৪।
১৪৮ The Rise and Fall, pp. 151.
১৪৯ Some Aspects, pp. 274.
১৫০ The Government of the Sultanate, pp. 87.
১৫১ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 115.
১৫২ 'কাসাইদ-ই বদর-ই চাচ', পৃষ্ঠা ৭; ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি স্পষ্ট বলেছেন, 'In other areas the Sultan demanded a fifth of the produce.' (The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 117).
১৫৩ 'তারিখ-ই মুবারকশাহী', Quoted from 'The Camb. Eco.History, Vol, I., pp.101-2

প্রতিটি গৃহ গণনা করে তার হিসাব সংরক্ষণের পদক্ষেপ নেন এবং গবাদি পশুর গায়ে উত্তপ্ত লৌহ শলাকার সাহায্যে দাগ চিহ্নিত করণ নিয়মিত করেন। এছাড়া প্রায় ২৫ প্রকারের 'আবওয়াব' (মূল ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত কর) চালু করেন।[১৫৪]

এই সময়ে সরকারিভাবে নির্দিষ্টকৃত 'ওয়াফা-হা-ই-ফরমানি' নামক এক ধরনের গজ বা মাপনী দিয়ে প্রায় অ-প্রচলিত হয়ে পড়া ভূমি জরিপ প্রক্রিয়া পুনঃ চালু করা হয়। এর ভিত্তিতে উৎপন্ন ফসলের রাজস্ব মূল্য নির্ধারণ করা হতো। ব্যাপারটি এ রকম : ভূমি পরিমাপ শেষে রাজস্বস্বরূপ সরকারি প্রাপ্য নিরূপিত হতো শস্য বা দ্রব্যে অর্থাৎ কতোটুকু ফসল রাষ্ট্র পাবে সেটা। কিন্তু তা আদায় করা হতো শস্যের প্রকৃত বাজার মূল্যের পরিবর্তে সরকার নির্ধারিত মূল্যে, নগদ অর্থে। এ ক্ষেত্রে প্রায়শই যা ঘটতো তাতে দেখা যায়, 'The result of this device was to inflate the tax heavily since the officially decreed yields and prices were probably much higher than the actual in most localities.'[১৫৫] এই পদ্ধতিতে রায়তের ভোগান্তি বেড়েছিল।

মূলত এটিও ছিল তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত রাজধানীর আশপাশ ও দোয়াবে ব্যাপক প্রজা অসন্তোষের কারণ।[১৫৬]

মুহম্মদ বিন তুগলকের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় কীর্তি হলো গরিব রায়তদের মধ্যে আবাদপূর্ব ঋণ দান প্রথার প্রবর্তন। 'তাকাবি' নামে এটি আগেও ছিল। কিন্তু তখন তা প্রদান করা হতো যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে রোপিত শস্যের ক্ষতি হবার ও তা সরকারিভাবে পরীক্ষানিরীক্ষার পর। অন্যদিকে মুহম্মদ বিন তুগলক এই নতুন ধরনের 'তাকাবি' চালু করেন গরিব রায়তদের তাদের অল্পস্বল্প স্থিত ভূমি ও অনাবাদি এলাকা চাষের আওতায় আনার উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে। ফলে বলা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে[১৫৭] তিনিই এই প্রক্রিয়ার আবাদপূর্ব ঋণ দান প্রথার পথিকৃৎ। ড. ইরফান হবিব নিঃসন্দেহে বলেন, 'In recorded history Muhammad Tughluq is the first Indian ruler to have used this device to promote cultivation on a large scale.'[১৫৮]

আগেই বলেছি সুলতানের দমন-পীড়নমূলক নীতির কারণে সাম্রাজ্যের কোন কোন অঞ্চল বিশেষ করে দোয়াব প্রায় জনমানবহীন বিরাণ হয়ে পড়েছিল। জিয়াউদ্দিন বারানির ভাষায়, দোয়াবের 'শহর ও গ্রামগুলো ধ্বংস হয়ে যায় এবং কৃষিকাজ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়।'[১৫৯] তাছাড়া সুলতানের কৃতকর্মের ফল বা জনসাধারণের দুর্ভাগ্য, যাই বলি না কেন,

১৫৪ History of FiruzShah Tughluq, Dr. J. M. Banerjee, pp. 121.

১৫৫ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 63-4.

১৫৬ Ibid., pp. 64.

১৫৭ খলিফাদের সময়ে প্রাথমিক যুগের মুসলিম রাষ্ট্রে এই ধরনের ঋণ দানের প্রচলন ছিল। তখন এটি প্রশাসনের স্বাভাবিক কার্যাবলির অংশীভূত বিবেচিত হতো (See fn. of Camb. Economic History of India, Vol. I., pp. 65).

১৫৮ Ibid., pp. 65.

১৫৯ 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী', পৃষ্ঠা ৪৭৩, সংগৃহীত ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, পৃষ্ঠা ১৪৯।

এ সময়ে এতদঞ্চলে প্রায় ফি-বছরই দুর্ভিক্ষ-খরা-অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকতো। ফলে শস্য মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এবং সার্বিক অবস্থার অনিবার্য পরিণতি হিশেবে 'হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। সমাজ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বহু মানুষ তাদের সব কিছু হারিয়ে ফেলে।'[১৬০] বস্তুত সুলতান এই ঘোর দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে অসহায় লোকজনকে উদ্ধার করার মানসে এক উচ্চাভিলাষী (সদর্থে) মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

প্রথমত তিনি রায়তদের সাংবাৎসরিক ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য সরকারিভাবে ঋণ ('সোন্দার' নামে পরিচিত ছিল) প্রদান চালু করেন যা ভূমিতে শস্য রোপনের পূর্বেই দেয়া হতো (pre-harvest loans)। বর্তমান যুগের 'তাকাবি' (আরবি শব্দ, মূলার্থ শক্তিদায়ী) ঋণের ধারণার উৎপত্তি সম্ভবত এখান থেকে। যা হোক, বিখ্যাত ঐতিহাসিক শামস-ই সিরাজ আফিফের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় সুলতান এ জন্যে প্রায় দুকোটি তঙ্কা খরচ করেছিলেন যদিও সেটা তাঁর জীবদ্দশায় আর ফেরৎ পাওয়া যায়নি। পরবর্তী শাসক সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক এটি আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয় জেনে তা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেন।[১৬১] দ্বিতীয়ত চাষাবাদের উন্নয়ন ও কৃষকদের অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে তিনি নতুন একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। W. H. Moreland বলেন, 'With this object a special Ministry was constituted, the region was divided into circles, and officials were posted to them with instructions to extend cultivation, and improve the standard of cropping.'[১৬২] নবগঠিত এই রাজস্ব বিভাগের নাম দেয়া হয়েছিল 'দিওয়ান-ই-আমির-ই-কোই'[১৬৩] । এর মুখ্য কাজ ছিল, 'to supervise his (Sultan's) attempt of bringing the uncultivated land under the plough by means of direct state management and financial support.'[১৬৪] সুলতান এই বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কৃষিকার্যের প্রসারের জন্যে এরা সমগ্র আবাদযোগ্য ভূমি চাষের আওতায় নিয়ে আসবে। আর যেখানে ভূমি ইতোমধ্যে পূর্ণ আবাদের অধীনে আনা হয়েছে সে সব স্থানে পূর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান ও ফলনশীল শস্য উৎপাদন করবে। প্রয়োজনে শস্য রোপনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতি অর্থাৎ কোন জমিতে এ বছর যে ফসল ফলানো হবে অব্যবহিত পরের বছর তাতে ভিন্ন ফসল বপন করার নির্দেশও দেন।[১৬৫] এই পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য ১০০ জন শিকদার বা তত্ত্বাবধায়ক[১৬৬] ও তাদের অধীনে প্রায় ১০০০ জনের একটি বিশাল কর্মীবাহিনী নিযুক্ত করেন।[১৬৭] প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োজনীয় পানির অপ্রতুলতায় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হয়। তিনি সেই সমস্যা দূরীকরণে অসংখ্য কূপ ও জলাশয় খননের ব্যবস্থা করেন। কিছু সংখ্যক ব্যক্তির আবেদন ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সাময়িক ভাবে পতিত ভূমি চাষাবাদের লক্ষ্যে রাজকোষ থেকে অর্থ

১৬০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৩/১৫০।
১৬১ Some Aspects, pp. 282.
১৬২ The Agrarian System, pp. 50.
১৬৩ 'তবকাত-ই আকবরী', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩।
১৬৪ Some Aspects, pp. 278.
১৬৫ 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী', পৃষ্ঠা ৪৯৮-৯৯।
১৬৬ 'তবকাত-ই আকবরী', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৩।
১৬৭ 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী', পৃষ্ঠা ৪৯৮-৯৯

প্রদান করেন। সুলতান ভেবেছিলেন এদের ব্যক্তি-উদ্যোগ সরকারি কর্মচারীদের তুলনায় পরিস্থিতির উন্নয়নে অধিক ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ এককথায় বলা যায় সম্ভাব্য সকল উপায়ে তিনি দোয়াবের কৃষকদের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সত্য বলতে সুলতানের ভাগ্য এবারেও তাঁকে প্রতারিত করলো। ড. ত্রিপাঠী দুঃখ করে বলেন, 'The experiment was interesting but not destined to succeed.'[১৬৮] নানা কারণে এই মহাপরিকল্পনা ভেস্তে যায়। যার মধ্যে অন্যতম ছিল, 'It was a new measure without any precedent.'[১৬৯] ফলে, 'numerous difficulties in its practical working were bound to arise.'[১৭০] বাস্তবক্ষেত্রে ঘটেও ছিল তাই। বিশেষ করে এমন অনেক লোককে 'সোন্দার' প্রদান করা হয়েছিল যারা সরকারের উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিল না। ফলে তারা সরকারি অর্থ গ্রহণ করে কৃষিকার্যে তা ব্যয়িত না করে অন্যভাবে এর অপচয় করেছিল। খাজা নিযামউদ্দীন উল্লেখ করেন, 'বহু লোক যাহারা ক্ষুধার্ত এবং মহা-দুর্দশায় নিপতিত হইয়াছিল এবং অন্যান্য বহু লোক যাহারা লোভী এবং অর্থলিপ্সু ছিল, তাহাদের কার্যের শেষ পরিণতি কি হইবে তাহা না ভাবিয়াই ভূমি গ্রহণ করে এবং অগ্রিমরূপে এবং পুরস্কাররূপে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করে। এইসব অর্থ তাহারা তাহাদের তৎকালীন অভাব দূরীকরণে ব্যয় করে এবং তৎপর তাহারা যে শাস্তি পার্থিব বলিয়া জানিত তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে।'[১৭১] এছাড়া যে অঞ্চলটি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নোপলক্ষে বাছাই করা হয়েছিল সেটিও এই স্বল্পকাল তথা মাত্র ৩ বছর সময়-পরিসরে সুফল দানের যথেষ্ট উপযোগী ছিল না। ফলে এগুলির সঙ্গে 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো যোগ হয়েছিল কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতি যা অচিরেই প্রকল্পটিকে স্থায়ীভাবে মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। অবশ্য এটাও ঠিক যে সুলতান যদি ঐ বিশেষ সময়ে সাম্রাজ্যের অন্যত্র নানা যুদ্ধবিগ্রহে অধিকক্ষণ ব্যস্ত না থাকতেন ও নিত্য নতুন পরিকল্পনায় মনোনিবেশ না করতেন এবং সবচেয়ে বড় কথা সম্রাট আলাউদ্দিন খলজির মতো একাগ্রতা নিয়ে 'আমির-ই-কোহ'-এর কার্যাবলির তদারকি করতেন, তাহলে হয়তো ফলাফল অন্যরকম হলেও হতে পারতো। এই মহতী পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি যা-ই হোক, সুলতান মুহম্মদের আপাত ব্যর্থ কৃষি নীতি থেকে এই প্রথমবারের মতো আমরা জনকল্যাণ ধর্মী রাষ্ট্রের একটি অবশ্য করণীয় সম্বন্ধে জানতে পারি, Moreland -এর ভাষায় যা— 'The other point in the story is that we now meet 'for the first time' with the idea that improvement in cropping should be one of the objects of administrative action.'[১৭২]

সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক আলাউদ্দিনের আমলের মতো 'ইক্তাদারি' প্রথাও চালু রেখেছিলেন। তবে পূর্ববর্তী শাসকের সময়ে এটি যতোটা সীমিত ছিল, তাঁর সময়ে ততোটাই সম্প্রসারিত হয়। এর পাশাপাশি অব্যাহত ছিল 'ইজারা' ব্যবস্থা।[১৭৩] ইক্তাগুলির

১৬৮ Some Aspects, pp.279.
১৬৯ Ibid., pp. 279.
১৭০ Ibid., pp. 279.
১৭১ 'তবকাত-ই আকবরী', পৃষ্ঠা ২৫৩।
১৭২ The Agrarian System, pp. 51.
১৭৩ Some Aspects, pp. 280-81; The Government of the Sultanate, pp. 88; 'The Agrarian System'-এ Moreland স্পষ্ট বলেছেন, 'Farming and Assignment

প্রধান ছিল 'মুক্তা' বা 'ইক্তাদার', কখনও কখনও 'আমিল' নামীয় মুখ্য ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক; আমিলদের অধীনে থাকতো 'শিকদার', 'আমলগুজার' প্রভৃতি। (এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।) যা হোক, তিনি ইক্তাগুলির দপ্তরে ভূমিরাজস্ব আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নানা নথিপত্র বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। এগুলি শুধু সংশ্লিষ্ট ইক্তার আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান জানার জন্যেই সংরক্ষণ করা হয়নি, উপরন্তু, 'It was perhaps intended to introduce a uniform revenue policy throughout the Sultanate on the basis of the information gathered from this register.'[১৭৪]

পরিশেষে আমরা মুহম্মদ বিন তুগলকের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সামগ্রিক মূল্যায়নে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে কোন সরকারের যে কোন মহৎ পরিকল্পনা ও সৎ উদ্যোগ, তা যতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও ব্যয়বহুলই হোক না কেন, যদি সময়োপযোগী এবং জনসাধারণের সমর্থন বা আনুকূল্য না পায়, তবে তা অবশ্যম্ভাবীরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক এমন এক সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন যখন সাম্রাজ্যব্যাপী প্রবল বিশৃঙ্খলা, রাজকোষের শোচনীয় অবস্থা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের তথা পূর্ববর্তী সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব নীতির প্রতি জনসাধারণের অত্যধিক বিতৃষ্ণা ও অসন্তোষ দিল্লির সালতানাতকে প্রায় টলটলায়মান অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। সর্বোপরি ছিল মুহম্মদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনা বিশেষ করে রাজধানী স্থানান্তরের উপর্যুপরি ঝামেলায় আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরের ধূমায়িত রোষ। ফলত এগুলি থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য নতুন সুলতানের সামনে আশু যে দু'টি পথ খোলা ছিল তা হলো—এক. কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও মনোযোগ এবং সুলতানের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা; এবং দুই. আমির-ওমরাহ্দের ওপর পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে যে বিভিন্ন ধকল-ঝাপ্টা গিয়েছে তার দ্রুত অবসান ও তাদের সন্তুষ্টি ও বিশ্বাস অর্জন করা। এখানে আগেই জানিয়ে রাখা ভালো যে, এই উভয় করণীয়ই নবীন সুলতান অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। যা হোক, এই লক্ষ্য অর্জনে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত যে সব ব্যবস্থা বা নীতি অনুসরণ করেছিলেন, সেগুলি নীচে আলোচনা করা হলো।

সর্বাগ্রে সুলতান সাম্রাজ্যবাপী ভূমিরাজস্বের সর্বশেষ পরিস্থিতি ও সর্বস্তরের জনমণ্ডলী বিশেষ করে ভূম্যধিকারী কৃষক ও ইক্তাদারদের মনোভাব জানার জন্যে খাজা হুসামউদ্দিন-এর নেতৃত্ব একটি কমিশন গঠন করেন, যা আমাদের জানা মতে ভারতীয় উপমহাদেশের

---

may...be regarded as the most prominent agrarian institutions of the reign.' (pp. 52).

১৭৪ Advanced Study in the History of Medieval India, Vol. III., Dr. J. L. Mehta, pp. 128.

এ যাবৎকালের মধ্যে সর্বপ্রথম কমিশন ছিল। কমিশন দীর্ঘ ছয় বছরব্যাপী প্রায় সমগ্র দেশ পরিক্রমণ শেষে স্থানীয় তথ্য-পরিসংখ্যান ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের প্রাপ্ত দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট তৈরি করে তাতে ভূমিরাজস্ব বাবদ মোটামুটি আয় দেখানো হয় ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ তঙ্কা।[১৭৫] এই হিসাব সম্পূর্ণ নির্ভুল ছিল বলে মনে হয় না। বরং ড. যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারণাই ঠিক; এটি ছিল একটি অনুমান-নির্ভর হিসাব ('a guess work')।[১৭৬] কারণ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি ও সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের সময়ে মোটামুটি ভূমিরাজস্ব নিরূপিত হতো ভূমি জরিপের মাধ্যমে, কিন্তু এর কোন সুনির্দিষ্ট 'জমা' বা পরিমাণ সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা ও নথিপত্রে পাওয়া যায় না। সুতরাং খাজা হুসামউদ্দিনের পক্ষেও সমুদয় তথ্য-পরিসংখ্যান না-পাওয়াই স্বাভাবিক। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, 'The fixing of a new jam' was indeed a valuable work done by Firoz.'[১৭৭] উল্লেখ্য হুসামউদ্দিনের নিরূপিত উল্লিখিত 'জমা' সুলতান ফিরোজশাহের প্রায় ৪৮ বছরের শাসনকাল অবধি প্রায় অপরিবর্তিত ছিল।[১৭৮] এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি বিষয় জানিয়ে রাখা দরকার যে, ইংরেজ শাসনামলে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার ভূমিরাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে সেই যে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল পরবর্তীকালে ১৯৫৫ সনে জমিদারি অধিগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তা কাগজে-পত্রে একপ্রকার স্থির ছিল। এই সুদীর্ঘ সময়ে জমির মূল্য, জমি থেকে জমিদার-তালুকদারের আয়, দ্রব্যমূল্য ইত্যাদি বৃদ্ধি পেলেও আইনগত ও নানাবিধ কারণে সরকারি ভূমিরাজস্ব দাবি একই রাখতে হয়। তবে রাষ্ট্র এই ক্ষতি পুষিয়ে নেয় জমিদার-তালুকদারদের ওপর (এরা আবার ভূম্যধিকারী প্রজাদের ওপর) ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত বিভিন্ন প্রকারের 'আবওয়াব' ধার্য করে। এর কিছুটা যৌক্তিকতা থাকলেও সত্য বলতে অধিকাংশ আবওয়াব-ই ছিল অন্যায়, অমানবিক ও প্রজার জন্য উৎপীড়নধর্মী বা নির্যাতনের শামিল। অথচ সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক তাঁর এই দীর্ঘ ৪৮ বছরে নির্ধারিত ভূমিরাজস্বের পরিমাণ তো বৃদ্ধিই করেননি, উপরন্তু কোন আবওয়াব ধার্য করেছিলেন, এমন কোন কথা সমকালীন ঐতিহাসিকগণ বলেননি। বরং সুলতান রায়তের স্বার্থবিরোধী ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত নয় এমন পূর্ববর্তী সরকারের প্রবর্তিত (অনুসৃত বলাই শ্রেয়) প্রায় ২৫ প্রকারের অতিরিক্ত কর বা সেস মওকুফ করে দেন।[১৭৯] ঐতিহাসিক আফিফ এগুলির একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন যা নিম্নরূপ :

১৭৫ Some Aspects, pp. 284. Moreland-এর মতে এর পরিমাণ ছিল ৫ ৩/৪ কোটি তঙ্কা (The Agrarian System, pp. 57); ড. যামিনীমোহন এর মতে ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ (History of FiruzShah Tughluq, pp. 116)
১৭৬ History of FiruzShah Tughluq, pp. 116.
১৭৭ Some Aspects, pp. 284.
১৭৮ Afif, pp. 94; quoted from 'Some Aspects', pp. 284.
১৭৯ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 122; ড. সৈয়দ মইনুল হকের মতে এর সংখ্যা ছিল ২৩টি (The Sultanate of Delhi, pp. 145) এবং ড. এস. এ. এ. রিজভী'র মতে ২৮টি

১. মন্দবি	হাটবাজারের তোলা;
২. দালালাত-ই-বাজারাহ্	বাজারে দালালির ওপর কর;
৩. জজারি	কসাইদের ওপর ধার্য কর;
৪. আমির-ই-তরাব	বিবাহ-নৃত্য-সঙ্গীত প্রভৃতি উৎসবানুষ্ঠানাদি তদারককারী রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কর (!);
৫. গুল ফরাশি	ফুল বিক্রয়ের ওপর কর;
৬. দরিবাহ্-ই-তাম্বুল	সরকারি হাটবাজারে বিক্রয়ার্থ পানের ওপর কর;
৭. চুঙ্গি-গুল্লাহ্ বা চিনকারি	শস্য থেকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত খাবারের ওপর কর;
৮. কিতাবি	বইপুস্তকাদি বিক্রয়ের ওপর কর;
৯. নীল ঘরহি	নীল উৎপাদনের ওপর কর;
১০. মাহি ফরাশি	মাছ্ বিক্রয়ের ওপর কর;
১১. নিদ্দাফি	সূতা কাটার ওপর কর;
১২. সাবুন গরি	সাবান তৈরির ওপর কর;
১৩. রিসমান-ই-ফরাশি	দড়ি ইত্যাদি বিক্রয়ের ওপর কর;
১৪. রোগান গরি	তেল-ঘি-মাখন প্রভৃতি তৈরির ওপর কর;
১৫. নাখুদ বিরইয়ান	শুকনো খাবারের ওপর কর;
১৬. তেহ্ বাজারি	চান্দিনা ভিটায় খুচরা দোকানিদের ওপর কর;
১৭. ঝবা	টাম্প-গাদা বা ছাপা কাপড়ের ওপর কর;
১৮. কীমার খানা	জুয়াখেলার ওপর কর;
১৯. দাদবেকি	কোর্ট ফি;
২০. কোতওয়ালি	কোতওয়ালের জন্য কর;
২১. ইহ্‌তিসাবি	ওজন, মাপ প্রভৃতির চৌকিদারি কর;
২২. করহি	নগণ্য ধরনের কিছু কর;
২৩. খিদরাওয়াত	শাকসব্জি বিক্রয়ের ওপর কর;
২৪. মুসদারাত	বিভিন্ন প্রকারের জরিমানা; ও
২৫. চরাই	গোচারণ বা পশুচারণ কর।

উপরিউক্ত আবওয়াবসমূহ রহিত করার আগেই সুলতান, মুহম্মদ বিন তুগলকের আমলে প্রদত্ত দুই কোটি তঙ্কার 'সোন্দার' ঋণ আদায়ের অযোগ্য বিবেচিত হওয়ায় চিরতরে তা মওকুফ করে দেন।[১৮০] এর ফলে রায়তদের মধ্যে নতুন সুলতানের জনপ্রিয়তা বহু গুণে বৃদ্ধি পায়।

(The Wonder That Was India. Vol. II., pp. 51); ড. আশীর্বাদি লালের মতে ২৪টি (the Sultanate of Delhi, pp. 209).

১৮০ Some Aspects, pp. 282.

সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের সাধারণ হার ছিল উৎপন্ন শস্যের ১/৫ অংশ। যদিও সমকালীন ইতিহাস-গ্রন্থাদিতে এই আমলের ভূমিরাজস্বের সুনির্দিষ্ট হারের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না, এবং এই কারণে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক এটি ১/১০ অংশ ছিল বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[১৮১] তবে ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি 'দস্তুর-উল-আলবাব ফি ইলমুল হিসাব' গ্রন্থের ভিত্তিতে যে ১/৫ অংশের কথা উল্লেখ করেছেন সেটিকেই আমরা যথার্থ বলে মনে করি।[১৮২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে উৎপাদিত ফসলের এক-পঞ্চমাংশ ভূমিরাজস্ব আদায় স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম রাষ্ট্রে ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত 'খেরাজ' বা ভূমিরাজস্বের সর্বনিম্ন সীমা ছিল ১/৫ অংশ।[১৮৩] ফলে যদি আমরা স্বীকার করি যে, 'In his general administration Firuz endeavoured to follow the rules of Islamic law, and regard to finance in particular he insisted that no taxation should be received in the treasury which was not strictly lawful.'[১৮৪] তাহলে উপর্যুক্ত বক্তব্য সত্য বলে মনে হবে। জিয়াউদ্দিন বারানি ও খাজা নিযামউদ্দিন আহমদের সূত্রে জানা যায় তিনি এই মর্মে প্রয়োজনীয় ফরমানও জারি করেছিলেন। বারানি বলেন, 'সুলতান ফিরুজশাহের আমলে... সকল রাজ্যের সমৃদ্ধি ফুটিবার সুব্যবস্থাটি হইল উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অনুসারে খেরাজ ও জিজিয়া আদায়ের আদেশ দান এবং সর্বপ্রকার অতিরিক্ত খেরাজ, খাজনা ও জবরদস্তি দূর করা।......প্রজারা স্বেচ্ছায় ও স্বচ্ছন্দে যে পরিমাণ খেরাজ দিতে পারে, তাহা আদায় করিবার আদেশ দেওয়া। যাহাতে বায়তুল মালের প্রকৃতরক্ষী চাষীদের কোন প্রকার অসন্তোষ ও অসদ্ভাবের সৃষ্টি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা।'[১৮৫] নিযামউদ্দিন বলেন, 'তাহার (সুলতানের) সকল বিধির মধ্যে তিনটি অতি চমৎকার। ...দ্বিতীয় বিধিটি এই ছিল যে, তিনি রায়তগণের নিকট হইতে ভূমির উৎপাদিত ফসল অনুযায়ী এবং তাহাদের দিবার ক্ষমতা অনুযায়ী খাজনা আদায় করিতেন।'[১৮৬] সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দু'টি সিদ্ধান্ত নিতে পারি—এক. সুলতান ভূমি রাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে ইসলামি নীতি ও অনুশাসন এর বাইরে যাননি, তা যতো নিম্ন বা উর্ধই হোক, এবং দুই. রায়তের খাজনা প্রদানের সামর্থ্য তাঁর সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। বস্তুত এই সিদ্ধান্তের আলোকে এটা নিশ্চিত বলা যায় যে ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে তাঁর রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার আগাগোড়াই মূলত ১/৫ অংশ ছিল। যুক্তি হিশেবে বলা যায়, প্রথমত এটা ছিল ধর্মানুমোদিত সর্বনিম্ন সীমা; 'তবকাত-ই-আকবরী'র লেখক সুলতানের ধর্মপ্রীতির

১৮১ History and Incidents of Occupancy Right, pp. 41
১৮২ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp.117.
১৮৩ The Government of the Sultanate, pp. 85.
১৮৪ The Agrarian System, pp. 61.
১৮৫ 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী', অনুবাদ গোলাম সামদানী কোরায়শী, পৃষ্ঠা ৪৭৩।
১৮৬ 'তবকাত-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১।

কথা বলতে গিয়ে তাঁর (সুলতানের) ভাষ্যে উদ্ধৃত করেছেন, 'আর আমি স্থির করিয়াছি যে হযরতের (সঃ) প্রবর্তিত আইনের পরিপন্থী এমন কোন রাজস্ব ধার্য করিব না।'[১৮৭] সুতরাং এই সর্বনিম্ন সীমার নীচে ভূমিরাজস্ব ধার্য তাঁর পক্ষে না করাই স্বাভাবিক। অবশ্য ব্যতিক্রমকে এ ক্ষেত্রে আমরা ধরছি না। দ্বিতীয়ত রায়তগণও এই হার মেনে নিয়েছিল বলে মনে হয়। কেননা প্রায় অব্যবহিত পূর্ববর্তী দু'জন প্রবল ক্ষমতাশালী সুলতানের (মুহম্মদ বিন তুগলক ও আলাউদ্দিন খলজি) শাসনাধীনে তাদেরকে এর চেয়েও অনেক বেশি (অর্ধেক বা প্রায় সমপরিমাণ) হারে ভূমিরাজস্ব প্রদান করতে হয়েছিল। ফলে আলোচ্য ক্ষেত্রে ড. কোরেশির সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, 'except for a few well defined areas, which paid the half or single tithe, the general charge on land was a fifth of the produce, which was maintained from the earliest days of the Sultanate until, at least, the end of Firuz Shah's reign; the only exception was 'Ala-ud-din Khalji's special demand of a half. There might, of course, have been variations in some outlying parts of the empire as the result of different local traditions.'[১৮৮] ড. মীরা সিংহ মনে করেন, 'In all probability, it varied from 1/5 to 1/6th but was always less than fifty per cent.'[১৮৯]

যারা মনে করেন, এই আমলে ভূমিরাজস্বের হার $\frac{১}{১০}$ অংশ ছিল তাদের ধারণার বিপক্ষে এই যুক্তিও খাড়া করা যায় যে, '(The) rule of taking one-tenth the produce as Land Revenue was however scarcely followed in India, and the Mahomedan rulers of India realized what they could.'[১৯০] ঐতিহাসিকের এ উক্তি অন্তত সুলতানি যুগের কোনও কোনও শাসকের ক্ষেত্রে সত্য ছিল।

ভূমিরাজস্ব বা খেরাজের হার নিরূপণের ক্ষেত্রে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক যেমন অপেক্ষাকৃত নমনীয় নীতি অনুসরণ করেছিলেন তেমনি তা যাতে সর্বস্তরের ভূম্যধিকারী রায়ত ও জনসাধারণের ওপর প্রযোজ্য হয় সে বিষয়ে সম্পূর্ণ একক ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। অনন্য এই অর্থে যে এই জাতীয় সর্বগামী একক নীতি ইতোপূর্বে হিন্দু বা মুসলিম শাসনামলে আর কোন শাসক অনুসরণ করেছিলেন বলে জানা যায় না। সুলতানের এই অনন্যসাধারণ নীতিটি হলো ভূমিরাজস্ব প্রদানে ধর্মীয় পুরোহিতশ্রেণী তথা ব্রাহ্মণদেরও তিনি এর আওতায় এনেছিলেন। তবে এটি তাদের ওপর 'জিজিয়া'রূপে[১৯১] চাপানো

১৮৭ ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৩।

১৮৮ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp.117-18.

১৮৯ Medieval History of India, pp. 119.

১৯০ Famines and Land Assessments in India, pp. 235.

১৯১ 'জিজিয়া' আরবি শব্দ যার অর্থ কর; মূলত ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অ-মুসলমানদের ওপর আরোপিত মাথাপিছু কর। এর হার মোটামুটি ৩ প্রকারের। এই আমলে 'জিজিয়া' প্রবর্তনের বিস্তারিত প্রেক্ষাপট জানার জন্য দেখুন, 'সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলকের কর-নীতি নির্ধারণের পটভূমি', ড. অসিতকুমার সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, পৃষ্ঠা ১৪৪-১৫০; The Administration

হয়েছিল। এ বিষয়ে যদিও ড. আর. পি. ত্রিপাঠী বলেন, 'Firoz Shah who was religious-minded thought of it seriously and tried to enforce it.'[১৯২] তথাপি আমরা মনে করি ফিরোজের এই ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তনে আদৌ ধর্মবোধ কাজ করেনি, বরং তাঁর নীতির এককতা এবং ন্যায় ও ঔচিত্য বোধ তাঁকে তা চালু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণও এ মত স্বীকার করেছেন। ড. যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেন, 'The fiscal reforms of Firuz Shah provide proof that he wanted to introduce the principle of equity in taxation, for which reason he gave up the old practice of levying land revenue as existed in the days of Muhammad Tughluq. Accordingly he abolished the exemption enjoyed by a community.'[১৯৩]

মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রয়োজনের সময়ে ধর্ম, জাতি ও রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দান করা নীতিগতভাবে সকল মুসলমানের জন্যই বাধ্যতামূলক।[১৯৪] কিন্তু অ-মুসলমানদের বেলায় তা সমভাবে প্রযোজ্য নয়। প্রাথমিক যুগে মুসলিম জনসাধারণ 'খেরাজ' দিতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদেরকে শুধু 'খেরাজ'ই দিতে হয়নি; পরন্তু বরাবরের মতো তৎসহ সম্পন্ন শ্রেণীকে জাকাতও দিতে হতো। বস্তুত এই উভয়বিধ করের আয় থেকে রাষ্ট্র একদিকে যেমন উন্নয়নমূলক কাজ করতো, তেমনি অন্যদিকে তা প্রতিরক্ষাকল্পে তথা সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন এবং সামরিক সরঞ্জাম ক্রয় ও তৈরি ইত্যাদি খাতে ব্যয় হতো। আগেই বলেছি মুসলমানরা এতে সক্রিয়ভাবে অর্থাৎ সশরীরে জড়িত থাকতো। কিন্তু ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে যেহেতু জাকাত আদায় করা হতো না (এর কোন ধর্মীয় নির্দেশও নেই), সৈন্যবাহিনীতে তাদের অন্তর্ভুক্তিও ছিল স্বেচ্ছাধীন, সেহেতু রাষ্ট্রের অপরিহার্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকে এক ধরনের কর আদায় করা হতো। এটিই হলো বহুল আলোচিত 'জিজিয়া' কর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জিজিয়া কোনরূপ ধর্মীয় কর নয়, অন্তত আলোচ্য পর্বে সেই জাতীয় কোন করই প্রচলিত ছিল না। এর প্রমাণ জিজিয়া শুধু যুদ্ধক্ষম পুরুষ অ-মুসলিম স্বাধীন নাগরিকদের ওপর প্রযোজ্য হতো। কোন অ-মুসলিম নারী ও শিশুর ওপর বা শারীরিকভাবে অক্ষম পুরুষের ওপর জিজিয়া আরোপিত হয়েছে এমন নজির আজ পর্যন্ত সুযোগসন্ধানী ঐতিহাসিকরাও দিতে পারেননি। তাই, 'In this context it should be noted that Jizya was not primarily conceived to be a tax on religious conscience, though individual writers, particularly in India, have interpreted it as such. It was a tax which earned exemption from military duty to the State. As non-Muslims could not be employed in the army, they were required to pay a compensation fee. As such it was a fiscal measure

of the Sultanate of Dehli, pp.96-98; History of Firuz Shah Tughluq, pp. 123-25; The Government of the Sultanate, pp. 90-92.

১৯২ Some Aspects, pp. 291.

১৯৩ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 124.

১৯৪ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 96.

rather than a religious levy.'[১৯৫] ব্রাহ্মণরা কোন কালেই এমন কি প্রাচীন হিন্দু যুগেও সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতো না।[১৯৬] অথচ বর্ণ প্রথায় অপর তিন শ্রেণীর ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ছিল না। সত্যি বলতে মুসলিম শাসনামলেও এরা যুদ্ধে যাবার পরিবর্তে জিজিয়া দিতো। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এ থেকে পুরোপুরি মুক্ত ছিল। ফলে এই প্রথম বারের মতো সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক ন্যায় ও সমতার নীতি (Principle of equity in taxation) প্রয়োগ করে তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন। উল্লেখ্য সুলতান তাঁর এই অনন্য নীতির ওপর যে কতো দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন তার প্রমাণ জিজিয়া রহিত করণে ব্রাহ্মণের আবদার-অনুরোধ, এমনকি তাদের একযোগে আত্মহত্যার হুমকি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এদের সামাজিক মর্যাদা ও আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি 'দয়াপরবশ হয়ে' জিজিয়ার হার কিছুটা কমিয়ে দেন[১৯৭] এবং ৬৪ জিতল মূল্যমানের স্থলে ৫০ মূল্যমানের ১০টি তঙ্কা প্রদানের অনুমতি দেন।[১৯৮] তুলনামূলকভাবে এই হার শুধু নিম্নতর-ই ছিল না, অধ্যাপক হোদিভালার মতে তা দরিদ্রদের ওপর ধার্য হারের চেয়েও কম ছিল।[১৯৯]

যা হোক সমতা নীতির প্রয়োগ ছাড়াও ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া আরোপের আরও একটি প্রধান কারণ ছিল বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সুলতান প্রায় ২৫টির মতো অতিরিক্ত কর বা সেস তুলে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে বহু জনকল্যাণমূলক কাজের ভার হাতে নিয়েছিলেন। ফলে নতুন করারোপ দ্বারা রাজকোষে অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি করা তাঁর জন্যে আশু জরুরি ছিল। কিন্তু ভূমিরাজস্বের হার বাড়িয়ে তিনি এই ঘাট্‌তি পূরণ করতে চাননি। কেননা তাতে করভারে কৃষককুলের নিপীড়িত হবার সমূহ সম্ভাবনা ছিল, অথচ তাদেরই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য, 'he took special interest'[২০০] সুতরাং, 'the Sultan did not like the idea,...The only remedy which probably appealed to him was the imposition of Jizya upon the Brahmanas which, though it might not have yielded a large income, yet added something to the revenue of the State.'[২০১] সুলতান ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া ধার্য করেছিলেন বটে, তবে এ দ্বারা অ-মুসলিম বিশেষ করে হিন্দু জনসাধারণ যে নিপীড়িত হননি তা ড. উপেন্দ্রনাথ দে-র বক্তব্য থেকে অনুমান করা যায়। ড. দে বলেন, 'Women and children below fourteen and slaves were exempted from this tax; blind men, cripples and lunatics paid only when they were wealthy.'[২০২]

১৯৫ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 124.
১৯৬ ড. অসিতকুমার সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, পৃষ্ঠা ১৪৭।
১৯৭ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 124.
১৯৮ ইতিহাস অনুসন্ধান-৩.,পৃষ্ঠা ১৪৮।
১৯৯ Studies in Indo-Muslim History, pp. 336-37; সংগৃহীত ইতিহাস অনুসন্ধান-৩, পৃষ্ঠা ১৫১।
২০০ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 125.
২০১ Ibid,. pp. 125.
২০২ The Government of the Sultanate, pp. 92.

আলোচ্য যুগে ভূমিরাজস্ব কি পদ্ধতিতে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হতো তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। তবে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ধারণা করেন ভূমিরাজস্ব সচরাচর নগদ অর্থে গৃহীত হতো।[২০৩] আবার সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলে অর্ধেক উৎপন্ন শস্যে এবং বাকি অর্ধেক নগদে প্রদানের রেওয়াজও চালু ছিল। ড. কোরেশি বলেন, 'Firuz Shah persuaded peasants in certain areas to pay a half of the demand in cash and the other half in kind.'[২০৪] শেষোক্ত ক্ষেত্রে ফিরোজশাহ্ রায়তদের সামান্য ছাড় বা রেয়াত দিয়েছিলেন, যেমন প্রতি তঙ্কায় তারা ২ জিতল কম দিতে পারতো। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে প্রজার ফসল উৎপাদন কম বা হানি হলে সেক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব আদায়কারীগণ যাতে তা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে এবং অতিরিক্ত করের জন্য অহেতুক জোরজবরদস্তি ও ক্রুরতা প্রদর্শন থেকে বিরত থাকে, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২০৫]

ভূমিরাজস্ব নিরূপণেও সুলতান অপেক্ষাকৃত নমনীয় নীতি অবলম্বন করেছিলেন। তিনি জানতেন যে সম্রাট আলাউদ্দিনের সময়কার ভূমি জরিপ পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠোর; এতে কোন কারণে রায়তের ফসল নষ্ট কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারি রেয়াতের পরিমাণ ছিল খুবই সীমিত ক্ষেত্রে এবং অল্প পরিমাণে। অন্যদিকে মুহম্মদ বিন তুগলকের প্রায় একই পদ্ধতি যথেষ্ট পরিকল্পনার অভাবে সফল হতে পারেনি। ফলে মধ্যবর্তী একটি পন্থা অবলম্বনই ছিল তাঁর অভীষ্ট। আর তাই অনেক ভেবে-চিন্তে সুলতান অবশেষে সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের প্রকৃত উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় পাওনা নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করেন—'In the collection of revenue Firoz reverted back to the policy of Ghayasuddin.'[২০৬] সুতরাং দেখা যায় ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তা আদায় করণে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক এমন এক নীতি গ্রহণ করেছিলেন সমকালীন আর্থ-বাস্তবতার প্রেক্ষিতে যার প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল প্রজার পক্ষে অনুকূল। কৃষকরা ছিল তাঁর কাছে সরকারি খাজাঞ্চিখানার খাজাঞ্চি; তাই কৃষি ও ভূমিরাজস্ব নীতি প্রণয়নে তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে যথেষ্ট চিন্তাভাবনাপ্রসূত পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। ড. সৈয়দ মইনুল হক বলেন, 'The Sultan (Firuz Shah Tughluq) was very particular about assessment and collection of revenue and provided all possible facilities to the cultivators because their prosperity alone could increase the revenue of the State.'[২০৭]

২০৩ History of Firuz Shah Tughluq, pp.118.
২০৪ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 110.
২০৫ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 118.
২০৬ Some Aspects, pp.285; The Agrarian System, pp.54; History of Firuz Shah Tughluq, pp.117.
২০৭ A Short History of the Sultanate of Delhi. pp. 145.

সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলক ছিলেন তাঁর সময় পর্যন্ত দিল্লির সর্বাপেক্ষা অধিক প্রজারঞ্জক ও জনদরদী উজ্জ্বল শাসকদের শীর্ষস্থানীয়। জিয়া বারানি তাঁর সম্পর্কে বলেন, 'সুলতান মুইযউদ্দিন মুহম্মদের পরে দিল্লির তখ্তে সুলতান ফিরুজশাহের সমতুল্য অন্য কোন বাদশাহ্ উপবেশন করেন নাই।'[২০৮] ঐতিহাসিকের এ উক্তি সুলতানের ভূমিরাজস্ব নীতির ক্ষেত্রে সত্য ছিল। বস্তুত প্রজাদের কোন অংশকেই ক্ষতিগ্রস্ত না করে বরঞ্চ যে কোন প্রকারে তাদের উপকার করাই ছিল তাঁর ব্রত। সুলতানের নিজের উক্তিতেই তাঁর এই মহতী লক্ষ্য উদ্ভাসিত। তিনি বলেন :[২০৯]

"বিপুল ধনরত্ন অপেক্ষা বন্ধুর শান্ত হৃদয় ঢের ভালো,
মানুষকে দুঃখে নিপতিত করার চেয়ে শূন্য কোষ ভালো।"

ফিরোজশাহ তাই একদিকে যেমন প্রচলিত ভূমিরাজস্বের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করেছিলেন, ২৫ বা ততোধিক সেস বাতিল করেন, ভূমিরাজস্ব নিরূপণে ও আদায় প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত নমনীয় পন্থা অনুসরণ করেন, তেমনি অন্যদিকে অবস্থাসম্পন্ন রায়তদের তিনি আরও কিছু অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেছিলেন। এগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণের নীতি অর্থাৎ পূর্ববর্তী সুলতানদের সময়ে যে সব উচ্চশ্রেণীর লোকদের ভূ-সম্পত্তি, বিশেষত জায়গির বিভিন্ন কারণে বাতিল করে রাষ্ট্রের তথা 'খালিশা'র অধিভুক্ত করা হয়েছিল তিনি সেগুলি সাবেক ভূম্যধিকারী ও জায়গিরদার বা তাদের উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেন। এই সঙ্গে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিশেষ করে মসজিদ ও খানকাহ-দরগাহ এবং শেখ ও উলামাশ্রেণীকে প্রদত্ত দান যার অধিকাংশই আলাউদ্দিনের সময়ে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলে গিয়েছিল এবং যে ধারা মুহম্মদ বিন তুগলকও অব্যাহত রেখেছিলেন, সেগুলিও তিনি মূল গ্রহীতা বা তাদের জীবিত উত্তরসূরীদের মধ্যে পুনঃবণ্টন করে দিয়েছিলেন।[২১০] বারানির ভাষ্য থেকে জানা যায় সুলতান ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ নীতির আলোকে প্রায় ১৭০ বছর পূর্বেকার (দিল্লির সালতানাতের শুরুরও আগের) ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন।[২১১] এ বিষয়ে W. H. Moreland[২১২] একটি চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'In this reign,....we come within measurable distance of the idea of a proprietary right in Grants; but the idea was not destined to develop, and in the Mogul period the

২০৮ *'তারিখ-ই-ফিরুজশাহী'*, পৃষ্ঠা ৪৫৬।

২০৯ ড. যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'History of FiruzShah Tughluq'-এ (পৃষ্ঠা ১২২) এর অনুবাদ পাই :
"To compose the hearts of friends is better than a store of wealth.
To have empty treasure is better than draining the people to affliction."

২১০ Some Aspects, pp. 283.

২১১ The Agrarian System, pp. 58.

২১২ Ibid., pp. 58.

practice of arbitrary resumption was well established.'[২১৩] সুলতানের এই নীতি যে একটি অত্যন্ত মহৎ ও দুঃসাহসিক উদ্যোগ ছিল তা বলাইবাহুল্য। কেননা অতীতে এতো ব্যাপকভাবে ভূ-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ও হস্তান্তর ভারতীয় কোন হিন্দু বা মুসলিম শাসক করেননি। এর ফলে ভূমিরাজস্ব থেকে সরকারের প্রত্যক্ষ আয় অনেকখানি কমে গিয়েছিল। তা সত্ত্বেও সুলতান এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন এবং সত্যি বলতে এর সুদূরপ্রসারী ফলও হয়েছিল তাঁর জন্য অনুকূল। ড. যামিনীমোহন যথার্থই বলেন, 'All these liberal measures greatly satisfied the officials.'[২১৪] 'as well as the grantees or their heirs.' সমাজের উঁচু ও প্রভাবশালী শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রাখা যে কোন শাসকের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ ও শ্লাঘার বিষয়। ফিরোজশাহ এই কৃতিত্বের দাবিদার।

সুলতান ভূমিরাজস্ব প্রশাসনযন্ত্রের চিরাচরিত দুর্নীতির দায় থেকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখতে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে একদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর থেকে প্রশাসনিক চাপ কমানো এবং অপরদিকে আমির-ওমরাহকুলের মনস্তুষ্টি ও আস্থা অর্জনের জন্য তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে বহুসংখ্যক ছোট-বড় ইক্তা'য় বিভক্ত করেন। সেই সঙ্গে 'ইজারা' ব্যবস্থাও চালু রাখেন। এই আমলে 'ইক্তা' ও 'ইজারা'র মধ্যে পার্থক্য ছিল খুবই সীমিত দাগের। কারণ ইক্তা ব্যবস্থার মূল দর্শনই হলো, 'farming and assignment.'[২১৫] ড. ইরফান হবিব ইক্তা'র এক কথায় সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, 'The iqta was a territorial assignment and its holder was designated muqti.'[২১৬] প্রাক-মধ্যযুগের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল প্রদেশ ও জায়গির হিশেবে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন শ্রেণীর ইক্তা'য় বিভক্ত করা। 'মুক্তি' বা 'ইক্তাদার'-কে কখনও প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শাসনকর্তা এবং কখনও জায়গিরদাররূপে নিযুক্ত করা হতো। এরা প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থ ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর বাবদ দিতো[২১৭], আবার কোনও কোনও সময় সুলতান অঞ্চল বিশেষকে সর্বোচ্চ ডাকের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য 'ইজারা' দিতেন।[২১৮] সুলতান ফিরোজশাহ এই উভয় ব্যবস্থা শুধু নতুন ও জোরদার করেই চালু করেননি, বরং বলা যায় এর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ভূমিই তিনি পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে দিয়ে ফেলেছিলেন। এতে অবশ্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের ওপর ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের চাপ কমে ছিল সত্য, কিন্তু একটি অন্তঃশীলা চোরা প্রবাহের মতো মারাত্মক ক্ষতও ভিতোরে ভিতোরে সৃষ্টি হচ্ছিলো। কারণ সরাসরি ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পূর্বে যেমন সরকার তথা সুলতানের সঙ্গে রায়তের যোগসূত্র গড়ে উঠতো এবং অটুট থাকতো প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ, ইক্তা ও ইজারা

২১৩ The Agrarian System., pp. 58.
২১৪ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 115.
২১৫ Ibid., pp. 115.
২১৬ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 68.
২১৭ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 115.
২১৮ Ibid., pp. 116.

ব্যবস্থায় তার অনেকখানিই চলে যায় মুক্তি ও ইজারাদারদের কব্জায়। নিঃসন্দেহে এটি তাদেরকে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিশেবে গড়ে তুলেছিল এবং ভবিষ্যতে ফিরোজের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের চাপে রাখতে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি যুগিয়েছিল। ড. মইনুল হক ঠিকই বলেছেন, 'The existence of big and influential fief-holders ultimately leads to the development of disintegrating tendencies as did actually happen in the case of the Tughluq Empire under the weak successors of Firuz.'[২১৯]

ইক্তা ও ইজারা প্রথার পাশাপাশি সুলতান সৈন্যদের মধ্যে একদা প্রচলিত গ্রাম বণ্টন প্রথাও পুনঃচালু করেন।[২২০] এই গ্রাম বণ্টন ব্যবস্থা সম্পর্কে সমকালীন ইতিহাস-গ্রন্থাদিতে বিশদ কিছু পাওয়া যায় না। সম্ভবত এটি যে সমস্ত সৈন্যদের বেতন-ভাতা নগদ অর্থে দেয়া হতো না তাদেরই বরাদ্দ করা হতো। যা হোক, এখানে এই সামগ্রিক ব্যবস্থার একটি প্রত্যক্ষ কুফলের কথা বলা যায়। বস্তুত এতে স্থানীয় পর্যায়ে ইক্তা ও জায়গিরদারির নিজস্ব ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অনাচার কিছুটা বেড়েছিল। প্রথমত এই প্রথায় ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের হাতে না থাকায় স্থানীয় কর্মচারীদের ওপর কেন্দ্রের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের অভাবে রায়তগণ কোন প্রকার প্রয়োজনে তাৎক্ষণিক প্রতিকার পেতো না; ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলে নিম্নস্তরের কর্মচারীরাও কখনও কখনও লাগামহীন অশ্বের মতো হয়ে পড়তো। দ্বিতীয়ত ইক্তাদার-ইজারাদার-জায়গিরদারদেরকে যেহেতু অনেক সময় নির্দিষ্ট কাল-পর্বের জন্য উচ্চ মূল্যে ভূস্বত্ব-নিলাম খরিদ করতে হতো, সেহেতু তারাও চাইতো এই সময়সীমার মধ্যে পর্যাপ্ত ভূমিরাজস্ব আয় করে নিতে। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে এই দুর্নীতি-অনাচারের বিশেষ ব্যাপকতা ছিল না। কারণ হিশেবে 'তবকাত-ই-আকবরী'র লেখকের ভাষায় বলা যায়, 'সাম্রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান ও শাসন করিবার জন্য তিনি (ফিরোয শাহ্) সৎ এবং বিশ্বাসী ও আল্লাহর ভয়ে ভীত অফিসার নিয়োগ করিতেন; আর কখনও কোন দুষ্ট প্রকৃতির ও শয়তান লোককে তাহার চাকুরীতে গ্রহণ করিতেন না এবং কখনও এরূপ কোন লোককে গভর্ণর বা আমীর পদে উন্নীত করেন নাই।'[২২১] সুতরাং যে দুর্নীতি ছিল তা একান্তই চিরাচরিত, তবে খুবই সীমিত পরিসরে। দুর্নীতির মহামারী ও প্রশাসনিক জটিলতা থেকে উদ্ভূত কৃষক হয়রানি (মুহম্মদ বিন তুগলকের সময়কার অবস্থা স্মর্তব্য) যে এই আমলে প্রবলভাবে হ্রাস পেয়েছিল তার আর একটি বড় প্রমাণ অব্যবহিত পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলকের রাজত্বকালে কৃষক অসন্তোষ ও প্রজা বিদ্রোহ প্রায় ছিল-ই না বলা চলে।

২১৯ A Short History of the Sultanate of Delhi, pp. 145.

২২০ The Agrarian System, pp. 55; স্মর্তব্য যে আলাউদ্দিন সৈন্যদের মধ্যে জায়গির ব্যবস্থা প্রায় উঠিয়ে দিয়ে তাদের বেতন-ভাতা নগদ অর্থে প্রদান চালু করেছিলেন।

২২১ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮১।

এ পর্যায়ে সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলকের কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও সুদূরপ্রসারী কৃতির কথা আলোচনা করবো। এটি হলো শুষ্ক অঞ্চলে প্রধানত কৃষি কাজে পানি সরবরাহের আধারস্বরূপ খাল ও জলাশয় খনন, প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে শস্য-ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে পূর্বের মতো ঋণ প্রদান ও উন্নত মানের শস্যবীজ সরকারিভাবে সরবরাহ করার ব্যবস্থা গ্রহণ। বলাবাহুল্য, এগুলি ছিল একজন মধ্যযুগীয় শাসকের জন্যে প্রজা-কল্যাণে সর্বাপেক্ষা উদার ও ব্যয়বহুল পদক্ষেপ; পূর্ববর্তী ভারতীয় মুসলিম সুলতানগণ বিশেষ করে সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, গিয়াসউদ্দিন তুগলক ও মুহম্মদ বিন তুগলক প্রমুখের সময়ে এর প্রচলন থাকলেও এই আমলের মতো তা ব্যাপক-বিশাল ছিল না। সত্যি বলতে তাঁর এই বিস্তৃত পদক্ষেপগুলি সমকালীন এবং আধুনিক—উভয় যুগের ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। এখানে দু'জন প্রখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিকের এ সম্পর্কিত মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। ড. আর.পি. ত্রিপাঠী বলেন, 'The most important and abiding contribution of Firoz Shah,..., was the policy of opening canals and irrigating those parts of the eastern Punjab where cultivation was not possible for want of water.....He took great delight and keen personal interest in canals and made it an important part of his policy....The advantages of such a wise policy were soon visible.'[২২২] ড. যামিনী মোহন বলেন, 'The most remarkable contribution of Firuz that gave a filip to agriculture was the scheme of artificial irrigation in which the excavation of canals, occupied an important place.'[২২৩] খাজা নিযামউদ্দিন আহমদের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় তিনি এই বিশাল প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৫০টি জলপথ ও খাল, ১০০টি জলাশয় ও ১৫০টি কূপ খনন করেছিলেন।[২২৪] এ ছাড়া জনসাধারণকেও তিনি খাল খননের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।[২২৫] বস্তুত জলপথ ও জলাশয় প্রভৃতি খননের ফলে একদিকে যেমন সাম্রাজ্যের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ সুগম হয়েছিল তেমনি যে সব এলাকায় আগে পানির অভাবে কৃষিকাজ অসম্ভব ছিল, সেখানে পানি সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় চাষাবাদ শুরু হয় এবং অত্যল্পকালের মধ্যে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়। এক দোয়াব অঞ্চলেই ৫২টিরও অধিক কৃষি-উপনিবেশ গড়ে ওঠে[২২৬] এবং গ্রামের জনসাধারণের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায়।[২২৭] ফলত চাষাবাদের

২২২ Some Aspects, pp. 286.
২২৩ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 118.
২২৪ 'তবকাত-ই-আকবরী', ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৪; এ ছাড়াও তিনি আরও প্রচুর জনহিতকর কাজ করেছিলেন। যেমন, ৪০টি মসজিদ, ৩০টি কলেজ, ২০টি ফকিরাবাস, ছোট-বড় ১০০টি প্রাসাদ, ২০০টি সরাইখানা, ৩০টি শহর, ৫টি হাসপাতাল, ১০০টি স্মৃতিসৌধ, ১০টি গণ-স্নানাগার, ১০টি মিনার, ১৫০টি সেতু, অসংখ্য উদ্যান প্রতিষ্ঠা। (সূত্র, ঐ, পৃষ্ঠা ২৮৪)।
২২৫ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 127.
২২৬ Some Aspects, pp. 286.
২২৭ The Agrarian System, pp. 59.

সম্প্রসারণ ঘটায় এবং সেচ সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায়[২২৮] *গতানুগতিক ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত* $\frac{১}{১০}$ *হারে জল বা সেচ কর ('হাক-ই-শরব' নামে পরিচিত ছিল) প্রযুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই* রাজকোষের আয় বেড়েছিল, যদিও এই আয়ের (প্রায় ২ লক্ষ তঙ্কা[২২৯]) কিছু অংশ সুলতানের ব্যক্তিগত খাতে ('privy purse')[২৩০] এবং অবশিষ্ট বৃহত্তরাংশই ধর্মীয়[২৩১] ও জ্ঞানী-গুণীর হিতৈষণায়[২৩২] ব্যয়িত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে উত্তর ভারতে ব্যাপক সংখ্যায় খাল, জলাশয়, কূপ প্রভৃতি খননের একটি পরোক্ষ কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফল ছিল ভবিষ্যতে এই সকল অঞ্চলে প্রায় স্থায়ীভাবে দুর্ভিক্ষ রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। মুহম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে আমরা দেখেছি যে কিছুটা তাঁর ভ্রান্ত নীতির ফলে এবং প্রধানত প্রাকৃতিক কারণে প্রতি বছরই সাম্রাজ্যের এই সব অঞ্চলের কোথাও-না-কোথাও দুর্ভিক্ষ নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ফিরোজশাহের সময়ে উপরিউক্ত কর্মসূচির কারণে তা অনেক কমে যায়। বলা যায় এই প্রথমবারের মতো অন্তত দুর্ভিক্ষ, খরা, অনাবৃষ্টি মোকাবিলার জন্যে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবহারযোগ্য প্রাকৃতিক অস্ত্র সালতানাতের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই স্বীকার করায় দোষ নেই যে, 'The idea of opening canals was a most important contribution to the methods of fighting famines.'[২৩৩] সুলতান খননকৃত খাল, জলাশয় প্রভৃতির সুষ্ঠু এবং নিয়মিত তদারকির জন্যও লোক—'পরিচালক ও ভৃত্য' নিয়োগ করেছিলেন।[২৩৪]

ভূমিরাজস্ব ও কৃষি-নীতির বাস্তবায়নে ফিরোজশাহের সর্বশেষ প্রশংসনীয় উদ্যোগ হলো অঞ্চলভিত্তিক শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষকদের মধ্যে উন্নতমানের শস্যবীজ বিতরণ। যতোদূর জানা যায় এই প্রকল্পের অধীনে সরকারি খামারগুলোতে পর্যাপ্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উচ্চ ফলনশীল শস্যবীজ উৎপাদন করা হতো। পরে তা উপযোগী অঞ্চল চিহ্নিত করে সেখানকার কৃষকদের মাঝে সরবরাহ করা হতো।[২৩৫]

উপসংহারে এটুকু বলে আমরা এ আলোচনা শেষ করবো যে, পূর্ববর্তী সুলতানদের মতো ফিরোজশাহ্ তুগলকের শাসনকাল যদিও নতুন নতুন রাজ্য বিজয় দ্বারা গৌরবমণ্ডিত

২২৮ বর্তমান ভারতের প্রধানত হরিয়ানা অঞ্চলেই 'হাক-ই-শরব' সীমাবদ্ধ ছিল। (The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 67).
২২৯ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 120.
২৩০ Ibid., pp. 120
২৩১ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp.127.
২৩২ History of Firuz Shah Tughlug, pp. 120.
২৩৩ Some Aspects, pp.288.
২৩৪ 'তবকাত-ই-আকবরী', ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৪; The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 127.
২৩৫ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 118.

হয়নি[২৩৬], প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক স্তরে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিলতা ও প্রচুর সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ফলে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে স্থানীয় আমলাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল[২৩৭], তা সত্ত্বেও এটা স্বীকার্য যে, মধ্যযুগের প্রচণ্ড একনায়কতান্ত্রিক শাসন-কাঠামোর ভিতোরে অবস্থান করেও সুলতান ফিরোজশাহ্ প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার গতানুগতিকতা পরিহার করে তাতে একটি নতুন জীবনীশক্তি দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ড. যামিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এর ভাষায় বলা যায়, 'Firuz Shah recognized the revenue department on a new pattern by introducing a series of benevolent reforms which aimed at the welfare of the agriculturists, and increased production of the State.'[২৩৮] ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে তাঁর এই নতুন ব্যবস্থা সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের শাসনের দুঃস্বপ্ন থেকে প্রজাসাধারণ বিশেষত দোয়াবের কৃষককুলকে অন্তত মুক্তি দিয়েছিল, তা বলাইবাহুল্য।

সম্রাট শেরশাহ্ (১৫৩৯-১৫৪৫)

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলকের মতোই এক স্বল্পকালস্থায়ী শাসন-ঐতিহ্যের অধিকারী সম্রাট শেরশাহ্। মাত্র পাঁচ বছরে রাজ্যবিস্তারের পাশাপাশি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাসহ সমগ্র প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় যে অভূতপূর্ব বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা এবং দেশব্যাপী শান্তি ও সমৃদ্ধির যে চমৎকার সমন্বয় সাধন তিনি করেছিলেন, তার নজির ভারতেতিহাসে নেই বলা চলে। শেরশাহের প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ. জে. কীনি সপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন, 'No Government—not even the British has shown so much wisdom as this pathan (SherShah)'[২৩৯] দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে পিতার অধীনে সাসারামের জায়গির চালানোর সময়ে প্রশাসন পরিচালনার যে বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন তাঁর হয়েছিল সেটাই তিনি পরবর্তীকালে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে পুরোপুরি কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা যায় তিনিই ছিলেন, 'the only sovereign who is known to have gained practical experience in managing a small body of peasants before rising to the throne of a peasant kingdom.'[২৪০]

২৩৬ 'His reign was barren in the field of victories..'., The Government of the Sultanate, pp. 90.
২৩৭ 'His reign was undoubtedly a golden age for the bureaucracy...', The Agrarian System, pp. 53.
২৩৮ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 114.
২৩৯ Quoted from 'Mughal Rule in India', Dr. V. D. Mahajan, pp. 58.
২৪০ The Agrarian System, pp. 74.

এটা ঠিক, তাঁর আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে সব প্রথাপদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল তার অধিকাংশেরই উদ্গাতা তিনি ছিলেন না, তথাপি এটাও অনস্বীকার্য যে, পূর্ববর্তী শাসককুলের তুলনায় শেরশাহ-ই ছিলেন এগুলির প্রথম সফল প্রয়োগকারী, এবং তুলনায় যুগপৎ জনপ্রিয়ও বটে। প্রসঙ্গত স্মর্তব্য সম্রাট আলাউদ্দিন খলজির সময়ে তাঁর অনুসৃত রাজস্ব ব্যবস্থাদি অত্যন্ত কঠোর ও সফলতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হতো, কিন্তু তিনি নিজে তেমন জনপ্রিয় ছিলেন না। অন্যদিকে সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক যে তুলনায় লোকপ্রিয় ছিলেন, সেই হারে তাঁর ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত শিথিল। মুহম্মদ বিন তুগলক সফল ও জনপ্রিয়—কোনটাই ছিলেন না। কিন্তু মধ্যযুগে সর্বপ্রথম শেরশাহের রাজত্বকালেই আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি একটি সুশৃঙ্খল ভূমিরাজস্ব প্রশাসন-অবকাঠামো, তার সফল কর্মকাণ্ড ও গতিশীলতা এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তথা সম্রাটের জনপ্রিয়তা সমান্তরালভাবে অগ্রসর হয়েছে। যা হোক এখন আমরা এই আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় যে সমস্ত বিধিবিধান ও পন্থা গৃহীত হয়েছিল সেগুলি নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করবো।

শেরশাহ ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দে মোগল সম্রাট হুমায়ুনের প্রতিনিধি (গভর্নর) জাহাঙ্গির কুলি বেগকে পরাজিত করে গৌড় অধিকার করেন। অতঃপর ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে কনৌজের যুদ্ধে স্বয়ং হুমায়ুনকে পরাস্ত করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে বাংলায় স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। উল্লেখ্য তিনি সমগ্র বাংলা ভূখণ্ড অধিকার করতে পেরেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম বলেন, 'চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ শেরশাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।'[২৪১] অন্যদিকে ড. আবদুল করিমের মতে, চট্টগ্রাম তাঁর অধিক্ষেত্রের বাইরে ছিল।[২৪২] যা হোক, বাংলার ভূ-প্রকৃতি ও জল-বায়ু, অসংখ্য নদনদী, দিল্লি থেকে বহু দূরে সাম্রাজ্যের প্রায় এক কোণে এর ভৌগোলিক অবস্থান এবং সর্বোপরি এই অঞ্চলে কেন্দ্রের প্রতিনিধি-গভর্নরগণের গতানুগতিক বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তৃত অবগত হয়ে সম্রাট বাংলাকে একক কোন শাসনকর্তার অধীনে রাখা অসমীচীন মনে করেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাংলা মুল্লুক একক কোন শাসনকর্তার অধীনে থাকলে প্রভূত সমৃদ্ধিশালী এই প্রদেশ যতো সহজে ও প্রায় বিনা বাধায় দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করতে পারবে, তার চেয়েও অধিক অসম্ভব হবে সেই বিদ্রোহ দমনে যথাসময়ে সৈন্য প্রেরণ ও তজ্জনিত বিপুল ব্যয় বহন করা। তাছাড়া এই সময়ে বাংলার সীমানাও পূর্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুলতান মাহমুদ শাহের (১৫৩৩-১৫৩৮) রাজত্বকালে বিহারের ভাগলপুর, মুঙ্গের ও হাজিপুরসহ বিস্তীর্ণ এলাকা বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেরশাহ বিহারের এই এলাকাগুলো ভাগ করে নেন এবং বাংলার পশ্চিম সীমানা নতুনভাবে তেলিয়াগড় পর্যন্ত প্রসারিত করেন।[২৪৩]

---

২৪১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহীম, চৌধুরী, মাহমুদ ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৪৪।
২৪২ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৭৬।
২৪৩ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৭৬।

প্রকৃতপক্ষে তিনি খিজির খানের বিদ্রোহের পর বাংলাকে কয়েকটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটিতে সমমর্যাদাসম্পন্ন কিন্তু একে-অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত-প্রকৃতির গভর্নর নিযুক্ত করেন। এই গভর্নরদের দায়বদ্ধতা ছিল সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকার তথা সম্রাটের কাছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক চার্লস স্টুয়ার্ট বলেন যে, শেরশাহের আগে আর কোন শাসক বঙ্গরাজ্য নানা ভাগে নানা জেলায় বিভক্ত করেছিলেন বলে শোনা যায় না।[২৪৪] প্রাচীন যুগে হিন্দু আমলে ভারতে ও বাংলায় বিভিন্ন শাসকের সময়ে সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত করা হতো, এমন কি নিকট অতীতে তুগলক সুলতানদের শাসনামলে সমগ্র বাংলাকে তিনটি বৃহত্তর প্রশাসনিক প্রদেশে বিভক্তির নজির থাকা সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে, শেরশাহের সময়ে সর্বাপেক্ষা কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা-বিভক্তিকরণের মধ্য দিয়ে এই প্রদেশগুলির সৃষ্টি ও এর দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম পরিচালিত হতো। তাই যে কোন বিচারেই এই পুনর্গঠিত ব্যবস্থা ছিল শেরশাহের অতুলনীয় প্রশাসনিক দূরদর্শিতার এক অনন্য প্রমাণ। আধুনিক ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'এই নীতির দ্বারা শেরশাহ দিল্লী সাম্রাজ্যের এক অতি পুরাতন সমস্যার সমাধান করেন। বাংলার গবর্নরেরা প্রায় দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতেন, কারণ রাজধানী হইতে অনেক দূরে এবং সম্রাটের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া বাংলার গবর্নরেরা শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেন এবং সুযোগ বুঝিয়া বিদ্রোহ করিতে পারিতেন। এখন শেরশাহ সেই শক্তি খর্ব করিলেন। ছোট ছোট এলাকার শাসনকর্তারা এককভাবে বিদ্রোহ করার মতো শক্তির অধিকারী ছিলেন না এবং সকলে মিলিয়া যে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবেন তাহার সম্ভাবনাও কম ছিল। কেহ বিদ্রোহাত্মক মনোভাব পোষণ করিলে অন্যেরা সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আশায় তাহাকে ধরাইয়া দিবার সম্ভাবনাই ছিল বেশী।'[২৪৫] শেরশাহের এই ব্যবস্থাকে পরবর্তীকালে ভারতে বৃটিশ শাসকশ্রেণীর বহুলকথিত 'ভাগ করো এবং শাসন করো' (Divide and rule) নীতির সঙ্গে অনায়াসে তুলনা করা যায়। বণিক থেকে রাজদণ্ডধারীরা যে বিচক্ষণ শেরশাহের এই নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়নি, তার-ই বা নিশ্চয়তা কী!

শেরশাহ বাংলাকে মোট কয়টি প্রশাসনিক ইউনিট বা অঞ্চলে ভাগ করেছিলেন তার ঠিক কোন সংখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সমসাময়িক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আব্বাস শেরওয়ানির সূত্রে ও আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'র অনুসরণে ড. করিম ধারণা করেন এগুলির সংখ্যা ১৯টির মতো হতে পারে।[২৪৬] অবশ্য শাসনতান্ত্রিক সুবিধার্থে সম্রাট যে শুধু বাংলাকেই খণ্ড খণ্ড করেছিলেন তাই নয়, উপরন্তু, 'Sher Shah divided his territory into hundreds, in each of which were local officers whose task it

২৪৪ দেখুন, 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ', ১ম খণ্ড, সুধীরকুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ১৫৭।
২৪৫ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৭৭-৭৮।
২৪৬ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৭৭।

was to mediate between the people and the officers of the Crown.'[২৪৭] বিভিন্ন সময়ের যুগোপযোগী সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসলে, 'This system (Land Revenue Policy) is in vogue in India today.'[২৪৮]

সর্বমোট ১৯টি বা প্রায় সমসংখ্যক প্রশাসনিক বিভাগ বা 'সরকারে' বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ায় শেরশাহের পক্ষে একদিকে যেমন প্রদেশে ভবিষ্যতে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দূর করা সম্ভব হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে কেন্দ্র থেকে এতদঞ্চলে একটি একক ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থা অনুসরণ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ প্রতিটি শাসন-ইউনিটে তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হওয়ায় কেন্দ্রীয় যে কোন আদেশ-নির্দেশ তাতে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ পূর্বাপেক্ষা অনেক গুণে বেড়েছিল। স্থানীয় শাসনকর্তারাও মূলত চাইতো সম্রাটের তথা দিল্লির নিয়মনীতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে সম্রাটের অধিক প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন হতে। শেরশাহের সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য সর্বনিম্ন ইউনিট ছিল 'পরগণা', যা ছোট-বড় বেশকিছু গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হতো। কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত হতো 'সরকার' ও একাধিক সরকার নিয়ে 'প্রদেশ' বা মুল্লুক। এগুলির পাশাপাশি মধ্যযুগের প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ হিশেবে প্রচলিত জায়গির ব্যবস্থাকেও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। অবশ্য জায়গির প্রথার প্রতি তাঁর কিছুটা দুর্বলতাও ছিল। কেননা আযৌবন তিনি এই ব্যবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠে ছিলেন এবং নিজেও কিছুকাল এর প্রত্যক্ষ ভোগদখলকারী ছিলেন। তাই তিনি এটা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, বিদ্যমান অবস্থায় মোগল শক্তিসহ নানারূপ অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শত্রুর মোকাবিলা করে অত্যল্পকালের মধ্যে প্রজাসাধারণকে একটি গ্রহণযোগ্য ও জনকল্যাণধর্মী শাসন ব্যবস্থা উপহার দিতে গেলে জায়গির প্রথা বিলুপ্ত করা উচিত হবে না। বরং সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো ব্যাপক হারে জায়গির বিলুপ্ত করে এগুলির অধিকারীদেরকে সাম্রাজ্যের নীরব শত্রু না বানিয়ে, এদেরকে আঞ্চলিক স্তরে শাসন ক্ষমতার অংশীদার করে প্রয়োজনে তাদের থেকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করাই তাঁর কাছে অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছিল। তবে তিনি জায়গিরগুলির ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন।

এই আমলে ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৪}$ অংশ।[২৪৯] অবশ্য কোনও কোনও আধুনিক ঐতিহাসিক এর পরিমাণ $\frac{১}{৩}$ অংশ বলেও মত প্রকাশ করেছেন।[২৫০] তবে

২৪৭ Commercial Policy of the Moguls, Dr. D. Pant, pp. 27; শেরশাহের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য বিভক্তি ছিল মূলত জমিদারি কেন্দ্রিক। সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন জমিদারিকে ঘিরেই বাংলায় পাঠানদের দ্বিতীয় আবাসভূমি গড়ে উঠুক। ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেন, 'Sher created more Zamindaris to make Bengal a second home for the Pathans.' (Sher Shah and His Times, pp. 309)

২৪৮ Ibid., pp. 27.

২৪৯ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম, পৃষ্ঠা ১০৭; Report of the Land Revenue Commission : Bengal, Vol. I., pp.9; Mughal Rule in India, S.M.Edwardes & H.L.O. Garrett, pp. 160; The Administration of the

এ কথা ঠিক যে মধ্যযুগে বিশেষ করে সুলতানি যুগের বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্যই যেহেতু পাওয়া যায় না তাই এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছান যায় না।[২৫১] তথাপি পর্যালোচ্য সময়ে ভূমিরাজস্বের হার মোটামুটি এক-চতুর্থাংশই ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

এক. ফিরোজশাহ্ তুগলকের পরে শেরশাহ্-ই ছিলেন এই পর্বের দিল্লির প্রথম কৃষক দরদী শাসক এবং অবশ্যই 'He was, in truth, one of the greatest rulers who ever sat upon the throne of Delhi. No other, from Aibak to Aurangzeb, possessed such intimate knowledge of the details of administration, or was able to examine and control public business so minutely and effectively as he.'[২৫২] সাসারামের জায়গির পরিচালনাকালে তিনি রায়তদের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ফলে অধ্যাপক এস. এম. জাফফারের ভাষায় বলা যায়, 'As an astute manager of the estate of his father, Sher Shah had realised at an early date that the stability of his empire depended upon the happiness of the agriculturists. He had also understood that the traditional methods of the hereditary revenue officers deprived the State of a large amount of its dues.'[২৫৩] স্বভাবতই শেরশাহ্ চাইতেন প্রজাসাধারণ বিশেষত কৃষককুলকে অতিরিক্ত চাপ না দিয়ে রাজ্য পরিচালনার প্রয়োজনীয় ব্যয় নিয়মিতভাবে আদায় করতে। এই সঙ্গে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সাথে জড়িত কর্মচারীরাও যাতে প্রজাদের থেকে আদায়কৃত অর্থ নিজেদের ভোগবিলাসে রেখে রাষ্ট্রকে এর প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে না পারে, সেদিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে তিনি খাজনা ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে অহেতুক নমনীয় বা উদাসীন ছিলেন। বরঞ্চ এর উল্টোটাই সত্য। প্রসঙ্গত শেরশাহের অতিপ্রসিদ্ধ প্রবচনের কথা স্মরণ করা যায়। তাঁর মতে—'one should be liberal at the time of assessment and strict at the time of collection'[২৫৪] —অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব ধার্যের ক্ষেত্রে যতোদূর সম্ভব যুক্তিনির্ভর, বাস্তববাদী ও নমনীয় হও, কিন্তু ধার্য রাজস্ব আদায়ের বেলায় কোনরূপ ছাড় বা রেয়াত দিও না, বরং কঠোর হও। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার জন্য অতিজরুরি এই নীতিটি শেরশাহ্-ই চালু করেছিলেন এবং এর প্রয়োগও তিনি করেছিলেন। সেই সঙ্গে যুক্তিসঙ্গত ও পূর্বনির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব প্রদান করতে

Sultanate of Dehli, Dr. I.H. Qureshi, pp. 119; The Mughal Empire; S.M.Jaffar, pp. 58.

২৫১ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৬। প্রসঙ্গত ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ড. কালীকিঙ্কর দত্তের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তাঁরা কোন সুনির্দিষ্ট হারের উল্লেখ না করে শেরশাহের আমলে ভূমি রাজস্বের হার বস্তুত এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ হতে পারে বলে ধারণা করেছেন, An Advanced History of India, pp. 440.

২৫২ The Cambridge Shorter History of India, Sir Wolseley Haig, pp. 261-62; quoted from 'Mughal Rule in India', Dr. Mahajan, pp.59.

২৫৩ The Mughal Empire, pp. 57-58.

২৫৪ Administration of the Sultanate, pp. 108.

যারা অস্বীকার বা বাধা প্রদান করতো তাদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে অন্যরা তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয়— 'if the people, from any lawlessness or rebellious spirit, created a disturbance regarding the collection of the revenue, they were so to eradicate and destroy them with punishment and chastisement that their wickedness and rebellion should not spread to others.'[২৫৫] সুতরাং ধরে নেয়া যায় যে, ভূমিরাজস্ব আদায়কালে যে শাসক এতো কঠোর ও অনমনীয়, এবং কোনরূপ ছাড় প্রদানে প্রায় অনিচ্ছুক, অথচ জনপ্রিয়তা যাঁর সমধিক, তাঁর আমলে ভূমিরাজস্বের হার খুব কম বা খুব বেশি না হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তাই আমরা মনে করি শেরশাহের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের মোটামুটি হার ছিল উৎপন্ন ফসলের $\frac{১}{৪}$ অংশ। তবে এর ব্যতিক্রমও ছিল।

দুই. আব্বাস খান শেরওয়ানি তাঁর 'তুহফা-ই-আকবরশাহি' গ্রন্থে বলেছেন যে উৎপাদিত শস্যের একভাগ পেতো চাষকারী কৃষক এবং অবশিষ্টের অর্ধেক পেতো গ্রামের মোড়ল (headman)[২৫৬]। ফলত এ থেকে কিছু কিছু আধুনিক ঐতিহাসিক ধারণা করেন যে, অবশিষ্ট অর্ধেক অর্থাৎ $\frac{১}{৩}$ অংশ পেতো কেন্দ্রীয় সরকার বা রাষ্ট্র। তাঁদের বিবেচনায় কৃষকের উৎপাদিত ফসলের মোট ৩ জন অংশীদার ছিল, সমান হারে—কৃষক, গ্রাম্য মোড়ল ও রাষ্ট্র। কিন্তু সত্যি বলতে এই ব্যতিক্রমী ব্যবস্থা মূলত দূরবর্তী প্রদেশ হিশেবে মুলতান ও তার আশপাশের এলাকার জন্য গৃহীত হয়েছিল।[২৫৭] সেখানকার গভর্নর হায়বত খানকে সম্রাট নির্দেশ দিয়েছিলেন উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করতে।[২৫৮] অধিকন্তু অতিরিক্ত সেস আদায়ও বন্ধ করতে বলেন।[২৫৯] অথচ অন্যত্র আমরা দেখেছি তাঁর সময়ে ভূমিরাজস্ব ছাড়াও উপরি হিশেবে প্রতি বিঘায় ৬/৭ সের ফসল বা তার সমান মূল্য আদায় করা হতো।[২৬০] সুতরাং চিন্তা করতে দোষ নেই যে এক-চতুর্থাংশের ওপর আনুষঙ্গিক করস্বরূপ অতিরিক্ত সেস গ্রহণ যতোটা সুবিধাজনক ও প্রজাগ্রাহ্য হবে, ঠিক ততোখানি গ্রহণীয় নিশ্চয়ই হবে না বিঘা প্রতি উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ আদায়ের পর অতিরিক্ত আরও ৬/৭ সের দাবির যৌক্তিকতা? নিঃসন্দেহে

২৫৫ The Agrarian System, pp. 75.

২৫৬ The Administration of the Sultanate, pp. 118.

২৫৭ The Agrarian System, pp. 75; The Administration of the Sultanate, pp. 118; Provincial Government of the Mughals, pp. 257.

২৫৮ The Agrarian System, pp. 75; The Administration of the Sultanate pp. 118.

২৫৯ The Administration of the Sultanate, pp. 118.

২৬০ ড. ত্রিপাঠী বলেন, 'Besides taking one third of the average produce of a bigha, Sher Shah also collected ten astars of grain from each bigha. It was a sort of contingency tax— a cess.' (Some Aspects, pp. 302). ড. পরমাত্মা শরণ একে রায়তদের এক ধরনের বীমা-কররূপে বিবেচনা করেছেন যা সাধারণত তাদের মধ্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে প্রদান করা হতো, এবং সমষ্টিগতভাবে প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ দুর্যোগকালে ঋণ বা সাহায্য বাবদ ব্যয়িত হতো (Provincial Government of the Mughals, pp. 258).

সেক্ষেত্রে শেরশাহ, সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের মতো প্রজানিন্দিত হতেন। এই অতিরিক্ত সেসের মাধ্যমে আদায়কৃত শস্যাদি রাষ্ট্রীয় ধনাগারে (granary) সংরক্ষণ করা হতো এবং দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি ক্রান্তিকালে বাজারে সরবরাহ করা হতো।[২৬১]

তিন. এই আমলের ভূমিরাজস্ব ('মাল') ধার্য ('তখশিস') ও সংগ্রহ ('তহসিল') পদ্ধতির জটিলতা ও কঠোরতা বিবেচনা করলেও যে কেউ ভাবতে প্রলুব্ধ হবে যে শেরশাহের সময়ে ভূমিরাজস্বের হার এক-চতুর্থাংশের অধিক ছিল না। তাঁর সময়ে ভূমিরাজস্ব নিরূপণের লক্ষ্যে প্রচলিত জরিপ পদ্ধতিকে শেরশাহ আরও নিয়মিত ও যুগোপযোগী করার চেষ্টা করেন। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের তিনি বেতন-ভাতা দেয়ার নিয়ম চালু করেন, যা সচরাচর ভূম্যধিকারী রায়তদের কাছ থেকে 'জরিবানা' ও 'মুহাস্‌সলানা' নামে আদায় করা হতো। কর্মচারীরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে চাষযোগ্য ভূমির বাস্তব ফসলোৎপাদনের হিসাব গ্রহণ করতো। এ জন্যে ভূমিকে তারা মূলত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতো—ভালো, মাঝারি ও খারাপ। প্রতিটি শ্রেণীতে প্রতি বিঘায় পরপর দু'বছরে যে শস্য উৎপন্ন হতো তার যোগফলের গড় নির্ণয় করতো। অতঃপর প্রচলিত হারে অর্থাৎ $\frac{১}{৪}$ অংশের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভূমির খাজনা নির্দিষ্ট করা হতো। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, প্রথমোক্ত শ্রেণীর জমিতে পরপর দুবছরে যে শস্য উৎপন্ন হলো তার গড় পরিমাণ ১৬ মণ, দ্বিতীয় প্রকারের জমিতে ১২ মণ এবং তৃতীয় শ্রেণীতে ৮ মণ। এগুলির সমষ্টি অর্থাৎ ১৬+১২+৮ এর গড় ১২ মণ। এখন এই ১২ মণের $\frac{১}{৪}$ অংশ হিশেবে রাষ্ট্রের পাওনা নির্দিষ্ট হতো ৩ মণ। বস্তুত এর ওপরে আনুষঙ্গিক কর বাবদ গ্রহণ করা হতো ৬/৭ সের পরিমাণের অতিরিক্ত ফসল। শেষোক্ত এই কর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শস্যে গ্রহণ করা হতো।[২৬২] ধারণা করা হয় সম্ভবত একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে শেরশাহ রায়তের উৎপাদিত প্রায় প্রতিটি প্রধান প্রধান ফসলের ক্ষেত্রে দেয় সরকারি ভূমিরাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে একটি তফসিল বা ভূমিরাজস্বের তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। উল্লেখ্য তাঁর আগে অন্য কোন ভারতীয় হিন্দু বা মুসলমান শাসক এতো সুচারু পদ্ধতিতে এই জাতীয় কোন তফসিল তৈরি করেননি। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনিই ছিলেন এর উদ্‌গাতা। ড. আর. পি. ত্রিপাঠী যথার্থই বলেন, 'The absence of any previous reference to it might suggest that it was Sher Shah who introduced it in India.'[২৬৩]

শেরশাহের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব নগদ অর্থে ও উৎপন্ন শস্যে গৃহীত হতো।[২৬৪] তবে আলাউদ্দিনের মতো শস্যে গ্রহণেই সম্রাটের আগ্রহ বেশি ছিল। কেননা এতে করে

২৬১ Some Aspects, pp. 302.
২৬২ Some Aspects., pp. 302.
২৬৩ Ibid., pp. 300.
২৬৪ The Provincial Government, pp. 257; An Advanced History of India, pp. 440; A History of India, pp. 304; The Mughal Empire, S. M. Jaffar, pp. 58; The Mughal Empire, Dr. Ishwari Prasad, pp.176.

প্রাপ্ত ফসল নিকটবর্তী সরকারি শস্যভাণ্ডারে মজুত করে রাখা যেতো এবং প্রয়োজনের সময়ে বিশেষত বাজারে দুর্মূল্যের দিনে নির্ধারিত তুলনামূলক কম দামে বাজারে ছেড়ে অর্থনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া দ্রুত রোধ করা সম্ভব হতো। ফলত দেখা যাচ্ছে মধ্যযুগে দ্রব্যে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব আর্থ-রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল উত্তরণে একটি ব্যাপক ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতো যা পূর্ববর্তী শাসকদের সময়েও আমরা দেখেছি। অবশ্য বাংলার ক্ষেত্রে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থেই ভূমিরাজস্ব গ্রহণে শাসককুল সচেষ্ট ছিলেন। শেরশাহও এই ধারা অব্যাহত রাখেন।[২৬৫] এর মুখ্য কারণ ছিল বাংলার ভূ-রাজনৈতিক অবস্থা। প্রথমত বাংলায় দিল্লির সাম্রাজ্যাধীন অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় প্রচুর পরিমাণে ফসল উৎপাদিত হতো যার রাষ্ট্রীয় অংশের সুষ্ঠু সংরক্ষণের জন্যে স্থান সংকুলানের অভাব ছিল; দ্বিতীয়ত প্রাপ্ত বিপুল শস্য মজুত করে রাখার ফলে মৌসুমি বৃষ্টিপাতে তা অনেক সময় ভিজে ও স্যাঁতসেঁতে হয়ে নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকতো; এবং তৃতীয়ত যোগাযোগ অবকাঠামো বিনির্মাণে শেরশাহের প্রশংসনীয় উদ্যোগ সত্ত্বেও তৎকালীন বাস্তবতায় নগদ অর্থ কেন্দ্র তথা দিল্লিতে প্রেরণ অপেক্ষাকৃত সহজতম ও স্বল্পব্যয়তম ছিল। এই সব বিবেচনা করে শেরশাহ পূর্ববর্তী সুলতানদের অনুসৃত নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রথা বাংলার বেলায় অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ পুরোপুরি একমত।

শেরশাহ শস্যের অজন্মাকালে তথা প্রাকৃতিক বা অন্যবিধ কারণে ভূমিতে রোপিত শস্য হানি বা কম হলে সেজন্যে আনুপাতিক হারে সম্পূর্ণ ভূমিরাজস্ব মওকুফ করে দিতেন। এ ছাড়া খরা, অনাবৃষ্টি ইত্যাদিতে ক্রমাগত কয়েক বছর ফসল উৎপাদন সম্ভব না হলে ও ফসল-ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে প্রচলিত ঋণ দান প্রথা অব্যাহত রাখেন।

এবার সম্রাট শেরশাহের আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও কৃতিত্বপূর্ণ সংযোজনের কথা উল্লেখ করবো। বস্তুত এই নব ব্যবস্থা আধুনিক ঐতিহাসিকদের সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ ও প্রশংসা লাভ করেছে।

এই প্রথম ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' নামক লিখিত দলিলের প্রচলন করা হয়। কোন রায়ত কোন্ ভূমি, কী শর্তে ভোগদখল করবে এবং তার বার্ষিক দেয় খাজনার পরিমাণ কী হবে, তা নির্দিষ্ট করে রাষ্ট্রের তরফ থেকে রায়তকে যে লিখিত দলিল দেয়া হতো তাকে বলা হতো 'পাট্টা'। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট রায়ত পাট্টায় নির্দেশিত শর্তাদি প্রতিপালনের অঙ্গীকার করে রাষ্ট্রের বরাবরে যে লিখিত পত্র সম্পাদন করতো, তাকে বলা হতো 'কবুলিয়ত' বা অঙ্গীকারনামা। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি ছিল উভয়পক্ষের মধ্যে এক ধরনের লিখিত চুক্তি। রাষ্ট্র প্রজাকে লিখিতভাবে ভূমি ভোগদখলের প্রস্তাব দিতো, প্রজা তা স্বীকার বা কবুল করতো। তবে এই কবুলিয়ত সম্পাদনে রায়তের স্বাধীন মতামত বা ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের সুযোগ খুবই কম ছিল। মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে ভূমি ভোগদখলে আসলে রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া ব্যবস্থাই রায়তকে মেনে নিতে হতো। পাট্টা-

২৬৫ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৭।

কবুলিয়ত ব্যবস্থার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই ছিল যে, এর দ্বারা প্রজার এক ধরনের ভোগদখলের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতো যদিও তা আজকের মতো চূড়ান্ত ছিল না। প্রজা পাট্টায় উল্লিখিত সমুদয় শর্তাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করলে রাষ্ট্র সহজে তাকে সংশ্লিষ্ট ভূমি থেকে উৎখাত করতে পারতো না। এখানে 'সহজে' শব্দটিকে আমরা আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কারণ এই যুগে রাষ্ট্রের শীর্ষে অবস্থানকারী এক ব্যক্তি তথা রাজা বা সম্রাটের বচনই ছিল আইন এবং কোন বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে একতরফাভাবে রায়তের পক্ষে লিখিত শর্তাদি প্রতিপালনের কোন বিচ্যুতি না থাকা সত্ত্বেও তাকে স্থানচ্যুত বা ভূমি থেকে সরিয়ে দিতে পারতেন। তারপরও প্রজারঞ্জক শাসকদের জন্য এক ধরনের বিচারিক ন্যায়বোধ তাদেরকে এ সকল ক্ষেত্রে রায়তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধা হয়ে দাঁড়াতো। একজন জনকল্যাণকামী মধ্যযুগীয় শাসক হিশেবে পাট্টা-কবুলিয়ত প্রচলনের মধ্য দিয়ে শেরশাহও এরূপ ন্যায় ও ঔচিত্যবোধের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন বলা যায়। তাই তাঁর আমলে প্রজার ভূমিতে ভোগদখলাধিকার অন্য সময়ের তুলনায় অধিক সুরক্ষিত ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

শেরশাহ ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মী-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও কিছুটা গুণগত পরিবর্তন এনেছিলেন। তবে এ ব্যাপারে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির মতো যেমন অতিরিক্ত কঠোর ও দয়ামায়াহীন প্রকৃতির ছিলেন না, তেমনি সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের মতো কোমল হৃদয়ের অধিকারীও ছিলেন না। বরং বলা যায় এই দু'জনের মন-মানসিকতার মাঝখানে ছিল তাঁর অবস্থান। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে তিনি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অনিয়ম ও কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রভৃতি নিরোধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণে বিরত থাকতেন। তাঁর আমলে রাজস্ব প্রশাসনে কর্মরত আমলা ও কর্মচারীদের সর্বোচ্চ ২ বছরের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি করা হতো। এটি অনেকটা অবধারিত পরম্পরা বা রুটিন-বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৬৬] এই সময়ের মধ্যে কোন কর্মচারী সম্রাটের আদেশ-নিষেধের পরিপন্থী কোন কাজ করলে, বিশেষ করে রায়তের স্বার্থবিরোধী ও উৎপীড়নধর্মী কোন ভূমিকা রাখলে, তিনি তাকে বা তাদেরকে শুধু আকস্মিকভাবে বদলিই করতেন না, বরঞ্চ ক্ষেত্রবিশেষে কঠিন শাস্তি দিতেও কার্পণ্য করতেন না। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত শাস্তি হতো মূলত দৃষ্টান্ত স্থাপনমূলক। ড. বিদ্যাধর মহাজন বলেন; 'The object of punishment was not to reform the criminal but to set an example so that the others may not do the same.'[২৬৭] স্বভাবতই নিয়মিত ও আকস্মিক বদলির হুমকি এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ভয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের চিরাচরিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা অনেক কমিয়ে দিয়েছিল।

উপসংহারে শেরশাহের শাসনামলের আরও ২/১টি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা এ অধ্যায়ের আলোচনার শেষ করবো। প্রথমত পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় খুবই

২৬৬ Professor Sri Ram Sharma, quoted from 'Mughal Rule In India', Dr. V. D. Mahajan, pp. 58.

২৬৭ Mughal Rule.., pp. 53. See also 'Mughal Empire', Jaffar, pp. 58-59.

স্পষ্ট যে সম্রাট ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ব সূরী মুসলিম সুলতানদের বিশেষত আলাউদ্দিন খলজির অনুসৃত নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দু'একটি ক্ষেত্রে (যার মধ্যে 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়ত' প্রথা অন্যতম) নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিলেও মূলত তিনি খলজি, তুগলক ও লোদি বংশীয় শাসকদের অবলম্বিত নীতি ও ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কার সাধন করেছিলেন মাত্র। ড. ত্রিপাঠীর ভাষায় তাই আসলেই তিনি ছিলেন 'a reformer and not an innovator.'[২৬৮] প্রচলিত ভূমি জরিপ ব্যবস্থার তিনি উদ্‌গাতা না হয়েও ভূমিরাজস্ব নিরূপণের বেলায় একে ব্যাপকভাবে ব্যবহার, সুনির্দিষ্ট প্রণালীবদ্ধ ও লোকপ্রিয় করে তুলেছিলেন যদিও এর কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বল দিক ছিল।[২৬৯]

দ্বিতীয়ত প্রজাহিতৈষণা ও কৃষক-মঙ্গলই রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও এর দীর্ঘস্থায়িত্বের চাবিকাঠি—এই সত্যোপলব্ধিজাত প্রশাসনিক যে মৌল নীতির চর্চা দিল্লির সালতানাতে প্রথমবারের মতো সুলতান ফিরোজশাহ্ তুগলকের সময়ে চালু হয়েছিল, শেরশাহ্ তাকে অব্যাহত রেখে ও আরও প্রজাকল্যাণধর্মী করে বস্তুত পরবর্তী শাসকদের জন্যে তা অনেকটা অবশ্য পালনীয় করে তুলেছিলেন, যার প্রকৃত বিকাশ ঘটেছিল মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে।

শেষত শেরশাহের সর্বাধিক কৃতিত্ব এখানেই যে, যে ব্যবস্থা ও পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছিলেন, পরবর্তীকালে সেটিই ভারতেতিহাসের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পর্বে সম্রাট আকবরের কাছে পাথেয়রূপে পরিগণিত হয়েছিল। Moreland-এর ভাষায় বলা যায়, 'The historical importance of Sher Shah's methods lies in the fact that they formed the starting point of the series of experiments in administration which marked the first half of Akbar's reign.'[২৭০]

২৬৮ Some Aspects, pp. 305.

২৬৯ বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন, 'Medieval History of India', Dr. Meera Singh, pp. 227-28.

২৭০ The Cambridge History of India, Vol. IV., quoted from 'Mughal Rule in India', Dr. Mahajan, pp. 53.

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব প্রশাসন (সুলতানী আমল)

ভৌগোলিক, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে বৃহৎ সাম্রাজ্যকে একাধিক ক্রমনিম্ন ক্ষুদ্র ইউনিটে বিভক্ত করার রীতি বাংলা ও ভারতে অতিপ্রাচীনকাল থেকেই ছিল। মধ্যযুগের প্রথম পর্বে সুলতানী শাসনামলেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। তবে সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের লিখিত গ্রন্থে ও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত লিপি-প্রমাণে বিস্তারিত তথ্যের অভাবে সুলতানী যুগের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট ও সঠিক চিত্র তুলে ধরা দুরূহ, যদিও একেবারে অসম্ভব নয়। ড. আবদুল করিম বলেন, 'সমসাময়িক শিলালিপি, মুদ্রা, সাহিত্য এবং পরবর্তীকালে লিখিত ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।'[১] বলাবাহুল্য শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 'কিছু কিছু তথ্য' পাওয়া গেলেও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় তথ্য আরও অপ্রতুল। তথাপি আমরা এখানে এ আমলের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি আপাতগ্রাহ্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো। তবে এই চিত্র স্থানকাল নিরপেক্ষ নয়।

পুরোপুরি রাজনীতিক হিশেবে ভারতবর্ষে আগমনের আগে পশ্চিম ও-মধ্য এশিয়ায় দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীব্যাপী রাজ্যশাসনের অভিজ্ঞতা মুসলমানদের ছিল। সত্যি বলতে একটি সমৃদ্ধ শাসনতান্ত্রিক প্রথাপদ্ধতি ততোদিনে তারা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে এটা মনে করা ঠিক হবে না যে বিজেতা মুসলমানরা এদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেছিল কোন প্রকার শাসন-ঐতিহ্য ছাড়াই। প্রকৃত প্রস্তাবে, 'They (the Sultans of Delhi) had borrowed certain salient features of administration from the Khalifas, Ghaznavides and Ghorides.'[২] এই শাসন-ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ হয়েছিল তৎকালীন বাংলা-ভারতে প্রচলিত প্রাচীন হিন্দু আমলীয় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা। মুসলিম সুলতানরা চেষ্টা করেছিলেন এই উভয় ব্যবস্থার সম্মিলনে একটি অপেক্ষাকৃত নবতর, সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে। যা হোক বিস্তারিত বলার আগে প্রথমেই এখানে প্রাসঙ্গিক দু'একটি ব্যাপারে কিছু আলোচনা করে নেবো।

১ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৯৭

২ Life and Culture in Medieval India, Dr. B. N. Luniya, pp. 40.

প্রথমত মধ্যযুগের প্রায় সাড়ে ছয় শত বছরের মুসলিম শাসনের প্রথম অর্ধ যেটাকে আমরা সুলতানী যুগ (১২০৪/৬-১৫২৬) বলে আখ্যায়িত করি, এই সময়ে ভারতবর্ষে মোটামুটি ৫টি রাজবংশ রাজত্ব করে। যথা—(ক) দাস বা মামলুক বংশ (১২০৪/৬-১২৯০), (খ) খলজি বংশ (১২৯০-১৩২০), (গ) তুগলক বংশ (১৩২০-১৪১৩), (ঘ) সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১) ও (ঙ) লোদি বংশ (১৪৫১—১৫২৬)।[৩] শেষার্ধে রাজত্বকারী একটি একক ও প্রবল ক্ষমতাশালী বংশ হিশেবে মোগলগণ এর চেয়েও প্রায় অর্ধ-শতক বছর বেশি ভারতবর্ষ শাসন করলেও সুলতানদের পক্ষে পাঁচটি রাজবংশ মিলিয়েও তা সম্ভব হয়নি প্রধানত সদ্য ক্ষমতাচ্যুত তথা পরাজিত ও বৈরীভাবাপন্ন হিন্দু রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণের অসহযোগী মনোভাবের কারণে। সেই সঙ্গে ছিল মঙ্গলদের আক্রমণ প্রভৃতি।[৪] ফলত জ্যেষ্ঠ মোগলগণ তথা সম্রাট বাবর থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব-এর যুগ পর্যন্ত সুদক্ষ শাসনযন্ত্রের যে ধারা একের পর এক গড়ে উঠেছিল ও পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ও যুগোপযোগী সংস্কারের মধ্য দিয়ে কাল-পরম্পরা অব্যাহত ছিল, বলাবাহুল্য যে সুলতানদের কোন একক বংশের পক্ষে এমন কি সম্মিলিতভাবেও সেটা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। তথাপি এই কিঞ্চিদধিক তিনশত বছরে কোনও কোনও সুলতানী শাসক ও বংশ উল্লেখযোগ্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলেছিলেন। এই শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দাস বা মামলুক বংশের সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২২১), সুলতান ইলতুতমিশ বা আলতামাশ (১২১১-১২৩৬) ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭), খলজি বংশের সুলতান আলাউদ্দিন খলজি (১২৯৬-১৩১৬), তুগলক বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক (১৩২০-১৩২৫), সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক (১৩২৫-১৩৫১) ও সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক (১৩৫১-১৩৮৮)। এঁরা নানারূপ পরীক্ষানিরীক্ষা, সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক যে অবকাঠামো তৈরি করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সত্যি বলতে উত্তরসূরী শাসক হিশেবে সম্রাট শেরশাহ ও আকবরের জন্যে সেটিই ছিল ভিত্তি ও পাথেয়।

অবশ্য একটি নিতান্ত দূরবর্তী প্রদেশ হিশেবে বাংলায় দিল্লির তৎকালীন মুসলমান শাসকদের প্রবর্তিত ও অনুসৃত এই প্রশাসনিক অবকাঠামো কতোটুকু অবলম্বিত হয়েছিল সেটা নিশ্চিত জানা না গেলেও একটি বিষয় নিঃসন্দেহে ধারণা করা যায় যে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ও তৎপরবর্তী সময়ে বাংলাসহ বিভিন্ন প্রদেশে যে ব্যবস্থা বিরাজমান ছিল, তার সমৃদ্ধ অস্তিত্ব সুলতানী যুগে ছিল না।

দ্বিতীয়ত সুলতানী আমল থেকেই বাংলা ছিল দিল্লি সালতানাতের জন্যে সবচেয়ে দূরধিগম্য ও অবাধ্য তথা বিদ্রোহী প্রদেশ নামে পরিচিত। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের ভাষায়,

৩ The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, Dr.Agha Mahdi Husain, pp. 3.
৪ bid., pp. 4.

'Bengal had always been a most refractory province of the empire of Delhi;'[৫] দিল্লির সুলতানদের প্রতিনিধি-শাসনকর্তাগণ সামান্য সুযোগ পেলেই বাংলায় বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। প্রসঙ্গত সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানির কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বাংলার শাসনকর্তাদের যখন-তখন বিদ্রোহ সংঘটনের কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন : (১) দিল্লি থেকে বাংলার দূরত্ব; (২) বাংলার আয়তনগত বিশালতা; ও (৩) যাতায়াত, যোগাযোগ এবং সংবাদ আদান-প্রদানের অসুবিধা।[৬] বস্তুত কেন্দ্রের অধীনতা মুক্ত হয়ে প্রায়শ এঁরা স্বাধীন ও পরাক্রমশালী শাসকের মতো রাজ্যশাসন করতেন। বখতিয়ার খলজি (১২০৪) থেকে হোসেনশাহি আমল (১৫৩৮) অবধি (আফগান শাসনের পূর্বপর্যন্ত) বাংলায় ৫০ জনেরও অধিক মনোনীত ও বিদ্রোহের মাধ্যমে ক্ষমতারূঢ় মুসলমান সুলতান রাজত্ব করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন বিশেষত সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারকশাহ (১৩৩৮-৪৮/৪৯), সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭), সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজমশাহ (১৩৯৩-১৪১০/১১), সুলতান আলাউদ্দিন হোসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৯) খুবই প্রসিদ্ধ। জনকল্যাণমূলক কাজ-কারবার ও অন্যান্য বিষয়ে এঁরা প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও এঁদের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো ও পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে দিল্লির সুলতানদের প্রদত্ত পদ-পদবির সামান্য সংযোজন-বিয়োজন ছাড়া এঁরা মূলত তাঁদেরই ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক পদ্ধতি ও অবকাঠামো আগাগোড়া অনুসরণ করেছিলেন, বা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম তাই যথার্থই বলেন, 'বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের সূচনা হয়েছিল সালতানাতের অধীন একটি প্রদেশ হিসেবে। সে হিসেবে প্রদেশের প্রশাসন ব্যবস্থা ও রীতিনীতি উত্তরের তুর্কী সালতানাতের প্রশাসন ব্যবস্থা ও রীতিনীতি অনুসরণ করে প্রচলিত হয়েছিল।'[৭]

তৃতীয়ত আগেই বলেছি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা প্রথা-পদ্ধতি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে সুলতানী আমল ছিল ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার যুগ। ড. সৈয়দ মইনুল হক বলেন, 'The administrative organization of the Sultanate was the result of an evolutionary process in which improvements and changes were effected by various Kings and Statesmen.'[৮] সত্যি বলতে এই দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মূলত ক্ষমতাসীন বলদর্পী সুলতানদের ইচ্ছা-অনিচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। স্থিত ব্যবস্থা তারা সময়ের প্রয়োজনে কখনও আংশিক বা সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন, আবার কখনও গ্রহণ করেছেন নতুন নীতি-আদর্শ। স্বভাবতই, 'The IDEAL of kingship in the Sultanat period differed from regime to regime, according to the attitude of the

৫ A Short History of Muslim Rule in India, pp. 268.
৬ 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহি', সংগৃহীত 'বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৭০৪-১৯৭১', সম্পাদক ড. সিরাজুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬
৭ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬
৮ A Short History of the Sultanate of Delhi, pp. 216.

sovereign and the requirements of the current situation. The evolution of its two-fold aspects viz. the practical and the theoretical was conditioned by the personal equation of the individuals at the helm of affairs.'[৯] উদাহরণস্বরূপ বলা যায় প্রথম যুগে মামলুক বংশের সুলতানরা সুষ্ঠু শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে দিল্লির সাম্রাজ্যকে কতকগুলি বিভাগ বা প্রদেশে (সচরাচর 'ইকতা' নামে পরিচিত ছিল) বিভক্ত করলেও[১০] ও প্রচলিত গ্রাম শাসনব্যবস্থাকে অপরিবর্তিত রাখলেও প্রধানত সময় ও সুযোগের অভাব তথা সাম্রাজ্যিক ব্যস্ততা ও মসনদের ঘন ঘন রদবদল তাদেরকে এর অতিরিক্ত সুনির্দিষ্ট ও বিস্তৃত কোন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেয়নি। পরবর্তীকালে খলজি ও তুগলক বংশের সুলতানগণ 'ইকতা' পদ্ধতিকে মোটামুটি অক্ষুণ্ন রাখলেও এর পাশাপাশি একটি অপেক্ষাকৃত জটিল ও বিস্তৃত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। এই আমলে সর্বশেষ লোদি ও সুর-আফগান শাসকদের বিশেষ করে শেরশাহের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ক্রম-বিবর্তনের ধারা অনেকটা স্থিরতা ও পরিণত রূপ লাভ করে।

যা হোক এই অবধি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের যে স্বরূপ পাই তা মোটামুটি এ রকম : ইকতা বা প্রাদেশিক প্রশাসন, 'ইকলিম' বা বিভাগীয় প্রশাসন, 'সরকার', 'শিক' ও 'আ'রসাহ' বা জেলা প্রশাসন, 'কসবা', 'মদিনাহ' বা 'খিত্তা' তথা নগর বা পুর-প্রশাসন, 'পরগণা' বা আধুনিককালের উপজেলা বা থানা প্রশাসন ও গ্রামশাসন ব্যবস্থা। এখানে পর্যায়ক্রমে এগুলি সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে অন্য দু'একটি বিষয় যা পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে জরুরি বলে মনে হয়, সে সম্বন্ধেও কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো।

ইকতা ও ইকলিম

প্রাথমিক যুগের দিল্লির সুলতানগণ মুখ্যত ভূমিরাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ও গৌণত প্রশাসনিক প্রয়োজনে নববিজিত সমগ্র সাম্রাজ্যকে কতকগুলি ছোটবড় অংশে বা প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন, যেগুলির সাধারণ নাম বা পরিচিতি ছিল 'ইকতা' হিশেবে।[১১] এর অন্য

৯ History of Firuz Shah Tughluq, Dr. J.M. Banerjee, pp. 67.

১০ ভারতে মুসলিম শাসনের প্রথম পর্বে 'ইকতার নিম্নবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ বলেন, 'The chronicles mention no smaller administrative unit below the iqta as comprising rural areas.' (The Foundation of Muslim Rule in India, pp. 215).

১১ ড. সতীশ চন্দ্র বলেন, 'প্রশাসন কার্যনির্বাহ ও রাজস্ব সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিজয়ী তুর্কী শাসকেরা সমগ্র দেশকে 'ইকতা' নামে কতকগুলি ভূখণ্ডে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।' (মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি, অনুবাদ চন্দ্রিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬)। যা হোক, সাধারণত 'ইকতা' বলতে বুঝাতো 'an administrative division' (The Foundation of Muslim Rule in India, pp. 209; History of the Khaljis, pp. 169); 'tracts of land' (Some Aspects of Muslim Administration, pp. 244); 'a territorial assignment' (Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 68); 'নির্দিষ্ট অঞ্চলে রাজস্ব আদায়ের অধিকার—,.... রাজস্বের স্বত্বনিয়োগ ও প্রশাসনিক কার্যভার' (মধ্যকালীন ভারত. [illegible] ড. ইরফান হবিব, পৃষ্ঠা

একটি নাম ছিল 'ওয়ালিয়াত'।[১২] এর শাসনকর্তাকে বলা হতো 'মুকতি'[১৩] বা 'মুকতা'[১৪], 'ইকতাদার'[১৫], 'ওয়ালি' বা 'অলি'[১৬], 'নায়িব'[১৭], 'আমির'[১৮] বা 'আমির-উল উমারা'[১৯], 'হাকিম'[২০] প্রভৃতি। বলাবাহুল্য বর্ণিত পদবিগুলি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন সুলতানদের দ্বারা প্রযুক্ত হলেও তা যে মূলত আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদের অভিধা হিশেবে ব্যবহৃত হতো, এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণের সকলেই একমত। তবে ইকতা বা ওয়ালিয়াতের গঠন-বৈচিত্র্য ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের সঙ্গে ইকতাদারদের সম্পর্কের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাবে যে, মামলুক বা দাস বংশ থেকে শুরু করে তুগলকদের যুগ পর্যন্ত দিল্লির সালতানাতের অধীনে মোটামুটি ৩ ধরনের ইকতা বা ওয়ালিয়াতের অস্তিত্ব ছিল।[২১]

এক. সীমিত ক্ষমতাধিকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা 'ইমারাত-ই-আম্মাহ বা তাওফীদ'; দুই. অ-সীমিত (অসীম নয়) ক্ষমতাধিকারী প্রদেশকর্তা বা 'ইমারাত-ই-খাস্সাহ' ও তিন. ক্ষমতা জবর-দখলকারী প্রাদেশিক শাসক বা 'ইমারাত-ই-ইসতিলা'। মুসলিম আইনশাস্ত্র বিশারদগণও এই তিন প্রকারের প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক শাসনকর্তার কথা উল্লেখ করেছেন।[২২]

---

৪৬)। 'ইকতার শুরু থেকে নিয়ে পর্যায়ক্রমিক বিকাশ পর্যন্ত (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ড. হবিবের প্রবন্ধ 'প্রাক্-ব্রিটিশ ভারতে ভূসম্পত্তির সামাজিক বিলিব্যবস্থা', ঐ, পৃষ্ঠা ৪৬-৮) যে স্বরূপ দাঁড়িয়েছিল, তাতে করে উপরের প্রতিটি সংজ্ঞার্থই এর ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছিল বলা যায়। এক কথায়, প্রাথমিক অবস্থায় 'ইকতা' দ্বারা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বা ভূখণ্ডে ভূমিরাজস্ব আদায়ের স্বত্বনিয়োগ বুঝালেও কালক্রমে তা বৃহত্তর প্রশাসনিক ইউনিট বা একক হিশেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল।

১২ The Wonder That Was India, Dr. S. A. A. Rizvi, pp. 191; বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'The Agrarian System of Moslem India', W. H. Moreland, pp. 216-223.

১৩ The Administration of the Sultanate of Dehli; Dr. Qureshi, pp. 197; The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 68-75; The Agrarian System of Moslem India, Moreland, pp. 216-23; The Foundation of Muslim Rule in India, Dr. A.B.M. Habibullah, pp. 209-215; মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬।

১৪ Some Aspects of Mulsim Administration, Dr. R.P. Tripathi, pp. 244; বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ৩৯৭; বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬; কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃষ্ঠা ২৭৫; বাংলাদেশের ইতিহাস (ড. রহিম, চৌধুরী, মাহমুদ ও ইসলাম), ড. আবদুল মমিন চৌধুরীর প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ২৩২।

১৫ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. এম. এ. রহিম, পৃষ্ঠা ৫৪।

১৬ History of the Khaljis. Dr. K.S. Lal, pp. 169.

১৭ The Government of the Sultanate, Dr. U. N. Day, pp. 61.

১৮ History of the Lodi Sultans of Delhi & Agra, Dr. Abdul Halim, p. 230.

১৯ Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 221.

২০ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬।

২১ ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি বলেন, 'The Sultanate of Dehli possessed governors of all three types in the course of its history.' (The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 194).

২২ The Government of The Sultanate, pp. 57.

মধ্যকালীন বাংলায় আমাদের বিবেচনায় যেহেতু দ্বিতীয় ধরনের অর্থাৎ অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রাধান্য ছিল, সেহেতু সেই বিষয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করবো।

সীমিত ক্ষমতাধিকারী ইকতাদার বা মুকতি

এককথায় সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা বলা হতো তাদেরকে যাদের অধীনে কিছু পরিমাণ নিয়মিত সৈন্য থাকতো। এই সেনাদল মুকতির সার্বক্ষণিক প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও সুলতান বা কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরি তলবে সর্বদা সহায়তার জন্য প্রস্তুত থাকতো। বিভিন্ন পলাতক, শাস্তি-এড়ানো অপরাধী ও বিদ্রোহীদের দমন এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহতকরণের প্রাথমিক দায়িত্ব থাকতো এদের ওপর। তবে বিচারিক কার্যে কাজিদের ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ ও জনসাধারণের ওপর করারোপের ক্ষমতা এদের ছিল না।[২৩] অধিকন্তু ধর্মীয় নেতা হিশেবেও এরা গণ্য হতেন না।[২৪] তবে অনগ্রসর জনমণ্ডলীর নৈতিক চরিত্র গঠন ও মানোন্নয়নে এদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতো।[২৫] সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের অধীনে মালিক ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খলজি লক্ষ্মণাবতী (বাংলা)-তে শাসনকর্তা থাকা কালে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তৎকালীন বাংলার মুসলিম রাজ্যকে এই জাতীয় কয়েকটি ইকতা'য় বিভক্ত করেছিলেন। যার মধ্যে মালিক আলি মর্দান খলজির অধীনে বরসৌল ও মালিক হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজির অধীনে গঙ্গাতরী ছিল অন্যতম।[২৬]

যা হোক এদেরকে আমরা Moreland নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকারের ওয়ালি বা ইকতাদারের প্রথম শ্রেণীভূক্ত করতে পারি।[২৭] আলি মর্দান ও হুসামউদ্দিন—দুজনই সমর বিভাগীয় লোক ছিলেন এবং তাঁদের হাতে বেসামরিক শাসন ক্ষমতাও ছিল[২৮], কিন্তু প্রধান ও মূল মুকতি ইখতিয়ারউদ্দিন বখতিয়ার খলজির বর্তমানে এদের ওপর ভূমিরাজস্ব বা

২৩ Ibid., pp. 58.
২৪ The Administration of the Sultanate, pp. 194.
২৫ The Government of the Sultanate, pp. 59.
২৬ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৯৮।
২৭ ভারতীয় উপমহাদেশের এই পর্বের অর্থনৈতিক ইতিহাসের (রাজনৈতিকও বটে) সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ঐতিহাসিক Moreland ভৌমিক গুরুত্বের ভিত্তিতে সুলতানী শাসনামলের আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা তথা 'ওয়ালি'দের নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডকে মোটামুটি ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The word wilayat is used in the chronicles in various senses, which can almost always be recognised with certainty from the context : it may mean (1) a definite portion of the kingdom, that is, a province; (2) an indefinite portion of the kingdom, that is, a tract or region; (3) the kingdom as a whole; (4) a foreign country; (5) the home-country of a foreigner....' (The Agrarian System of Moslem India, pp. 216).
২৮ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

করারোপের কোন ক্ষমতা ছিল বলে মনে হয় না। তবে ভূমিরাজস্ব আদায়ের অধিকার যে ছিল এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[২৯]

অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতি

মুসলিম আইনশাস্ত্র বিশারদগণের নির্দেশিত অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতিদের ক্ষমতা ও কার্যের পরিধি ও এদের প্রভাব বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাবে। যথা :

(ক) প্রদেশে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা, অবস্থান, পরিচালনা ও বেতন-ভাতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে মুকতিদের পূর্ণ এক্তিয়ার;

(খ) কাজিদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা;

(গ) ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য সকল প্রকারের করারোপের ক্ষমতা ও আদায়কৃত রাজস্ব ব্যবহারের অধিকার;

(ঘ) অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিধান ও জনসাধারণের নৈতিক মানোন্নয়নে আধ্যাত্মিক নেতার ভূমিকা নির্বাহ;

(ঙ) পবিত্র হজ্জের মৌসুমে হাজিদের কাফেলা প্রেরণ ও তাঁদের নিরাপত্তা সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার; এবং

(চ) প্রয়োজনে বিধর্মীদের প্রতি জেহাদ ঘোষণা ও যুদ্ধলব্ধ মালের ধর্মীয় বিধানানুসারে বণ্টনের[৩১] দায়িত্ব।

এখন দেখা যাক উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির সমুদয় বা আংশিক অধিকারী কোন মুকতি পর্যালোচ্য সময়ে বাংলায় ছিল কি-না?

এক্ষেত্রে শুরুতেই উল্লেখ করতে হয় ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বখতিয়ার খলজির নাম। তিনি নিজে একজন প্রভাবশালী মুকতি ছিলেন।[৩২] তাঁকে Moreland কথিত দ্বিতীয় Category-র 'ওয়ালি' বললেও অত্যুক্তি হয় না। কর্মজীবনের প্রথম ভাগে তিনি ভিউলি ও ভাগত নামক দু'টি পরগণার মুকতির দায়িত্ব পালন করলেও পরবর্তীকালে যখন 'সুলতান মুইজ-উদ-দীন মোহাম্মদ বিন সাম বা তাঁহার দিল্লীস্থ প্রতিনিধি কুতুব-উদ-দীন আইবকের নিকট হইতে কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই' চতুর্দিকে আক্রমণ পরিচালনা করছিলেন এবং নিত্য নতুন এলাকা স্বীয় অধিকারভুক্ত করে চলেছিলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় বখতিয়ার 'indefinite portion of the kingdom'-এর 'ওয়ালি' বা 'মুকতি' ছিলেন। তিনি অধীন সৈন্যবাহিনীর রক্ষণা-বেক্ষণ, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, এবং তাদের বেতন-ভাতা প্রদান করতেন। তিনি প্রভু মুহম্মদ বিন সামের নামে মুদ্রার প্রচলন ও খুতবা পাঠের ব্যবস্থা

২৯ Social History of the Muslims in Bengal : Down to A. D. 1538, Dr. Abdul Karim, pp. 19.

৩১ বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব, ড. সুখময় মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৫।

৩২ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

করেছিলেন।[৩৩] বলাবাহুল্য এগুলি তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নামেও করতে পারতেন। কারণ তাঁর প্রভূত ক্ষমতার ওপর কেন্দ্র বা দিল্লির কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে অবস্থা দৃষ্টে আদৌ মনে হয় না। ড. সুখময় মুখোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'বখতিয়ার মুহম্মদ ঘোরী এবং তাঁর অধীনস্থ দিল্লীর শাসনকর্তা কুৎবুদ্দীন আইবকের আনুগত্য স্বীকার করলেও, তিনি যে কার্যত সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।'[৩৪] কিন্তু প্রভুর প্রতি অবিচল আস্থা ও মাত্রাতিরিক্ত শ্রদ্ধাবশত তিনি এ সব থেকে বিরত ছিলেন। আগেই বলেছি শাসনকার্যের সুবিধার্থে তিনি বিজিত রাজ্য বাংলাকে কয়েকটি অংশে (ইকতা) বিভক্ত করেছিলেন, এবং এগুলিতে নিযুক্ত মুকতিদের দ্বারা ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাও করেছিলেন।[৩৫] সুতরাং সার্বিক অবস্থা বিচারে এটা সহজেই বলা যায় যে, ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি ছিলেন একজন অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতি। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে তাঁর এই ক্ষমতা কখনই নিরঙ্কুশ (absolute) ছিল না। এককথায় বাংলায় তিনি ছিলেন একজন 'semi-dependent monarch'.[৩৬]

জবর-দখলকারী মুকতি

জবর-দখলকারী মুকতি বা ওয়ালি হতেন তারাই—'If unlimited governorship has been acquired by force as the result of successful rebellion, it is called imarat-i-istila.'[৩৭] এদের অন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এরা 'সুলতান' উপাধি গ্রহণ করতেন বা যে কোন প্রকারে তা হাসিলের জন্যে উদ্‌গ্রীব হতেন। পর্যালোচ্য সময়ে বাংলায় এই জাতীয় বেশ কিছু মুকতির অস্তিত্ব ছিল যারা বস্তুত স্বাধীন রাজার মতোই রাজত্ব করেন। ফলত এক্ষেত্রে জবর-দখলকারী মুকতি ও অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতির মধ্যে পার্থক্য খুব সীমিত রেখায় এসে দাঁড়াতো। অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী মুকতিদের দিল্লির সুলতানগণ সময়ে-অসময়ে ইচ্ছা মাফিক পদায়ন ও বদলি করতে সক্ষম হলেও জবর-দখলকারী মুকতিদের বেলায় সেটা খুব সহজ ছিল না, বরং এদের মৌখিক আনুগত্য ও কার্যত কিছু পরিমাণ নির্দিষ্ট রাজস্ব পেয়েই তাঁদেরকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সুলতান শামসউদ্দিন ইলতুতমিশ লখনৌতি রাজ্যকে (বাংলা) দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'জন মুকতিকে আঞ্চলিক শাসক নিযুক্ত করেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুগলক ও সুলতান

৩৩ জেহাদে লব্ধ মালকে ইসলামি পরিভাষায় 'গনিমাহ' বলা হয়। গনিমাতের মালকে সর্বমোট ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। এক ভাগ রাষ্ট্রের জন্য রেখে অবশিষ্ট চার ভাগ জেহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে সমানাংশে বন্টন করাই ধর্মীয় বিধান।

৩৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫।

৩৫ তাঁর নিযুক্ত মুকতি হিশেবে এ ক্ষেত্রে আলি মর্দান খলজি ও হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজির নাম স্মর্তব্য।

৩৬ Dr. I. H. Qureshi, in 'The Delhi Sultanate : The History and Culture of the Indian People, Vol, VI., B. V. Bhavan, pp. 453.

৩৭ The Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 194.

মুহম্মদ বিন তুগলক বাংলাকে লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও—তিনটি রাজ্যে ভাগ করেন ও প্রত্যেকটিতে এক-একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শেরশাহ্ বাংলাকে আরও অধিক সংখ্যক ভাগে (নির্দিষ্ট সংখ্যা সঠিকভাবে জানা যায় না) ভাগ করেন এবং প্রতিটির জন্যে একজন স্বতন্ত্র ও একে-অন্যের নিয়ন্ত্রণমুক্ত আঞ্চলিক শাসক (মুকতি) নিয়োগ করেন। এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এ সকল মুকতিগণ স্থানীয়ভাবে আপাত অ-সীমিত ক্ষমতাধিকারী বলে প্রতীয়মান হলেও বাস্তবে তারা ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্র তথা সুলতানের আজ্ঞাবহ—তাঁর যথেচ্ছ ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের অধীন। ড. করিম বলেন, 'এই সকল এলাকায় নিযুক্ত গবর্নর বা প্রশাসকের সকলে একই মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং কেহ কাহারও অধীনে ছিলেন না, সুলতান নিজেই তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহারা সুলতানের নিকট তাহাদের কৃতকার্যের জন্য দায়ী থাকিতেন।'[৩৮] কিন্তু অন্যদিকে মুহম্মদ বিন তুগলকের রাজত্বকালে সোনারগাঁওয়ের শাসনক্ষমতা জবর-দখলকারী ও স্বাধীনতা ঘোষণাকারী সুলতান ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ্ ও সাতগাঁও প্রভৃতির শাসক সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ এবং সুলতান সিকান্দর লোদির (১৪৮৯-১৫১৭) সময়ে বাংলার স্বনামধন্য শাসক সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ প্রভৃতি যদিও আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক শাসক ছিলেন (একার্থে 'ওয়ালি' বা 'মুকতি'ও বটে), তথাপি এঁদের প্রধান পরিচয় এঁরা ছিলেন বাংলার এক-একজন জনপ্রিয় ও পরাক্রমশালী স্বাধীন নরপতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সুলতান শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ দিল্লির ক্ষমতাসীন সুলতানদের সঙ্গে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কখনও কখনও নামেমাত্র উপঢৌকন প্রেরণ করতেন[৩৯], তবে অধিকাংশই দিল্লির কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলতেন। তাই বলা যায় বাংলায় জবর-দখলকারী মুকতির সংখ্যা ছিল নিতান্তই সীমিত।

যা হোক উপরের আলোচনা থেকে একটি সিদ্ধান্ত টানা যায় যে, মধ্যযুগে সুলতানী আমলে বাংলায় মুসলিম আইনশাস্ত্রবিদগণের নির্দেশিত বর্ণিত তিন ধরনের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা মুকতি'রই অস্তিত্ব ছিল, এবং এঁরা প্রধানত দিল্লির সুলতানদের প্রবর্তিত ও অনুসৃত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেটা ধারণা করা যায়। অবশ্য এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, সমসাময়িক বাংলার অদ্যাবধি এতদসংক্রান্ত যে সমস্ত শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া গেছে তাতে প্রতীয়মান হয় মোগল আমলের মতো স্বতন্ত্র কোন ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় একক বা ঐ জাতীয় কিছুর সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত অস্তিত্ব এ যুগে ছিল না। তবে এর অর্থ এটাও নয় যে এই যুগে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন বলতে বাংলায় কিছুই ছিল না। বরং সত্য এই, বিরাজমান সাধারণ প্রশাসনিক এককগুলিই এক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায়করণের দৈনন্দিন কার্যাদি সম্পাদন করতো। প্রসঙ্গত অধ্যাপক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার মত উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'ভূমি প্রশাসনের জন্য

৩৮ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৭৭
৩৯ মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ৭৯

কোন স্বতন্ত্র বিভাগের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তাতে ধারণা করা যায় যে, উপরে উল্লিখিত (ইকলিম, আরসাহ্, শিক, থানা ও মহাল) প্রশাসনিক বিভাগগুলি রাজস্ব প্রশাসন কেন্দ্র হিসাবেও কার্যকরী ছিল এবং রাজস্ব প্রশাসনের জন্য অন্য কোন স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি হয়নি।'[৪০] সুতরাং অন্য কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য বা সূত্র না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, মোগল যুগের পূর্বে অর্থাৎ সুলতানী শাসনামলে সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন বস্তুত একীভূত ছিল; দু'টির স্বাতন্ত্রিক অবস্থান উভয় বিভাগে কর্মরত আধিকারিকবৃন্দ ও কর্মচারীদের ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ভার বিন্যাস অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের ঘটনা।

এখানে আরও একটি বিষয়ের অবতারণা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। এই সময়ের বাংলায় প্রাপ্ত লিপিগুলিতে ইকতার বদলে প্রায়শই 'ইকলিম' নামক বিভাগের উল্লেখ দেখা যায়। এ থেকে মনে হতে পারে বাংলায় লোদি শাসনের অবসান অবধি হয় তো প্রদেশ বা বিভাগের প্রতিশব্দ হিশেবে 'ইকলিম'[৪১] নামেরই চল শুরু হয়েছিল। তবে 'ইকতা' ও 'ইকলিম' বা 'আকলিম'-এর মধ্যে নামগত ছাড়াও অন্য কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল কি-না, সেটা আজ আর নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও দু'টি দ্বারাই যে আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক বৃহত্তম প্রশাসনিক ইউনিটকে বুঝাতো, তা নিশ্চিত। যা হোক, এখন সাধারণভাবে ইকতা বা ইকলিম প্রশাসনিক ইউনিটের কার্যাবলি নীচে আলোচনা করা হলো।

সুলতানী যুগে ইকতা বা ইকলিম বা আরসাহ্ যে নামেই পরিচিত ছিল না কেন, ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে যে তা সংগঠিত প্রদেশ হিশেবে ভূমিকা পালন করেছিল, এ বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত। সুলতানগণ তাঁদের প্রায় সোয়া তিনশত বছরের শাসনকালে কেন্দ্রের মতো প্রদেশেও একটি বলিষ্ঠ ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। ড. বি. এন. লুনিয়া বলেন, 'The Sultans of Delhi had gradually evolved system of administration both for the centre as well as provinces.'[৪২] প্রদেশগুলিতে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক যে অবকাঠামো ছিল তা অনেকটা কেন্দ্রীয় প্রশাসনেরই ক্ষুদ্রাকার প্রতিরূপ বলা যায়। ড. লালের ভাষায়, 'The administration in the various provinces was a replica of that of the central government.'[৪৩] । যদিও 'for its working it had all the paraphernalia of the Central Government'. কিন্তু বাস্তবে, 'the various posts in the two governments did not carry indentical designation.'[৪৪] আগেই বলেছি যে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কারণে দিল্লির সালতানাতের অধীন প্রদেশগুলির একটির

৪০ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, পৃষ্ঠা ২৭৮
৪১ ড. আবদুল করিম 'ইকলিম' দ্বারা 'প্রদেশ' (বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৫) এবং ড. এম. এ. রহিম 'বিভাগ' (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪) নির্দেশ করেছেন। ড. করিমের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রচলিত 'ইকতা' ব্যবস্থার পরিবর্তে 'ইকলিম' ব্যবস্থার প্রচলন করেন। (বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৩৯৯)
৪২ Life and Culture in Medieval India, pp. 40.
৪৩ History of the Khaljis, pp.168.
৪৪ The Government of the Sultanate, pp. 63-4.

সঙ্গে অন্যটির আয়তনের ছিল বিভিন্নতা; তাছাড়া এগুলির নিজস্ব সীমা-চৌহদ্দিও সর্বদা সুনির্দিষ্ট ছিল না।[৪৫] বাংলা ছাড়া অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পদবি ছিল মুকতি, ওয়ালি, নায়েব, হাকিম প্রভৃতি। কিন্তু বাংলায় প্রাপ্ত এই সময়ের শিলালিপিগুলি থেকে দেখা যায়, এই পদবি ছিল 'উজির', 'সর-ই-লস্কর'[৪৬], ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় প্রধান হিশেবে 'সর-ই-গুমাশতাহ'[৪৭], 'সর-ই-লস্কর ওয়া ওয়াজির'[৪৮] প্রভৃতি। শেষোক্ত পদবির দু'টি অংশ। প্রথমাংশ 'সর-ই-লস্কর' বলতে বুঝাতো সৈন্যাধ্যক্ষ এবং পরবর্তী অংশ দ্বারা উজির বা মন্ত্রী। এ সময়ে প্রদেশের ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় প্রধান রূপে 'সাহিব-ই-দিওয়ান' বা 'খাজা' পদবিও কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।[৪৯] সাধারণ প্রশাসনের প্রধান 'মুকতি' বা 'ওয়ালি' এবং ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধান 'সাহিব-ই-দিওয়ান' পরস্পরের প্রায় নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতেন।[৫০]

প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিশেবে যখন কোন মুকতি সুলতান কর্তৃক নিয়োগ লাভ করতেন তখন তাঁকে শাসন বিষয়ক বেশ কিছু লিখিত নির্দেশ যাতে তাঁর দায়িত্ব-কর্তব্য নির্দিষ্ট করা থাকতো, তা দিয়ে পাঠানো হতো। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক, সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক প্রভৃতি দিল্লির শাসকগণ প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগকালে এই জাতীয় নির্দেশ দিয়েছিলেন।[৫১] আমির ফতেহ খানকে সিন্ধুর প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করে ফিরোজ শাহ তাঁকে যে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন তাতে সমকালীন একজন মুকতির দায়িত্ব-কর্তব্য সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা পাওয়া যায়। এগুলি নিম্নরূপ[৫২] :

ক. মুখ্য নির্বাহি হিশেবে দায়িত্ব পালন করা;
খ. জনসাধারণের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে কাজ করা;
গ. জ্ঞানী ও পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করা;
ঘ. ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় দপ্তরসমূহের কাজকর্মের তদারকি;
ঙ. যে কোন প্রকারের হয়রানি থেকে রায়তদের রক্ষা করা;
চ. সুষ্ঠু ও সতর্কতার সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর প্রতিপালন ও
ছ. প্রাদেশিক পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কাজের সমন্বয় ও তদারকি।

মুকতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ যখন থেকে সরকারি প্রশাসনের নিয়মিত ও বেতনভোগী কর্মচারী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েন অর্থাৎ তাদের নিয়োগ, বদলি,

৪৫ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 102.
৪৬ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৫
৪৭ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ১৮৮
৪৮ Husain Shahi Bengal, pp. 116.
৪৯ The Wonder That Was India, Vol. II. pp. 191-2.
৫০ The Life and Times of Sultan Mahmud of Ghazna, Dr. Muhammad Nazim, pp. 149.
৫১ Administration of the Sultanate of Dehli, pp. 198-9.
৫২ The Government of the Sultanate, pp. 65.

অপসারণ বা পদচ্যুতি, পদোন্নতি প্রভৃতি একটি সুষ্ঠু ও নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীন তথা আমলাতান্ত্রিক প্রথাপদ্ধতিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন তাদেরকে যে কষ্টসাধ্য ভূমিকা পালন করতে হতো, সে সম্বন্ধে Moreland সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায় :[৫৩]

"1. A Muqti had no territorial position of his own, and no claim to any particular region : he was appointed by the King, who could remove him, or transfer him to another charge, at any time...........
2. The Muqti was essentially administrator of the charge to which he was posted. ......
3. It was the Muqti's duty to maintain a body of troops available at any time for the King's service.....the strength and pay of the Muqti's troops were fixed by the King, who provided the cost; the Muqti could, if he chose, increase their pay out of his own pocket, but that was the limit of his discretionary power in regard to them.
4. The Muqti had to collect the revenue due from his charge, and after defraying sanctioned expenditure, such as the pay of the troops, to remit the surplus to the King's treasury at the capital.
5. The Muqit's financial transactions in regard to both receipts and expenditure were audited by officials of the Revenue Ministry, and any balance found to be due from him was recovered by processes."

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে বাংলায় ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে 'উজির' পদবিধারী সরকারি আধিকারিকের স্থান ছিল সর্বোচ্চ, সুলতানের অব্যবহিত পরেই। ড. আবদুল করিম বলেন, 'মধ্যযুগে শাসনব্যবস্থায় সুলতানের পরেই উজীরের স্থান ছিল। উজীরেরা শাসনকার্যে এবং রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বেসর্বা ছিলেন।'[৫৪] ড. এম. এ. রহিমও বলেন, 'দিল্লির সুলতানদের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বাঙালী মুসলমানগণ কয়েকজন মন্ত্রী নিয়োগ করতেন এবং তাদের উপর প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। সুলতান রাজস্ব পরিচালনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।....প্রধান মন্ত্রীকে উজীর বলে বিশেষভাবে আখ্যায়িত করা হত। তার দায়িত্ব ছিল রাজস্ব শাসন ও রাজকোষ রক্ষণাবেক্ষণ।'[৫৫]

প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের প্রশাসনিক, সামরিক ও অন্যান্য ব্যয়ভার সুলতান কর্তৃক বাৎসরিকভাবে পূর্বেই নির্দিষ্ট করা থাকতো।[৫৬] তারা ভূমিরাজস্ব বাবদ আয় ও অপরাপর

৫৩ The Agrarian System of Moslem India, pp. 218-20.

৫৪ *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৪*

৫৫ *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯*

৫৬ ড. কিশোরী শরণ লাল বলেন, 'His (Muqti's) salary was probably fixed in proportion to the entire revenue of his assignment.' (History of the Khaljis, pp. 169).

উৎস থেকে প্রাপ্ত রাজকোষের সমন্বিত অর্থ থেকে উক্ত নির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ কর্তন পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ[৫৭] কঠোর সৈন্য প্রহরায় কেন্দ্রে প্রেরণে বাধ্য ছিলেন। কখনও কখনও প্রেরিতব্য অর্থ যথাসময়ে কেন্দ্রে প্রেরণ না করা হলে বা কোন কারণে তা প্রেরণে বিলম্ব হলে উক্ত অর্থ ত্বরিৎ আদায়ের জন্য কেন্দ্র থেকে প্রদেশে সুলতানের প্রতিনিধি (রসুল) প্রেরণ করা হতো।[৫৮] প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, অধিকাংশ প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা মুকতিগণ কেন্দ্রে প্রকৃত আয় অনুপাতে যথা প্রাপ্য অর্থ প্রেরণে সত্য গোপন করতো ও ফাঁকির আশ্রয় নিতো।[৫৯] সাধারণত এরা আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি দেখাতো।

এ পর্যায়ে আরও দু'একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা সুলতানী শাসনামলের প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা শেষ করবো।

এক. প্রাথমিক যুগের মুকতিগণ সচরাচর প্রাদেশিক শহরেই তাদের জন্য নির্দিষ্টকৃত বাসভবনে অবস্থান করতেন এবং দাপ্তরিক কাজকারবার নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতেন। তবে রাজধানী (প্রথমত দিল্লি) নগরের নিকটবর্তী মুকতিরা অনেক সময়ে সুলতানের দরবারে সর্বদা হাজির থাকার জন্যে সুলতান কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমেও 'ইকতা' পরিচালনা করতেন।[৬০] এই প্রতিনিধিদের বলা হতো 'নায়েব'।[৬১]

দুই. সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইত্যাদিতে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মুকতিদের দপ্তরের অধস্তন কর্মচারীমণ্ডলের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৬২] তবে তা যে ছিল এটা নিশ্চিত, কেননা যদি আমরা ড. এ. বি. এম. হাবিবুল্লাহ্-এর এ উক্তিকে সত্য ধরে নিই—'Since he was a miniature king, the reproduction of the Sultan's main departments in his province can perhaps be presumed.'[৬৩], তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, প্রাদেশিক স্তরেও আমলাতন্ত্রের একটি ক্রম-নিম্ন-সম্প্রসারণশীল কর্মচারীগোষ্ঠী ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট শেরশাহ্ ও আকবরের প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের কর্মচারীমণ্ডলীর পরিকাঠামোয় এর কিছুটা নমুনা পাওয়া যায়।

প্রধানত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে যেমন 'ইকতা' ব্যবস্থার প্রচলন হয়েছিল তেমনি এর অবসানও সূচিত হয়েছিল মূলত একই কারণে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ারের নদীয়া বিজয়ের মধ্য দিয়ে দিল্লির সুলতানদের তথা মুসলমানদের সেই যে মধ্য বাংলায় পদার্পণ, তার ফলে এক সময়ে প্রায় সমগ্র বাংলা

৫৭ অনেক সময় প্রদেয় অর্থের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা থাকতো। দেখুন, The Government of the Sultanate, pp. 66.
৫৮ Some Aspects, pp. 243.
৫৯ Ibid., pp. 246.
৬০ History of the Khaljis, pp. 169; Foundation of Muslim Rule, p. 213.
৬১ Foundation of Muslim Rule in India, pp. 213.
৬২ Ibid., pp. 213.
৬৩ Ibid., pp. 213.

তাদের অধিকারে আসে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক শান্তি-সমৃদ্ধির পাশাপাশি প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ ও তাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করাও ছিল নবীন শাসককুলের জন্য খুবই জরুরি। ফলে এক পর্যায়ে পুরোনো ব্যবস্থা হিশেবে 'ইকতা'র প্রয়োজনীয়তা নিঃশেষিত হয়। চালু হয় অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সুসংগঠিত প্রশাসনিক ইউনিট 'ইকলিম' ও 'আরছা'। উল্লেখ্য, যেহেতু 'ইকতা'র স্থলে 'ইকলিম' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল সেহেতু স্বভাবতই ধরে নেয়া যায় এটিও অবশ্যই ছিল একটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক ইউনিট। তবে এক্ষেত্রে 'ইকলিম'কে (আরবি ভাষার শব্দ) অনেক ঐতিহাসিক 'প্রদেশ' (Province) রূপে বিবেচনা করলেও[৬৪] আমাদের মতে এর দ্বারা 'বিভাগ' (Division)-ই বুঝাতো। আমাদের এ ধারণার স্বপক্ষে দু'টি উল্লেখযোগ্য যুক্তি হলো :

প্রথমত শুরু থেকেই বাংলা ছিল দিল্লি সালতানাতের অধীনে অপরাপর প্রদেশের মতোই একটি দূরবর্তী, দুর্গম কিন্তু ধনসমৃদ্ধ অন্যতম প্রদেশ। একটা যুগ পর্যন্ত এখানে একাধিক 'ইকতা'র অস্তিত্ব ছিল বিধায় তখন একে সংশ্লিষ্ট 'ইকতাদার' তথা মুকতির বা সেই অঞ্চলের নাম যুক্ত করে 'ইকতা' বলা হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন 'ইকতা' ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়, তখন একে বাংলা মুলুক[৬৫] বা অঞ্চলবিশেষের পরিচয়ে যেমন সোনারগাঁও, সাতগাঁও, লখনৌতি বা লক্ষ্মণাবতী, গৌড় প্রভৃতি নামে ডাকা হতো। অথচ সমগ্র বাংলাকে 'ইকলিম' নামে অভিহিত করা হয়েছে এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে, দিল্লির শাসককুলের অধীনতা মুক্ত হয়ে বাংলার স্থানীয় শাসকগণ যখন স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন শুরু করেন (১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর বাংলা দিল্লির পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ মুক্ত হয়ে কখনও ভিন্ন ভিন্ন, আবার কখনও একক রাজ বংশের নানা শাসকের মাধ্যমে শাসিত হয়), তখন তো বাংলা দিল্লির কোন প্রদেশ ছিল না। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত যুক্তি কার্যকর কি-না? এর উত্তর, নিঃসন্দেহে 'না'। বস্তুত প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ বলে এ পর্যায়েও 'ইকলিম' দ্বারা আদৌ 'প্রদেশ' বুঝাতো না। উদাহরণস্বরূপ সমসাময়িক বেশ কিছু মুদ্রা ও শিলালিপির ভিত্তিতে প্রাপ্ত এতদসম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য এখানে আমাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে উদ্ধৃত করা গেলো। যেমন[৬৬] :

৬৪ The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, p. 221; The Wonder That Was India, Vol. II., p. 191; The Sultanate of Delhi, Haq, q. 214; বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৫; বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম প্রমুখ, পৃষ্ঠা ২৩৭।

৬৫ "সুলতানী আমলের বাংলা সাহিত্যে রাজ্যের উপ-বিভাগগুলিকে 'মুলুক' এবং তাদের শাসনকর্তাকে 'মুলুকপতি', 'অধিকারী' ইত্যাদি বলা হয়েছে।" (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা : প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ, কে. এম. রাইছউদ্দিন খান, পৃষ্ঠা ৪২৪)

৬৬ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১২; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।

মুদ্রায়	ইকলিম	ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ
	আরছা	আরছা সাতগাঁও
		আরছা চাটগাঁও
		আরছা আওয়ালিস্তান ওরফে কামরূ
শিলালিপিতে	ইকলিম	ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ
		ইকলিম মোবারকাবাদ
	আরছা	আরছা শ্রীহট্ট
		আরছা হাদিগড়
		আরছা সাজলা মনখাবাদ, প্রভৃতি।

উপরের সংক্ষিপ্ত তালিকা থেকে দেখা যায়, ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ মুদ্রা ও শিলালিপি—উভয়টিতে এবং ইকলিম মোবারকাবাদ শুধু সুলতান নাসিরউদ্দিন মাহমুদের একটি শিলালিপিতে উল্লিখিত।[৬৭] ড. আবদুল করিম মনে করেন যে, ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ঢাকা জেলার (বর্তমান নারায়ণগঞ্জ) সোনারগাঁওয়ের অদূরস্থ মুয়াজ্জমপুরের সঙ্গে অভিন্ন এবং সোনারগাঁও থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে সিলেট পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যদিকে ইকলিম মোবারকাবাদ ঢাকা থেকে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পরিব্যাপ্ত হয়ে দক্ষিণ ঢাকা ও বর্তমান ফরিদপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল।[৬৮] উভয় ইকলিমের অধীনে বিস্তীর্ণ ভূভাগ ছিল বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা।

মধ্য বাংলায় এ যাবৎ যতোগুলি প্রসিদ্ধ নগরী বা অঞ্চলের নাম পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিকীর্তিত তিনটি হলো—লখনৌতি, সোনারগাঁও ও সাতগাঁও। মুয়াজ্জমাবাদ ও মোবারকাবাদ—এর প্রসিদ্ধি খুবই কম, নেই বললেও অত্যুক্তি হবে না। পরবর্তীকালে 'আইন'-এর সময়ে তৎকালীন বাংলাকে যখন সম্রাট আকবর ১৯টি সরকারে, যথা ঃ[৬৯] (১) জান্নাতাবাদ বা লখনৌতি (২) ফতেহাবাদ (৩) মাহমুদাবাদ (৪) খলিফাতাবাদ (৫) বাকলা (৬) তাজপুর (৭) ঘোড়াঘাট (৮) পিঞ্জরা (৯) বারবকাবাদ (১০) বাজুহা (১১) সোনারগাঁও (১২) সিলেট (১৩) চাটগাঁও বা চট্টগ্রাম (১৪) শরিফাবাদ (১৫) সোলায়মানাবাদ (১৬) সাতগাঁও (১৭) মন্দারণ (১৮) পূর্ণিয়া ও (১৯) তান্ডা'য়—বিভক্ত করে প্রশাসনিক পুনর্গঠন করেন সেখানেও ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ও মোবারকাবাদের নাম দেখা যায় না। অথচ প্রাচীনতা তথা ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সমকালীন রাজনৈতিক প্রসিদ্ধির জন্য লখনৌতি, সোনারগাঁও, সাতগাঁও প্রভৃতির অবস্থান এখানে সুরক্ষিত। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মধ্যবাংলার প্রশাসনিক এককের পূর্বোদ্ধৃত তালিকায়

৬৭ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১২।

৬৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১২-১৩; প্রখ্যাত ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা H. Blochmann-এর মতে ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ছিল বর্তমানের (১৮৭৩) পূর্ব-ময়মনসিংহ। (Contributions to the Geography and History of Bengal : Muhammedan Period, p. 6)

৬৯ The Ain-i-Akbari, Vol. II., pp. 143-155; Contributions to the Geography and Histroy of Bengal, Ibid., pp. 11. সর্বমোট ৬৮২টি 'মহাল' নিয়ে আলোচ্য 'সরকার'গুলি গঠিত হয়েছিল। (বাংলাদেশ জেলা গেজেটিয়ার : বৃহত্তর ঢাকা, ৬২৪)

সাতগাঁও, চাটগাঁও, সিলেট ইত্যাদিকে 'আরছা' হিশেবে বর্ণনা করা হয়েছে। 'আরছা' বলতে ড. আবদুল করিম[৭০] ও ড. আবদুল মমিন চৌধুরী[৭১] জেলা বুঝিয়েছেন। এক্ষেত্রে সাতগাঁও-এর মতো একটি অতিপ্রসিদ্ধ 'ইকতা'[৭২]-কে 'আরছা' (ড. করিম ও ড. মমিনের ভাষায় যার অর্থ জেলা) বলা হচ্ছে, অথচ পূর্বাপর প্রায় অখ্যাত ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ ও ইকলিম মোবারকাবাদ, যা পূর্বোক্ত ঐতিহাসিকদের মতে 'প্রদেশ'রূপে গণ্য, এই অর্থ-নির্দেশ আদৌ যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। তা সত্ত্বেও যেহেতু ইকলিম হিশেবে মুয়াজ্জমাবাদ ও মোবারকাবাদ এবং আরছা হিশেবে সাতগাঁও প্রভৃতির উল্লেখ মুদ্রা ও শিলালিপিতে পাওয়া যায়, সেহেতু উভয়ের বাস্তবতাকে অস্বীকার না করে আমরা মনে করি 'ইকলিম' ও 'আরছা' দ্বারা মূলত প্রশাসনিক 'বিভাগ' (Division) বুঝাতো। প্রসঙ্গত Moreland-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'Beyond Tirhut was Lakhnauti, or Western Bengal, which was sometimes a province, but usually a kingdom, subordinate or independent according to circumstances.'[৭৩] পর্যালোচ্যক্ষেত্রে 'province' কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়।

সুতরাং সার্বিক বিবেচনায় বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার কালের কথা স্মরণে রেখেও এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মধ্যবাংলা প্রায় সময়ই যেখানে দিল্লির অধীনে নিজেই একটি প্রদেশ, সেখানে একটি প্রদেশের অধীনে ইকলিম মুয়াজ্জমাবাদ প্রভৃতি প্রদেশ না হয়ে বরং প্রশাসনিক 'বিভাগ' হওয়াটাই ছিল অধিক যুক্তিসঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য। আমাদের এ মতের সমর্থনে ড. এম. এ. রহিমের বক্তব্যও উদ্ধৃত করতে পারি। তাঁর ভাষায়, 'প্রশাসনের সুবিধার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি বিভাগকে বলা হ'ত ইকলিম বা 'আরসাহ'।'[৭৪] ড. রহিম অবশ্য ড. এ. এইচ. দানীর সঙ্গে[৭৫] একমত হয়ে বলেন যে, 'তৎকালীন পূর্ববাংলার বিভাগগুলির নাম হয় ইকলিম এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলার বিভাগগুলির নাম হয় 'আরসাহ'।[৭৬] কিন্তু আমরা তাঁর এই শেষোক্ত মতের সঙ্গে ভিন্নতা পোষণ করি। যুক্তি হিশেবে ড. আবদুল করিমের ভাষায় বলতে পারি 'এই পর্যন্ত প্রাপ্ত সূত্রে পশ্চিম বঙ্গের কোথাও ইকলীমের নাম পাওয়া যায় নাই, কিন্তু পূর্ব ও

৭০ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, ৪০৫, ৪১৩; অধ্যাপক কে. এম. রাইছউদ্দিন খানের মতে 'অরসহ' ও 'মুলুক' (রাজ্যের উপ-বিভাগ একার্থবোধক, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৪; ড. মমতাজুর রহমান তরফদার মধ্যবাংলায় 'আরছা' বলতে 'প্রদেশ' (Province)-ও বুঝাতো বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, 'Husain Shahi Bengal', pp. 116.

৭১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৩৭।

৭২ স্মর্তব্য এখানে মুহম্মদ বিন তুগলকের সময়ে অজিউদ্দিনকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছিল। (বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ১৬০; বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব, পৃষ্ঠা ১৩০)।

৭৩ The Agrarian System, pp. 24.

৭৪ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪

৭৫ Bibliography of the Muslim Inscriptions of Bengal, pp. 109.

৭৬ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫।

পশ্চিমবঙ্গ উভয় এলাকাতেই আরছার নাম পাওয়া যায়।'[৭৭] সুতরাং ড. রহিম ও ড. দানীর পূর্বোক্ত মত বাস্তব কারণেই গ্রহণযোগ্য নয়। অবশ্য ড. আবদুল মমিন চৌধুরী এ দু'টি সম্বন্ধে নতুন একটি তথ্য দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'লিপি ও মুদ্রায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিলে এই কথা প্রমাণিত হয় যে ইকলিম দ্বারা বড় এলাকা ও আরছা দ্বারা ছোট এলাকা বুঝাইত এবং আরছা ইকলীমেরই অংশবিশেষ।'[৭৮]

তবে চূড়ান্ত বিচারে প্রদেশ, বিভাগ ও জেলার জন্য 'ইকলিম' ও 'আরছা' অভিধাগুলি আসলেই বিভ্রান্তিকর। কেননা, 'there was hardly any uniformity in the administrative terminology of the country.'[৭৯] হোসেনশাহি আমলের তৎকালীন বাংলা সম্বন্ধে এ কথা বলা হলেও আদতে এ উক্তি সমগ্র প্রাক-মধ্যবাংলা সম্পর্কে সত্য। প্রমাণস্বরূপ 'আরছা'র কথা বলা যায়। অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই যখন 'আরছা' বা 'আরসাহ' দ্বারা 'জেলা' নির্দেশ করেছেন এবং ক্ষেত্রত যা যথার্থও বটে[৮০], তখন যে মুহূর্তে আমরা 'অরসহ বঙ্গালহ' বলতে সমগ্র মধ্যকালীন বাংলাকে নির্দেশিত হতে দেখি[৮১], তখন সত্যি বলতে আমাদের বিভ্রান্তির আর সীমা থাকে না। তাই বলা যায়, যে পর্যন্ত না 'ইকলিম', 'আরছা' প্রভৃতির সুনিশ্চিত ও সপ্রমাণ অর্থ ও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, তদবধি এগুলিকে আপেক্ষিক অর্থেই গ্রহণ করা সমীচীন। নতুবা অর্থ-বিভ্রান্তির চোরাবালিতে পা ডুবে যাবার সম্ভাবনা সমধিক।

শিক ও সরকার

প্রশাসনিক প্রয়োজনে সাম্রাজকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে যেমন 'ইকতা', 'ইকলিম', 'আরছা' প্রভৃতি ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, তেমনি একই কারণে এগুলিকে বিশেষ করে প্রদেশকে ভাগ করে একাধিক অপেক্ষাকৃত ছোট ইউনিটও চালু করা হয়। তবে প্রাপ্ত তথ্য প্রমাণ থেকে মোটামুটি জানা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত 'ইকতা' ও 'গ্রাম' প্রশাসনের মধ্যবর্তী অন্য কোন প্রশাসনিক এককের অস্তিত্ব ছিল না, বা থাকলেও সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।[৮২] বস্তুত তুগলক বংশীয় শাসকদের সময় থেকেই মধ্যবর্তী ইউনিটগুলি ফলপ্রসূভাবে কার্যক্রম শুরু করে[৮৩], এবং লোদি শাসকদের সময়ে তা মোটামুটি একটি স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করে বললে অত্যুক্তি হয় না। বলাবাহুল্য এই মধ্যবর্তী এককগুলির মধ্যে প্রদেশের বা বিভাগের অব্যবহিত (Immediate) পরবর্তী স্তরটি

৭৭ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১৩।
৭৮ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৪০।
৭৯ Husain Shahi Bengal, pp. 114.
৮০ উদাহরণস্বরূপ 'আরছা' শ্রীহট্টের কথা বলা যায়।
৮১ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা ১৮৮।
৮২ The Foundation of the Muslim Rule in India, p. 215; History of Medieval India, Dr. L. P. Sharma, pp. 196.
৮৩ The Administration of the Sultanate of Dehli, p. 202.

কী ছিল, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন এটি ছিল 'শিক', কেউ 'পরগণা', আবার কেউ 'সরকার', 'সাদি' প্রভৃতি। তবে অধিকাংশ খ্যাতনামা ঐতিহাসিকই এটিকে 'শিক' হিশেবে উল্লেখ করেছেন যা বস্তুত লোদি যুগ ও পরবর্তীকালে 'সরকার'-এ রূপান্তরিত হয়।[৮৪] আমরাও এই মতের সমর্থক। অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, মধ্যবাংলায় একটা সময় পর্যন্ত এর কিছুটা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছিল যা যথাস্থানে আলোচনা করা হবে।

এ পর্যায়ে প্রথমেই ড. এল. পি. শর্মার একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'there was no smaller administrative unit than Iqta by the end of the thirteenth century. After that Iqtas were divided into smaller units called shiqqs which were put under shiqqdars. When the empire decayed, the shiqq emerged as a sarkar and the officer incharge of a sarkar was called shiqqdar-i-shiqqdaran or the chief shiqqdar.'[৮৫]

'ইকতা' ও 'ইকলিম'-এর অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে 'শিক' যে তুগলক শাসনামলেই বিকাশ লাভ করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলকের সময় সংক্রান্ত জিয়াউদ্দিন বারানির বক্তব্যে। 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহি' থেকে জানা যায় সুলতান দাক্ষিণাত্য প্রদেশকে চারটি 'শিকে' বিভক্ত করেছিলেন।[৮৬] শুধু তাই নয়, দোয়াবের বিদ্রোহীদের দমনের জন্য তিনি শিকদার ও ফৌজদারদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন বলে বারানি জানান।[৮৭] সমসাময়িক ঐতিহাসিকের সূত্রে ড. কোরেশি তাই যথার্থই ধারণা করেছেন যে, 'It is obvious that there were several shiqqdars in the province,...'[৮৮] ড. মীরা সিংহও বলেন, 'A Shiq, in all probability was used for areas like the Doab country, which were in the vicinity of Delhi and were smaller than a province.'[৮৯] যদিও এ বিষয়ে কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না, তথাপি এটা ধারণা করা যায় যে, মুহম্মদ বিন তুগলকের মতো একজন অত্যুচ্চবিলাসী মধ্যযুগীয় শাসক শিকের মতো একটি অপেক্ষাকৃত সংগঠিত ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা দোয়াব ও দিল্লির বাইরে অন্যান্য প্রদেশেও সম্প্রসারিত করেছিলেন।[৯০]

৮৪ The Rise & Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 224; The Sultanate of Delhi, Dr. Haq, pp. 215; The Government of the Sultanate, pp. 69; History of Firuz Shah Tughluq, pp. 102; The Administration of the Sultanate, pp. 201-2; Moreland তাঁর 'The Agrarian System' গ্রন্থে (pp. 25) চতুর্দশ শতকের বিকাশমান অবস্থায় 'শিক'কে প্রদেশের সমার্থক মনে করেছেন।

৮৫ History of Medieval India, pp. 196.

৮৬ The Administration of the Sultanate, pp. 201.

৮৭ Ibid., pp. 201.

৮৮ The Administration of the Sultanate, pp. 202.

৮৯ Medieval History of India, pp. 167.

৯০ বাংলায় এই আমলে 'শিক' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল কি-না, তার কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশাসনিক বিভাগ হিশেবে 'শিক'-এর সর্বোচ্চ নির্বাহি কর্মকর্তা ('highest executive officer') ছিলেন 'শিকদার'।[৯১] তাঁকে কখনও কখনও 'আমিল'ও বলা হতো।[৯২] আবার দোয়াব অঞ্চলে তিনি 'ফৌজদার' হিশেবে পরিচিত ছিলেন।[৯৩] বারানি 'শিক'কে রাজস্ব-স্বত্ব রূপে বিবেচনা করেছেন।[৯৪] সে মতে এককথায় বলা যায় ভূমিরাজস্ব আদায় করাই ছিল শিকদারের প্রধান কাজ। তবে যেহেতু নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক রায়তদের দমন করার দায়িত্বও তাঁকে অর্পণ করা হতো, সেহেতু মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও তাঁর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আগেই বলেছি পরবর্তীকালে 'শিক'কে আরও পরিশীলিত রূপ দিয়ে 'সরকার'-এ রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এতে করে নবতর প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে 'সরকারে'র যে স্বরূপ দাঁড়িয়েছিল তা অনেকটা আধুনিককালের 'জেলা'র অনুরূপ। সুতরাং এটা মোটামুটি নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, সুলতানী যুগের 'শিক'ই ছিল আধুনিক যুগের জেলার সূচক।[৯৫]

শেরশাহের পূর্ব পর্যন্ত সময়কালে শিকের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছিল সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকের রাজত্বে। ড. উপেচন্দ্র নাথ দে বলেন, 'During the reign of Firuz Tughlaq shiq acquired a more definite shape,..'[৯৬] তাঁর সময়েই সিরহিন্দ, সালুরা, সামানা, হিসার ফিরোজা, খিজরাবাদ, সম্বল, বাদাউন, কোয়েল, গোয়ালিয়র, ফিরোজপুর, মেয়াট, বায়ানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য 'শিক' হিশেবে প্রসিদ্ধি অর্জন করে।[৯৭] ফিরোজশাহ তুগলকের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী শাসকদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতা, এবং সৈয়দবংশীয় সুলতানদের বিজয়-এর মধ্যবর্তী সময় পর্বে সাম্রাজ্যব্যাপী যে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়, তার ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে 'শিক' নামের মর্যাদা লোপ পায়—'the shiqq seems to have disappeared during the anarchy following that Sultan's (Firuz Shah) death.'[৯৮] লোদি সুলতানগণ প্রচলিত 'শিক' ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করে একে 'সরকার' অভিধা প্রদান করেন। ড. দে উল্লেখ করেন, 'With the coming of the Lodis the term shiq seems to have been replaced by the term sarkar. The former shiqs emerged during the rule of the Lodis as well defined administrative units through an evolutionary process and came to be called as sarkars.'[৯৯]

৯১ The Administration of the Sultanate, pp. 202.
৯২ The Sultanate of Delhi, Dr. Haq, pp. 215.
৯৩ History of the Lodi Sultans of Delhi & Agra, pp. 231.
৯৪ See fn. of The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 224.
৯৫ The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 224.
৯৬ The Government of the Sultanate, pp. 70.
৯৭ Ibid., pp. 70.
৯৮ The Administration of the Sultanate, pp. 202.
৯৯ The Government of the Sultanate, pp. 70.

প্রশাসনিক এই রূপান্তর বা পরিবর্তন যা-ই বলা হোক না কেন, এটি সম্ভব হয়েছিল মূলত দু'ভাবে।

প্রথমত পিতা বাহলুল লোদির অনুসরণে সুলতান সিকান্দর লোদি প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় 'শিক'সহ স্থিত প্রদেশগুলির সীমানা নতুনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন।[১০০] পুনর্বিন্যস্ত এই প্রশাসনিক একক বা 'সরকার' (তখন পর্যন্ত সংখ্যায় ৩২টি) ছিল বর্তমান যুগের জেলার চেয়ে বড় কিন্তু বিভাগ অপেক্ষা ছোট।[১০১]

দ্বিতীয়ত সরকারগুলির প্রশাসকদের পদবি পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়েছিল, যেমন 'নায়েব' বা 'নায়েব-ই-সুলতান' (Vicegerent of the Sultan)[১০২]। সেই সঙ্গে নতুন প্রশাসকদের দায়িত্ব-কর্তব্যও লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছিল।

নবগঠিত প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে প্রতিটি 'সরকার' ছিল—'a miniature of the central government'।[১০৩] 'নায়েব-ই-সুলতান' সরাসরি সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন, ফলে তাঁর জবাবদিহিতাও ছিল সুলতানের কাছেই। যা হোক, সাধারণ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহি হিশেবে তাঁর মুখ্য কাজ ছিল, 'to supervise the pargana Shiqqdars, enforce the farmans of the Sultan, maintain army and render armed help to the Sultan when he required such help, suppress rebellions within his jurisdiction, settle boundary disputes between the parganas, impart justice with appellate jurisdiction from the decision of the Qazis and act as a court in the first instance; and see that taxes prescribed by religious law were levied with justice, and watch that criminal justice was administered with fairness.'[১০৪]

অন্যদিকে 'সরকার' ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব বিভাগের মুখ্য আধিকারিক ছিলেন 'দিওয়ান'। তিনিও সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। ভূমিরাজস্বসহ সকল প্রকারের কর ধার্য ও আদায় করাই ছিল তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ। 'দিওয়ান' রাজস্বসংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারতেন। ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় অধস্তন কর্মচারী যেমন 'পরগণা-দিওয়ান', 'মুশরিফ' বা হিসাবরক্ষক, 'মুস্তোফি' বা নিরীক্ষক প্রভৃতির ওপর তাঁর ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব। 'সরকারে'র ভূমিরাজস্ব বিষয়ে যদিও দিওয়ানই ছিলেন সর্বেসর্বা এবং 'নায়েব-ই-সুলতানে'র প্রত্যক্ষ কোন নিয়ন্ত্রণ তাঁর ওপর ছিল না, তথাপি তাদেরকে নিজস্ব প্রয়োজনেই পারস্পরিক যোগাযোগ, সম্প্রীতি ও সমন্বিত উদ্যোগ রক্ষা করে চলতে হতো বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে বিশেষ করে বিদ্রোহী ও ভূমিরাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত বা অবাধ্য রায়তদের

১০০ History of the Lodi Sultans..., pp. 231.
১০১ Ibid., pp. 232.
১০২ Ibid., pp. 234.
১০৩ Ibid., pp. 234.
১০৪ History of the Lodi Sultans, pp. 234-5.

দমনের ক্ষেত্রে 'দিওয়ান'কে যেমন 'নায়েব-ই-সুলতানে'র সহযোগিতা গ্রহণ করতে হতো (সাধারণত সৈন্যসামন্ত দিয়ে এই সহায়তা করা হতো), তেমনি অনিয়মিত ও অতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয় ভার মঞ্জুরির জন্য 'নায়েব-ই-সুলতান'কেও 'দিওয়ান'-এর মন-মর্জির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হতো। ফলে বলা যায় তারা ছিলেন একে-অপরের পরিপূরক। যা হোক, সার্বিক বিচারে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়, যদিও সুলতানী আমলে বিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে 'সরকার' ব্যবস্থায় সাধারণ প্রশাসন এবং ভূমিরাজস্ব প্রশাসন একে অন্যের প্রায় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল, তা সত্ত্বেও দু'টির সমন্বয়ে একটি অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি হয়েছিল—'The Sarkar government thus was complete in itself.'[১০৫]

এ পর্যায়ে প্রাক-মধ্যবাংলার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথা বলতে পারি। এ পর্বে আমরা 'ইকতা' ও 'ইকলিম'-এর পরবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে 'আরছা'কে দেখতে পাই। যদিও সত্য কথা বলতে এই ব্যবস্থাও স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। বরং ক্ষেত্রত তা প্রবল বিভ্রান্তিকরও বটে।

সমকালীন বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ, শিলালিপি ও মুদ্রায় বাংলার যে সব অঞ্চলের নাম 'আরছা'রূপে পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বেশ কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। যথা—সাতগাঁও, চাটগাঁও,শহর-ই-নৌ (সম্ভবত পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদ এলাকা), সাজলা মনখাবাদ, ঘোড়াঘাট, সিরাহাট, গৌড় (হোসেনাবাদ-নুসরতাবাদ-মুহম্মদাবাদসহ), খলিফাতাবাদ, ফতেহাবাদ, কামরূ (কামরূপ), দেবকোট, বিহার শরিফ প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের যুগেও ফতেহাবাদ, খলিফাতাবাদ, ঘোড়াঘাট, চাটগাঁও, সাতগাঁও 'সরকারে'র মর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখেছিল। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মুসলিম শাসকগণ সাধারণত বিভাগীয় শহরগুলিকেই তাঁদের মুদ্রা তৈরির কেন্দ্র হিশেবে গড়ে তুলতেন।[১০৬] উদাহরণস্বরূপ ইলিয়াসশাহি বংশের সুলতান সিকান্দার শাহের রাজত্বকালের (১৩৫৭-১৩৯৩) একটি মুদ্রার কথা বলা যায়, যাতে পূর্বোক্ত 'কামরূ'র উল্লেখ রয়েছে 'আরছা' হিশেবে। সুতরাং ধরেই নেয়া যায় 'আরছা' ছিল একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ, যার অবস্থান ছিল সম্ভবত প্রদেশেরই অব্যবহিত পরবর্তী স্তরে। 'উজির' বা 'সর-ই-লস্কর' ছিলেন 'আরছা' বিভাগের প্রধান অধিকর্তা। তিনি একদিকে যেমন দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের মুখ্য নির্বাহি ছিলেন[১০৭], তেমনি ভূমিরাজস্ব প্রশাসনেরও ছিলেন কর্ণধার।[১০৮] অবশ্য সমসাময়িক কোনও কোনও শিলালিপিতে 'সর-ই-গুমাশতাহ্' পদবির একজন রাজকর্মচারীর নাম পাওয়া যায় যাকে ড. অতুল সুর ভূমিরাজস্ব বিভাগের প্রধান আধিকারিক

১০৫ Ibid., pp. 236.
১০৬ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।
১০৭ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৩৭।
১০৮ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪০৫।

রূপে আখ্যায়িত করেছেন।[১০৯] তবে আমাদের মনে হয় এই কর্মচারী 'আরছা' স্তরের নয়, বরং পরবর্তী প্রশাসনিক বিভাগ তথা 'পরগণা' স্তরের রাজস্ব কর্মচারী ছিলেন। যা হোক, 'আরছা' ব্যবস্থার অন্তিমে যে বাংলায় 'শিক' পদ্ধতি চালু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সুলতান রুকনউদ্দিন বারবক শাহ (১৪৫৯/৬০-১৪৭৪) ও সুলতান জালালউদ্দিন ফতেহ মুহম্মদ শাহ (১৪৮১-৮৭) এর লিপিতে। এঁদের সময়কার শিলালিপিতে 'শিকদার' শব্দের উপস্থিতি থেকে প্রতীয়মান হয় সম্ভবত তখন 'কয়েকটি মহাল নিয়া একটি 'শিক' গঠিত হইত এবং শিকের শাসনকর্তাকে শিকদার বলা হইত।'[১১০]

পরগণা

'শিক' ও 'সরকার'-এর অব্যবহিত পরবর্তী স্তরের প্রশাসনিক একক ছিল পরগণা।[১১১] 'পরগণা' ফারসি ভাষাজাত শব্দ[১১২], প্রশাসনিক বিভাগের নাম হিশেবে সম্ভবত 'প্রতিগণা' অভিধায় রাজপুতগণই এর প্রথম ব্যবহার করেন[১১৩] যা থেকে মুসলমান শাসকসম্প্রদায় একে ঈষৎ বিবর্তিতরূপে গ্রহণ করে থাকবেন।[১১৪] মোগল আমলে অতিগুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক একক হিশেবে 'পরগণা'র যে চূড়ান্ত ও স্থায়ী রূপ দেখা যায় তার সত্যিকার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল বস্তুত সুলতানী যুগে বিশেষত লোদি শাসকদের সময়ে। সুলতান বাহলুল লোদি প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'পরগণা'কে নিয়মিত করেন এবং সুলতান সিকান্দার লোদি দেন এর অধিকতর উন্নত ও পরিশীলিত রূপ। ড. আবদুল হালিমের ভাষায় বলতে পারি, 'We have seen that a start in making the Pargana as the unit of administration was made by Bahlul and completed by Sikandar Lody.'[১১৫]

এখানে মনে রাখা দরকার যে 'পরগণা'র অস্তিত্ব এই উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের প্রায় প্রাথমিক যুগ থেকেই ছিল। বারানি তাঁর রচনায় 'পরগণা'র উল্লেখ করেছেন।[১১৬] স্বভাবতই বলা যায় তুগলক বা তার পূর্ববর্তী মুসলমান শাসকদের সময়ে সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থায় এর প্রচলন ছিল, যদিও এই ধরনের কোন নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা অদ্যাবধি পাইনি। প্রসঙ্গত জগদ্বিখ্যাত আফ্রিকীয় পরিব্রাজক ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনী থেকে এখানে একটি সূত্রের উল্লেখ করা যায়। মরক্কো

১০৯ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা ১৮৮।
১১০ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৪১।
১১১ ড. ইসতিয়াক হোসেন কোরেশি বলেন, 'The next smaller unit after Shiqq or the Sarkar was the parganah'. (The Administrion...., pp.203).
১১২ বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাল, পৃষ্ঠা ২১৬; শব্দ সঞ্চয়িতা : বাংলা অভিধান, সম্পাদনা ড. মিলন দত্ত ও অধ্যাপক অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫১৫।
১১৩ The Government of the Sultanate, pp. 69.
১১৪ Ibid., pp. 69.
১১৫ History of the Lodi Sultans..., pp. 236.
১১৬ তিনি তাঁর 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহি'তে 'পরগণা'র আভাস দিলেও এ সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলেননি।

দেশীয় এই মুসলিম পরিব্রাজক ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ পরিভ্রমণ করেন।[১১৭] তার আগে ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে তিনি ভারতে প্রবেশ করেন এবং কাবুল থেকে পেশোয়ার ও মুলতান হয়ে দিল্লিতে পৌঁছেন। দিল্লির সালতানাত তখন মুহম্মদ বিন তুগলকের দখলে। ইবনে বতুতা দীর্ঘ আট বছর সুলতানের অধীনে কাজির পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরে তাঁর এই ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে তিনি 'তুহ্ফাত-উন-নুজ্জার ফি ঘরাইব-ইল অমসার ওয়া আজাইব ইল-অসফার' বা সংক্ষেপে 'রেহ্লা' নামক যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন, তাতে মধ্যযুগীয় পরিব্রাজক 'সাদি' নামীয় একটি প্রশাসনিক বিভাগের উল্লেখ করেছেন। তিনি এটির যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে মনে হয় 'সাদি' ছিল ভূমিরাজস্ব আদায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত ১০০টি গ্রামবিশিষ্ট একটি প্রশাসনিক এলাকা বা ইউনিট।[১১৮] ড. ইসতিয়াক হোসেন কোরেশি[১১৯], ড. উপেন্দ্রনাথ দে[১২০] প্রমুখ 'সাদি'কে 'পরগণা'রই প্রতিরূপ বলে বিবেচিত করেছেন। যদিও সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনায় ও পরবর্তীকালে এর আর কোন উল্লেখ না পাওয়ায় তাঁরা ধারণা করেন সম্ভবত এই অভিধাটি একটি বিশেষ অঞ্চলে (ইন্দ্রপথ) সীমাবদ্ধ ছিল[১২১], সাধারণ প্রচলিত ইউনিট হিশেবে এর অস্তিত্ব ছিল না।[১২২] পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে ইবনে বতুতার বক্তব্যের সঠিকতা যাই থাক না কেন, তা থেকে একটা ধারণা নিঃসন্দেহে করা যায় যে, সুলতানী আমলে কোন কোন 'পরগণা' ১০০টি বা অনুরূপ সংখ্যক গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠতো—'a pargana generally contained hundred villages.'[১২৩] তবে ১০০টি না হলেও 'পরগণা' যে একাধিক গ্রামের সমষ্টি ছিল এটা সকল আধুনিক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন।[১২৪]

এ পর্যায়ে 'পরগণা' প্রশাসনেরই প্রায় সমান্তরাল আরও দু'টি প্রশাসনিক ইউনিটের নাম উল্লেখ করা যায়। এর একটি 'কসবা' বা 'কসবাহ্' ও অপরটি 'খিত্তা' বা 'খিত্তাহ'।

১১৭ বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা ২০

১১৮ ড. আগা মাহদী হুসেন বলেন, 'The Sadi was the lowest administrative unit. Its supreme officer, namely, the amir-i-sadah, had under him a large number of subordinate officials—-the chaudhri, the mutasarrif, the patwari, the sarhang, the balahar, the khut and the piyadah, all of them Hindus.' (The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 225).

১১৯ The Administration of the Sultanate, pp. 203.

১২০ The Government of the Sultanate, pp.69.

১২১ The Administration of the Sultanate, pp. 203.

১২২ The Government of the Sultanate, pp. 69.

১২৩ Ibid., pp. 69. ড. শ্রীবাস্তবও স্বীকার করেন যে, পরগণা ছিল, 'an aggregate of a number of villages'. (The Sultanate of Delhi, pp. 290)

১২৪ Some Aspects, pp.304; The History of the Afghans in India, pp.97; The Agrarian System, p.276; History of Firuz Shah Tughluq, pp.102; The Wonder That Was India, Vol-II. p.194. History of the Lodi Sultans...., pp. 236.

দু'টিই প্রাক-মধ্যবাংলায় ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। যেমন 'লখনৌতি'—মুদ্রা প্রমাণে এটি 'কসবা' ও 'খিত্তা' উভয় স্বরূপেই বর্তমান ছিল।[১২৫] 'ঢাকা খাস' ছিল কসবা। আরবি শব্দ 'কসবা'-এর আভিধানিক অর্থ 'একটি পাড়া বা শহর পার্শ্ববর্তী স্থান'।[১২৬] প্রশাসনিক বিন্যাসে 'কসবা' বলতে বুঝাতো, 'the aggregate of villages.'[১২৭] বা নগর (City) অপেক্ষা ছোট শহর (Town)[১২৮], যা সচরাচর দুর্গ বা স্থায়ী সামরিক ছাউনিবিহীন[১২৯] হতো। অন্যদিকে 'খিত্তা' ছিল মূলত দুর্গসম্বলিত কসবা।[১৩০] তবে এটা সত্য যে চুলচেরা বিচারে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে 'শহর' (ব্যবসা কেন্দ্রবহুল নগর), 'কসবা' ও 'খিত্তার মধ্যে বিশদ পার্থক্য নির্ণয় করা বাস্তবিকই দুরূহ, বলা যায় এগুলি ছিল 'প্রায় একার্থবোধক'।[১৩১]

যা হোক, 'কসবা'র পরিবর্তে 'পরগণা' শব্দের প্রথম ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগের অন্যতম ঐতিহাসিক শামস-ই সিরাজ আফিফের 'তারিখ-ই ফিরুজশাহি'তে।[১৩২] তৎপরবর্তীকালে লোদি সুলতানদের সময়ে 'কসবা' একটি নিয়মিত 'প্রশাসনিক বিভাগ ও ভূমিরাজস্ব স্বত্বের সূচক'[১৩৩] হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই থেকে 'পরগণা'র প্রধান নির্বাহীকে কখনও 'পরগণাদার'[১৩৪], কখনও 'শিকদার' বা 'পরগণা-শিকদার'[১৩৫], আবার কোনও কোনও সময় 'মুতাহশরিফ' বা 'আমিল'[১৩৬] প্রভৃতিও বলা হতো।

সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে 'পরগণা' প্রশাসনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিস্তৃতি ঘটে। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি এটি সংগঠিত অবস্থায় লোদি সুলতানদের কাছ থেকে লাভ করলেও সত্যি বলতে মাঠ পর্যায়ের একটি প্রশাসনিক একক হিশেবে 'পরগণা' অবকাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল শেরশাহের সময়েই।[১৩৭]

১২৫ দেখুন, বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১২।
১২৬ বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃষ্ঠা ৬২।
১২৭ The Agrarian System, pp. 18.
১২৮ The Administration of the Sultanate, pp. 203.
১২৯ বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা ১৮৮।
১৩০ The Administration of the Sultanate, pp. 203.
১৩১ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১৩; বাংলাদেশের ইতিহাস; ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৪১।
১৩২ The Agrarian System, pp. 18-9.
১৩৩ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৮।
১৩৪ History of Firuz Shah Tughluq, pp. 102.
১৩৫ History of the Lodi Sultans..., pp. 236; The History of the Afghans in India, pp.97.
১৩৬ A Short History of Pakistan : Book Two : Muslim Rule Under the Sultans, Dr. Mafizullah Kabir, pp. 150; Sher Shah and His Times, pp. 311
১৩৭ শুধু তাই নয়, ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো মনে করেন শেরশাহ প্রচলিত মাঠ প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার জন্য 'পরগণা' ও 'গ্রাম' প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে তৃতীয় একটি প্রশাসনিক একক সৃষ্টি করেছিলেন। দেখুন, Medieval History of India, Dr. Meera Singh, p. 222.

'শিকদার' বা 'পরগণাদারে'র প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল 'পরগণা'র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। যেহেতু একাধারে তিনি ছিলেন 'পরগণা'র পুলিশ বিভাগেরও প্রধান, সেহেতু তাঁর অধীনে সর্বক্ষণের জন্য নিয়োজিত থাকতো একটা ফৌজি দল, যার সাহায্যে তিনি 'পরগণা'র অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধী-চক্রের শাস্তি বিধান ও বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করতে পারতেন। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে কৃষির উন্নয়ন ও ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগকে পুলিশি সহযোগিতা প্রদানসহ নানাভাবে তিনি দৈনন্দিন প্রশাসনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন।[১৩৮]

অপরপক্ষে 'পরগণা'র ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত প্রধান কর্মচারী ছিলেন 'আমিল'—'who had dealings with the central or provincial Diwan.'[১৩৯] তবে সম্ভবত 'শিকদার' ও 'আমিল' তথা পরগণাস্থ সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধানের পদ দু'টি সর্বদা পৃথক ছিল না। প্রসঙ্গত মোগল আমলের 'পরগণা' প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনাকালে আমরা দেখতে পাবো সেখানে পদ দু'টির অনুকূলে পদাধিকারী ব্যক্তিদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য এতো সুস্পষ্ট ও বিভাজিত যে 'শিকদার' ও 'আমিলে'র অবস্থান সমগ্র মোগল শাসনামলে প্রায় আগাগোড়াই দুমেরুতে অবস্থিত ছিল। কিন্তু সুলতানী যুগে এঁদের সহ-অবস্থান সবসময় আলাদা ও সুচিহ্নিত নয় বলেই মনে হয়। বস্তুত এঁদের অবস্থানগত এই অনির্দিষ্টতার জন্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তাতে লক্ষ্য করা যায় প্রায়শই তাঁরা 'পরগণা'র দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের মুখ্যাধিকারিক রূপে হয় 'শিকদার', নতুবা 'আমিলে'র নাম উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিশেবে ড. কোরেশির বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি বলেন, 'The amil was the chief executive officer and the head of the Parganah adminstration.'[১৪০] ড. মফিজুল্লাহ্ কবিরও বলেন, 'The Parganah was headed by a mutasarrif who was also called an amil.'[১৪১] অন্যদিকে ড. আবদুল হালিমের মতে, 'the Paragana was a fiscal unit......, and its governor was termed the Shiqqdar. He was the executive head of his jurisdiction, the head of the army, and a governor within a restricted area.'[১৪২] ড. উপেন্দ্র নাথ দে-রও প্রায়

১৩৮ History of the Lodi Sultans of Delhi and Agra, pp. 236; রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কার বা আর্থিক ও সামাজিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত মাশায়েক, সাদাত প্রভৃতি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ যাতে ভালোভাবে কালাতিপাত করতে পারে এবং সরকারি কর্মচারীরা তাদেরকে কোনরূপ হয়রানি না করে, সে বিষয়েও তাকে দেখাশুনা করতে হতো।

১৩৯ History of the Lodi Sultans..., pp. 237.

১৪০ The History and Culture of the Indian People : The Delhi Sultanate, pp. 453. ড. কালিকারঞ্জন কানুনগো বলেন, 'The shiqdar and the' amil discharged the duties of the magistrate and collector respectively at the pargana level; (sner shah and His Times, pp. 313).

১৪১ Muslim Rule Under the Sultans, pp. 150.

১৪২ History of the Lodi Sultans, pp. 236.

অনুরূপমত। তাঁর ভাষায়, 'Later on during the Lodis, the term Shiqdar seems to have been commonly used for the executive head of the pargana and cities included in the Khalsa.'[১৪৩]

উল্লেখ্য ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের মুখ্য পদের নামকরণ 'শিকদার' বা 'আমিল' যাই থাক না কেন, লোদি এবং তৎপরবর্তী আফগান শাসনামলে বিশেষ করে শেরশাহের রাজত্বকালে 'পরগণা' স্তরে ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মপরিধি ও কাজের গুরুত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই বিভাগে কর্মরত এক বিরাট সংখ্যক কর্মীবাহিনীর অস্তিত্ব থেকে। লোদি সুলতানদের সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে 'আমিলে'র সহযোগী হিশেবে কাজ করতেন, যেমন 'ফোতাহদার' বা 'খাজাঞ্চি' (কোষাগারের প্রধান), 'দারোগা' (কোষ-রক্ষীদের নেতা), 'কারকুন' (লেখক বা কেরানি), 'মুশরিফ' (হিসাবরক্ষক), আমিন, কানুনগো, পাটোয়ারি প্রভৃতি।[১৪৪] 'ফোতাহদার' ও 'দারোগা' অবশ্য 'শিকদারে'র সহযোগীরূপেও কাজ করতো। এরা প্রায় সকলেই সরকারিভাবে নিযুক্ত হতেন[১৪৫] এবং সরকারি কোষাগার থেকে প্রাপ্য বেতনভাতা আহরণ করতেন, সেই সঙ্গে কেউ কেউ লা-খেরাজ ভূমিস্বত্বও লাভ করতেন। এছাড়া শেরশাহের সময়ে 'পরগণা'র ভূমি রাজস্ব প্রশাসনে কর্মযজ্ঞের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল তার চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় সমকালীন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আব্বাস খান শেরওয়ানির 'তারিখ-ই-শেরশাহি'-তে। আব্বাস লিখেছেন—'The rules for the collection of revenue from the subject and the increase of population of the kingdom was so arranged that there had been appointed in each parganah, one shiqdar, one amin, one treasurer, and one manager for writing in Hindi and another, in Persian. It had been ordered that they should measure the cultivated land each and every year and collect the revenue according to the measurement with a view that muqaddam and 'ummal should not oppress the helpless cultivators who are the backbone of prosperity.'[১৪৬] শুধু তাই নয়, তাঁর আমলে, 'There was a qanungo in every parganah to report on its present, past and probable future state. .....If there arose any dispute on the boundary of the parganahs and

১৪৩ The Government of the Sultanate, pp. 71.

১৪৪ History of the Lodi Sultans, pp. 237, 246; এখানে ভূমিরাজস্ব-এর সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে জড়িতদের পদ-পদবি উল্লেখ করা হলো। তবে বলাবাহুল্য এই তালিকা পুরোপুরি স্থানকালনিরপেক্ষ নয়।

১৪৫ *তবে দুর্গম যোগাযোগ ও স্থানকালপাত্র ভেদে সর্বাবস্থায় এই নিয়োগ হয় তো কেন্দ্রীয়ভাবে করা সম্ভব হতো না।* ড. হালিম বলেন, 'During the Lodi period we do not hear of any 'Amil of a pargana being directly appointed by the central government, nor was it judicious in those days of bad communication, except the 'Amaldar of Agra (Safdar Khan) who was regarded as an officer of considerable importance because of the capital city being the head-quarters of the 'Amil.' (History of the Lodi Sultans, pp. 247).

১৪৬ The Tarikh-i-Sher Shahi, Vol. II., Trans. Dr. S.M. Imamuddin, pp. 164.

other matters in the king's dominion they were to settle it so that confusion might not be created in the State affairs. If some people, being rebels and disloyal, created disturbance at the time of the collection of revenue they were there to eradicate and annihilate them by punishing them in such a way that the evil of their rebellion might not spread among others.'[১৪৭]

পরিশেষে সুলতানী শাসনামলের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা অন্যতম প্রশাসনিক একক হিশেবে 'পরগণা'র গুরুত্ব সম্বন্ধে ড. ইসতিয়াক হোসেন কোরেশির একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করে আমরা এ আলোচনা শেষ করবো। সত্যি বলতে সমগ্র সুলতানী শাসনকাঠামোয় প্রাদেশিক প্রশাসন ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যকার প্রধানতম যোগসূত্র ছিল 'পরগণা'[১৪৮]; গ্রামের যে সাধারণ রায়ত তার ভূমি সংক্রান্ত অভিযোগ ও অন্যবিধ সমস্যা সমাধানোপলক্ষ্যে প্রাদেশিক প্রশাসনযন্ত্রের শীর্ষমহল বা ন্যূনপক্ষে 'সরকার' প্রশাসনের দোর গোড়ায় পৌঁছোতে সক্ষম হতো না, তাদের সহজতম গতায়াতের ও অভিযোগ জানাবার নিকটতম সরকারি জায়গা ছিল এই 'পরগণা'। অন্যদিকে সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের এই স্তরেই মাঠ পর্যায়ে সুলতানের প্রতিনিধিগণ সর্বপ্রথম জনগণের প্রত্যক্ষ সাহচর্য লাভ করতো ও আপামর রায়তের সুখ-দুঃখের কথা অবগত হয়ে তা সুলতানের গোচরীভূত করতো। ড. কোরেশি তাই চমৎকার বলেছেন, 'The Parganah was an important administrative unit because it was here that the government came into direct contact with the peasant.'[১৪৯]

গ্রাম পঞ্চায়েত

প্রাক-মধ্যকালীন বাংলায় সুলতানদের প্রায় সোয়া তিনশত বছরের শাসনকালে আবহমান গ্রাম বাংলার চলমান জনপ্রশাসন ব্যবস্থায় খুব একটা হাত পড়েছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য শুধু বাংলারই নয়, তৎকালীন ভারতবর্ষের অন্যত্রও গ্রামের যুগ যুগ ধরে চলে আসা দৈনন্দিন পঞ্চায়েত (বা অন্য যে কোন নামের) ব্যবস্থায় মুসলমানগণ কোনরূপ হস্তক্ষেপ থেকে এক প্রকার বিরত ছিলেন বলা যায়। ড. হালিম বলেন, 'The village autonomy was left untouched. The village Panchayats or caste-courts disposed of local cases through boards of arbitration imposing fines in civil and criminal cases of less serious nature.'[১৫০]

১৪৭ Ibid., pp. 165.

১৪৮ এখানে উল্লেখ্য যে ড. আর. পি. ত্রিপাঠী-র দেয়া তথ্য থেকে জানা যায় সুলতানী আমলে মধ্যবাংলায় 'সরকার' ও 'পরগণা' প্রশাসনের মধ্যবর্তী স্তরে 'জওয়ার' নামক একটি বিভাগ বা ইউনিট ছিল। উদাহরণস্বরূপ তিনি জান্নাতাবাদ (লখনৌতি) সরকারের অধীনে ১৬টি মহালবিশিষ্ট দরসরক জওয়ারের ও ১৪টি পরগণাবিশিষ্ট আক্রা জওয়ারের নাম করেন। তবে জওয়ার বাংলার তৎকালীন সবগুলি 'সরকারে'র সঙ্গে অবধারিতরূপে অঙ্গীভূত ছিল না বলে তিনি উল্লেখ করেন। (Some Aspects, pp. 320-21).

১৪৯ The History & Culture of the Indian People, p. 453; আরও দেখুন, Life & Culture in Medieval India, p. 94; History of Medieval India, p. 196.

১৫০ The History of the Lodi Sultans, pp. 237.

গ্রামের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার প্রতিবিধান, বিবাদ-বিসংবাদ তথা যে কোন ছোটখাট প্রকারের ব্যক্তিগত ও সামাজিক বিরোধ গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোর ভিতোরেই নিষ্পত্তি করতে পারতো। বস্তুত এই গ্রামীণ শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গড়ে উঠলেও সর্বত্রই তার একজন মুখ্য কার্যনির্বাহি বর্তমান ছিলেন, যা আমরা এ সম্পর্কিত প্রাচীন বাংলার আলোচনাকালেও লক্ষ্য করেছি। বলাবাহুল্য এই নির্বাহি প্রধানের নামকরণেও প্রাচীন বাংলা তথা ভারতীয়তার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন ছিল। যেমন পর্যালোচ্য যুগেও এদের নাম ছিল স্থানবিশেষে 'মুখিয়া', 'মোড়ল', 'মণ্ডল', 'মাতব্বর', 'মুকাদ্দাম', 'চৌধুরি' প্রভৃতি। এই প্রধানগণ পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় প্রায়শই অধিকাংশ সদস্য-মণ্ডলীর সম্মতিতে গৃহীত এবং কদাচিৎ একক উদ্যোগে কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অপরাপর অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন। অনেক ক্ষেত্রে এদের ক্ষমতা ছিল নাম মাত্র। তবে এদের অবস্থানিক গুরুত্ব ছিল অনত্র, যা মাঠ পর্যায়ে বিশেষ করে 'পরগণা'র মতো সরকারি প্রশাসনিক যন্ত্রের সঙ্গে সমগ্র গ্রামের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগের বেলায় দৃশ্যমান হয়ে উঠতো। বস্তুত এই নিরিখে গ্রাম প্রধানের পদটির গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। যা হোক, এখন সুলতানী আমলে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় বিষয়ে গ্রাম প্রশাসনের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা হলো। তবে বলাবাহুল্য এ আলোচনা সঙ্গত কারণেই প্রাচীন বাংলা ও পরবর্তী যুগ তথা মোগল যুগের গ্রাম প্রশাসনের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই সম্পর্কিত।

প্রাক-মধ্যকালীন বাংলার প্রতিটি গ্রাম মোটামুটি ২০০ থেকে ৩০০ জনমণ্ডলীর সমন্বয়ে গড়ে উঠতো।[১৫১] এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে যেমন হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি ছিল তেমনি উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শোষক-শোষিত শ্রেণীও ছিল। ড. কুনওয়ার মুহম্মদ আশরাফের কথায়, গ্রামের 'The life is essentially stereotyped and unprogressive, but extremely simple and continuous.'[১৫২] ; প্রতিটি গ্রামেরই ছিল একজন নিজস্ব প্রধান ও কৃষিভিত্তিক তিনটি শ্রেণী—এক. অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণী—এরা কৃষিজাত পণ্য নির্ভর হলেও নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষির উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করতো না। অঞ্চল ভেদে এরা বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল, যেমন উত্তর ভারতে 'রায়', 'রানা', 'খুট'[১৫৩], পাঞ্জাবে 'ঠাকুর'[১৫৪], বাংলায় 'চৌধুরি', 'মজুমদার', 'ভূঁইয়া', 'মাতব্বর', 'প্রধান' ইত্যাদি। উল্লেখ্য, এদের সংখ্যা হতো খুবই হাতে গোনা, তবে বিত্তবান বিধায় প্রভাবশালী ও

১৫১ See, Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 48.

১৫২ Life and Conditions of the People of Hindustan, pp. 113.

১৫৩ 'খুট' (গ্রামের মোড়ল) প্রভৃতি সম্বন্ধে ড. ইরফান হবিব বলেন, এরা 'সম্ভবত বিরাট জোতের মালিক ছিলেন, যেগুলি সাধারণভাবে রাজস্বের আওতায় পড়ত না। এগুলি থেকে যে কৃষি-উদবৃত্তের বখরা আসত তার বিনিময়ে এই গ্রামীণ 'সর্দাররা সুলতান ও তাঁর স্বত্বনিয়োগীদের তরফে কৃষকের থেকে রাজস্ব আদায় করত।' (মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১)।

১৫৪ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫১।

শক্তিমান। দুই. নিম্নবিত্ত শ্রেণী—উত্তর ভারতে এরা কখনও 'চৌধুরি', আবার কখনও 'বলাহার' নামে পরিচিত। অর্থ-সম্পদে এরা প্রথম শ্রেণীর তুলনায় হীন হলেও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের সঙ্গে এদের যোগ[১৫৫] থাকায় এরাও কম প্রভাবশালী ছিল না। তিন. অনুদ্‌বৃত্তের সাধারণ রায়ত ও ভূমিহীন অন্ত্যজশ্রেণী[১৫৬]। বস্তুত এরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং কৃষিভিত্তিক মধ্যযুগীয় সমাজ কাঠামোর মূল চালিকা শক্তি যাদের সম্বন্ধে ড. আশরাফ প্রকৃতই বলেছেন, 'কৃষকের দায়িত্ব পল্লীর প্রতিটি লোকের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা—কাজেই সে জমি চাষ করে, ফসল ফলায়, উৎপন্ন ফসল কেটে গোলাজাত করে। বাকীরা কোন না কোনভাবে এই উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।'[১৫৭] (নাকি উৎপাদনে ভাগ বসায়?)। পূর্বোল্লিখিত প্রথম শ্রেণী থেকে গ্রামের জনমণ্ডলীর মৌখিক মনোনয়ন বা নির্বাচনের মাধ্যমে[১৫৮] ও সুলতান বা স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদনে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নিযুক্ত হতেন। অতঃপর রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাকেই দেয়া হতো পূর্ব-নির্ধারিত ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ভার। বলা যায় সমগ্র গ্রামের পক্ষে সরকারি পাওনা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধের জন্য সে-ই জিম্মাদার হতো। কেননা সংশ্লিষ্ট 'পরগণাদার' সমগ্র গ্রামের ভূমিরাজস্বের জন্য তার সঙ্গেই চুক্তি করতেন।[১৫৯] চুক্তির পর গ্রাম প্রধান তার অন্যান্য সহযোগী ও গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত নিতেন কে, কতোটুকু ভূমিরাজস্ব প্রদান করবে। অতঃপর সে অনুযায়ী 'the Headman had to collect this assessment in order to complete the necessary payments, and balance his account.'[১৬০]

গ্রাম প্রধান তার এই কাজের জন্য লা-খেরাজ ভূমিস্বত্ব লাভ করতেন। এছাড়া তার ব্যক্তিগত জোতজমিও থাকতো যা বিভিন্ন ছলে-বলে-কৌশলে তিনি সরকারি করের আওতামুক্ত করে রাখতেন। অনিবার্যভাবে এর দায় গিয়ে বর্তাতো সাধারণ রায়তশ্রেণীর

১৫৫ ড. ত্রিপাঠী 'বলাহার' বলতে গ্রাম 'চৌকিদার' ('the village watchman', Some Aspects, p. 258) এবং ড. ইরফান হবিব ('village menial'; Cam. Econom. History, p. 48) বুঝিয়েছেন। পেশাগত দিক দিয়ে এরা সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের খুব নৈকট্য লাভ করতো। স্বভাবতই ধারণা করা যায় এদের দৌরাত্ম্য কতোখানি ছিল।

১৫৬ 'মুসলমান শাসনামলে কৃষকশ্রেণীর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল সামান্য এবং কৃষক শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু জন সাধারণই ছিল অধিকাংশ। যারা মূলত কৃষক শ্রেণীর হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিল কেবল মাত্র এ ধরনের ধর্মান্তরিত মুসলমানরা তাদের পূর্ববর্তী পেশায় নিয়োজিত ছিল।' (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩৫)। তবে এ যুগেও যে সমাজে ভূমিহীন অন্ত্যজ শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল তার উজ্জ্বল প্রমাণ প্রাক-মধ্যযুগে রচিত 'চর্যাপদ' যাতে পাই : 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী। / হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।।' অর্থাৎ টিলার ওপর আমার ঘর—কোনো প্রতিবেশী নেই/। হাঁড়িতে ভাত নেই—অথচ নিত্য অতিথি আসছে। দেখুন, 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য', ভোলানাথ ঘোষ, পৃষ্ঠা ২৪৮।

১৫৭ হিন্দুস্তানের জন-জীবন ও জীবন-চর্যা, অনুবাদ তপতী সেনগুপ্ত, পৃষ্ঠা ১২৭।

১৫৮ প্রাচীন বাংলার এতদসংক্রান্ত এই গ্রন্থের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৫৯ The Government of the Sultanate, pp. 93.

১৬০ The Agrarian System, pp. 170.

ঘাড়ে। এ জন্যে অনেক সময় রায়তদের সঙ্গে তার সংঘর্ষ দেখা দিতো।[১৬১] আর সত্য এই যে, এ সকল ক্ষেত্রে শ্রেণীস্বার্থগত কারণেই বস্তুত গ্রাম প্রধানগণের সরবরাহকৃত মিথ্যা তথ্য ও প্ররোচনায় রাষ্ট্রযন্ত্রও প্রায় সর্বদাই আপামর রায়তশ্রেণীর বিপক্ষে অবস্থান নিতো, যা পরিণামে বৃহত্তর সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতো।

উপসংহারে দু'একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা সূত্র আলোচনার মাধ্যমে আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানবো।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর তুর্কি বিজয়ের পর থেকে শুরু করে ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে (১৫২৬ খ্রিঃ) মোগলদের কাছে ইব্রাহিম লোদি তথা সুলতানদের পরাজয় পর্যন্ত ভারত ও বাংলায় (বাংলায় প্রকৃতার্থে মোগলদের বিজয় আরও পরের ঘটনা) মুসলমান শাসনের যে দীর্ঘ পরম্পরা বা অধ্যায়, তা বাস্তবিকপক্ষেই একটি গঠন-পর্ব (Formative phase)। যদিও এ সময়ে মুসলমান শাসকশ্রেণীর প্রশাসনিক চিন্তাভাবনায় উপকরণ সংগ্রহের দিক থেকে দু'টি উৎসই ছিল অধিক জোরালো। এর একটি পূর্ববর্তী হিন্দু রাজন্যবর্গ-সম্রাটদের অনুসৃত সুসংগঠিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা, এবং অন্যটি ভারতসহ ভারতের বাইরের মুসলিম শাসককুল বিশেষ করে আব্বাসীয় খলিফা, গজনি ও ঘোরি সম্রাটদের সুদীর্ঘ কালব্যাপী শাসন-ঐতিহ্য।[১৬২] মূলত এ দুই উৎসই প্রাক-মধ্যকালীন বাংলার মুসলিম সুলতান ও শাসকদের অব্যাহত শাসন-কার্যে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। তারপরও বলতে হবে এটি ছিল নিতান্তই একটি পরীক্ষানিরীক্ষার যুগ যাতে নবীন শাসকশ্রেণী মোটামুটি সফল হয়েছিল এবং মোগলদের জন্য একটি অনুসরণীয় প্রশাসনিক রূপরেখা বা 'মডেল' খাড়া করতে পেরেছিল। বস্তুত এখানেই নিহিত সুদীর্ঘ তিনশত বছরব্যাপী সুলতানী শাসনামলীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

একদিকে নববিজিত সাম্রাজ্য বিস্তারে নানা যুদ্ধে লিপ্ত তখ্‌তাসীন সুলতানদের নিয়ত ব্যস্ততা ও অন্যদিকে ক্ষমতার মসনদে ঘন ঘন রদবদল—একটার পর একটা বংশের উত্থান-পতন (স্মর্তব্য মোগলরা একটানা তিনশত বছরেরও অধিককাল ভারত শাসন করেছিল যার মধ্যে প্রায় পৌণে দু'শত বছর ছিল প্রবল পরাক্রমশালী জ্যেষ্ঠ মোগলদের সোনালি যুগ), যার ফলে সুলতানদের কোনও একক বংশের পক্ষে মোগলদের মতো একটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া মোগলদের ন্যায় বিশাল ভারতের শাসন কর্তৃত্বও তারা কখনও লাভ করেনি। বিশেষত বিপুল সম্পদশালী বাংলা[১৬৩] তো প্রায় দু'শত বছর অবধি দিল্লির সুলতানদের হাত ছাড়াই ছিল।

১৬১ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২।

১৬২ Life and Culture in Medieval India, pp. 40.

১৬৩ মধ্যযুগে বাংলাদেশ যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও এখানকার জীবনযাত্রার ব্যয় খুব সুলভ ছিল তার সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সমকালীন দু'জন প্রখ্যাত পরিব্রাজক যথা ইবনে বতুতা ও মা হুয়ানের ভ্রমণবিবরণীতে। এখানে তাঁদের প্রাসঙ্গিক দু'টি বর্ণনা তুলে ধরা হলো : ইবনে বতুতা বলেন, 'the land of Bangala (Bengal)...is a vast country, abounding in rice, and nowhere in the world have I (Ibn Battuta) seen any land where prices are

যদিও তখনও বাংলায় মুসলমান (রাজা গণেশের স্বল্পকালীন শাসন ব্যতীত) শাসনকর্তা-সুলতানগণই রাজ্য শাসন করেছেন। তথাপি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বিচারে দেখা যায় আকবর-পূর্ব যুগে বাংলাদেশ সুলতান আলাউদ্দিন খলজি, মুহম্মদ বিন তুগলক, সুলতান ফিরোজ শাহ্ তুগলক, সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্, সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ও সর্বোপরি সুলতান শেরশাহ্ সুরির ন্যায় অনন্যসাধারণ শাসকদের শাসন-ঐতিহ্যের ধারক-বাহক হতে পেরেছিল। যে কারণে পর্যালোচিত শাসনতান্ত্রিক গঠন-পর্বেও ক্রমাগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সুলতানী আমলের শেষ দিকে—লোদি ও আফগান শাসকদের সময়ে বাংলায় ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের একটি বলিষ্ঠ ও মজবুত ক্রমাধিকারতান্ত্রিক (hierarchical) অবকাঠামো তৈরি হয়েছিল। ঐতিহাসিক তো বলেই ফেলেছেন, 'Good government by the Muslims in India may be said to have begun in the days of Sher Shah. When Humayun was restored to throne, the seed that Sher Shah had shown sprouted and Akbar by his originality contributed to the development of good government.'[১৬৪] উল্লেখ্য মোগল সম্রাটদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা এই আলোকেই বিচার্য। এই প্রশাসন-বৃক্ষের সুলতানী যুগ যদি বীজ হয়, মোগল যুগ তার অনিবার্য ফল।[১৬৫]

দ্বিতীয়ত বাংলায় মুসলমান সুলতান ও শাসনকর্তাদের এই পর্বের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হলো প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা ও তথ্য-সংঘর্ষের প্রবণতা। সমকালীন প্রশাসন সম্বন্ধে জানার প্রথম ও প্রধান উৎস দিল্লিকেন্দ্রিক কয়েকজন সুবিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক যাঁদের মধ্যে 'তবাকাত-ই-আকবরী'র লেখক খাজা নিযামউদ্দিন আহমদ, 'তারিখ-ই-ফিরুজশাহি'র লেখক জিয়াউদ্দিন বারানি ও 'তারিখ-ই-শেরশাহি'র লেখক আব্বাস খান শেরওয়ানি অন্যতম। বস্তুত এঁদের রচিত ইতিহাস-গ্রন্থাদি এবং তৎকালীন বাংলার সুলতানদের এ যাবৎ আবিষ্কৃত কতিপয় মুদ্রা ও শিলালিপি ছাড়া অপর কোন সূত্র থেকে এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য-

lower than there.' (Ibn Batturta : Travels in Asia and Africa, Trans. by H. A. R. Gibb, pp. 267).
মা হুয়ান বলেন, 'The country (P'angkie-1 = Bengal) is extensive, the population dense, the wealth and property abundant and great.' (Ma Huan : বাংলায় বিদেশী পর্যটক, পৃষ্ঠা ৯৮)।

১৬৪ Advanced History of India, Dr. K.A. Nilakanta Sastri and Dr. G. Srinivasachari, pp. 524.

১৬৫ ড. আগা মাহদী হুসেনের ভাষায়, 'It should, however, be noted that the Sultanate was the root and the Mughal empire the fruit of Muslim initiative and statesmanship in India. The Sultanate period was decidedly one of experiment, and as such was one of great difficulty. The Mughal emperors had three hundred years and successes; and were able to profit from the lessons of the past.' (The Rise and Fall of Muhammad Bin Tughluq, pp. 3-4).

উপাত্ত পাওয়া যায় না। অধিকন্তু উল্লিখিত গ্রন্থ, মুদ্রা ও শিলালিপি ইত্যাদিতেও প্রচলিত ভূ ও এর প্রশাসনিক অবকাঠামো সম্পর্কে যে তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় তা শুধু সংখ্যায় অপ্রতুল ও অনির্ভরযোগ্যই নয়, বরঞ্চ ক্ষেত্র বিশেষে পরস্পরবিরোধী ও বিভ্রান্তিকরও বটে। তথাপি ড. আবদুল করিমের ভাষায় বলতে পারি যে, 'তবুও সামান্য যা সূত্র পাওয়া যায় তাহার সাহায্যে বাংলাদেশে সুলতানী আমলের (ভূমিরাজস্ব) প্রশাসনিক ব্যবস্থার মোটামুটি চিত্র ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করা হইল। প্রশাসনিক ব্যবস্থায় মুসলমান সুলতানেরা সাধারণত দিল্লীকেই অনুসরণ করিত, তবে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এখানে প্রশাসনিক ব্যবস্থারও রদবদল হইত।'[১৬৬]

এ উক্তি সর্বৈব সত্য।

১৬৬ বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল, পৃষ্ঠা ৪১৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (মোগল আমল)

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ষোড়শ শতাব্দীতে। ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দের ২১শে এপ্রিল পানিপথের প্রথম যুদ্ধে তুর্কি বীর জহিরুদ্দিন মুহম্মদ বাবরের কাছে লোদি বংশের সুলতান ইব্রাহিমের শোচনীয় পরাজয়ের মধ্য দিয়ে। বস্তুত পানিপথের বিজয় মোগলদের জন্য বিশাল ভারত শাসনের নবদুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।[১] পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে এই বিশাল সাম্রাজ্য-সীমার মধ্যে যে শুধু ভারতের বিরাট ভূভাগ একত্রিত হয়েছিল তাই নয়, বরং একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব এবং তার স্থায়িত্বও অর্জিত হয়েছিল, যা আগেকার সুলতানদের কারও আমলেই হয়নি।[২] বাবর যদিও এই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছিলেন কিন্তু এর সুবিপুল আয়তন, দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তি এবং সর্বোপরি একটি ক্রমাধিকার-তান্ত্রিক (hierarchical) সুবিস্তৃত প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণ করেন মূলত সম্রাট আকবর। এখানে উল্লেখ্য ভারতীয় রাজা-বাদশাহদের মধ্যে সর্বকালের বিচারে মোগল সাম্রাজ্যকে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃতি দিয়েছিলেন আকবরেরই এক উত্তরসূরী সম্রাট আওরঙ্গজেব।[৩] অবশ্য ঐতিহাসিকদের মূল্যায়নে তাঁর আমলে একদিকে সাম্রাজ্যের নজিরবিহীন প্রসার ঘটলেও অন্যদিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের বীজও রোপিত হয়েছিল মূলত এই সময়ে। যা হোক, বর্তমান নিবন্ধ যেহেতু মোগল আমলের ভূমিরাজস্ববিষয়ক সেহেতু আমরা অন্য আলোচনায় যাবো না। এ অধ্যায়ে আমরা প্রধানত মোগল যুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও তার ক্রমবিকাশ এবং পূর্ববর্তী তথা সুলতানি যুগের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করবো। এবং সেক্ষেত্রে বরাবরের মতো মোগল ভারতের প্রেক্ষাপটে এটির আলোচনা করে আমরা বাংলার সমকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেবো।

১ ড. এস. এম. জাফর বলেন, 'The first battle of Panipat, in which Babar defeated Ibrahim Lodhi, marked the beginning of a new era in the history of India. It paved the way for the Great Mughals to come and settle in this country and make it their permanent abode.. The victory at Panipat meant the establishment of the Mughal Dynasty, which furnished a line of those illustrious sovereigns under whom India reached the pinnacle of her greatness and the apex of her fortunes.' (The Mughal Empire, pp. 9).

২ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৩

৩ ঐতিহাসিক T. Walter Wallbank বলেন, 'For the first time in all its history the Indian Sub-Continent was under one sovereignty. From the Himalayas to Cape Comorin the writ of Aurangzeb was supposed supreme.' (A Short History of India and Pakistan : From Ancient Times to the Present, pp.51).

বাংলায় মোগল শাসনের সূত্রপাত ঘটে সম্রাট আকবরের আমলে।[৪] তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি মুনিমখানের হাতে তুকারয়ের যুদ্ধে (৩রা মার্চ, ১৫৭৫) আফগান শাসক দাউদ খান কররানির পতনের ফলে বাংলা মোগলদের অধিকারে আসে।[৫] তবে সত্যি বলতে আকবরের সময়ে বাংলাদেশ নামমাত্র মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল।[৬] এর কারণ স্বরূপ বলা যায়, 'স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চলাধিকারীদের প্রতিরোধ দমনের জন্য মোগল বাহিনী ব্যস্ত থাকত, রাজস্ব আদায় এবং শাসনসংক্রান্ত অন্যান্য কাজ যুদ্ধবিগ্রহের জন্য নিয়মিতভাবে করা সম্ভব হয়নি।'[৭]

যা হোক, পরবর্তীকালে মোগলদের এই বাংলা বিজয়পর্বের সমাপ্তি ঘটেছিল ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক চট্টগ্রাম দখলের মাধ্যমে। ফলে এক্ষণে এই সমগ্র বিজিত প্রদেশে মোগল সম্রাটদের বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থাই হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু, যা তাদের কেন্দ্রীয়ভাবে গৃহীত ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় পর্যালোচিত হবে।

সম্রাট বাবর (১৫২৬-১৫৩০) ও তৎপুত্র সম্রাট হুমায়ুন (১৫৩০-১৫৪০)

সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে একটি নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা এবং সর্বনিয়ত প্রচুর প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ব্যাপৃত বাবর সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তোলার মতো প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ পাননি তা সহজেই অনুমেয়।[৮] ১৫২৬ থেকে ১৫৩০—এই সময়কালের মধ্যে তাঁকে ছোটবড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই সঙ্গে ছিল নিজ সৈন্যদের বিদ্রোহ ও অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার চাপ। যে কারণে এ সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার না ঘটলেও[৯] প্রবল ইচ্ছা থাকা

৪ বৃহত্তর মধ্যবাংলা ভুক্ত সুবিখ্যাত 'গৌড়' রাজ্য ইতোপূর্বে সম্রাট হুমায়ুনের সময় (১৫৩৮ খ্রিঃ) অধিকৃত হয়। প্রায় ৮ মাস তিনি এখানে ছিলেন।

৫ The Fifth Report, Chapter II., W. K. Firminger, pp. 313; Bengal under Akbar and Jahangir, Dr. Tapan Raychaudhuri, pp. 49.

৬ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৫৫। স্যার যদুনাথ সরকার অবশ্য বলেন, 'Mughal Conguest opened for Bengal a new era of peace and progress. It re-established that contact with upper India,—and through upper India by the land-route with the countries of Central Asia and Western Asia,—which Bengal had lost first when Buddhism became dead in the land of its birth and next when its Muslim viceroys threw off the overlordship of Delhi;' (The History of Bengal, Vol. II, Muslim Period, pp. 188).

৭ মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৫।

৮ দেখুন, Two Studies in Early Mughal History, Dr. Yusuf Husain, pp. 106; Babar (Rulers of India Series), Stanley Lane-Poole, pp. 185; Medieval India under the Mohammedan Rule, Stanley Lane-Poole, pp. 215; The Mughal Empire, Dr. Ishwari Prasad, pp. 125 ; Akbar the Great Mogul, Dr. Vincent Arthur Smith, pp. 258 ; The Mughal Empire, S. M. Jaffar, pp. 23; Mughal Rule in India, S. M. Edwardes & H. L. O. Garrett, pp. 158.

৯ মোগল ভারতের এই সময়কার সীমানা ছিল, সিন্ধু নদীর অববাহিকা থেকে নিয়ে উত্তরে বিহার পর্যন্ত, যার অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি বিখ্যাত প্রদেশ ও অঞ্চল যেমন পাঞ্জাব, মুলতান, সিন্ধু, সম্ভল, আলওয়ার,

সত্ত্বেও সম্রাটের পক্ষে উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে, তিনি তাঁর শাসন-কর্তৃত্ব দৃঢ়ীকরণের ব্যাপারে আদৌ উদাসীন ছিলেন। ড. রাধে শ্যাম বলেন, 'While fighting the Afghans and the Rajputs Babar was not oblivious of the necessity of consolidating his possessions and position. The process went on simultaneously. As a ruler it was incumbent upon him to define the boundaries of his empire and to give it a compact shape.'[১০] সাম্রাজ্য সংগঠনের পাশাপাশি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল প্রশাসক হিশেবে বাবরের প্রথম ও প্রধান কাজ। এ ব্যাপারে তিনি তৈমুরবংশীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করেছিলেন। ড. মহিবুল হাসান বলেন, 'Babur borrowed the structure of the central government from the Timurids.'[১১] গোটা সাম্রাজ্যে একাধারে সম্রাট হিশেবে তিনি নিজে যেমন ছিলেন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু; শাসন ও বিচারবিভাগের প্রধান মুখ্য সামরিক অধিকর্তা, তেমনি এই ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগের জন্য একাধিক আলাদা বিভাগের সৃষ্টিও তিনি করেছিলেন যার এক-একটির জন্য নির্দিষ্ট বিভাগীয়-প্রধান ছিল—মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে এদের উপাধি ছিল 'উজির', 'বখশি', 'দিওয়ান' প্রভৃতি।[১২] অনুরূপভাবে কেন্দ্রের বিভিন্ন ক্ষমতা প্রাদেশিক স্তরে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি মাঠ পর্যায়ে কেন্দ্রের প্রায় সমসংখ্যক অনুবিভাগও প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যারা মূলত সম্রাটের মাঠ-প্রতিনিধি হয়ে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ করতো। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রাদেশিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা অনুসরণে বাবর তৈমুরদের অনুসৃত প্রথাপদ্ধতি বাদ দিয়ে বরং স্থিত তথা লোদি সুলতানদের ব্যবস্থাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অব্যাহত রাখেন।[১৩] সম্ভবত এর দু'টি কারণ ছিল। এক. প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তে নিজস্ব কিছু উদ্ভাবন ও তার কার্যকর প্রয়োগে প্রয়োজনীয় সময়ের অভাব, এবং দুই. বিভিন্ন সময়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা সুলতানি আমলের প্রথাপদ্ধতি ইতোমধ্যে মোটামুটি যুগোপযোগী ও কার্যকরী বলে সম্রাটের কাছে প্রতীয়মান হয়ে থাকবে। যা হোক, সম্রাট তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের বিষয়ে মোটামুটি ৩ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। প্রথমত প্রাথমিক যুগের দিল্লির সুলতানদের মতো তিনি 'খালিশা' বহির্ভূত অঞ্চলে প্রচলিত 'ইকতা' ব্যবস্থা চালু রাখেন।[১৪] সেলজুক শাসকদের অনুসরণে তিনি এর নতুন নামকরণ করেন 'তিয়ুল'।[১৫] যে সমস্ত তুর্কি, মোগল ও আফগান আমির-ওমরাহ তথা উচ্চপদস্থ শাসন কর্মকর্তা বাবরের অধীনে কাজ করতেন,

---

[illegible]পুর, গোয়ালিয়র, চান্দেরি, বায়ানা প্রভৃতি। ভারতের বাইরে ছিল বলখ, বাদাখশান, কাবুল, গজনি, [illegible], কান্দাহার ইত্যাদি। (See, Babar, Dr. Radhey Shyam, pp. 395).

১০ Babar, pp. 395.

১১ Babur : Founder of the Mughal Empire in India, pp. 162

১২ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'Babur', Dr. Mohibbul Hasan, pp. 162-8; 'Babar', Dr. Shyam, pp. 401-10.

১৩ ড. ইউসুফ হুসেন বলেন, 'Babur maintained the administrative machinery of the Lodis for the collection of revenue.' (Two Studies in Early Mughal History, pp. 106). আরও দেখুন, 'Babur', Dr. Hasan, pp. 168 : The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp.125.

১৪ Babur, Dr. Hasan, pp. 171.

১৫ Ibid., pp. 171.

তাঁর বিভিন্ন যুদ্ধ বিজয়াভিযানের সঙ্গী ছিলেন—অথচ এঁদেরকে অন্যান্য রাজকর্মচারীদের ন্যায় নিয়মিত বেতন-ভাতা দিয়ে লালন-পালন করা নৈতিকভাবে তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না[১৬], এমন ব্যক্তিদের 'খালিশা' বহির্ভূত অঞ্চলে রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ (Assignments) দেয়া হতো। এই রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগীদের 'ওয়াজদার'ও বলা হতো। মোটামুটি দু'ধরনের 'ওয়াজদার' ছিল—ক. 'ওয়াজ-ইস্তকামাত' বা স্থায়ী প্রকৃতির, এবং খ. 'ওয়াজ-উলুফা' বা অস্থায়ী রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ। তবে যেহেতু এই স্বত্বনিয়োগ সংশ্লিষ্ট 'ওয়াজদার'-এর প্রাপ্য ব্যক্তিগত বেতনভাতা ও তার অধীনে নিয়োজিত সৈন্যবাহিনীর প্রতিপালন ব্যয় ও অন্যবিধ প্রশাসনিক খরচ নির্বাহের জন্য আনুপাতিকভাবে ভূমি-বণ্টন (এক্ষেত্রে বণ্টিত এলাকা থেকে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব-বণ্টন বলাই সঙ্গত) করা হতো[১৭], স্বভাবতই প্রায় সকল 'ওয়াজদার'ই ছিল সম্রাটের ইচ্ছা-অনিচ্ছার আজ্ঞাধীন, অর্থাৎ এরা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট 'ওয়াজ' বা 'তিয়ুলে' অবস্থান করতে পারতো। তিনি যখন-তখন তাদেরকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বদলি বা তাদের অধিক্ষেত্রের সীমা কম-বেশি করতে পারতেন। ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি ছিল সুলতানি আমলের 'ইকতা'রই নামান্তর বা মোগল-সংস্করণ। কারণ আমরা দেখতে পাই, 'the Wajhdars of Babar's time performed all the functions of the Iqtadars of the earlier period.'[১৮]

দ্বিতীয়ত পূর্বোক্ত রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগে বাবর যেমন সরাসরি স্বীয় পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতেন অথবা প্রয়োজনে 'ওয়াজদার'কে সুবিধা মতো এক জায়গা থেকে অন্যত্র সরিয়ে নিতেন এবং অন্যদেরকে তদস্থলে পদাসীন করতেন, কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি বোধগম্য কারণেই বিভিন্ন বিজিত অঞ্চলে স্থানীয় সামন্ত-প্রধান বা অঞ্চলাধিকারীদের তার নিজস্ব স্থানে বহাল রেখে রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ দান অব্যাহত রাখেন। তবে সে-ক্ষেত্রে এই সমস্ত সামন্ত-প্রভুদেরকে অবশ্যই সম্রাটের পূর্ণ আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করতে হতো, এবং এর প্রায়োগিক স্বীকৃতিস্বরূপ সম্রাটকে অধিকৃত অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব বাবদ বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অঙ্কের নগদ অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করতে হতো। অধিকন্তু সম্রাটের প্রয়োজনে তারা সৈন্য বা লোকবল সরবরাহ করেও তাঁকে সাহায্য করতো।[১৯] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তখন পর্যন্ত মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি খুব মজবুত ছিল না; অভ্যন্তরীণ ও

১৬ কারণ এই রাজস্ব-স্বত্ব নিয়োগ উচ্চ পদস্থ আমির-ওমরাহদের কাছে বেতন-ভাতারও অতিরিক্ত বিশেষ মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক বলে বিবেচিত হতো। তাই সম্রাট তাঁর নানা সুখ-দুঃখের সাথীদের এগুলির রাজস্ব-স্বত্বাধিকারী নিযুক্ত করে তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করেন।

১৭ এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ড. রাধে শ্যাম চমৎকার উল্লেখ করেছেন, 'Babar assigned large territories and specified a sum out of the total Jama as Wajh of Wajhdar...Wajhdars were not given specified lands but specified sums of money out of the total revenue of the territories in their respective charge. These territories were not given in jagir to them. They were assigned to them for administrative convenience. The sum granted to them, was intended for the maintenance of their troops and for their personal expenses. A Wajhdar in fact, was responsible for the collection of the state dues and the revenue within the territory assigned to him.' (Babar, pp. 416-17).

১৮ Babar, Dr. Shyam, pp. 417.

১৯ Babur, Dr. Hasan, pp. 172.

বহিঃশত্রু সর্বদাই ওঁৎ পেতে থাকতো ক্ষমতা হরণে। এছাড়া নতুন নতুন বিজিত অঞ্চলের অচেনা পরিবেশে শাসনকর্তা নিয়োগের মতো উপযুক্ত লোকেরও যথেষ্ট অভাব ছিল—এমতাবস্থায় ঐ সকল এলাকায় আগে থেকেই যারা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল (সচরাচর 'জমিদার' নামেই এরা পরিচিত ছিল) তাদেরকেই সম্রাট স্ব-পদে বহাল রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই জমিদাররা যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় এগুলির ভূমিরাজস্ব ভোগ করতো ও কেন্দ্রীয় মুসলিম সুলতানদের মৌখিক ও প্রায়োগিক আনুগত্য স্বীকার করে প্রায় স্বাধীন রাজার মতো চলতো। তাই বলা যায় সম্রাট বাবর এদের কাছ থেকে নগদ আর্থিক ও সামরিক সুবিধা আদায় করে তাদের চিরাচরিত জীবনপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সুযোগ দেন। 'He neither interfered with their internal affairs nor did he assign any part of their territory or Zamindari to any of his nobles.'[২০] ফলে দেখা যায়, 'a large number of Zamindars submitted to him and paid regular tribute to him.'[২১]

তৃতীয়ত 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ ও এলাকাগুলিতে সুলতানি শাসনামলের নিয়মিত প্রশাসনিক অবকাঠামো ও তার ভিত্তিতে পরিচালিত ভূমিরাজস্ব প্রথাপদ্ধতি সম্রাট অব্যাহত রাখেন। এ বিষয়ে যতো দূর জানা যায় তিনি গোটা সাম্রাজ্যকে সর্বমোট ২০টি 'সরকারে' বিভক্ত করেন[২২], যার প্রতিটির জন্য একজন 'হাকিম' ও একজন 'দিওয়ান' এবং তাদের অধীনে নানা সংখ্যক কর্মচারী ছিল। 'হাকিম' ছিলেন সাধারণ প্রশাসন ও বিচার বিভাগের মুখ্য অধিকর্তা, অন্যদিকে 'দিওয়ান' ছিলেন ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য অর্থ সংক্রান্ত কায়-কারবারের নিয়ন্তা। এঁরা প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয়ভাবে বাবরের প্রত্যক্ষ অনুমোদনে নিযুক্তি লাভ করতেন। প্রতিটি 'সরকার' আবার কয়েকটি 'পরগণা'য় এবং 'পরগণা' অনেকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত হতো। সাধারণত 'পরগণা'র প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন 'শিকদার', তবে কোনও কোনও 'সরকারে'র মুখ্য পদাধিকারীর উপাধিও ছিল 'শিকদার'।[২৩] উদাহরণস্বরূপ দিল্লি, ধোলপুর, বায়ানা, কোয়েল প্রভৃতি 'সরকারে'র নাম করা যায়। 'পরগণা'র ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন 'আমিল' নামক রাজকর্মচারী। তার সহযোগী হিশেবে ছিলেন 'কানুনগো' (ভূমিরাজস্ব নিরূপণকারী), 'আমিন' (রাজস্ব-আরোপযোগ্য ভূমির পরিমাপক) প্রভৃতি নিম্নপদস্থ কিন্তু ভূমিরাজস্ব বিভাগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারীবৃন্দ। এরা মূলত 'দিওয়ানে'র দপ্তর থেকে বেতন-ভাতাদি পেতেন।[২৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে মোগল যুগের নিতান্ত প্রাথমিক পর্বে বাবর পূর্ববর্তী শাসকদের রাজস্ব ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখেও ব্যক্তিগত মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন। কেননা ক্ষমতায় আরোহণ করেই হুট করে স্থিত ব্যবস্থা পাল্টে দেয়া বা তার পরিবর্তে নতুন কিছু চালু করা কোন বুদ্ধিমান শাসকের জন্যই শুভজনক নয়। সম্রাট আকবরও তাঁর শাসনকালের একটা উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত পূর্ববর্তী শাসককুলের বিশেষ করে সম্রাট শেরশাহের গৃহীত ব্যবস্থা প্রায় পুরোপুরি বহাল রেখেছিলেন এবং পরে ধীরে ধীরে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় তিনি

২০ Babar, Dr. Shyam, pp. 419.
২১ Ibid., pp. 419.
২২ Babur, Dr. Hasan, pp. 168.
২৩ Ibid., pp. 168.
২৪ Ibid., pp. 170.

নিজস্ব চিন্তাভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটান। তবে দুঃখজনক বিষয় এই যে কীর্তিমান উত্তরসূরীর মতো বাবর শাসন ব্যাপারে নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রবিষ্ট করার জন্য দরকারী সময় মোটেও পাননি। ফলে যাঁরা মনে করেন যে সম্রাট বাবরের আদৌ কোন প্রশাসনিক প্রতিভা ছিল না[২৫], তাঁরা ঠিক বলেন বলে মনে হয় না। বরং সম্রাটের এই সুপ্ত প্রতিভার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় নবাগত শাসক হিশেবে সম্পূর্ণ অচেনা ও বৈরী পরিবেশে সময় ও অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা—যেমন কোথাও সরকারি প্রশাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ কার্যকলাপে, কোথাও 'ইকতা'র অনুরূপ 'ওয়াজহার' বা 'তিয়ুল'-এর অনুকূলে রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ দিয়ে, আবার কোথাও পূর্ব-থেকে-চলে-আসা অঞ্চলাধিকারী তথা জমিদারি প্রথা বহাল রেখে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করার সুচতুর পদক্ষেপে।[২৬] তবে এ কথা ঠিক যে, ড. রাধে শ্যাম যেমন বলেছেন, 'Babar found himself in an alien land and amidst hostile population, and so he deemed it prudent to consolidate his position without disturbing the existing socio-political order. He adopted the existing political institutions, and made changes here and there for administrative conveniesce. To accomodate his supporters in the new set up and to conciliate the Afghan and non-Afghan nobles Babar had to evolve out a machinery which could help him in maintaining control over the remotest corner of his empire.'[২৭] প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও তার অবকাঠামোয় ছোটখাট যে পরিবর্তন ও সংযোজনার মাধ্যমে বাবর সাম্রাজ্যব্যাপী তাঁর সুদৃঢ় কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কোন লিখিত প্রমাণ সমকালীন ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে সত্যিই দুর্লভ। এমন কি যে সুবিশাল আত্মজীবনী গ্রন্থের[২৮] জন্য বাবরের সুখ্যাতি জগৎজোড়া, সেটিও এ সম্পর্কে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যা হোক, তাঁর সময়ে ভূমিরাজস্বের প্রকৃত হার কতো ছিল এটা নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ধারণা করা যায় তা লোদি সুলতানদের সময়কার মতোই ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্রাট রাজকোষের সাময়িক ঘাটতি মোকাবিলার জন্য 'ওয়াজদার'দের ওপর এককালীন ৩০% ভাগ করারোপ করেছিলেন বলে ড. মহিব্বুল হাসান জানিয়েছেন।[২৯]

এ পর্যায়ে বাবরপুত্র সম্রাট হুমায়ুনের কথা বলা যায়। বস্তুত মধ্যযুগের এই মহাভাগ্য-বিড়ম্বিত শাসক তাঁর এক দশকের শাসনকালে ভূমিরাজস্ব নীতি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থায়

২৫ কোনও কোনও আধুনিক ঐতিহাসিকের এমনই ধারণা। যেমন ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিনহা ও ড. নিশীথ রঞ্জন রায় মনে করেন, 'Babur had no administrative genius.' (A History of India, pp. 297). ড. এস. কে. ব্যানার্জীরও এই মত। দেখুন, 'Post-War Settlements in Doab, Malwa and Bihar', an article published in the Proceedings of the Indian History Congress, for details, see 'Babar', pp. 421. আরও দেখুন, Mughal Empire in India, Prof. S. R. Sharma, pp. 37.

২৬ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য চমৎকার দু'টি গ্রন্থ হচ্ছে, 'Babar' এবং 'Babur'.

২৭ Babar, pp. 408.

২৮ সচরাচর এই চমৎকার আত্মজীবনী-গ্রন্থটি 'তুযুক-ই-বাবরী' (Memoirs of Babur) বা 'ওয়াকিয়াত-ই-বাবুরী' বা 'বাবুর-নামা' নামে পরিচিত। এতে তাঁর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের তথ্য জন্ম-সন ১৪৮৩ (১৪ই ফেবরুয়ারি) থেকে নিয়ে মৃত্যুর পূর্ব-সন পর্যন্ত (৭ই সেপটেমবর, ১৫২৯) যোগ-বিয়োগ করে মোটামুটি ১৮ বছরের খুবই খোলামেলা ও বর্ণাঢ্য কথামালা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

২৯ Babur, pp. 158; Also see 'Babar', Dr. Shyam, pp. 424.

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু করতে পেরেছিলেন বলে বোধ হয় না। কারণ একদিকে সমকালীন রাজনীতির তীব্র চাহিদা মিটিয়ে তথা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকে, এবং অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত উন্নত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, সমরকুশলী ও সুযোগ্য আফগান শাসক শেরশাহের কাছে অসময়ে সিংহাসন খুইয়ে (১৫৪০) ও পরবর্তী প্রায় ৫ বছর দুর্ভাগ্যপীড়িত যাযাবরের মতো একস্থান থেকে অন্যস্থানে পালিয়ে বেড়িয়ে চেষ্টা নৈপুণ্যে যখন দ্বিতীয়বার তিনি সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন (২৩শে জুলাই, ১৫৫৫) তখন অনিবার্য মৃত্যু (১৫৫৬) তাঁকে সেই হৃত সাম্রাজ্য সুসংহত ও পুনর্গঠিত করার সুযোগ থেকে যারপরনাই বঞ্চিত করে। ফলে নির্দ্বিধায় বলা যায় শাসক হুমায়ুনের অপ্রসন্ন অমোঘ নিয়তিই তাঁর শাসন ব্যবস্থায় পরিকল্পিত ও কার্যকর ভূমিরাজস্ব নীতি গড়ে তোলার পথে তাঁর কঠিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভুলে গেলে চলবে না যে তিনি পিতা বাবরের চেয়েও দু'বারে মিলিয়ে অধিককাল রাজ্য শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু শেরশাহের মতো প্রবল শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাঁর সব স্বপ্ন-সাধ ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়বার শাসন করা কালে যে সাম্রাজ্য তিনি ফিরে পেয়েছিলেন তার প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ও ভূমিরাজস্ব নীতিতে শেরশাহের প্রভাব ও সৌকর্য এতো বেশি ছিল যে, সেটিকেই হুমায়ুন অবলীলাক্রমে গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত Moreland-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়। তিনি সমসাময়িককালের লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 'There is nothing in the literature to indicate that either Babur or Humayun made any alterations in the agrarian system of northern India, and the few references I have traced to the subject suggest that they accepted what they found.'[৩০]

উদাহরণ হিশেবে বলা যায় তিনি পিতা বাবরের আমলে প্রদত্ত রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগসমূহ (Assignments) বহাল রেখেছিলেন, অধিকন্তু নববিজিত অঞ্চল যেমন বাংলা ও অন্যত্র এই ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান।[৩১] তাঁর শাসনামলে শস্য ভাগাভাগি (Share cropping) প্রথাও প্রচলিত ছিল।[৩২]

যা হোক সম্রাট বাবর ও হুমায়ুনের সময়ে নতুন কোন জরিপ ছাড়াই যে সুলতানি শাসনামলের বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজের ভিত্তিতে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় করা হতো, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি নিঃসন্দেহ।[৩৩]

সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)

সম্রাট আকবরের সময়কার মোগল ভারতের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আলোচনার শুরুতেই আমরা ড. এম. পি. শ্রীবাস্তবের একটি প্রাসঙ্গিক ও মূল্যবান উক্তির শরণাপন্ন হবো, অতঃপর বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার চেষ্টা করবো। তিনি বলেন, 'It was the time of Akbar (1556-1605), the great Mughal emperor, that a definite system which

---

৩০ The Agrarain System, pp. 79.
৩১ Ibid., pp. 79.
৩২ The Mughal Empire, S. M. Jaffar, pp. 152.
৩৩ Policies of the Great Mughals, Dr.M. P. Srivastava, pp. 2.

proved to be workable and profitable for the kingdom, as well as the king, was inaugurated.'[৩৪] এ কথা সত্য যে, আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে (১৪ই ফেবরুয়ারি) সিংহাসনে আরোহণ করলেও তাঁর মাথার ওপর ছত্রধরের মতো সার্বক্ষণিকভাবে বিরাজমান বিপুল প্রভাবশালী বৈরাম খানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত প্রকৃত ক্ষমতার স্বাদ তিনি ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত পাননি। বস্তুত এই সময় থেকে পরবর্তী চার দশকেরও বেশি সময়ব্যাপী সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন রাজত্বকালে একটি সুনিয়ন্ত্রিত, সমন্বিত ও যুগোপযোগী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্রাট যে সকল রীতি, নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। এর প্রথম ভাগকে সীমাবদ্ধ করা যেতে পারে তাঁর সিংহাসনে আরোহণের বছর থেকে নিয়ে পরবর্তী প্রায় ২৪ বছর অর্থাৎ ১৫৭৯-৮০ পর্যন্ত—এ পর্বে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারে ও একটি নির্ভরযোগ্য কল্যাণধর্মী প্রশাসনিক অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, Moreland-এর ভাষায় 'series of experiments'[৩৫], করেছিলেন। দ্বিতীয় ভাগের স্থায়িত্ব-কাল ১৫৮০ থেকে ১৬০৫—মৃত্যু অবধি। মূলত এই শেষ ভাগে আমরা দেখতে পাই প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অন্তর্মূলে ইতোমধ্যে প্রোথিত মহান সম্রাটের নিজস্ব চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তির স্ফূরণ, যার প্রত্যক্ষ ফল ছিল একটি সুসংহত ও স্থায়ীরূপের বিকাশ—'stability of system had been attained'[৩৬] বলে যে ক্ষেত্রে Moreland সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর প্রথম তাঁর স্ব-প্রণোদিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এ জন্যে 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত ভূমিকেই তিনি বেছে নেন। সমগ্র মুসলিম বিশেষত মোগল শাসনামলে 'from the fiscal or revenue point of view' রাষ্ট্রের সমুদয় ভূমিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো।[৩৭] এক. 'খালিশা' বা খাসমহাল, দুই. জায়গির বা ভূমিরাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ এবং তিন. জমিদারি বা স্থানীয় সামন্ত-প্রভু ও রাজন্যপ্রশাসিত অঞ্চল। ড. সুলেখ চন্দ্র গুপ্ত অবশ্য এই তিনটিকে দু'টি ভাগে সীমাবদ্ধ করেছেন—'খালিশা' ও জায়গির।[৩৮] সূক্ষ্ম পার্থক্য বাদ দিলে একার্থে জায়গির ও জমিদারি (এই আমলের) প্রায় সমানই। 'খালিশা' যে অর্থে সম্রাটের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের খাস

৩৪ Ibid., pp. 2.

৩৫ The Agrarian System, pp. 80.

৩৬ Ibid., pp. 80.

৩৭ Indian Land System, Dr. Radha Kumud Mookerjee, pp. 166; Bengal in the Reign of Aurangzeb, Dr. Anjali Chatterjee, pp. 52, 68; The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, Dr. Khondhar Mahbubul Karim, pp.151.

৩৮ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 17; ড. উপেন্দ্র নাথ দে-ও একই মত পোষণ করেন। দেখুন, The Mughal Government (A. D. 1556-1707), pp. 135. প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মূল ২/৩ টি ভাগকেই বিভিন্ন লেখক-ঐতিহাসিক বিভিন্ন শ্রেণীতে বিশ্লিষ্ট করেছেন। যেমন ড. ঈশ্বরী প্রসাদ—"(1) The Khalsa or Crown land.. (2) Assignments and Jagirs,.. (3) Sayurghal.. (4) Land held by chiefs, Raos and Rajas.....' (The Mughal Empire, pp. 325); ড. এস. এ. কিউ. হুসাইনী'র কৃত ভাগ হলো, "(a) Khalisah land... (b) The iqta' or jagir land... (c) The suyurghal land (milk or madad-i-ma'ash).... (d) The sulhi land... (e) The altamgha land...'. (Administration under the Mughuls, pp.103-4).

মালিকীয়, জায়গির ও জমিদারি সে অর্থে রাষ্ট্রের অধীনে থেকেও সম্রাটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নয়। অন্য কথায় 'খালিশা'র অন্তর্গত ভূমি থেকে সম্রাট ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের মাধ্যমে যেমন সরাসরি রায়ত-সাধারণের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও আদায় করতে পারতেন, অনুরূপভাবে জায়গিরদার বা রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগী ও জমিদারদের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের ভূমি থেকে সে রকম সরাসরি ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তা আদায়ের তিনি অধিকারী ছিলেন না।

আধুনিককালের বিবেচনায় এক কথায় খাসজমি তথা ১নং খতিয়ানে সরকারের পক্ষে কালেক্টরের নামীয় যে ভূমি, মধ্যযুগে বিশেষত মুসলমান শাসনামলে তাই-ই ছিল 'খালিশা' বা 'খালিশ-ই-শরিফা'ভুক্ত ভূমি। এ থেকে আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব সরাসরি রাজকোষে নীত হতো। তবে এর একটা ব্যাপকাংশ ব্যয়িত হতো সম্রাটের ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসন তথা রাজপ্রাসাদ ও রাজপুরুষদের ভরণপোষণ ও আমোদ-প্রমোদে ও কিছু কিছু জনহিতকর কার্যে। এছাড়া কখনও কখনও 'মনসবদার'দের বেতন-ভাতা ('যারা মূলত রাজস্ব-স্বত্বনিয়োগ লাভ করতো না'), রাজপুরুষদের (এখানে সম্রাটের পুত্র-কন্যা বা তৎপুত্র-কন্যা বুঝানো হচ্ছে) ব্যক্তিগত সেনা ('আহদী') প্রতিপালন, গোলন্দাজ-বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ এবং 'সুবা' বা প্রদেশগুলির নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক ব্যয় প্রভৃতিও 'খালিশা'র আয় থেকে মিটানো হতো।[৩৯] এখানে মনে রাখা দরকার যে, 'খালিশা' ভূমি থেকে রাজকোষের আয় বিভিন্ন সময়ে কমবেশি হতো। কারণ এর পরিমাণ প্রায় সময়ই উঠানামা করতো। নতুনভাবে রাজ্য-সীমানা সম্প্রসারিত না হলেও স্থিত একই ভূমি ক্ষমতাসীন সম্রাট বা সুলতানের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছায় বা শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে কখনও 'খালিশা' থেকে জায়গির, আবার জায়গির থেকেও 'খালিশা'য় অন্তর্ভুক্ত হতো। এ ধরনের যোগ-বিয়োগ হরহামেশাই চলতো। স্বভাবতই 'খালিশা'র নিরূপিত আয়ের কোন স্থিরতা ছিল না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় সম্রাট আকবর একবার সাম্রাজ্যের বিরাট এলাকার প্রায় সমস্ত জায়গির অধিগ্রহণ করে 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এর ফলে পরবর্তীকালে এক 'খালিশা' থেকেই তাঁর রাজকোষের মোট আয়ের $\frac{১}{৪}$ ভাগ আসা শুরু করেছিল।[৪০] অথচ সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে 'খালিশা' ভূমির 'জমা' কমে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্যের মোট 'জমা'র ৫ শতাংশেরও নীচে।[৪১] আবার সম্রাট শাহজাহানের সময়ে হয়েছিল $\frac{১}{৭}$ অংশ।[৪২] আওরঙ্গজেবের শাসনামলে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় $\frac{১}{৫}$ ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৪৩] অবশ্য তাঁর আমলে ভূমিরাজস্বের পরিমাণও ছিল সর্বোচ্চ—উৎপাদিত ফসলের এক-তৃতীয়াংশ থেকে কখনও কখনও ৫০%। উল্লেখ্য একই ভূমি একবার 'খালিশা', আবার

৩৯ মধ্যকালীন ভারত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫।
৪০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।
৪১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।
৪২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৫।

জায়গির ভুক্ত—যা-ই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে মৌল পার্থক্য ছিল, 'In the case of Khalisah lands, the revenue would be collected without the intervention of the local landed magnates.'[৪৪] অর্থাৎ মধ্যস্বত্ব, তা যে কোন ধরনের বা আকারের হোক না কেন, এখানে তার কোন ভূমিকা ছিল না। অন্যদিকে, 'The jagirdar was only the representative of the government; he was not a middleman. He realized only the prescribed state demand.'[৪৫] তবে বাস্তবে, 'The holders of those jagirs were usually mansabdars, holding definite ranks bestowed on them by the emperor. They received the emoluments either in cash from the government treasury or, more commonly, they were assigned particular areas as jagirs. ... Since a jagir was usually assigned in lieu of pay, it was necessary to determine in each case an area that would yield an amount of revenue equivalent to the sanctioned pay. A standing assessment or jama was, therefore, prepared for each unit of territory, the village and more especially the pargana or mahal. This jama was used for purposes of assessment.'[৪৬] অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, জায়গিরদার বা ভূমিরাজস্ব-স্বত্বনিয়োগী হলেন রাষ্ট্রের পক্ষে ভূমিরাজস্ব আদায়কারী একজন এজেন্ট বা প্রতিনিধি মাত্র। মনসবদার-জায়গিরদার যে আকৃতি-প্রকৃতি (এখানে আকারটাই প্রধান বিবেচ্য) 'মনসব' বা সৈন্যবাহিনী সংরক্ষণ-প্রতিপালনের অধিকারী ছিলেন, তার ব্যক্তিগত ও রক্ষণীয় বাহিনীর ভরণপোষণের জন্য যে সমুদয় ব্যয় রাষ্ট্রকর্তৃক নিরূপিত ও ধার্য হতো, তেমন আয়জ্ঞাপক ভূমিবিশিষ্ট এলাকা তাকে প্রদান করা হতো। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভূমি থেকে কোন প্রকার বাড়তি বা অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের অধিকারী জায়গিরাধিকারী মনসবদার যেমন হতেন না[৪৭], তেমনি সম্রাটের ইচ্ছার ক্রীড়ানকের মতো যখন-তখন তারা এক জায়গা থেকে অন্যত্র বদলি হতেন (সচরাচর ৩/৪ বছর ব্যবধানে তা ঘটার কথা[৪৮]) বা সম্রাট তা মর্জিমাফিক করার অধিকারী ছিলেন।

৪৪ The Fifth Report, pp. 317.

৪৫ The Administration of the Moghul Empire, Dr. I. H. Qureshi, pp. 172.

৪৬ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 18.

৪৭ এই সুযোগ যে আইনগতভাবে আদৌ ছিল না তার সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ রসিক দাসের কাছে লেখা সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্র যার ১০ নং অধিনিয়মে বলা হয়েছে :
"১০. আমিন, আমিল, চৌধুরি, কানুনগো আর মুকদ্দম-দের 'মলবা'র সমাপ্তি, মাল (ভূমি রাজস্ব) ছাড়া অন্যান্য ব্যয় বিলোপ ও নিষিদ্ধ কর—যেগুলি কৃষকের হয়রানির উপলক্ষ্য হতে পারে—এই সব ব্যাপারে কড়া হুকুম দিন; তাঁদের থেকে অঙ্গীকারপত্র নিন যে, কখনো 'মলবা' বাড়াবেন না এবং শাহী দরবার কর্তৃক নিষিদ্ধ অথবা মকুব কর আদায় করবেন না; স্বয়ং এ-সমস্ত অবগত থাকুন; তথাপি যদি কেউ এ-কাজ করেন এবং নিন্দাবাদ ও নিষেধ সত্ত্বেও করে যেতে থাকেন তবে শাহী দরবারে মামলাগুলি উপস্থাপন করুন যাতে (অপরাধীকে) পদচ্যুত করা যায় এবং তাঁর স্থানে অন্য কাউকে নিয়োগ করা যায়।" (মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, ড. ইরফান হবিব সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৪১) তবে কখনও কখনও দূরবর্তী প্রদেশে অতিদুঃসাহসী জায়গিরদাররা সরকারি এ মূল নীতির ব্যত্যয় যে ঘটাতো না এটা জোর করে বলা মুশকিল।

৪৮ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 18.

স্বাভাবিকভাবে এ থেকে ধারণা করা যায় যে, অন্যান্য সরকারি কর্মচারী যেমন সুবেদার, ফৌজদার, আমিল, কানুনগো, আমিন প্রভৃতির ন্যায় এরাও (জায়গিরদার-মনসব-দার) ছিলেন এক ধরনের রাষ্ট্রীয় কর্মচারী। যা হোক 'খালিশা'র সঙ্গে জায়গিরের আরেকটি মূল পার্থক্য ছিল এই যে, প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টির আয় ও ব্যয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা সম্রাটের ছিল না। আর যে পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ সম্রাট সংরক্ষণ করতেন তা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিল নামে মাত্র। একবার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সম্রাটের বাস্তব অনুমোদনে জায়গির কারও ওপর ন্যস্ত হলে প্রকৃতপক্ষে তিনিই হয়ে যেতেন এর প্রভু ও নিয়ন্তা। কোনও প্রকার গুরুতর অনিয়ম না ঘটলে অথবা প্রাপ্ত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া না গেলে সম্রাট শুধু জায়গিরদারের কাছ থেকে আপৎকালে সৈন্য সহযোগিতা লাভ করেই ক্ষান্ত ও সন্তুষ্ট থাকতেন।

মোগল যুগের জমিদারি ও বিভিন্ন স্থানীয় রাজন্যবর্গ প্রশাসিত অঞ্চলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিল খানিকটা ভিন্ন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার পূর্বে তৎকালীন জমিদারি ব্যবস্থা সম্পর্কে ড. রাধাকুমুদ মুখার্জীর একটি মন্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক বলে উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, 'The zemindars were those who did not accept service or status as Mansabdars under the Imperial Government but retained their position as rulers of their own domains, subject to payment of a tribute to the emperor. They collected the land revenue from their cultivators in their traditional indigenous methods.'[৪৯] বলা যায় এই সকল জমিদার ও অঞ্চলাধিকারীগণ ছিল রাষ্ট্রের আশ্রিত ও প্রশ্রয়-প্রাপ্ত একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী যারা মৌসুমওয়ারি প্রজাদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় করে তার কিয়দংশ রাষ্ট্রকে 'নজরানা' বা আনুগত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ থোক উপঢৌকন প্রদান করতো, এবং অবশিষ্ট বৃহত্তর অংশ তারা নিজেরা রেখে দিতো। ফলত রাষ্ট্রের এই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা তাদেরকে যে সর্বদা অনুগত ও সম্রাটের আজ্ঞাবাহী করে রেখেছিল তা বলাইবাহুল্য। তাছাড়া এরা অঞ্চলবিশেষের জন্য প্রচলিত বা রাষ্ট্রকর্তৃক পূর্ব থেকে ধার্য ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত কোন খাজনা কৃষকদের কাছ থেকে আদায়ের অধিকারী ছিল না, তথাপি নিজস্ব এলাকার কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষত ভূমির উৎপাদিকা শক্তি ও সেচ সুবিধার ওপর নির্ভর করে তারা প্রায় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের এই প্রাক-নিরূপিত হারের সীমা অতিক্রম করে যেতো। তবে এ ব্যাপারে এদেরও কিছুটা জবাবদিহিতা ছিল। কারণ, 'The Zamindar was.... to render accounts of his collection and submit a statement through the Qanungo and the Diwan of the province. He was to attract people for settlement and improve cultivation. He was responsible for the preservation of peace in the area and was to assist the state in time of need.'[৫০]

৪৯ Indian Land System, pp. 166.

৫০ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, Dr. Khondkar Mahbubul Karim, pp. 153.

এ পর্যায়ে 'জায়গিরদার'দের সঙ্গে মোগল যুগের জমিদার ও অঞ্চলাধিকারী স্থানীয় প্রধানদের পার্থক্য নির্দেশ করা হলো।

বস্তুত রাষ্ট্রের সঙ্গে এদের কার্য-কারণ সম্পর্কই উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের মূল ভিত্তি ছিল। আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, জায়গিরদারগণ ছিল একার্থে রাষ্ট্রের বেতনভোগী নিয়মিত কর্মচারীগোষ্ঠীর মতো[৫১]। বদলি, পদোন্নতি (এক্ষেত্রে 'মনসব' বৃদ্ধিই মুখ্য) প্রভৃতি থাকার ফলে রাষ্ট্রের অন্যান্য কর্মচারীদের সঙ্গে জায়গিরদারদের বিভেদ বিশেষ ছিল না। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, অধিকাংশ জায়গিরদারই ছিলেন সম্ভ্রান্ত গোত্রভুক্ত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে সম্রাটের খুব প্রিয়ভাজন। অন্যদিকে হাতে গোণা সামান্য কিছু শীর্ষস্থানীয় রাজকর্মচারী ছাড়া অন্যান্য সরকারি কর্মচারীর এই মর্যাদা ছিল না। এছাড়া জায়গিরদারদের সম্রাটকে সচরাচর জমিদারদের মতো নিয়মিত বার্ষিক 'tribute' দিতে হতো না। যদিও শেষোক্ত শ্রেণীর জন্য এটি ছিল একান্তভাবেই বাধ্যতামূলক। বরং এ ব্যাপারে কোন রূপ ব্যত্যয় বা বার্ষিক দেয় যথাসময়ে সম্রাটের দরবারে প্রেরিত না হলে সেটাকে খুব কঠোর দৃষ্টিতে গ্রহণ করা হতো। কখনও কখনও আঞ্চলিক প্রধানের সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের ঘাট্তি বা বিদ্রোহ বিবেচনায় তার বিরুদ্ধে সেনা পর্যন্ত প্রেরণা করা হতো। এখানে উল্লেখ্য, আঞ্চলিক প্রধান বা স্থানীয় ভূস্বামীগণের সরকারি কর্মচারীদের মতো সময়ে-সময়ে বদলি বা স্থানান্তর ছিল না সত্য, তবে তাদের ব্যক্তিগত ভূমিকা ও আচরণের কারণে পদচ্যুতি ঘটতো, তবে সেক্ষেত্রে বংশ-পরম্পরায় নতুন কোন উত্তরাধিকারী তার স্থান গ্রহণ করতো। অথবা তার অবর্তমানে সম্রাটের বিশেষ পছন্দের কেউ।

যা হোক, উপরে উল্লিখিত তিন প্রকারের সরকারি ভূমির মধ্যে সম্রাট আকবর 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত ভূমিকেই স্বীয় ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে হিশেবে বেছে নিয়েছিলেন। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে আমাদের পরবর্তী আলোচনাও মূলত একে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হবে।

শুরুতেই সম্রাট রাজধানী আগ্রা, প্রধান শহর দিল্লি ও লাহোর প্রদেশের কিছু অংশের 'খালিশা'র জন্যে আমির ইতিমাদ খানকে নিযুক্ত করেন। ইতিমাদ খান দায়িত্ব লাভ করার পর প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো জায়গির ভূমি থেকে 'খালিশা'র পৃথকীকরণ। তাঁর এই কার্যে সম্রাটের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল তা অনস্বীকার্য। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি সমগ্র মোগল শাসনামলে 'খালিশা'র পাশাপাশি জায়গির ও জমিদারি ব্যবস্থার প্রাবল্য থাকা সত্ত্বেও অপরাপর জ্যেষ্ঠ মোগলদের মতো সম্রাট আকবরও সাম্রাজ্যবাপী নিজের নিরঙ্কুশ প্রভাব ও একচ্ছত্র আধিপত্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সর্বদাই চাইতেন এ দু'টির যাতে ব্যাপক বিস্তার না ঘটে। আর যদি নিতান্ত অনিবার্য কারণে জায়গির ও জমিদারি ব্যবস্থার সম্প্রসারণ

৫১ ড. সতীশ চন্দ্র বলেন, 'জাগীরদারগণ ছিল পুরোপুরি রাজকর্মচারী। পদোন্নতি, অগ্রসরতা, এমন কি অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্যও তাহারা সম্পূর্ণরূপে রাজানুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিল।' (মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ৭)। ড. শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, '(প্রদত্ত) জমির ওপর সাধারণত জায়গিরদারদের কোনো ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব থাকত না। প্রায়ই এক জায়গির থেকে আরেক জায়গিরে মনসবদারদের বদলি করা হতো। এগুলিকে বলা হতো 'তনখা জায়গির।' (অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা, পৃষ্ঠা ১২)।

ঘটেও সেক্ষেত্রে যেন এর অধিকারীরা তথা জায়গিরদার ও জমিদাররা প্রভূত ক্ষমতা না পায়। তাই দেখা গেছে যখনই সম্রাট সুযোগ পেয়েছেন অথবা জায়গিরদারদের অনভিপ্রেত ভূমিকার কারণে হস্তক্ষেপ করার মতো সামান্য অজুহাত দেখেছেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি জায়গির বাতিল করে জায়গিরদারকে সরকারি কর্মচারীদের মতো স্বাভাবিক বেতন-ভাতার অর্থাৎ নগদ অর্থের আওতাভুক্ত করেছেন।[৫২] এতে করে একদিকে যেমন সম্রাটের সুপ্ত অভিলাষ চরিতার্থ হয়েছিল— জায়গিরদারদের স্থানীয় প্রভাব ও রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টিকারী মনোভাব দূরীভূত হতো অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের আড়ালে জায়গিরদাররা রায়তদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায় কালে বিভিন্ন অজুহাতে যে অতিরিক্ত ও অবৈধ অর্থ উপার্জন করতো তা-ও বন্ধ হয়। ফলত রায়তদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রায়তরা যেমন খুশী হতো তেমনি 'খালিশা'র ব্যাপ্তি ঘটায় রাজকোষের আয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতো, যা আকবরের মতো সাম্রাজ্যবাদী শাসকের একান্তই প্রার্থনীয় ছিল। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাই যথার্থই বলেছেন, 'Thus he (Akabr) secured more money and more power, the two things which he loved most.'[৫৩]

আগ্রা, দিল্লি ও লাহোর (অংশবিশেষ)— এই তিনটি প্রদেশের 'খালিশা'র অন্তর্ভুক্ত ভূমি থেকে যে রাজস্ব ('জমা-ই-রকমি') আয় হতো তার পরিমাণ ছিল প্রায় ২ $\frac{১}{২}$ লাখের মতো।[৫৪] এটি শেরশাহের আমলের নথিপত্রের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়েছিল। ইতিমাদ খান এ ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন আনেননি। তবে তিনি করারোপযোগ্য ভূমি খণ্ডগুলি স্থানীয়ভাবে জরিপ করান এবং সেই অনুপাতে নতুনভাবে রাজস্ব আয় নির্ধারণ করেন। তাঁর কাজের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভূমিতে উৎপাদিত ফসলের রাষ্ট্র-নির্ধারণকৃত মূল্যানুসারে উৎপন্ন দ্রব্যে রাষ্ট্রের অংশ নির্দিষ্ট করে তাকে নগদ অর্থে (এক্ষেত্রে 'দাম'-এ) পরিবর্তিত-করণ। বিষয়টি একটু বিশ্লেষণ করা গেল। ধরা যাক, কোন ভূমিতে বার্ষিক দু'বার ধান উৎপন্ন হয়। এই ধানের বিক্রয় মূল্য সরকার থেকে বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্নভাবে আগেই নির্ধারণ করে দেয়া হতো। এখন উক্ত ভূমিতে যে ফসল উৎপন্ন হতো তাতে রাষ্ট্রের অংশ নিরূপণ করা হতো। অতঃপর উক্ত অংশের ফসলের মূল্য সরকার নির্দিষ্টকৃত

৫২ আগেই বলেছি, মনসবদার বা জায়গিরদার পদে নিয়োগের একমাত্র অধিকর্তা ছিলেন মহামান্য সম্রাট স্বয়ং। (আরও দেখুন 'অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা', পৃষ্ঠা ১৩)। ক্ষমতা-কাঠামোয় জায়গিরদারদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও তাদেরকে ঘিরে একটি শক্তিশালী প্রভাব-বলয় সৃষ্টি হচ্ছিলো (স্মিথ যথার্থই বলেছেন, 'Each jagirdar was a little king in his own domain.' Akbar the Great Mogul, p. 265), যা প্রবল পরাক্রমশালী সম্রাটের আদৌ মনঃপুত ছিলো না। তিনি কোনও অবস্থাতেই চাইতেন না বিশেষ রাজানুগ্রহপ্রাপ্ত এই সকল অভিজাত ব্যক্তিদের গোপন প্রভাব ও প্রশ্রয়ে বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যেই আর একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গড়ে উঠুক এবং পরিণামে তাঁর জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াক। মূলত এই উদ্দেশ্যেই সম্রাট জায়গিরদারদের নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি বা জায়গির প্রদানের চেয়ে তাদেরকে নগদ বেতনের আওতায় এনে তাদের ক্ষমতা খর্ব করার ব্যাপারে দিন দিন অধিক উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন।

৫৩ Akbar the Great Mogul, pp. 165.

৫৪ Policies of the Great Mughals, pp. 5.

হার অনুসারে ধার্য করে তাকে প্রচলিত মুদ্রা তথা 'দামে' রূপান্তরিত করা হতো এবং সেই অনুযায়ী নগদ অর্থে (সর্বদা নয়) খাজনা আদায় করা হতো। ইতিমাদ প্রদেশগুলির সকল পরগণার জন্যই একই হারে রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।[৫৫] এর ফলে আর যাই হোক, প্রাথমিকভাবে প্রজারা তাদের দেয় সম্বন্ধে আগেভাগেই নিশ্চিত হতে পেরেছিল এবং ফসল উৎপাদন কালে খাজনা আদায়ের সময়ে কর্মচারীরা যে হয়রানি করতো তার হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল।

তবে এটি ছিল মহামতি সম্রাটের একটি প্রাথমিক উদ্যোগ। বস্তুত ১৫৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত তথা মুজাফফর খান তুরবাতি ও বিখ্যাত রাজা টোডরমলকে রাজস্ব সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োগের আগে পর্যন্ত আকবর দ্বিতীয় পর্যায়ে সত্যিকারভাবে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা প্রক্ষিপ্ত করতে পারেননি। বলা যায় এ যাবৎ নানা যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থেকে এবং রাষ্ট্রীয় সীমা-পরিসীমা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার ফাঁকে ফাঁকে তিনি ভূমিরাজস্ব ক্ষেত্রে যে প্রথাপদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছিলেন তা ছিল শেরশাহেরই অনুসৃত ব্যবস্থা। অবশ্য এর পরবর্তীকালেও সম্রাট নিজস্ব যুগের জন্য যে ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সাম্রাজ্যব্যাপী গৃহীত ও উপযোগী করে তুলেছিলেন, একার্থে সেটিও ছিল শেরশাহেরই ব্যবস্থার সম্প্রসারিত, পরিশীলত ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক উন্নততর রূপ। তাই শেরশাহ-ই ছিলেন তাঁর পরিকল্পনার ভিত্তি ও প্রেরণা। ড. রাধাকুমুদ বলেন, 'The historical importance of Sher Shah's scheme of Land Revenue Administration lies in the fact that it was adopted by the great Akbar as the basis of his own scheme which was gradually evolved through a series of experiments.'[৫৬] ড. বিদ্যাধর মহাজনও বলেন, 'It goes without saying that Sher Shah Sur was the forerunner of Akbar in the field of land revenue system. Sher Shah laid down the main principles which were followed later on in the time of Akbar.'[৫৭]

পিতা হুমায়ুনের সূত্রে আকবর সূর বংশীয় শাসকদের যে ভূমিরাজস্ব জমা-খতিয়ান লাভ করেছিলেন—একদিকে সেগুলি যেমন ছিল বেশ পুরোনো ও কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণ, ফলে তার নতুন বিন্যাসের প্রয়োজন ছিল, তেমনি অন্যদিকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ভূ-খণ্ড বিজিত হয়ে সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হচ্ছিলো—যার জন্য প্রয়োজন হয়েছিল নতুনভাবে রাজস্ব 'জমা' নির্ধারণ করার। ইতিমাদ খানের তত্ত্বাবধানে যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তাতে বেশ কিছু ত্রুটি ছিল, যে কারণে এ থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছিলো না। ইতিমাদ খান সমগ্র অঞ্চলের জন্য একই হারে শস্য মূল্য নিরূপণ করেছিলেন, যা বাস্তব কারণেই যথার্থ ছিলো না। দ্বিতীয়ত নিরূপিত মূল্য হার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্র তথা সম্রাটের কাছে পাঠাতে হতো। দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য এক্ষেত্রে বেশ জটিলতা হতো। একদিকে সময় ক্ষেপণ হতো, অন্যদিকে সম্রাটের দরবারে একবার কাগজপত্র নীত হয়ে যদি তাতে তাঁর সম্মতি না পাওয়া যেতো তখন

৫৫ Ibid., pp. 5.
৫৬ Indian Land System, pp. 161.
৫৭ Mughal Rule in India, pp. 108.

আবার তা আদান-প্রদানে প্রচুর সময় নষ্ট হতো। এতে করে নতুন 'জমা' সরকারিভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে পরে এর ভিত্তিতে সরেজমিনে খাজনা আদায়ে বিলম্ব ঘটতো। তৃতীয়ত আগেই বলেছি ইতিমাদ খান ভূমিরাজস্ব গ্রহণ নগদ অর্থে চালু করেছিলেন; এর কিছু কিছু ভালো দিক ছিলো স্বীকার করে নিলেও দেখা যেতো এতে গ্রামের সাধারণ রায়তশ্রেণী প্রকৃতার্থে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কেননা গ্রামাঞ্চলে এমনিতেই শস্য বিক্রয় মূল্য শহর-বন্দর অপেক্ষা কম ছিলো। অথচ তাদেরকে খাজনা দিতে হতো প্রাদেশিক শহরগুলির মূল্য হারের সমানুপাতে যেখানে স্বাভাবিক কারণেই শস্য বিক্রয় মূল্য ছিলো তুলনামূলক চড়া। ফলত খানের এই নীতির কারণে গ্রামের সাধারণ রায়তশ্রেণীর মধ্যে যে রাষ্ট্রের প্রতি অসন্তোষ জমা হচ্ছিলো তা সহজে অনুমেয়। চতুর্থত এক-এক অঞ্চলের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের ভূমিগত এবং ভূমিজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও উৎপাদনের পরিমাণ এবং বিক্রয় মূল্যের মধ্যে তফাৎ থাকা সত্ত্বেও রাজস্ব 'জমা' নিরূপণে ইতিমাদের তথা সরকারের অভিন্ন নীতি অবলম্বন রাজস্ব কর্মচারীদের মধ্যেও গোপন অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। কেননা সরেজমিনে প্রজার কাছে তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হতো। অথচ এর কোন সদুত্তর তারা দিতে পারতো না। উপরন্তু এর প্রতিকারের ক্ষমতাও তাদের ছিলো না। শেষত এই ব্যবস্থা কর্মচারীদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষায়ও বিব্রতকর অবস্থার জন্ম দিয়েছিলো। তার মুখ্য কারণ একই পদের কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বৈষম্য। দেখা গেছে কোন অঞ্চলে দ্রব্য মূল্য অন্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও সেই অঞ্চলের রাজকর্মচারী যে বেতন-ভাতা পেতো, তা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যের অঞ্চলের কর্মচারীর বেতন-ভাতার সমান। অথচ এই বেতন-ভাতার বাস্তব ব্যয়ে ছিলো যথেষ্ট তারতম্য। (অবশ্য এই অবস্থা আজও বর্তমান)। ফলত এ সব কিছু বিবেচনায় সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার স্বার্থেই, এবং এ কাজে ইতিমাদ খান অপেক্ষা অধিক যোগ্য লোকের সন্ধান লাভ করায় সম্রাট ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কারে নতুন নীতি প্রণয়নে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ইতিমাদ খানের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উপরিউক্ত অসঙ্গতি ও জটিলতাসমূহ দূর করার জন্য আকবর রাজস্ব বিষয়ে সমকালে সর্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ দুই অমাত্য—মুজাফফর খান তুরবাতি ও রাজা টোডরমলকে নিযুক্ত করেন। দায়িত্ব লাভ করার পর মুজাফফর খান তুরবাতি, রাজা টোডরমলের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় প্রথমেই রাজস্ব দপ্তরে রক্ষিত কাগজপত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে পরীক্ষা করেন। তাঁরা দেখতে পান প্রচলিত 'জমা-বন্দি'র খতিয়ানগুলিতে অজস্র রকমের ভুল ও ভুয়া তথ্য-পরিসংখ্যানের ছড়াছড়ি। অনুসন্ধানে তাঁরা আরও গভীরভাবে লক্ষ্য করেন যে, খতিয়ানের অনেক ভুল সম্বন্ধেই রাজস্ব কর্মচারীরা অবহিত, অথচ তারা বোধগম্য কারণে এগুলি শুধরানোর কোন চেষ্টা করেনি। দ্বিতীয়ত যেটা রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর হিশেবে তাঁদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল, তা রাষ্ট্রনির্দিষ্ট মূল্যের ভিত্তিতে উৎপাদিত দ্রব্যের রাষ্ট্রের প্রাপ্যাংশকে 'দামে' পরিণত করার পদ্ধতিতে সূক্ষ্ম ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। রাজস্ব কর্মচারীরা প্রায় সময়েই 'জমা-বন্দি'র দৈনন্দিন হিসাবের খাতায় গোঁজামিল দেখিয়ে রায়তদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ স্থানীয় কোষাগারে জমা দানের বেলায় কম করে ফেলতো। এভাবে উদ্বৃত্ত

অর্থ তারা নিজেরাই আত্মসাৎ করতো। ফলত খতিয়ানের ভুল ও অসামঞ্জস্য এবং 'জমা-বন্দি'র হিসাবের খাতায় কর্মচারীদের ফাঁকি দেয়া রোধের জন্য তুরবাতি ও রাজা প্রস্তাব করেন এলাকাভিত্তিক তথা প্রত্যেক পরগণার জন্য স্বতন্ত্র শস্য মূল্য হার চালু করার। শুধু তাই নয়, তাঁরা প্রতিটি প্রদেশের, এমন কি একই প্রদেশের বিভিন্ন রাজস্ব-বছরের (Fiscal year) খাজনার শস্যনির্ভর মূল্য হারও নিরূপণ করেন। যদিও সত্যি বলতে এগুলিও পুরোপুরি নির্ভুল ছিলো না। তবে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে বাৎসরিক 'জমা' আগে ভাগে নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট হওয়ায় একদিকে প্রজাসাধারণ যেমন তা জানতে সক্ষম হয়, তেমনি রাজস্ব কর্মচারীরাও 'জমা' 'ওয়াসিল' কালে তাতে হিসাবের গড়মিল দেখিয়ে অবৈধ উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে, তখন পর্যন্ত সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ব্যাপকাকারে নতুন কোন ভূমি জরিপ (একে 'জমা-জরিপ' বলাই যুক্তিসঙ্গত)-এর প্রচলন হয়নি। কিন্তু এবার সেটাও শুরু করা হয়।

নতুন ব্যবস্থায় পূর্বের প্রচলিত শস্য-মাধ্যমে রাজস্ব প্রদানের প্রথা (জমা-ই-রকম-ই কালামি) প্রায় বিলোপ করা হয়। এর পরিবর্তে জরিপকৃত নতুন খতিয়ান (আজ করার-ই-মাসাহাত) এবং কর্ষিত ও অকর্ষিত সকল ভূমির জন্য কানুনগোদের কাছে আগের রক্ষিত ও যাচাইবাছাইকৃত তথ্য-পরিসংখ্যান (তাকসিমাত-উল মুলক) ইত্যাদি উপযুক্ত পরীক্ষানিরীক্ষা করে পৃথক পৃথক 'জমা' নিরূপণ করা হয়। এতে করে স্থানবিশেষে শস্য-মূল্য হার আগের তুলনায় কিছুটা কমে গেলেও পরগণাভিত্তিক রাষ্ট্রীয় দাবির অংক অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কেননা ততোদিনে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মানুষের নতুন নতুন ভূ-খণ্ড আবাদের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই এই বর্ধিত ভূমি নতুন জরিপের আওতায় এসে সরকারি 'জমা'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও তখন পর্যন্ত নতুন 'জমা'র অনুপাতে 'হাসিল' (রাজস্ব আদায় বা উশুল) ছিল কম। এর প্রধান কারণ হিশেবে বলা যায় জরিপকৃত ভূমিতে উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ণয় ও তার অনুকূলে রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণের জন্য যে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো তা ছিল অনুমান-নির্ভর ও ত্রুটিপূর্ণ। ব্যবস্থাটি ছিল এ রকম : ভূমিতে কৃষকরা শস্য রোপন করার পর ফসল যখন কাটার উপযোগী হতো তখন রাজস্ব কর্মচারীরা কৃষকদের নিয়ে মাঠে গিয়ে নজর-আন্দাজে সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করতো। পরে সেই অনুযায়ী ভূম্যধিকারী ও রাষ্ট্রের ভাগ নির্দিষ্ট করা হতো। ব্যাপারটি যেহেতু একান্তই চোখের অনুমান-নির্ভর, স্বভাবতই এর সঠিকতা ও গ্রহণযোগ্যতা কী ছিল তা সহজেই বোধগম্য। পরবর্তীকালে (১৫৬৮-৬৯ খ্রিঃ) নতুন 'দিওয়ান' (এক কথায় রাজস্ব-মন্ত্রী) হিশেবে আমির শিহাব উদ্দিন আহমদ খান নিযুক্ত হয়ে সাংবাৎসরিক এবং ব্যয়বহুল ভূমি জরিপ পদ্ধতি বাতিল করে নতুন ব্যবস্থার প্রচলন করেন। নতুন ব্যবস্থায় তিনি আগের বছরগুলিতে রায়তদের প্রদত্ত ভূমিরাজস্বের সম্পূর্ণ হিসাব সংগ্রহ করেন। পরে সেগুলির মোট পরিমাণের গড় ফল বের করেন এবং সেটিকেই কৃষকদের বার্ষিক দেয় হিশেবে নির্দিষ্ট করেন। বস্তুত শিহাবউদ্দিনের এই সংশোধিত ব্যবস্থা স্থিত অবস্থার উত্তরণে বেশ ভূমিকা রেখেছিল। প্রথমত এতে রাষ্ট্রের আয়ের একটা সুনির্দিষ্টতা তৈরি হয়েছিল। কারণ ফসল উৎপাদন কম-বেশির সঙ্গে এর সংশ্রব বিশেষ ছিলো না। আগে যেমন নানা কারণে (প্রধানত প্রাকৃতিক) কৃষকদের ভূমিতে ফসলোৎপাদন কোন বছর কম হতো, আবার কোন বছর খুব বেশি। এবং সেই অনুপাতে রাষ্ট্রের পাওনাও নামা-ওঠা করতো। কিন্তু শিহাবউদ্দিনের ব্যবস্থায় কয়েক বছরের মোট

উৎপাদনের গড় নির্ণীত হওয়ায় এবং ফসল উৎপাদন কম হোক বা বেশি, গড়-টিকেই কৃষকদের দেয় ধার্য করায় রাষ্ট্রের আয়ও আগেভাগেই স্থির হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত নতুন নিয়মে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া কৃষকদের নিজেদের অবহেলা ও অন্যবিধ কারণে ভূমির উৎপাদনহ্রাস পাওয়ার ঘটনা অনেকটা কমে যায়। কেননা এখন থেকে তারাও সতর্ক হতে বাধ্য হয়—ব্যক্তিগত কারণে ভূমিতে উৎপাদন কম হলেও আগের মতো রাজস্ব পাওনা পরিশোধে কোন হেরফের হওয়ার সুযোগ ছিলো না। স্বভাবতই কিছুটা হলেও রাষ্ট্রের সার্বিক ফসলোৎপাদনের হার বেড়ে গিয়েছিলো এ কথা না বললেও চলে। যা হোক, শিহাবউদ্দিনের ব্যবস্থার প্রকৃত চারিত্র্য জানা না যাওয়ায় এ সম্বন্ধে আর বিশদ বলা সম্ভব নয়।[৫৮]

এখানে একটি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, তা হচ্ছে উপর্যুপরি এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনিবার্য ফল হিশেবে সম্রাট আকবরের কাছে নিত্য-নতুন তথ্য-পরিসংখ্যান প্রকাশিত হচ্ছিলো বটে, কিন্তু তা থেকে স্থির কোন সিদ্ধান্ত বা করণীয় তিনি স্পষ্ট বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেননা প্রতিনিয়ত রাজস্ব-নীতি পরিবর্তনের ফলে একদিকে যেমন প্রজাসাধারণের হয়রানি বাড়ছিলো, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রের মোট আয় সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট কিছু বোঝা যাচ্ছিলো না। বস্তুত এই দ্বিবিধ সমস্যা থেকে প্রজা ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার জন্য সম্রাট ১৫৬৬-৬৭ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফর খান তুরবাতি ও রাজা টোডরমলের দ্বারা নিরূপিত রাজস্ব 'জমা'কে ১০ জন অভিজ্ঞ কানুনগোর মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে সেটাকেই আপাতত গ্রহণীয় বিবেচনা করেন এবং বলা যায় এর বাস্তব প্রচলনও শুরু হয় ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দ থেকে।

কিন্তু এতো কিছুর পরেও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় একটি স্থিতিশীল ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। অবশেষে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট তাঁর সুদীর্ঘ শাসনামলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী রাজস্ব-সংস্কার প্রবর্তিত করেন। এ ব্যাপারে প্রথম যে উল্লেখযোগ্য সংস্কার তিনি করেন এবং যা প্রকৃতই ছিলো অত্যন্ত তাৎপর্যবহ, তা হলো দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন থেকে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের পৃথকীকরণ। প্রাদেশিক স্তরে এ দু'টি বিভাগ এ যাবৎ একজন শাসনকর্তার অধীনে ন্যস্ত ছিলো। কিন্তু এই প্রথম সম্রাট দু'টিকে স্বতন্ত্র দু'জন কর্মকর্তার অধীনে বিন্যস্ত করেন। সে অনুযায়ী প্রশাসনকেও নতুনভাবে ঢেলে সাজান। দ্বিতীয়ত 'দশসালা' বন্দোবস্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে নতুনভাবে রাজস্ব 'জমা' নির্ধারণ করেন। 'আইন-ই-আকবরী'র ভাষায় বলা যায়, 'From the beginning of the 15th year of the Divine era to the 24th, an aggregate of the rates of collection was formed and a tenth of the total was fixed as the annual assessment; but from the 20th to the 24th year the collections were accurately determined and the five former ones accepted on the authority of persons of probity.'[৫৯] প্রসঙ্গত 'দশসালা' বন্দোবস্তের কিছুটা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন।

৫৮ Calcutta Review, July 1949, pp. 18, quoted from 'Policies of the Great Mughals', pp. 6

৫৯ Volume II., pp. 94.

এটা ঠিক যে ভারতে ইংরেজ আমলে 'দশসালা' বন্দোবস্ত বলতে যে প্রকৃতির ভূমি ব্যবস্থাপনা বুঝাতো, এটি তেমন ছিলো না। আবার এর সম্বন্ধে সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে ('আইন-ই-আকবরী'সহ) এতো কম লেখা হয়েছে যে আসলেই বিষয়টি কেমন ছিলো তা জানা খুবই দুষ্কর, যে কারণে 'দশসালা' বন্দোবস্তের প্রকৃতি নির্দেশ করতে গিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের এক-একজন এক-এক রকমের ধারণা উপস্থাপন করেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভি. এ. স্মিথ 'আইন-ই-আকবরী'র পূর্বোদ্ধৃত বিবৃতি থেকে যথার্থই ধারণা করেন, 'দশসালা' (১৫৭০-৭১ থেকে ১৫৭৯-৮০)-র প্রথম পাঁচ বছরের হিসাব আজও দুষ্প্রাপ্য[৬০], যে জন্যে এর শেষ পাঁচ বছরের পরিসংখ্যান নিয়ে চূড়ান্ত ব্যবস্থাটি কার্যকরী হয়ে থাকবে। তবে বাস্তব অবস্থা যাই হোক, এর মাধ্যমে সম্ভবত বর্ণিত দশ বছরের বার্ষিক গড় ফসলোৎপাদনের পরিমাণ ও একই সময়ে সরকার নির্দিষ্ট মূল্যহারের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের অংশের বাজার মূল্য নিরূপণ করা হয়েছিল এবং এটি প্রচলিত মুদ্রা 'দামে' নগদে পরিশোধযোগ্য করা হয়। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'The Dahsala system (decennial settlement) proved a beneficial measure. ...... It was levied on the average produce of the past ten years and the state demand in cash was fixed on the basis of the average of the last ten years' prices.'[৬১] বস্তুত অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকের বিবেচনায় 'দশসালা' বন্দোবস্ত ছিলো শুধু সম্রাট আকবরের নয়, বরং সমগ্র মোগল শাসনামলের সবচেয়ে মৌলিক ও সুদূরপ্রসারী রাজস্ব সংস্কার। এ সম্পর্কে দু'জন প্রখ্যাত আধুনিক ঐতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি বলেন, 'This was the most basic and far reaching reform undertaken during the Mughal regime.'[৬২] ড. জগদীশ নারায়ণ সরকারও বলেন, 'This was perhaps the most fundamental reform in the Mughal period and it had far-reaching significance.'[৬৩]

আলোচ্য 'জমা' নির্ধারণ করতে গিয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যকে নতুনভাবে ও একক পরিমাপক দিয়ে জরিপ ('তনাব' হিশেবে পরিচিত) করতে হয়েছিল। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি শেরশাহের সময়ে জরিপ কাজে অনেক সময় 'দড়ি'র ব্যবহার করা হয়েছিল। কিন্তু 'দড়ি' ব্যবহারের কিছু খারাপ দিক ছিলো। শুকনো ও ভেজা অবস্থায় এ থেকে দু'রকমের দৈর্ঘ্য পাওয়া যেতো। আবার বাঁশের নল ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির হাতের মাপ নির্ভর হিসাব সর্বদা সুফল দিতো না। কারণ এতে এক-এক অঞ্চলে এক-এক দৈর্ঘ্যের পরিমাপক ব্যবহৃত হতো যা ভূমিরাজস্ব 'জমা'র ভিত্তি 'বিঘা'র পরিমাপ নির্ণয়ে প্রায় সময়ই জটিলতা সৃষ্টি করতো। ফলত এতে রাজস্ববিভাগীয় কর্মচারীদের অঘোষিত

৬০ Akbar the Great Mogul, pp. 270.
৬১ The Mughal Empire, pp. 328; A Short History of Muslim Rule in India, pp. 328-29
৬২ The Administration of the Moghul Empire, pp. 168.
৬৩ Mughal Polity, pp. 275.

দুর্নীতির কারণে আখেরে রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আকবর তাই অনেক চিন্তাভাবনার পর প্রচলিত 'দড়ি' বা নলের পরিবর্তে লোহার আংটাযুক্ত বাঁশের নল চালু করেন। এর দৈর্ঘ্যও তিনি নির্দিষ্ট করে দেন বিখ্যাত সিকান্দরি গজের (বিস্তারিত জানার জন্য এই লেখকের 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা' দ্রষ্টব্য) হিসাবে।

যা হোক ইতিমাদ খান, মুজাফফর খান তুরবাতি ও বিশেষত রাজা টোডরমল প্রভৃতির প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা ও আন্তরিক সহযোগিতা এবং সর্বোপরি সম্রাটের ব্যক্তিগত মনীষা ও উদ্ভাবনী শক্তির সংমিশ্রণে এই আমলে বাংলা তথা বৃহত্তর ভারতের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সর্বশেষ স্বরূপ যা দাঁড়িয়েছিল তা একে একে নীচে তুলে ধরা হলো।

তবে তার আগে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় আরও দু'একটি বিষয় আলোচনা করে নেয়া হলো।

সম্রাট হিশেবে আকবরের সমগ্র জীবনকাল বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট ধরা পড়ে, তা হলো সকল ধর্মের মানুষের প্রতি তাঁর অভূতপূর্ব সমতা-নীতি। আধুনিক সেক্যুলার (secular) রাষ্ট্রের যে মূল ধারণা অর্থাৎ রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব ও আনুকূল্য দেখাবে না, বরং তদ্বিষয়ে আশ্চর্য রকমের নিরপেক্ষ ও নিস্পৃহ থাকাই তার উদ্দীষ্ট। বস্তুত সেই দূর মধ্যযুগে আকবরের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল নীতি-আদর্শও ছিল সেটাই। যদিও সর্বদা এই ধর্মীয় নিরপেক্ষতা-নীতি অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।[৬৪] একটি যুগোপযোগী ও সর্বজনগ্রাহ্য ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে সম্রাট অপেক্ষাকৃত উদার ও সহাবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। একদিকে তিনি যেমন হিন্দু প্রজাদের কাছ থেকে প্রচলিত 'জিজিয়া' কর আদায় রহিত করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানদের দেয় বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কর 'জাকাত' আদায়ও বন্ধ করেছিলেন।[৬৫] এর ফলে কেন্দ্রীয় রাজকোষের যে ক্ষতি হয়েছিল তা সম্রাট পুষিয়ে নিয়েছিলেন 'পরিবর্ত কর ব্যবস্থা' চালু করে। এর মধ্যে ছিল 'জরিবানা' (ভূমি জরিপকালে মাঠ আমিনদেরকে দেয় 'ফী'), 'মাসাল্লিনা' (রাজস্ব আদায়কারীদের 'ফী')[৬৬], লবণ কর প্রভৃতি। এছাড়া রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্যেও জড়িয়ে পড়েছিল।[৬৭] মোদ্দা কথা আকবর তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে ইসলামি অনুশাসনকে খুব একটা প্রাধান্য দেননি, অথচ এ জাতীয় প্রবণতা প্রাক-মোগলযুগে সুলতানদের কারও কারও সময়ে প্রবলভাবে ছিল।

আকবর যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী তখন ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তার স্বেচ্ছাচারী প্রয়োগ শুরু হয়েছিলো। তিনি চেয়েছিলেন বিচ্ছিন্ন পদ্ধতিগুলিকে একটি বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ার ভিতোর শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে। যদিও কাজটি ছিলো নবীন সম্রাটের জন্য বেশ কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ।[৬৮]

৬৪ Akbar the Great Mogul, pp. 258-9.
৬৫ Policies of the Great Mughals, pp. 3-4.
৬৬ Mughal Polity, pp. 273.
৬৭ Policies of the Great Mughals, pp. 4.
৬৮ The Crescent in India : A Study in Medieval History, Prof. Sri Ram Sharma, pp. 394.

পূর্বোক্ত 'দশসালা' বন্দোবস্ত এবং স্থানবিশেষের জন্য অনুসৃত স্বতন্ত্র পদ্ধতিসমূহ যথা 'জবতি', 'গল্লাবকশি', 'নাসক' প্রভৃতি ব্যবস্থার[৬৯] অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলে আমরা এই আমলের (সমগ্র মোগল যুগেরও বলা যায়) ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌল সূত্র হিশেবে কয়েকটি অনুষঙ্গের উপস্থিতি খুঁজে পাই। প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Mount Stuart Elphinstone-এর ভাষায় অনুষঙ্গগুলি নিম্নরূপ :[৭০]

'1. To obtain a correct measurement of the land.
2. To ascertain the amout of the produce of each bigha of land, and to fix the proportion of that amount that each ought to pay to the government.
3. To settle an equivalent, for the proportion so fixed, in money.'

ঐতিহাসিক এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট এই সূত্রগুলিকে আরও সংক্ষেপে চমৎকার বিবৃত করেছেন। যথা :[৭১]

'(a) measurement of land,
(b) classification of land, and
(c) fixation of rates.'

যা হোক, এখন এ আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সার্বিক চিত্র নীচে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

ভারতীয় মুসলমানদের ভূমিরাজস্ব বিষয়ক দলিলদস্তাবেজে 'জবতি' শব্দটির একটি বিশেষ স্থান রয়েছে। যদিও অভিধানে এর সঠিক অর্থ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, তথাপি একে 'জরিপ' বা

৬৯ ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'আমরা দেখিয়াছি যে আকবরের সময় হইতে রাজস্ব নির্ধারণের প্রথা হিসাবে নাসাক, জবৃত, কান্‌কুট এবং ভাওয়ালি, এই কয়েকটি অতি পরিচিত প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল।' (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪০)। অবশ্য ড. এস. এ. কিউ. হুসাইনি 'দশসালা'র বাইরে মাত্র তিনটি প্রথার অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন। তাঁর ভাষায়, 'In spite of the dah salah arrangement three methods of assessment seem to have prevailed in certain parts of the Empire at the close of Akbar's reign—dabt, nasq, and ghallah bakshi.' (Administration under the Mughuls, pp. 131).

৭০ The History of India : The Hindu and Mahometan Periods, pp. 529; অধ্যাপক এস. এম. জাফফার এগুলিকে চারটি বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'In order to elaborate the existing land revenue system four things were found necessary : (1) to make a correct paimaish (measurement) of the whole land under cultivation, (2) to ascertain the average produce of each bigha of land, (3) to fix the share of the State per bigha, and (4) to fix the equivalent for the share of the State so fixed in terms of money.' (The Mughal Empire, pp. 153).

৭১ Mughal Rule in India, pp. 201. ঐতিহাসিক স্মিথের সূত্রগুলিও একই রূপ : 'The first step in the new system of 'settlement' operations was measurement. The next was the classification of lands; the third was the fixation of rates for application to the classified areas.' (Akbar the Great Mogul, pp. 271).

'আমল-এ-জরিপ' এর সমার্থক হিশেবে গণ্য করা যেতে পারে বলে এ যুগের কৃষি ও রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বিশেষজ্ঞ ড. ইরফান হবিব জানিয়েছেন।[৭২] 'আইন-ই-আকবরীতে 'জবতি' ব্যবহারের তাৎপর্য থেকে ড. হবিব আরও ধারণা করেন, 'পরিমাপ এবং তার ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ বোঝাতেই শব্দটি' ব্যবহৃত হয়।[৭৩] Moreland একে নির্দিষ্ট অর্থে সংজ্ঞায়িত না করলেও 'জবতি' দ্বারা শস্য ভাগাভাগির পরিবর্ত কোন পদ্ধতি মনে করেছেন— 'Zabt must mean a method of assessment different from sharing.'[৭৪] এই পরিবর্ত ব্যবস্থা বলতে সম্ভবত তিনি 'জরিপ' বা (measurement)-কেই নির্দেশ করে থাকবেন।[৭৫]

'জবতি' পদ্ধতির প্রচলন পূর্বেও ছিলো। সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনামলে এবং বিশেষ করে শেরশাহ ও তৎ-পুত্র ইসলাম শাহের সময়ে এর প্রচলন ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'আইন-ই-আকবরী' থেকে।[৭৬] মূলত শস্য ভাগাভাগি পদ্ধতির ত্রুটি দূর করার জন্যেই সম্রাট ব্যাপকভাবে 'জবতি'র ব্যবহার চালু করেন।

সংক্ষেপে 'জবতি' পদ্ধতির চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ড. সুলেখ চন্দ্র গুপ্ত। তাঁর ভাষায়, 'Under the zabti system, the land under cultivation of different crops was actually measured for purposes of assessment. To it was then applied a schedule of rates (ie, zabt) prepared on the basis of average yield per unit of land for each crop. Concessions were made to the assessee on the basis of the actual state of productivity of his land at any given time. One-third (?) of the total produce thus assessed into cash on the basis of average prices for different crops prevalent in the area. The total amount of revenue thus estimated on the basis of average yields and average prices provided the basis for the formation of average revenue rates per unit of area for different qualities of soil and for different crops.'[৭৭]

মাঠ পর্যায়ে সামগ্রিক 'জবতি' পদ্ধতির বাস্তবায়নে প্রধানত দু'টি জিনিসের দরকার হতো অর্থাৎ ভূমিরাজস্ব বিভাগের মাঠ কর্মীদেরকে এগুলি সার্বক্ষণিকভাবে হাতের কাছে রাখতে হতো। এর একটি শস্য মূল্য হারের তালিকা (Schedule of crop rates); সচরাচর একে 'দস্তুর' বলা হতো। এবং অন্যটি শস্য-পরিসংখ্যান (Crop Statements) বা তৎসম্পর্কিত বিশদ তথ্যাদি।

প্রচলিত শস্য মূল্যহার দু'ভাবে নির্ধারণ করা হতো। 'পোলাজ' শ্রেণীর ভূমিকে[৭৮] এ ক্ষেত্রে ভিত্তি ধরা হতো। একটি নির্দিষ্ট একক (বিঘা) পরিমাণ ভূমিতে বার্ষিক যে ফসল

৭২ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১২।
৭৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২১২।
৭৪ The Agrarian System, pp. 235.
৭৫ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 14.
৭৬ 'আইন' ১ম খণ্ড, সংগৃহীত 'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ২১৩।
৭৭ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 14.
৭৮ 'পোলাজ' নামীয় ভূমি বলতে বুঝাতো সেই শ্রেণীর ভূমিকে যাতে প্রতি বছরই একের পর এক বিভিন্ন জাতের শস্য উৎপন্ন হতো এবং বছর বছর রাজস্ব পাওয়া যেতো। এই জাতীয় ভূমি কখনই অনাবাদি বা পতিত ফেলে রাখা হতো না।

উৎপাদন হতো তার ভালো, মাঝারি ও খারাপ ফলনের মোট পরিমাণের গড় নির্ণয় করা হতো, পরে তা থেকে ১/৩ হারে রাষ্ট্রের পাওনা বাবদ ফসলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা হতো ও সরকার নির্ধারিত শস্য মূল্যহারের ভিত্তিতে প্রচলিত মুদ্রা 'দামে' রূপান্তরিত করা হতো। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করা যায়। ধরা যাক, কোনও এলাকার এক বিঘা 'পোলাজ' শ্রেণীর ভূমিতে জলবায়ু, মাটির স্থানীয় গুণাগুণ প্রভৃতি কারণে খুব ভালো যে ফলন হলো তার পরিমাণ ২০ মণ, অনুরূপভাবে মাঝারি ও খারাপের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫ ও ১০ মণ। এখন এ তিন রকম ফলনের সমষ্টির গড় হলো (২০+১৫+১০ = ৪৫ ÷ ৩) ১৫ মণ। পরবর্তীতে ভালো-মন্দ যাই হোক, এটিকেই ধরে নেয়া হতো বিঘা প্রতি মোট উৎপাদনের পরিমাণ। এ থেকে এখন রাষ্ট্রের অংশ বাবদ ১/৩ হারে নির্দিষ্ট করা হতো (১৫ ÷ ৩) ৫ মণ। বলাবাহুল্য এই পরিমাণকে সরকারি ভাষায় বলা হতো 'মাল'।[৭৯] অবশ্য ব্যাপারটির এখানেই শেষ ছিলো না। পরে 'মাল'কে সরকার নির্ধারিত শস্য মূল্য হারের ভিত্তিতে 'দামে' রূপান্তরিত করে তবেই কৃষকের দেয় নগদে নির্দিষ্ট করা হতো।

আগেই বলেছি ভূমিরাজস্ব কর্মচারীদের জন্য শস্য-পরিসংখ্যান সংরক্ষণ করা ছিলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা কোন্ জমিতে কখন ('খরিপ' ও 'রবি' শস্যের জন্য দু'টি মৌসুম) কি পরিমাণ কী কী ফসল উৎপন্ন হতো, সেটা আগেভাগে নিশ্চিতভাবে জানতে না পারলে পূর্বোক্ত নিয়মে শস্য মূল্য নির্ধারণ করা খুবই কষ্টকর ও অসুবিধাজনক হতো। ফলে এই অসুবিধা যাতে না হয় সেজন্য সার্বক্ষণিক প্রয়োজন মিটানোর উপযোগী একটি বিস্তারিত পরিসংখ্যান রাজস্ব দপ্তরে আগেই সংরক্ষণ করা হতো। 'জবতি' পদ্ধতির সাহায্যেই এটি করা হয়েছিলো।

অন্যদিকে সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য অংশে ইতোমধ্যে নতুনভাবে ভূমি জরিপ কার্য শুরু হয়েছিলো। রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও নির্ধারিত 'মান গজ' (Standard yard) এর ভিত্তিতে পরিমাপক দণ্ড (লোহার আংটাযুক্ত বাঁশের নল) চালু হয়েছিলো এবং সে অনুযায়ী মাঠ আমিনগণ সরেজমিনে মেপে 'মান বিঘা' (Standard bigha)[৮০] এর পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলো। জরিপ বিভাগের লোকজন মাঠে মাঠে কাজ করে যে পর্চা বা খতিয়ান প্রস্তুত করতো তাতে সচরাচর নীচের তথ্যগুলি সন্নিবেশিত হতো। যথা :[৮১]

(ক) রায়তের নাম;
(খ) জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ;
(গ) চাষাধীন জমির মোট পরিমাণ;
(ঘ) ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের জমির আয়তন;

৭৯ 'মাল' কথাটি বহু অর্থ-জ্ঞাপক। পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে এর অর্থ 'ভূমিরাজস্ব দাবি' (Demand)। ড. এন. এ. সিদ্দিকী'র বর্ণনায় বলা যায়, "'মাল' কথাটি পণ্য হার অথবা মূল্য হার অনুযায়ী কৃষিকার্যে নিয়োজিত জমির উপর আসল যে ভূমি-রাজস্ব নির্ধারিত করা হইত, তাহাকেই বলা হইত।' (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩৫)।

৮০ প্রায় ৩২ ইঞ্চি মাপের গজের ('ইলাহি গজ') ৬০×৬০= ৩৬০০ বর্গগজ বিশিষ্ট ভূমি-ক্ষেত্র।

৮১ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪২।

(ঙ) উদ্‌বৃত্ত জমির পরিমাণ;
(চ) বিভিন্ন শস্য উৎপাদিত জমির পরিমাণ, ইত্যাদি।

আসলে 'জবতি' ব্যবস্থার উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যাবলি বিশ্লেষণ করে একে আমরা অনায়াসে আকবরের বহুল-কথিত ও নন্দিত 'রায়ত-ওয়ারি' প্রথা বলে ধরে নিতে পারি। এই ব্যবস্থায় প্রধান যে বিষয়টি তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষণীয় তা রাজস্ব-প্রদাতাশ্রেণী তথা রায়তের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক; উভয়ের মধ্যে তৃতীয় কোন শক্তি বা মাধ্যম এক্ষেত্রে একান্তভাবেই অনুপস্থিত ছিল। দেখা যায় রাষ্ট্রের পক্ষে তার বেতনভাতাভোগী কর্মচারী-গোষ্ঠী সরাসরি নিয়মিতভাবে মাঠে যাচ্ছে, চাষযোগ্য ভূমির হাল-হকিকত পর্যবেক্ষণ করছে, রায়তের সঙ্গে কথা বলছে, অতঃপর দু'দলের মধ্যে দেনা-পাওনা নির্দিষ্ট হচ্ছে। সুতরাং এটাকে 'রায়তওয়ারি' প্রথা না বলার কোনও যুক্তি নেই। ড. মুখার্জী ঠিকই বলেছেন, 'the assessment under this system was Ryotwari, the demand being fixed on each cultivation'.[৮২]

এখানে উল্লেখ্য যে, 'জবতি' প্রথার উত্তরোত্তর প্রসারের ফলে জায়গির ব্যবস্থা ক্রমাগত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলো[৮৩]। অবশ্য সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছাও ছিলো সেটাই। তারপরও দেখা যাবে মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র এর প্রচলন ঘটেনি। মূলত 'জবতি'র সবচেয়ে ব্যাপক প্রচলন সম্ভবপর হয়েছিলো বিহার, এলাহাবাদ, মুলতান, আগ্রা, অযোধ্যা, মালওয়া, দিল্লি, লাহোর এবং আজমির ও গুজরাটের কোনও কোনও অঞ্চলবিশেষে।[৮৪] মধ্যবাংলা, সিন্ধু, কাবুল, খান্দেশ, কাশ্মির ইত্যাদি দূরবর্তী 'সুবা'গুলিতে এর প্রচলন বিশেষ ছিলো না।[৮৫] যা হোক, নীচে 'জবতি'[৮৬] ব্যবস্থার কয়েকটি ভালো দিকের উল্লেখ করা হলো।

এক. আগেই বলেছি 'জবতি' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। উভয় পক্ষের জন্য তা ছিলো তুলনামূলক সহজ ও সুবিধাজনক।[৮৭]

দুই. একজন ভূম্যধিকারী রায়তের অধীনে কতোটুকু ভূমি রয়েছে অর্থাৎ যে পরিমাণ ভূমি সে চাষ করতে চায় ও তজ্জন্য তাকে কতো ভূমিরাজস্ব রাষ্ট্রকে দিতে হবে, তার

৮২ Indian Land System, pp. 163.
৮৩ Policies of the Great Mughals, pp. 17.
৮৪ The Mughal Empire, Dr. Ishwari Prasad, pp. 331; Mughal Rule in India, Dr. V.D. Mahajan, pp.110.
৮৫ Policies of the Great Mughals, pp. 17.
৮৬ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 331.
৮৭ ড. মুহম্মদ আবদুর রহীম বলেন, 'By infusing his own ideas into the revenue regulations of Sher Shah, he (Akbar) developed an excellent revenue organisation which was called the Zabti system. ...The main essence of this system was that the Emperor,.....fixed the assessment on a sound basis, fair and convenient to the cultivators as well as to the Government.' (History of the Muslims in Indo-Pakistan Sub-Continent, Drs. Reazul Islam, M.A. Rahim & Abdul Hamid, pp. 271).

সুস্পষ্ট উল্লেখ করে 'জবতি' ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্র রায়তকে 'পাট্টা' (অধিকার-পত্র) দিতো। অনুরূপভাবে রায়ত রাষ্ট্রীয় প্রস্তাব স্বীকার করে নিয়ে রাষ্ট্রকে দিতো 'কবুলিয়ত' (অঙ্গীকার-পত্র)।

তিন. এভাবে 'পাট্টা' ও 'কবুলিয়তে' উভয় পক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু লিখিত থাকায় ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়কালে অসৎ কর্মচারীদের পক্ষে পরবর্তীতে তাতে কোন রকম অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হতো না। ফলে তাদের দুর্নীতির পথও রুদ্ধ হতো।

চার. 'জবতি' প্রথা রাজস্ব কর্মচারীদের কাজের পরিধি আগের তুলনায় বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কেননা নতুন নতুন ভূখণ্ড জরিপ ও শস্য মূল্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে তা দপ্তরে রেজিস্টার ভুক্ত করতে হতো, এতে সময় লাগতো প্রচুর।

পাঁচ. রাষ্ট্রের জন্য এই ব্যবস্থার সবচেয়ে সুবিধাজনক দিক ছিলো এই যে, এতে করে রাষ্ট্র তার আয়ের উৎস ও মাত্রা অর্থাৎ কোন্ কোন্ ভূখণ্ড বা অঞ্চল থেকে বার্ষিক কী পরিমাণ ভূমিরাজস্ব পাওয়া যাবে, তা আগেভাগেই জানতে পারতো এবং তদনুযায়ী ব্যয় নির্দিষ্ট করতে পারতো। বলাবাহুল্য, 'খালিশা'র আয় থেকে যেহেতু সম্রাটের ব্যক্তিগত ও প্রাসাদের বিভিন্ন খরচাদি নির্বাহ হতো, স্বভাবতই 'জবতি' সম্রাটের কাছে তুলনামূলকভাবে পছন্দনীয় ছিলো তা সহজে অনুমান করা যায়।

গল্লাবকশি

মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় 'গল্লাবকশি' কোনও নতুন সংযোজন ছিলো না। বরং সম্ভবত এটি ছিল সর্বপ্রাচীন প্রথা[৮৮], ও সুপ্রতিষ্ঠিত।[৮৯] ভিনসেন্ট এ. স্মিথ[৯০] ও ড. ঈশ্বরী প্রসাদ[৯১] একে 'আদি ভারতীয় প্রথা' (Original Indian System) হিশেবে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিকে ড. ইরফান হবিব একে 'আদিম-রূপ' (Primitive form)[৯২] বলে স্বীকার করলেও সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলেছেন যে, 'রীতিটি....আদৌ রাজস্ব-নির্ধারণের পদ্ধতি নয়, বরং এমন একটা সংগ্রহ-পদ্ধতি যাতে রাজস্ব ধার্য না করলেও চলে।'[৯৩] একার্থে ড. হবিবের এ বক্তব্য সঠিক। কারণ ভূমিরাজস্ব ধার্যের জন্য মধ্যযুগে বিশেষত মোগল শাসনামলে যে সুনির্দিষ্ট পরিশ্রমসাধ্য প্রায়োগিক ব্যবস্থা বা পথ অনুসরণ করতে হতো, এ ক্ষেত্রে তার অনুপস্থিতি বা অপ্রয়োজনীয়তাই নির্দেশ করে এটি মূলত কোনও তথাকথিত প্রথা নয়। আবার যদি ধরে নেয়া হয় যে, সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই এর মাধ্যমেই রাষ্ট্র তার ভূমিরাজস্ব দাবি ও আদায় সংক্রান্ত জটিল প্রক্রিয়াটি এক প্রকার প্রায় নির্বিঘ্নেই চালিয়ে

৮৮ ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ৩১২।

৮৯ Dr. Qeyamuddin Ahmad, see 'Land Revenue in India', Ed. Dr. Ram Sharan Sharma, pp. 33

৯০ Akbar the Great Mogul, pp. 273.

৯১ ড. প্রসাদ 'original'-র স্থলে 'old' ব্যবহার করেছেন শুধু। দেখুন, The Mughal Empire, pp. 332.

৯২ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 235.

৯৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২০৯।

এসেছে, এবং পর্যালোচ্য সময়েও তার ব্যবহার বহুলভাবে সক্রিয় ছিলো, তা হলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে 'গল্লাবকশি'ও ছিলো একটি স্বীকৃত পদ্ধতি। মোগল যুগে অন্যান্য পদ্ধতির পাশাপাশি এরও প্রচলন ছিলো ব্যাপক।

'গল্লাবকশি' ফারসি শব্দ, অর্থ 'ভাগচাষ' বা 'ফসলভাগ'।[৯৪] হিন্দি বা সমজাতীয় ভাষায় এর অর্থ দাঁড়ায় 'বাটাঈ'[৯৫] ও 'ভাওলি' (ভাওয়ালি)[৯৬]। এই পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো ভূমিজ উৎপন্ন দ্রব্যের রাজস্ব ভাগাভাগিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ তথা রাষ্ট্র বা জায়গিরদার ও রায়তের মধ্যকার পারস্পরিক যৌথসম্মতি। ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় এর একটি চমৎকার সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'Ghallabakhshi or crop division denotes the system of assessing and realising revenue by sharing the produce of land, whether by actual division or by estimation.'[৯৭] এ ক্ষেত্রে ভূমিরাজস্ব ধার্য ('জমা') ও আদায় ('হাসিল') একই সময়ে হতো। 'It...combined the assessment and collection in one stage.'[৯৮] তবে ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে, সম্ভবত 'কৃষিকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিবার পরই শস্য ভাগ করা হইত এবং সেই ভাবেই জমাবন্দি তৈয়ারি করা হইত।'[৯৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'আইন-ই-আকবরী'তে 'গল্লাবকশি' শব্দের সরাসরি প্রয়োগ দেখা যায় না। তবে এখানে 'আমলগুজার' অধ্যায়ে (৫ম) 'বাটাঈ' ও 'ভাওলি' পদ্ধতির যে প্রকৃতি বর্ণিত হয়েছে তাতে স্পষ্টতই মনে হয় আকবরের রাজত্বকালে মূলত ৩ ধরনের 'গল্লাবকশি'র প্রচলন ছিলো।[১০০] ড. ইরফান হবিবের ধারণা, 'প্রথমটিতে দু'-দলের লোকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি ('করার-দাদ') অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগি করা হয়। মনে হয় এটিকেই 'বটাঈ'-এর যথাযথ রূপ বলে গণ্য করা হতো।'[১০১] এক্ষেত্রে ফসল পাকার মৌসুমে তা কেটে ক্ষেতে বা সুবিধাজনক জায়গায় স্তূপীকৃত করে রাখাবস্থায় যেহেতু যার যার অংশ হারাহারি ভাবে ভাগ করা হতো, স্বভাবতই রাষ্ট্রের ন্যায্য স্বার্থ যাতে কোন অবস্থায় ক্ষুণ্ন না হয় অর্থাৎ সুযোগসন্ধানী রায়তগণ যেন রাজস্ব কর্মচারীদের অনভিজ্ঞতা ও অপরিপক্কতার কারণে কোনরূপ ফাঁকি দিতে না পারে, সে জন্য মাঠে কাজ করার মতো বেশ কিছু বিচক্ষণ পরিদর্শক নিয়োগ করা হতো। 'আইনে'র ভাষায়, 'in this case several intelligent inspectors are required, otherwise the evil-minded and false are given to deception.'[১০২]

৯৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯; ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, পৃষ্ঠা ৩১২; The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 235.
৯৫ হিন্দি 'Batana' বা ভাগ করা (to divide) থেকে এসেছে। দেখুন, ' nnals and Antiquities of Rajasthan, Vol. I.', James Tod, pp. 582.
৯৬ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২০৯।
৯৭ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 69.
৯৮ Dr. Qeyamuddin Ahamad, 'Op. Cit.', pp. 34.
৯৯ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৩।
১০০ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২০৯।
১০১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৯।
১০২ The Ain-I-Akbari, Vol. I., pp. 47.

দ্বিতীয় ধরনের পদ্ধতি ছিলো 'খট্ট বাটাঈ' (একে আমরা ক্ষেত বাটাঈ বলতেই বেশি আগ্রহী)। এ পদ্ধতিতে সাধারণত জমিতে বীজ বপনের আগেই, অথবা চারা রোপন হয়ে গেলে পরবর্তী পর্যায়ে তা পাকার আগেই দু'দলের মধ্যে চাষাধীন ক্ষেত 'খট্ট' বা সীমানা-নির্ধারণী রেখা (khatt or line of demarcation) দ্বারা চিহ্নিত করা হতো[১০৩], অতঃপর স্ব স্ব সীমানাচিহ্নিত ভূমিতে উৎপন্ন ফসল পক্ষগণ গ্রহণ করতো। এ সম্পর্কে 'আইনে' বিস্তারিত কিছুর উল্লেখ না থাকলেও একটা ধারণা নিঃসন্দেহে করা যায়, 'খট্ট বাটাঈ'য়ে রাষ্ট্রের (প্রজারও) ভাগের ফসল অনেক সময় নানাবিধ কারণে মারা পড়তো বা নষ্ট হতো অর্থাৎ সামান্য হলেও ঝুঁকি ছিলো।

তৃতীয়টি তথা 'লাঙ্গ বাটাঈ' ছিলো প্রথমটিরই প্রায় অনুরূপ। তবে এক্ষেত্রে যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা—'বাটাঈ' পদ্ধতিতে মূলত সংশ্লিষ্ট ক্ষেতে বা খামারে শস্যের আঁটি ভাগাভাগি হতো, কিন্তু 'লাঙ্গ বাটাঈ' প্রথায় কর্তিত শস্যের আঁটি উভয়পক্ষের পছন্দ মতো স্থানে প্রথমে নিয়ে স্তূপ করা হতো, পরে তা মাড়াই করে খড় বা খোসা থেকে শস্য বা শস্য-দানা বের করা হতো এবং পরস্পরের হিস্যানুযায়ী (রাষ্ট্রের প্রাপ্য $\frac{১}{৩}$ হলে ৩ স্তূপ করে রাষ্ট্র ১ স্তূপ, আবার প্রাপ্য $\frac{১}{৪}$ হলে ৪ স্তূপ করে ১ স্তূপ) তা বণ্টিত হতো। তবে এই হিস্যা নির্বাচনে রাষ্ট্রীয় বা জায়গিরদার পক্ষের কিছুটা অগ্রগণ্যতা ছিলো অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করলে আপাত দৃষ্টিতে ভালো ভাগটা গ্রহণ করতে পারতো।[১০৪]

'জবতি'র মতো 'গল্লাবকশি' বা 'ভাওয়ালি' প্রথায়ও ফসল ভাগাভাগিতে রাষ্ট্র বা জায়গিরদার ও রায়তের মধ্যে লিখিতভাবে চুক্তি সম্পাদিত হতো। এর নাম ছিলো 'খসড়া-ই-ভাওয়ালি'। এতে সাধারণত নিম্নোক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ থাকতো। যথা :[১০৫]

ক. রায়ত বা আসামীর নাম;
খ. জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ;
গ. জমির মোট আয়তন ও উৎপাদনের পরিমাণ;
ঘ. রাষ্ট্র বা জায়গিরদার ও রায়তের হিস্যা ও
ঙ. ফসলোৎপাদনের মোট ব্যয়।

'গল্লাবকশি'র প্রধান প্রচলন এলাকা ছিলো 'থাট্টা' বা নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল, কাশ্মির ও কাবুলের অংশবিশেষ[১০৬] এবং কান্দাহার[১০৭] প্রভৃতি।

যা হোক, এ পর্যায়ে 'গল্লাবকশি' বা 'ভাওয়ালি' প্রথার কয়েকটি ভালো-মন্দ দিকের উল্লেখ করে এর আলোচনা শেষ করবো।

পর্যালোচ্য সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ব্যবস্থার তুলনায় মোগল সাম্রাজ্যের কোনও কোনও অঞ্চলের রায়তশ্রেণীর কাছে এটি যে কারণে প্রথম পছন্দের তালিকায় ছিলো

---

১০৩ Administration under the Mughuls, Dr. S. A. Q. Husaini, pp. 132.
১০৪ The Land Systems of British India, Vol. I., Baden Powell, pp. 275.
১০৫ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, ৪৩।
১০৬ Indian Land System, pp. 162; A History of India, Dr. Narendra Krishna Sinha & Dr. Nisith R. Ray, pp. 321.
১০৭ The Provincial Government of the Mughals, Dr. Paramatma Saran, pp. 291; Mughal Government, Dr. Upendra Nath Day, pp. 109.

তা—একমাত্র এই ব্যবস্থায় রায়তগণ যে কোনও মৌসুম শেষে ফসল হানির ঝুঁকি রাষ্ট্র বা জায়গিরদারের সঙ্গে যৌথভাবে তথা হারাহারি মতে ভাগ করে নিতে পারতো[১০৮], অন্য পদ্ধতিতে যা প্রায় ছিলোই না বলা যায়। কিন্তু রাষ্ট্র ও জায়গিরদারের জন্যে এতে সুবিধা-অসুবিধার দুটো দিকই ছিলো। সুবিধার দিক, যেমন অন্যান্য পদ্ধতির মতো এক্ষেত্রে ফি-বছর বা একটি উল্লেখযোগ্য বিরতি অন্তর সরেজমিনে জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য প্রচুর সংখ্যক জনবল নিয়োগ করতে হতো না। একইভাবে শস্য মূল্যহার সম্বলিত ঢাউস ঢাউস নথিপত্রও রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষণের ঝামেলা ছিলো না। আবার এতে খারাপ যেটা ছিলো সেটিও কম ক্ষতির নয়। এই প্রথায় রাজস্ব কর্মচারীদের ক্ষেতেখামারে শস্য ভাগাভাগির সময়ে রায়তের সঙ্গে তাদের স্থানীয় আঁতাঁতের ফলে প্রকৃত 'জমা' 'ওয়াসিলে' ফাঁকি দেওয়ার সমূহ সুযোগ ছিলো। কারণ মাঠ পর্যায়ে কর্মচারীরা যেহেতু রায়তের সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করতো এবং তাদের সঙ্গে 'পরগণা' ও গ্রামের অবস্থাপন্ন শ্রেণীর সামাজিক সখ্যতা গড়ে উঠতো, সে জন্য দু'পক্ষের মধ্যে স্বার্থগত সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র কিছু ছিলো না। অথচ তাদের গোপন সম্পর্কের খেসারত গুণতে হতো রাষ্ট্রকে। রাষ্ট্রের জন্য আর একটি খুব খারাপ দিক ছিলো যার আভাস আগেই অন্যভাবে দেয়া হয়েছে, তা হলো এই প্রথা অনুসরণের ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্ষেতে শস্যোৎপাদন কম হলে বা কোন কারণে সম্পূর্ণ নষ্ট হলে তার ঝুঁকি রায়তের পাশাপাশি রাষ্ট্র ও জায়গিরদারকেও বহন করতে হতো। অবশ্য অন্য প্রথাগুলিতেও কখনও কখনও প্রাকৃতিক কারণে যেমন বন্যা, খরা বা অনুরূপ কোনও দুর্যোগ প্রভৃতির ফলে কোনও এলাকায় ফসলের ব্যাপক হানি ঘটলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তরফ থেকে 'ওয়াসিল' পুরোপুরি বা আংশিক মওকুপ করার নিয়ম ছিলো। এ সময় কৃষকদের রাষ্ট্র 'তাকাবি'ও দিতো। কিন্তু, 'গল্লাবকশি' প্রথায় উপর্যুক্ত প্রাকৃতিক কারণ বহির্ভূত উপায়ে যেমন কৃষকের ব্যক্তিগত গাফলতি, সময় মতো জমিতে বীজ বপন না করা বা সেচ না দেওয়া ইত্যাদির জন্য ফসলোৎপাদন কম বা আদৌ না হলেও তারও দায় বর্তাতো রাষ্ট্র ও জায়গিরদারের ওপর। এ ছাড়া 'ক্ষেত বাটাঈ' পদ্ধতিতে যেহেতু ক্ষেতে বীজ বপনের আগেই ক্ষেত ভাগ হয়ে যেতো, ফলে পরবর্তী স্তরে রাষ্ট্রের ভাগের ভূমির যথাযথ দেখভালের প্রতি রায়ত কার্যত দায়সারা গোছের হয়ে পড়তো। সুতরাং সার্বিক বিচারে এটা বলা যায় যে, 'গল্লাবকশি' বা 'ভাওয়ালি' প্রথায় 'সরকারের মোট প্রাপ্য রাজস্ব কমিয়া যাইত'।[১০৯] ফলত আবশ্যিকভাবে এটিও ঘটতে দেখা যেতো যে, 'স্থানীয় কর্মচারিবৃন্দের যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও প্রকৃত শস্য ভাগের পূর্বে উৎপন্নের কিছু অংশ বে-হাত হইত'।[১১০] এই কারণে এটি সবচেয়ে পুরোনো ভারতীয় ভূমিরাজস্ব প্রথা হওয়া সত্ত্বেও রায়তদের মধ্যেও বেশ জনপ্রিয় ছিলো।[১১১]

১০৮ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১০।

১০৯ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৩।

১১০ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৩।

১১১ তুলনামূলক বিচারে এই প্রথায় রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী ব্যয় ছিলো কম, অথচ সুযোগলোভী রায়তদের জন্য তা ছিলো একই সময়ে লাভজনক; ফলে সমকালীন কোনও কোনও নথিপত্রে একে

নাসক

সম্রাট আকবরের আমলের বা আরও বৃহত্তর গণ্ডীর জন্য বললে সমগ্র মোগল যুগের প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সবচেয়ে বহুব্যাখ্যাত এবং সেই অনুপাতে সবচেয়ে পরস্পরবিরোধীভাবে সংজ্ঞায়িত রাজস্ব ধার্য পদ্ধতি হলো 'নাসক'। ড. পরমাত্মা সরণ বলেন, 'The nature of nasq has not been clearly defined by any contemporary authority and consequently it has occasioned a good deal of discussion and research on the part of some modern writers.'[১১২] বস্তুত 'নাসক' পদ্ধতির আলোচনা আমাদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই করতে হবে।

সাধারণভাবে 'নাসক' শব্দের অর্থ প্রশাসন বা কোন প্রদেশ, জেলা ইত্যাদির দায়িত্ব পালন।[১১৩] কিন্তু মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় এর স্বতন্ত্র অর্থ বিদ্যমান। তবে সত্যি কথা বলতে এই স্বতন্ত্র অর্থ যে কী ছিলো সেটি আজ আর নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। কারণ তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য প্রথা-পদ্ধতির সঙ্গে 'নাসক'-এর মূলগত সাদৃশ্য এতো বেশি ছিল এবং ইতিহাসের বহু দূরবর্তী সোপানে বসে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এর এতো অধিক স্বরূপ নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন যে এটির আলোচনাই এক অর্থে দুরূহ ও মনগড়া হয়ে উঠেছে। ড. ইরফান হবিব তো বলেই ফেলেছেন, 'নসক' নামে পরিচিত নির্ধারণ ব্যবস্থার যথার্থ স্বরূপকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে।....ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, শব্দটির ব্যাখ্যার সংখ্যা সম্ভবত এর মোট উল্লেখ-কেও ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এই তালিকা যতই লম্বা হোক না কেন, কোন ব্যাখ্যাই যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না।'[১১৪] সুতরাং এই অ-গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা অন্যান্য মতের সহযোগিতায় এর একটা স্বরূপ দাঁড় করাবার চেষ্টা করবো।

আগেই বলে রাখা ভালো যে, 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবরনামা'য় এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ পাওয়া যায় না।[১১৫] 'আইনে' 'কানকূট', 'ভাওয়ালি' (এর রকমফেরসহ) প্রভৃতির স্বরূপ সম্পর্কিত যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সে ধরনের কোন উল্লেখও 'নাসক' সম্বন্ধে সেখানে অনুপস্থিত। স্বভাবতই শেষোক্ত দু'পদ্ধতি নিয়ে যতো বিস্তারিত আলোচনাই করা হোক না কেন, তার একটা মূল সূত্র 'আইনে' লভ্য। কিন্তু 'নাসক' সম্বন্ধে আবুল ফজল প্রমুখ সমকালীন লেখকদের নীরবতা এখানে এই ধারণা করতেও আমাদের প্রলুব্ধ করে যে, সম্ভবত এটি স্বতন্ত্র কোন প্রথা ছিলো না। বরং অন্য প্রচলিত প্রথাই 'নাসক' অভিধা পেয়ে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ধারণাও খুব জোরালো ও টেকসই বলে মনে হয় না।

যা হোক এ পর্যায়ে আধুনিক যুগের কয়েক জন প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের 'নাসক' সম্বন্ধীয় অভিমত তুলে ধরা হলো। ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী বলেন, 'Under this (Nazaq),

---

'রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। দেখুন, 'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ২০৯-১০।

১১২ The Provincial Government of the Mughals, pp. 282.

১১৩ The Agrarian System, pp. 235.

১১৪ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২২৮।

১১৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২৮।

revenue was fixed by arrangement or contract and not based on a detailed examination of the yield of crops...This system, accordingly, did not depend upon survey, Seasonal Records of Produce, area of cultivation, or the crops grown. It fixed the demand irrespective of these factors.'[১১৬]

ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'Nasaq was a system which denoted summary assessment on the village or some larger area as a unit. Under nasaq there was no need of assessment of land every year. Once it was assessed, its results could be repeated.'[১১৭]

ড. আই. এইচ. কোরেশি বলেন, 'In the course of time another method grew up. When a holding had paid state demand over a number of years, in ten or twelve years, it became quite apparent what the average payment had been, and the state and the cultivator came to an agreement whereby a fixed sum was paid and the area cultivated and the crops grown were not taken into consideration; this was contract and was known as nasaq.'[১১৮]

'নাসক'কে 'summary assessment of the village' বলে সর্বপ্রথম ধারণা দেন ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড।[১১৯] কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করতে পারেননি ড. আর. পি. ত্রিপাঠী। তিনি সরাসরি বলেন, 'I must frankly confess that I am not yet satisfied with the translation of the word 'nasaq' as "summary assessment'.....At any rate 'nasaqi' does not appear to me as yet "a summary assessment on village",...'[১২০] অবশ্য ড. ত্রিপাঠীও এর কোন অর্থ নির্দেশ করেননি। এখানে উল্লেখ্য, পরবর্তীকালে মোরল্যান্ড 'নাসক' সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত 'The Agrarian System of Moslem India' নামক গ্রন্থের 'Appendix- D' অংশে। এতে তিনি আকবরের সময়ে প্রচলিত 'ভাগচাষ' ও জরিপের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন যে, বস্তুত 'নাসক' ছিলো এ দু'টি পদ্ধতি থেকে ভিন্ন— 'nasaq must be read as denoting a particular method of assessment other than Sharing or Measurement, with both of which it is specifically contrasted.'[১২১] তাঁর মতে এটি ছিলো এক ধরনের 'Group-assessment', যা শুধুমাত্র খাসমহাল বহির্ভূত ভূমির জন্য প্রধানত গ্রাম প্রধানের (Village headman) সঙ্গে করা হতো।[১২২]

১১৬ Indian Land System, pp. 164.
১১৭ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp.69.
১১৮ The Administration of the Moghul Empire, pp. 170.
১১৯ Journal of the Royal Asiatic Society, 1926, pp. 46.
১২০ Some Aspects of Muslim Administration, pp. 360.
১২১ The Agrarian System, pp. 236.
১২২ Ibid., pp. 236.

অন্যদিকে ড. হবিব 'নাসক'কে কোন আলাদা ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী পদ্ধতি রূপে বিবেচনা করতে চান না। তিনি সমকালীন বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 'নসক'কে রাজস্ব নির্ধারণের কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি বলে গণ্য করা হয়নি। একে বরং অন্য সব পদ্ধতির সহায়ক হিসেবেই দেখা হয়েছে।'[১২৩] ড. কেয়ামুদ্দিন আহমদও ড. হবিবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত পোষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'the nasaq was not an independent method of assessment, but a "handmaid" of other methods, of both sharing and measurement. Its essential feature was that there was no periodic assessment. The initial assessment once made, whether by measurement or by appraisement, was used subsequently.'[১২৪]

যা হোক ড. হবিবের উপর্যুক্ত বক্তব্যের মধ্যে রাষ্ট্রের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছুটা স্ববিরোধ আছে বলে মনে হয়। কেননা প্রথমত 'নাসক' যদি অন্যান্য পদ্ধতির সহায়ক একটি ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী পদ্ধতিই হয় তা হলে একদিকে এর যেমন নিজস্ব কোন অস্তিত্ব থাকে না (হবিব বলেছেনও সেটা), তেমনি অন্য পদ্ধতিগুলিও ('জবতি', 'গল্লাবকশি', 'কানকূট' প্রভৃতি) এককভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় না। স্মর্তব্য, ড. হবিবের বর্ণনায় একে 'অন্য সব পদ্ধতির সহায়ক' হিশেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১২৫] তারপরও যদি যুক্তির খাতির ধরেও নিই যে, 'জবতি', 'ভাওয়ালি' প্রভৃতি এককভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ এক-একটি পদ্ধতি ছিলো (আমরা সেটাই মনে করি) এবং কোথাও কোথাও সেগুলির সহায়ক হিশেবে 'নাসক' কাজ করতো, তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে, এমন অনেক প্রদেশ বা অঞ্চল ছিলো (যার কিছু কিছু ড. হবিবও উল্লেখ করেছেন) যেখানে 'নাসক'ই এককভাবে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণে ভূমিকা রাখতো। প্রসঙ্গত 'নাসক' এর প্রধান প্রধান প্রচলন এলাকার নাম উল্লেখ করা হলো, যেমন—বাংলা, পূর্ব ওড়িশা, বেরার, খান্দেশ এবং সম্ভবত গুজরাট।[১২৬] বস্তুত এ সকল এলাকায় 'নাসক'এর ব্যাপক প্রচলন থেকে অনুমান করা অসিদ্ধ নয় যে, একটি একক ও বিশিষ্ট ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী পদ্ধতি হিশেবে আকবরের সময়ে 'নাসক' অনুসৃত হয়েছিলো।

দ্বিতীয়ত 'নাসক'এর সমসাময়িক প্রয়োগ নিয়ে যদি আমরা ভাবি তাহলেও দেখতে পাবো যে এটি নিঃসন্দেহে একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিলো যার প্রয়োগে ছিলো বিভিন্নতা। যেমন 'আইন' থেকে জানা যায় 'নাসক' অনুসৃত এলাকায় ভূমি জরিপের প্রয়োজন হতো না।[১২৭] 'আকবরনামা' থেকে প্রতীয়মান হয় কোনও কোনও খাসমহালে জরিপ ও 'দস্তুর' ব্যতিরেকে এটি সরাসরি কৃষকদের সঙ্গে সম্পন্ন হতো।[১২৮] সম্রাট আওরঙ্গজেবের

১২৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২২৯

১২৪ Aspects of Land Revenue Administration in the Mughal Period'—a treatise in 'Land Revenue in India : Historical Studies', pp. 35.

১২৫ ড. অনিরুদ্ধ রায়, 'নাসক' বলতে বুঝিয়েছেন যে 'প্রথায় প্রতি বছর জমি জরিপ করার প্রয়োজন হতো না'—দেখুন, মুঘল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৭

১২৬ The Agrarian System, pp.121.

১২৭ The Ain-I-Akbari, Vol. I., pp. 485. দেখুন, 'মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ২৩১।

১২৮ Vol. II., pp. 333;

সময়কার কোনও কোনও লেখায়ও একে 'রাজস্ব-নির্ধারক মুওয়াজানা-এ দহসালা' বলা হয়েছে। অধিকন্তু ড. হবিবও তাঁর সাম্প্রতিককালের এক লেখায় মোগল আমলে অঞ্চল বিশেষে 'জবতি' প্রচলনের পূর্বেকার রাজস্ব নির্ধারক পদ্ধতি হিশেবে 'নাসক'এর উল্লেখ করেছেন।[১২৯]

তৃতীয়ত পর্যালোচ্য যুগে 'নাসক' যে একটি আলাদা ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী পদ্ধতিরূপে শাসক মহলে গৃহীত হয়েছিলো তার সবচেয়ে বড় ও বাস্তব প্রমাণ কেন্দ্রীয় রাজস্ব দপ্তরের মুখ্য দিওয়ান হিশেবে শিহাবউদ্দিন আহমদ খানের নিয়ুক্তির পর খান কর্তৃক সাম্রাজ্যের কতিপয় অঞ্চলে 'জবতি'র স্থলে 'নাসক'এর প্রবর্তন।[১৩০] তিনি যেভাবে ও যে প্রক্রিয়ায় 'নাসককে ব্যবহার করেছিলেন তাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় আকবরের সময়ে 'নাসক' ছিলো 'a specific system, a particular method of fixing the jam.'[১৩১]

পরিশেষে একটি বিষয় অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আসলেই 'নাসক' প্রথায় ভূমিরাজস্ব কিভাবে নিরূপিত হতো তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা খুবই দুষ্কর। ড. গৌতম ভদ্র যেমন বলেছেন, 'খুব সম্ভবত, পরিমাপ ও শস্যবন্টন ব্যবস্থার মাঝামাঝি কোনো একটি উপায়ের নাম 'নস্‌ক'।'[১৩২] এই সংজ্ঞায় আর যাই কিছু থাক, আসল জিনিস অর্থাৎ 'উপায়'টি, নিরুদ্দিষ্ট। কিছুটা দ্বিধাযুক্ত মনে মোরল্যান্ডের বক্তব্য আপাতত যথার্থ বলে মেনে নিলে সঙ্গে সঙ্গে এটাও মানতে হবে যে, এই পদ্ধতির অনুকূলে রাজস্ব কর্মচারীদের যে বন্দোবস্ত চুক্তি হতো, তা মূলত গ্রাম-প্রধান বা জমিদারের সঙ্গে হতো।[১৩৩] কিন্তু সেক্ষেত্রে গ্রাম প্রধান কৃষকদের কাছ থেকে কোন্‌ পদ্ধতিতে সরকারি দাবি আদায় করে দিতেন সেটাও এখানে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাকেও নিশ্চয়ই প্রচলিত যে কোন একটি প্রথা অনুসরণ করতে হতো যা 'নাসক'এর অনুরূপ না-ও হতে পারে; তাই যদি হয় তা হলে তো আবার সেই ড. হবিবের কাছেই ফিরে যেতে হয়। ড. হবিব বলেন, 'যে—সব

১২৯ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 237.
১৩০ Vol. III., pp. 381.
১৩১ Some Aspects of Muslim Administration, pp. 357.
১৩২ মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ২২৮
১৩৩ মোরল্যান্ড তাঁর 'The Agrarian System, (Appendix 'D')' গ্রন্থে শুধু 'গ্রাম্‌-প্রধান'এর কথা উল্লেখ করেছেন। অন্যত্র (Journal of the Royal Asiatic Society, 1918) ঐতিহাসিক আলীর সহযোগে তিনি (মোরল্যান্ড) বলেন, '..it was ordinarily a zamindari rather than a ryotwari arrangement.' ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ও ড. নিশীথ রঞ্জন রায়ও মনে করেন, 'It resembled the Zamindari settlement'. (A History of India, pp. 322). অন্যদিকে ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 'The Nasaq was a ryotwari rather than a zamindari arrangement. In this system there was no intermediary between the ryot and the state.' (The Mughal Empire, 332). ড. আবদুল করিমও একই কথা বলেন। তাঁর ভাষায়, 'নছক্‌ প্রথা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে মনে হয় ইহা রায়তওয়ারী প্রথা এবং এই প্রথায় সরকার ও রায়তের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্ব বা জমিদার ইত্যাদি ছিল না।' (ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, পৃষ্ঠা ৩১২)। যা হোক, মোরল্যান্ডের বক্তব্যকে যদি সত্য ধরা হয় অর্থাৎ 'নাসক' প্রথায় 'গ্রাম-প্রধান' এর সঙ্গে রাজস্ব চুক্তি হতো সরকারের, তা হলে স্বীকার্য যে, ড. প্রসাদ ও ড. করিমের বক্তব্য যথার্থ নয়। তবে আসলে প্রথাটি প্রকৃতই কী ছিলো সেটাই আগে বিবেচ্য, নচেৎ ঐতিহাসিকদের পারস্পরিক এই মতদ্বৈধতা থেকেই যাবে।

ব্যবস্থা সম্বন্ধে আবুল ফজল 'নসক' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন সেই বিষয়ক সমস্ত তথ্য জড়ো করলে দেখা যায় যে বিভিন্ন রূপের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আসলে একটিই মূল বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে যা সর্বত্রই দেখা যেত। তা হলো এই : প্রতি বছর নতুন করে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো না, একবার নির্ধারণ করা হয়ে গেলে তার ফল বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করা হতো। মাপের অংক, নগদের পরিমাণ, শস্যের পরিমাণ, কিংবা লাঙলের সংখ্যা—এ সব বিষয়ে কীভাবে একেবারে গোড়াতে নির্ধারণ হতো কিংবা কোন্ কোন্ বিষয়ে পুনরাবৃত্তি হতো, সেটা আসলে কোন ব্যাপারই ছিল না। আগে যা হিসেব করে বার করা হয়েছিল, তা মেনে নিয়ে প্রকৃত নির্ধারণ প্রক্রিয়া চালু ছিল। 'নসক' বলতে বোঝাত ঐ প্রক্রিয়াকে যে-কোনভাবে পাশ কাটিয়ে যাওয়া।'[১৩৪] যা হোক, এটি ড. হবিবের মত। আমরা শুধু বলতে পারি আধুনিক ঐতিহাসিকদের জন্য মোগল আমলের ভূমিরাজস্ব নির্ধারণী প্রথা হিশেবে 'নসক'এর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় বাস্তবিকই কষ্টকল্পিত ব্যাপার এবং অধিকাংশ সময়ই যা চূড়ান্ত বিভ্রান্তিকর।

কানকূট*

দু'টি হিন্দি শব্দের যৌগ হচ্ছে 'কানকূট' বা দানাবন্দি পদ্ধতি। 'আইন-ই-আকবরী'তে এর যে স্বরূপ বিশ্লেষিত সেটি আগে এখানে উল্লেখ করা হলো—'kankut : kan in the Hindi language signifies grain, and kut, estimate. The whole land is taken either by actual mensuration or by pacing it, and the standing crops estimated in the balance of inspection. The experienced in these matters say that this comes little short of the mark. If any doubt arise, the crops should be cut and estimated in three lots, the good, the middling and the inferior, and the hesitation removed. Often, too, the land taken by appraisement, gives a sufficiently accurate return.'[১৩৫]

বাস্তবক্ষেত্রে 'কানকূট' প্রথায় দু'ভাবে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ করা হতো। এক. রজ্জু তথা দড়ি বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে কিংবা ক্ষেতের 'আইল' ধরে দ্রুত পায়ে হেঁটে (Pacing) চাষাধীন জমি মেপে ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা হতো। পরে উক্ত জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হতো (বিভিন্ন ফসলের বেলায় বিভিন্ন রকম) তার হিসাব, এবং অনুরূপ ফসল যে সকল জমিতে উৎপন্ন হতো সেখানে প্রথম পরিমাপকৃত ভূমির ক্ষেত্রফলের অনুপাতে মোট সম্ভাব্য উৎপাদন অঙ্ক কষে বের করা হতো। এভাবে প্রথমোক্ত জমির উৎপন্ন ফসলে রাষ্ট্রের প্রাপ্য যেভাবে নিরূপিত হতো ঠিক অনুরূপ ফসলের একই পরিমাণ বা বেশি পরিমাণ ভূমিতে হারাহারিভাবে রাষ্ট্রীয় পাওনা ধার্য করা হতো। এ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

১৩৪ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৩২।

* ড. পরমাত্মা সরণ 'কানকূট' আর 'নাসক' একই পদ্ধতি হিশেবে গণ্য করেছেন (The Provincicl Government..., pp. 291). ড. এম. পি. শ্রীবাস্তবেরও বিবেচনা অনুরূপ। দেখুন, Policies of the Grent Mughals, pp. 5).

১৩৫ The Ani-I-Akbari, Vol. I., pp. 47.

এই যে এতে চাষযোগ্য সমুদয় ভূমি বা ভূমি-খণ্ড পরিমাপ করার প্রয়োজন পড়তো না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নজর-আন্দাজে' ভূমির পরিমাণ ও তার সম্ভাব্য উৎপাদন এবং তদনুপাতে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ করাই ছিলো রাজস্ব কর্মচারীদের দায়িত্ব। দুই. 'নজর-আন্দাজ' সর্বদা কার্যকরী হতো না। এর দুর্বলতা সহজেই অনুমেয়। সেক্ষেত্রে কর্মচারীরা নিজেদের পছন্দ মাফিক ভালো, মাঝারি ও খারাপ— এই তিন ধরনের ফসলের ক্ষেত থেকে নমুনাস্বরূপ সমপরিমাণ জায়গার ফসল কেটে নিয়ে খামারে ঝাড়াই-মাড়াই করে ফসলোৎপাদনের পরিমাণ যাচাই করতো। পরে নির্ধারিত ফলনশীল জমির মোট উৎপাদন হিসাব করে রাষ্ট্রীয় দাবি ধার্য করা হতো। উল্লেখ্য এ পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের ধার্য রাজস্ব প্রায় সময়ই ওঠানামা করতো। কারণ কোনও জমিতে নজর-আন্দাজে প্রথমে যে রাজস্ব ধার্য করা হতো, পরবর্তীকালে রায়তের ইচ্ছায় দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় পরিমাপ করে তাতে ফসলের উৎপাদনের মাত্রায় কম-বেশি প্রমাণিত হলে স্বভাবতই তখন রাজস্বের পরিমাণও পুনর্বিবেচিত হতো অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পাওনার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো।[১৩৬] এখানে উপরের আলোচনা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রথায় ধার্য রাজস্ব মূলত নগদে না হয়ে প্রাথমিকভাবে তা হতো শস্যে বা দ্রব্যে।[১৩৭] কিন্তু এর চেয়েও লক্ষণীয় যে বিষয়টি এই প্রথার সুষ্ঠু বাস্তবায়নে রাষ্ট্র বা জায়গিরদারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য ছিলো তা সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারীদের সততা, অভিজ্ঞতা ও কর্মপটুতা। ফলত 'কানকুট' ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের জন্য প্রাথমিক অবস্থায় যে মূল ভূমি পরিমাপ করা হতো, তার ভিত্তিতে (পরিমাপকৃত ভূমির ক্ষেত্রফল ও শস্যের উৎপাদন) অনুরূপ শস্যাধীন সমুদয় ভূমির ক্ষেত্রফল ও সম্ভাব্য উৎপাদন 'নজর-আন্দাজে' নিরূপণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হতো উভয় পক্ষের (রাষ্ট্রপক্ষে রাজস্ব নির্ধারক, ও রায়ত) মধ্যে সমঝোতা, এরপর রাজস্ব নির্ধারকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও সততা, এবং সবশেষে রাজস্ব দাতা রায়তের রাষ্ট্রের প্রতি সত্যিকারের আনুগত্য ও আন্তরিকতা। কিন্তু এ সকল ক্ষেত্রে ভারত তথা বাংলায় সর্বযুগেই সততা ও আন্তরিকতার প্রচণ্ড অভাব ছিলো, এবং আছে, অন্তত ভূমিরাজস্ব আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে, তা বলাইবাহুল্য। তাই রাজস্ব নির্ধারক যতোই অভিজ্ঞ এবং দক্ষ হোক না কেন, তার সততারহিত মনোভাব রায়তের সঙ্গে তাকে অন্যায় চুক্তিতে আসতে প্রলুব্ধ করতো। ব্যক্তিস্বার্থ হাসিলের জন্য উভয়পক্ষ রীতিমত দর কষাকষি শুরু করে দিতো।[১৩৮] অন্যদিকে রাজস্ব কর্মচারী যতো সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হোক, যদি তার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার অভাব থাকে তা হলে তার পক্ষে 'নজর-আন্দাজে' চাষযোগ্য ভূমি পরিমাপ ও তদনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত রাজস্ব ধার্য করণ আদতেই সম্ভব হবে না। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীর ব্যক্তিগত কোন লাভ বা লোকসান না হলেও রাষ্ট্রের জন্য তা ছিলো ক্ষতিকারক। মোদ্দা কথা এই উভয় অবস্থায় ভূমিরাজস্ব প্রদানে প্রায়শই গররাজি, নিমরাজি বা ফাঁকি প্রদানে অভ্যস্ত রায়তকুল কমবেশি লাভবান হতো।

১৩৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪২
১৩৭ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১২
১৩৮ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪২

তবে এই পদ্ধতির একটা নঞর্থক ভালো দিকও ছিলো। ড. ইরফান হবিব বলেন, "কনকূত' ব্যবস্থা ভাগ-চাষেরই অনুরূপ এক পদ্ধতি কারণ দু-এর ক্ষেত্রেই হিসেবের ভিত্তি হলো প্রকৃত ফলন। কিন্তু তুলনায় 'কনকূত' ব্যবস্থা অনেক কম ব্যয়সাপেক্ষ, কেননা এতে শস্য কাটা ও ঝাড়াই-এর ওপর কোন নজরদারির দরকার পড়ে না।'[১৩৯] এই প্রথায় ভূমিরাজস্ব নিরূপণের ব্যয় প্রায় ছিলো না বললেও পূর্বালোচনায় যে ক্ষতির চিত্র দেখা যায় সেটিও রাষ্ট্রের জন্য নিতান্ত কম ছিলো না।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় যে পরবর্তীকালে সম্ভবত 'কানকূটে'রই পরিবর্তিত ও উন্নততর রূপ হিশেবে 'জবতি' চালু হয়েছিলো।[১৪০] অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, 'কানকূট' পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

হস্ত ও বুদ

জ্যেষ্ঠ মোগলদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সুপরিচিত একটি নির্ধারক পদ্ধতি ছিলো 'হস্ত ও বুদ'।[১৪১] এই ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব নির্ধারক আমিনগণ 'পরগণা'স্থ বিভিন্ন গ্রাম বা মৌজা পরিদর্শন করতেন, ভালো-মন্দ দু'ধরনের জমি দেখে মোট শস্যোৎপাদনের একটি আনুমানিক হিসাব বের করতেন, পরে সেই কাল্পনিক হিসাবের ভিত্তিতে চাষাধীন ভূমির রাজস্ব নিরূপণ করতেন।[১৪২] অনুরূপ আরেকটি খুব সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি হলো—কখনও কখনও শুধু জমিতে ব্যবহৃত লাঙ্গল গুণতি করে এলাকা অনুযায়ী লাঙ্গল পিছু নির্দিষ্ট হার প্রয়োগ করে ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ করা হতো।[১৪৩] উল্লেখ্য শেষোক্ত পদ্ধতির প্রচলন ছিলো প্রধানত দাক্ষিণাত্যে।[১৪৪]

এক্ষণে উপরিউক্ত অবস্থা বিচারে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'হস্ত ও বুদ' ছিলো আকবর তথা মোগল ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের সবচেয়ে সহজ, সংক্ষিপ্ত ও প্রায় নির্ঝঞ্ঝাট একটি পদ্ধতি।[১৪৫] এতে রাজস্ব-নির্ধারকদের ভূমি জরিপ এবং আনুষঙ্গিক কাজের পরিশ্রম

১৩৯ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১২। 'kankut reduced expense and vexation for the revenue collecting authorities.' (The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 236).

১৪০ The Cambridge Economic History of India, Vol. I., pp. 236.

১৪১ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪১

১৪২ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১০; মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪১।

১৪৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২১০। ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী একে স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি রূপে বিবেচনা করেছেন যদিও এর কোন নাম লেখক উল্লেখ করেননি। তাঁর ভাষায়, 'It was a method of assessment different from the practice of calculating jama on the basis of the number of ploughs or the area of land ploughed.' (Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 49).

১৪৪ Dr. Qeyamuddin Ahmad, Land Revenue in India, pp. 35.

১৪৫ উল্লেখ করা দরকার যে রায়তসাধারণকে প্রায়শ কোনরূপ ঝামেলা ও অসন্তুষ্টির মধ্যে না ফেলে এই প্রথায় রাষ্ট্র যেহেতু অত্যন্ত সহজে ও সংক্ষিপ্ততম সময়ে ভূমিরাজস্ব আদায়ের কাজ সারতে পারতো, তাই সমকালীন কোনও কোনও কিতাবে যেমন 'দস্তুর-উল-আমাল-ই-বেকাস' (পৃষ্ঠা ৭৬) ইত্যাদিতে একে 'রাজস্ব ধার্যের শ্রেষ্ঠতম পদ্ধতি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যেমন কম হতো, তেমনি রায়তশ্রেণীও জরিপের ঝামেলা বিশেষ করে সরকার নির্দিষ্ট 'জরিবানা'[১৪৬] প্রদান ও কর্মচারীদের অন্যায় দাবি-দাওয়ার খপ্পর থেকে নিষ্কৃতি পেতো।[১৪৭]

এ পর্যায়ে আকবরের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অন্য দু'একটি সাধারণ দিক আলোচনা করবো।

প্রথমত উপরে যে পদ্ধতিগুলি ('জবতি', 'গল্লাবকশি', 'নাসক', 'কানকূট', 'হস্ত ও বুদ') সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা হলো, বাস্তবে তৎকালে (বৃহত্তর অর্থে সমগ্র মোগল যুগে) এছাড়াও বিভিন্ন নামে ও রকমে ভূমিরাজস্ব নির্ধারক আরও কয়েকটি প্রথা বর্তমান ছিলো। তার মধ্যে অন্যতম 'আমল-ই-খেওয়াত', 'সরবস্তা', 'আমল-ই-জিন্‌সি', 'তস্‌খিস্‌-ই-নকদি' প্রভৃতি।[১৪৮] বলাবাহুল্য এগুলি যেমন সর্বত্র প্রচলিত ছিলো না বা একই প্রদেশের সকল ভূমিখণ্ডের জন্যও তা প্রযোজ্য হতো না, তেমনি এর চেয়েও বড় কথা যেটি তা হচ্ছে 'জবতি', 'গল্লাবকশি', 'নাসক', 'কানকূট', 'হস্ত ও বুদ'-এর স্থানবিশেষে ব্যাপক প্রচলের পাশাপাশি এর ব্যবহার ছিলো অনেকটা অনুল্লেখযোগ্য গোছের।

দ্বিতীয়ত এই আমলে মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী ভূমিরাজস্ব নির্ধারণের বিভিন্ন রকমের পদ্ধতির প্রচলন থেকে একটি বিষয় খুব তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে যা এখানে না বললেই নয়। বস্তুত ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তার আদায় করণে রাষ্ট্র স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যখন, যেখানে ও যেভাবে পেরেছে, সেটি মাটির স্থানিক গুণাগুণ ও জলবায়ুর কারণে হোক কিংবা রায়তসাধারণের খাজনা প্রদানে কোন একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রতি দুর্বলতা বা দূরবর্তী প্রদেশ বিধায় রাষ্ট্রযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিলতার (মধ্যবাংলার কথা স্মর্তব্য) কারণে হোক, রাষ্ট্র সেখানকার উপযোগী প্রথাপদ্ধতি অনুসরণে বিন্দু মাত্র কার্পণ্য করেনি। এক প্রদেশে যে পদ্ধতিটি খুব জনপ্রিয় ছিলো, দেখা গেছে অন্য প্রদেশে তার অস্তিত্বও নেই, আবার একই প্রদেশের এক অঞ্চলে যখন একটি বিশেষ পদ্ধতির প্রাধান্য দেখা গেছে, অন্য অঞ্চলে তখন হয় তো অন্যকিছু জেঁকে বসেছে। রাষ্ট্রও এই বিভিন্নতা অবলীলায় মেনে নিয়েছে। প্রসঙ্গত স্বনামধন্য ইংরেজ লেখক (বম্বে সিভিল সার্ভিসের সাবেক সদস্য) আলেকজানডার রজার্সের চমৎকার একটি মন্তব্যের উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করবো। রজার্স বলেন, 'There was, in fact, no one revenue system. Every province had its own variety of systems, differing from each other according to the manner in which the geographical affected the political position of the country in which they prevailed. Such systems, again, varied according to local usage and the state of civilization and agricultural skill to which the inhabitants of each locality had attained.'[১৪৯]

১৪৬ আগেই বলেছি 'জরিবানা' ছিলো জরিপ বিভাগীয় কর্মচারীদের ব্যয় বাবদ গৃহীত কর। এতে সাধারণত বিঘা প্রতি ১ দাম গ্রহণ করা হতো। দেখুন, 'আইন' ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১।

১৪৭ এই কারণে অনেক জমিদার স্বেচ্ছায় এই প্রথায় রাজস্ব নির্ধারণের জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাতো। দেখুন, মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪১।

১৪৮ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'মোঘল রাজত্বে ভূমিরাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

১৪৯ The Land Revenue of Bombay, Vol. I., pp. 3.

সম্রাট জাহাঙ্গির (১৬০৫-১৬২৭) ও তৎপুত্র সম্রাট শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮)

একমাত্র জীবিত উত্তরাধিকারীর[১৫০] জন্য প্রবল পরাক্রমশালী তৃতীয় মোগল সম্রাট যে বিশাল সাম্রাজ্য[১৫১], নানা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী সমন্বিত বিপুল জনসংখ্যা ও একটি চূড়ান্তভাবে কেন্দ্রাভিমুখি, সুঠাম ও যুগোপযোগী প্রশাসনিক অবকাঠামো বিশেষ করে মজবুত রাজস্ব ব্যবস্থা রেখে যান, পূর্ব ও পরবর্তী আলোচনার প্রেক্ষিতে সেটা যদি আমরা মনে রাখি তা হলে আমাদের এবারের আলোচনা বুঝতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। আসলে আকবরের রেখে যাওয়া ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন যন্ত্রে নতুনভাবে হাত দেওয়ার মতো সুযোগ ও প্রয়োজন তাঁর অপেক্ষাকৃত দুর্বল উত্তরসূরীদের বিশেষত সম্রাট জাহাঙ্গির ও সম্রাট শাহজাহানের ছিলো বলে মনে হয় না। এই কারণে আমরা দেখতে পাই আকবরের রাজত্বকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌল চারিত্র্যই শুধু নয়, বরং অনেক খুঁটি-নাটি তথ্য জানার জন্য যে বিশাল আকরগ্রন্থ তথা 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' প্রভৃতি পাই, পরবর্তী দুই খ্যাতিমান মোগল সম্রাটের সুদীর্ঘ রাজত্বকাল সত্ত্বেও জাহাঙ্গির ও তৎপুত্র শাহজাহানের শাসনকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার মতো গ্রন্থ-সূত্র সমকালে প্রায় বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না।[১৫২] বস্তুত এ থেকে একটা ধারণা নিঃসন্দেহে করা যায় যে, সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া জাহাঙ্গির পিতা আকবরেরই অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আগাগোড়া বহাল রেখেছিলেন।[১৫৩] ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'His (Jahangir) father had bequeathed to him a legacy of noble ideals and however rebellious and refractory he may have been in his youth, he now cherished a lofty ideal of kingship and regarded the contentment and prosperity of his subjects as his primary concern.'[১৫৪] সমকালীন সূত্রগুলিতে তথ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বিভিন্নভাবে

১৫০ মোগলদের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কোনও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিলো না। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদের একমাত্র অস্ত্রের জোরেই ক্ষমতা গ্রহণ ছিলো যোগ্যতার প্রধান মাপকাঠি। কন্যাদের কথা বাদ দিলে (এঁরা কখনই সিংহাসনের জন্য প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেনি বলে এঁদেরকে এখানে ধরা হচ্ছে না) আকবরের ৩ পুত্রের মধ্যে মুরাদ (মে, ১৫৯৯) ও দানিয়াল (এপ্রিল, ১৬০৪) তাঁর জীবদ্দশায়ই ইহজগৎ ত্যাগ করে। ফলে বিদ্রোহী হয়ে পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গিরই ছিলেন মৃত্যু পথযাত্রী সম্রাটের একমাত্র জীবিত (পুত্র) উত্তরাধিকারী; বাকশক্তিরহিত সম্রাট জ্যেষ্ঠ পুত্রের বরাবরে উষ্ণীষ, পোশাক ও তরবারি প্রত্যর্পণ করে আকারে-ইঙ্গিতে সেই নীরব নির্বাচনও করে গিয়েছিলেন। (History of Jahangir, Dr. Beni Prasad, pp. 68; A History of India, Drs. Narendra Krishna Sinha & Nisith Ranjan Ray, pp. 328).

১৫১ ড. বেণী প্রসাদের ভাষায় এই বিশাল সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল এ রকম :
'Nearly the whole country from the eastern confines of Persia to the western bounds of modern Assam and Burma and from the Himalayas to a line between the Mahananda and the Godavari acknowledged the sway of one emperor.' (History of Jahangir, pp. 74).

১৫২ The Agrarian System, pp. 124.

১৫৩ Policies of the Great Mughals, pp.15.

১৫৪ The Mughal Empire, pp. 455.

জাহাঙ্গিরের সময়কার প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা জানা যায়, তাতে ড. প্রসাদের বক্তব্যের যাথার্থ্যই ফুটে ওঠে। যা হোক এ বিষয়ে এখন নীচে আলোচনা করা হলো।

জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেও ভূমিরাজস্ব নির্ধারক হিশেবে 'জবতি', 'নাসক', 'গল্লাবকশি' প্রভৃতি পদ্ধতি বর্তমান ছিলো। তবে পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা যেমন দেখেছি স্বয়ং আকবরের সময়েও প্রধান ও অধিক প্রচলন পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও 'জবতি'র ব্যবহার সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছিলো না[১৫৫], প্রধানত রাজধানী ও তৎসন্নিহিত সুবাগুলিতে তা সীমাবদ্ধ ছিলো। এগুলি থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো মূলত জায়গিরদার ও জমিদারদের মাধ্যমে। জায়গিরদারগণ ছিলো অনেকটা সরকারি কর্মচারীর মতো। তাদের বদলির চাকরি হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণে যে জায়গা-জমি থাকতো তার প্রতি তারা হতো উদাসীন। সরকারের আর্থিক সুবিধা ও চাপ থাকা সত্ত্বেও তারা জায়গা-জমির উন্নতির মাধ্যমে (অধিক ফসল ফলানোই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের লক্ষ্য) রায়তদের কাছ থেকে রাজস্ব বৃদ্ধির পরিবর্তে তারা ব্যক্তিস্বার্থে অতিরিক্ত রাজস্বই (নানা অজুহাতে) আদায় করতো। এতে করে যে শর্তে মূলত জায়গিরদারকে জায়গির প্রদান করা হতো, তা ক্রমাগত শুধু লঙ্ঘিতই হতো না, তাদের অত্যাচার-নিপীড়নের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছিলো। এ সম্পর্কিত প্রচুর অভিযোগও নতুন সম্রাটের কানে আসতে লাগলো। ফলে পরিবর্তিত অবস্থায় তাঁকে এটি নিয়ে নতুন করে ভাবতে হলো। অন্যদিকে সম্রাট লক্ষ্য করেছিলেন যে, জায়গিরদারগণ এক জায়গায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে তারা স্থানীয় প্রভাবশালী লোকেদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসতো এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের মেয়েদের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হতো। এতে স্থানীয়ভাবে সরকারি কাজ-কারবারে জায়গিরদারের ওপর এই সকল লোকেদের যেমন অবাঞ্ছিত প্রভাব সৃষ্টি হতো, অন্যদিকে তেমনি রাষ্ট্রের ভিতোরেই ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিশেবে জায়গিরদারের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক শক্তি অনেক বেড়ে যেতো, যা পিতার মতো জাহাঙ্গিরেরও কাম্য ছিলো না। ফলত এই সকল দিক বিবেচনা করে সম্রাট শেষ পর্যন্ত জায়গিরদার, জমিদার প্রমুখ রাজস্ব কর্মচারীদের জন্য যে আচরণ-বিধি (সচরাচর 'দস্তুর-উল-আ'মাল' বা Rules of Conduct হিশেবে পরিচিত) প্রণয়ন ও জারি করেছিলেন, বর্তমান আলোচনার সঙ্গে সাযুজ্যমান তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হলো। এই দস্তুরের সংখ্যা ছিল মোট ১২টি।[১৫৬] যথা—

এক. তিনি বেশ কয়েক ধরনের আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও হয়রানিমূলক ট্রানজিট কর এবং সেই সঙ্গে জায়গিরদার ও জমিদারদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে গৃহীত নিপীড়নধর্মী টোল ও সেস আদায় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন;

দুই. সম্রাট সম্ভাব্য সকল উপায়ে জায়গিরদারদের নির্জন পথিপার্শ্বে জনবসতি গড়ে তোলার জন্য সরাইখানা, মসজিদ, কূপ প্রভৃতি তৈরি করার আদেশ দেন;

১৫৫ 'জবতি'র আলোচনাংশ দেখুন।

১৫৬ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 410-12; The Mughal Empire, Prof. S.M. Jaffar, pp. 181-82; Mughal Rule in India, Edwardes & Garrett, pp.55; Mughal Rule in India, Dr. V.D. Mahajan, pp. 136.

তিন. মৃত ব্যক্তির ভূ-সম্পত্তি রাষ্ট্র কর্তৃক অধিগ্রহণের প্রচলিত নিয়ম তিনি বাতিল করেন এবং সেগুলি মৃতের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রত্যর্পণের আদেশ দেন। তৎসহ নিতান্তই উত্তরাধিকারীবিহীন সয়-সম্পত্তি অতঃপর মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত করেন;

চার. রাজস্ব কর্মচারী ও জায়গিরদারদের সম্রাট নির্দেশ দেন তারা যেন অন্যায়ভাবে রায়তের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস না করে এবং বিশেষ করে আবাসগৃহ থেকে তাদেরকে উৎখাত না করে ও এভাবে আত্মসাতকৃত ভূমি চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত না হয়;

পাঁচ. তিনি ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহক ও জায়গিরদারদেরকে তারা যে 'পরগণা'য় কর্মরত থাকবে সেখানে তাঁর (সম্রাটের) পূর্বানুমতি ব্যতীত স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন;

ছয়. সম্রাট সাধারণ ঘোষণা দেন যে তাঁর পিতার আমলে প্রদত্ত জায়গির, 'আইমা' প্রভৃতি যথারীতি বহাল থাকবে এবং কার্যক্ষেত্রে তিনি এগুলির অধিকারীদের 'মনসব', হারেমের সম্মানীয়া মহিলাদের ভাতা প্রভৃতিও বৃদ্ধি করেন।

উল্লেখ্য ১২-সংখ্যক সুলিখিত দস্তুরের বাইরেও জাহাঙ্গির আরও কিছু বিধিনির্দেশ জারি করেছিলেন।[১৫৭]

আগেই বলেছি পিতার অনুসৃত ভূমিরাজস্ব নির্ধারক প্রথাসমূহ জাহাঙ্গিরের সময়েও বলবৎ ছিলো। তবে তিনি সম্ভবত 'জবতি'র প্রয়োগ উত্তরোত্তর নিরুৎসাহিত করেছিলেন। ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী বলেন, 'Under Jahangir, Akbar's Regulation System (Zabti) was discarded and replaced by Village Assessments made with the headman or with farmers, as circumstances might permit.'[১৫৮] খামার ইজারা সাধারণত গ্রাম-প্রধান ও বড় রায়তের সঙ্গে বার্ষিক নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদানের শর্তে করা হতো।

প্রসঙ্গত এই আমলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব-অনুষঙ্গ, যাকে মোরল্যান্ড সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালের 'only definite innovation' রূপে চিহ্নিত করেছেন সেই 'আলতমঘা'র কথা বলা যায়। যদিও এটি জাহাঙ্গিরের নিজস্ব উদ্ভাবন নয়, বরং মধ্য এশিয়ায় এর উৎপত্তি, তথাপি তাঁর সময়ে 'আলতমঘা'র ব্যাপকত্ব ও গুরুত্ব যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছিলো তাতে করে সত্যিই এটি নবজীবন লাভ করেছিলো বলা যায়। যখন কোনও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বা রাজ প্রতিনিধি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে স্বীয় জন্মস্থানে (সচরাচর গ্রাম বা পরগণায়) আবাসস্থল নির্মাণের জন্য সম্রাটের কাছে দরখাস্ত করতো, সম্রাট তখন বিশ্বস্ত কর্মচারী দ্বারা আবেদনকারীর বর্তমান জীবন-জীবিকা, চাল-চলন, অতীত কার্যকলাপ প্রভৃতি অনুসন্ধান করে যদি সন্তুষ্ট হতেন তবে তাকে সরকারি সীল-মোহরাঙ্কিত লিখিত দলিলের মাধ্যমে যে ভূ-দান করতেন তাকে বলা হতো 'আলতমঘা'। 'আলতমঘা'র

১৫৭ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 412.

১৫৮ Indian Land System, pp. 167. আরও দেখুন, 'Administration under the Mughuls', Dr. S.A.Q. Husaini, pp. 133.

অনুকূলে প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি হতো নিষ্কর ও স্থায়ী প্রকৃতির। শুধু তাই নয় মধ্যযুগে যদিও ভূমি মালিকানা ছিলো রাষ্ট্রের কিন্তু এ ক্ষেত্রে, 'These Altamgha grants represent the nearest approach to the land ownership of Mughal times.'[১৫৯]

শেষত উল্লেখ করা যায় যে এই আমলে কতিপয় ফসলের বিশেষ করে ফলের বাগানসমূহকে রাজস্ব ধার্যের আওতামুক্ত ঘোষণা করা হয়েছিলো, তবে স্থানীয় রাজকর্মচারীদের সদিচ্ছার অভাবে সেটা কতোটুকু ফলপ্রসূ হয়েছিলো তা বলা মুশকিল।[১৬০]

শেষ বয়সে জাহাঙ্গির রাজকার্যে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়ায় এবং পর্দার অন্তরালে তাঁর বিদুষী স্ত্রী নূরজাহানের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো রাজস্ব ব্যবস্থাপনায়ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিলো।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আলোচনা ঐতিহাসিকদের জন্য আরেকটি বিড়ম্বনার বিষয়। দেখা যায় জাহাঙ্গিরের আমলের ঐতিহাসিক রচনাদিতে রাজস্ব সম্পর্কিত যে ছিটেফোঁটা তথ্য-বর্ণনা পাওয়া যায়, শাহজাহানের সময়ে তাও দুর্লভ। মোরল্যান্ড যথার্থই বলেন, 'The contemporary chronicles tell us even less of the activities of Shahjahan than of Jahangir.'[১৬১] তাঁর সময়ে অনুসৃত রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেটুকু জানা যায় তাতে প্রতীয়মান হয় পূর্ববর্তী তথা 'আইনে' নির্দেশিত ব্যবস্থাই বহাল ছিলো। 'জবতি'র পরিবর্তে জাহাঙ্গির যে গ্রাম-ইজারা প্রথা ব্যাপকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন সেটা তিনিও অব্যাহত রাখেন।[১৬২] শুকনো মৌসুমে রায়তরা যাতে সহজে ভূমিতে সেচের পানি দিতে পারে সে জন্য সম্রাট বেশ কিছু খাল খনন করেন।[১৬৩] স্বাভাবিকভাবে ধারণা করা হয় যে তাঁর আমলে ভূমিরাজস্বের হার (পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে) পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিলো। কেননা শাহজাহান জগদ্বিখ্যাত তাজমহল, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, দিল্লির বিখ্যাত জামে মসজিদ, মোতি মসজিদ, সাম্মান বুরুজ প্রভৃতির ন্যায় অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও সৌকর্যমণ্ডিত স্থাপত্যশিল্পসমূহ নির্মাণ করেছিলেন যে কারণে তাঁর রাজকোষে অর্থের চাপ সবসময়ই থাকতো। তারপরও বলা যায় তাঁর সময়ে রাজস্বের হার কখনও $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{২}$ এর ওপরে যায়নি।[১৬৪] তিনি কয়েকটি অবৈধ সেস বাতিল করেছিলেন[১৬৫], যদিও বরাবরের মতো অঘোষিত সব 'আবওয়াব' তাঁর পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য তাঁর প্রধান দিওয়ান সাদুল্লাহ্ খান

১৫৯ Indian Land System, pp. 167.
১৬০ Mughal Polity, Dr. Jagadish Narayan Sarkar, pp. 290.
১৬১ The Agrarian System, pp. 131.
১৬২ Administration under the Mughuls, pp. 133; Policies of the Great Mughals, pp. 17.
১৬৩ Policies of the Great Mughals, pp. 16.
১৬৪ Ibid., pp.17.
১৬৫ Mughal Polity, pp. 290.

কর্তৃক আদায়কৃত নিম্নলিখিত 'আবওয়াব' তখনও চালু ছিলো যা পরে আওরঙ্গজেব রহিত করেন।[১৬৬]

(ক) উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় কর;
(খ) সম্পত্তি বিক্রয় কর;
(গ) দিওয়ানি বিভাগীয় কর্মচারীদের রুসুমি;
(ঘ) ব্যবসায় ও বৃত্তির অনুমতি-পত্রের জন্য কর;
(ঙ) নজর, চাঁদা ও শ্রম আদায়;
(চ) হিন্দু তীর্থ কর প্রভৃতি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সম্রাট শাহজাহানের যুগে যদিও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যুগোপযোগী সংস্কারের (আকবরের রেখে যাওয়া কালজয়ী ব্যবস্থায় তখনও পর্যন্ত সম্ভবত এর তেমন প্রয়োজন অনুভূত হয়নি) উল্লেখযোগ্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, উপরন্তু বিভিন্ন উচ্চাভিলাষী স্থাপত্য প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্রাটের বিপুল অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন ছিলো যার প্রধান উৎস সেই ভূমিরাজস্ব, তথাপি আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এই আমলে আপামর রায়তসাধারণের অবস্থা পূর্বাপর অনড় ছিলো, মোটামুটি সুখে-শান্তিতেই তাদের জীবন অতিবাহিত হয়েছিলো। মোরল্যান্ডের ভাষায়, 'so far as the chronicles go, we might look on the reign as a period of agrarian tranquility.'[১৬৭]

সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)

আকবর পরবর্তীকালে এই প্রথম মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগিরের জমানার বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ ও ভূমিরাজস্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নথিপত্রে। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সম্রাটের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণীত সুবিখ্যাত 'ফতুহাত-ই-আলমগিরি' (এর 'উশর' ও 'খরাজ' শীর্ষক অংশ), কাফি খানের 'মুন্তাখাব-উল-লুবাব', জগজ্জীবন দাসের 'মুন্তাখাব-উত-তাওয়ারিখ', 'দস্তুর-উল-আমাল', জগৎ রায়ের 'ফরহাঙ্গ-ই-কারদানি', আলি মুহম্মদ খানের 'মিরাত-ই-আহমাদি', বখতওয়ার খানের 'মিরাত-উল-আলাম', 'জাওয়াবিত-ই-আলমগিরি' ইত্যাদি। প্রসঙ্গত রসিকদাস নামীয় জনৈক 'করোড়ি' ও মুহম্মদ হাশিমকে লেখা তাঁর বহুল আলোচিত ফরমানের কথাও উল্লেখ করতে হয়। বস্তুত এতো সব উৎস-সূত্র থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যে চিত্র ফুটে ওঠে তাতেও দেখা যায় মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যে দীর্ঘকালব্যাপী স্থায়ী রূপ ও অবকাঠামো আকবর প্রতিষ্ঠিত

১৬৬ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 509; ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, পৃষ্ঠা ৩৮০।

১৬৭ The Agrarian System, pp. 131-2.

করেছিলেন, সেটি তখনও প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল ছিল।[১৬৮] উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই রাজস্ব ব্যবস্থায় আওরঙ্গজেব খুব কমই সংযোজন-পরিবর্তন করেন।

'ফতুহাত-ই-আলমগিরি'তে মূলত ইসলামি দৃষ্টিতে ভূমিরাজস্ব ('খরাজ') ব্যবস্থা কী হতে পারে সে সম্পর্কিত আলোচনা লভ্য। 'করোড়ি' রসিক দাসকে লিখিত পত্রে (১৬৬৫-৬৬) প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রায়তশ্রেণীর কল্যাণ, মুহম্মদ হাশিমের পত্রে (১৬৬৮-৬৯) ভূমিরাজস্ব কী হওয়া উচিত, কিভাবে সেটা আদায় হবে, আদায়কালে কি কি বাস্তব অবস্থার প্রতি রাজস্ব কর্মচারীদের দৃকপাত করতে হবে, এবং অন্য সূত্রগুলিতে বিস্তারিত রাজস্ব পরিসংখ্যান, জায়গিরদার প্রমুখের সংখ্যা-অবস্থান ইত্যাদি লিপিবদ্ধ হয়েছে। বলাবাহুল্য এগুলি থেকেই আমরা তৎকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি মোটামুটি চিত্র এখন তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগিরের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূল কথা ছিলো রায়তদেরকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে তাদের সহনশীল ক্ষমতার মধ্যে রাজস্ব আদায় করা এবং তার হার ও পরিমাণ যাই হোক। তিনি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন বাস্তবেই ক্ষেতে-মাঠে গিয়ে রায়তদের সঙ্গে কথা বলে তাদের পছন্দনীয় পন্থায় 'জরিপ' বা 'জবতি', 'গল্লাবকশি', 'কানকূট' ইত্যাদির ভিত্তিতে 'জমা' নিরূপণ ও প্রদেয় কিস্তির (সর্বোচ্চ ৩) পরিমাণ ঠিক করে এবং সে অনুযায়ী কোনরূপ ছাড় না দিয়ে যথাসময়ে কিস্তিওয়ারি 'হাসিল' (ভূমিরাজস্ব উশুল বা আদায়) সম্পাদন করে। এ ব্যাপারে প্রপিতামহ আকবর নয়, বরং মহান শেরশাহ-ই ছিলেন সম্রাটের আদর্শ। স্মর্তব্য, দিল্লির সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান সুলতানের নীতি ছিলো ভূমিরাজস্ব ধার্য কালে কর্মচারীরা হবে সর্বোচ্চ নমনীয় ও যুক্তিবান, কিন্তু রাজস্ব আদায়কালে তারা হবে কঠোরতম। ষষ্ঠ মোগল সম্রাটেরও 'করোড়ি-আমিল' ইত্যাদির জন্য লিখিত নির্দেশ ছিলো : 'জমা নির্ধারণ এমনভাবে করুন যাতে সমস্ত কৃষকই নিজের প্রদেয়টুকু মিটিয়ে দিতে পারে, আর 'মাল-ই ওয়াজিব' (অধিকারভুক্ত ভূমির রাজস্ব) সময়মত উসুল হয়ে যায়, এবং একটিও কৃষক নিপীড়িত না হয়।'[১৬৯] এখানে প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড এর আওরঙ্গজেবের ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের কড়াকড়ি সম্পর্কিত একটি ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা জরুরি বলে মনে হয়। মোরল্যান্ড তাঁর আর একটি অতিবিখ্যাত গ্রন্থ 'From Akbar to Aurangzeb'-এ বলেছেন, সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে '... the standard of cultivation was to be determined not by the peasant, but by the assessor, whose momentary interest was that it should be as large as possible, and who was authorised to enforce his views if necessary'by flogging. If this regulation be compared with the directions on the same subject given by Akbar, the change in emphasis will be apparent; Akbar laid stress on friendly arrangements,

১৬৮ A Short History of Muslim Rule in India : From the Advent of Islam to the Death of Aurangzeb, Dr. Ishwari Prasad, pp. 511; The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 629;

১৬৯ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, ড. ইরফান হবিব সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৩৮।

Aurangzeb laid stress on the whip.'[১৭০] রসিকদাসকে লিখিত যে পত্র থেকে মোরল্যান্ড এই ধারণা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন সম্ভবত তিনি তা ভালো মতো পাঠ করেননি, অথবা করলেও এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য ও তাৎপর্য উদ্ধারে প্রকৃতই ব্যর্থ হয়েছেন। প্রথমত আগেই বলেছি যে আওরঙ্গজেব ভূমিরাজস্ব নিরূপণে যথেষ্ট বাস্তববাদী ও যুক্তিনিষ্ঠ ছিলেন এবং রাজস্ব নির্ধারক পদ্ধতি বাছাইয়ে রায়তদের পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। প্রমাণ হিশেবে রসিকদাসের পত্রের অংশবিশেষ তুলে ধরছি : 'ইসলামের আজ্ঞাবহ, বিবেকবান বিত্তাধিকারী রসিকদাস সম্রাটের কৃপার্থী থাকুন এবং এ কথা জানুন যে, সম্রাটের সমস্ত ধ্যান-জ্ঞান-সংকল্পই যেহেতু জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বর্ধন এবং সমুদয় 'রিয়ায়া' (কৃষকশ্রেণী) আর বিধাতার আশ্চর্য সৃষ্টি প্রজাসাধারণের কল্যাণে সমর্পিত, সুতরাং এখন খালিস ও তুয়ুলদার-দের পরগণাগুলির 'আমল' (রাজস্ব সংগ্রহ)-এর বাস্তবতা সামনে রেখে শাহী কার্যাধিকারিকরা মহামহিমের বিচারার্থ এই প্রস্তাব পেশ করছেন যে, বর্তমান বর্ষে শাহী অধিকারভুক্ত এলাকার পরগণাগুলির আমিন (নির্ধারক)-রা 'সাল-ই কামিল' (সর্বাধিক রাজস্ব আদায়ের বছর), কৃষিযোগ্য জমির 'হাসিল' (রাজস্ব উসুল), কৃষকশ্রেণীর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য মাথায় রেখে বছরের শুরুতেই পরগণার অধিকাংশ গ্রামের 'জমা' (অনুমিত রাজস্ব) নির্ধারণ করুন। যদি কোনো গ্রামের কৃষকরা রাজস্ব আদায়ের উক্ত পদ্ধতিটি পছন্দ না করে তাহলে তারা যেন জমার নির্ধারণ ফসল কাটার সময় জরিপ বা কনকুৎ বিধিমত করিয়ে নেয়। যে-সমস্ত গ্রামে কৃষকদের দুর্দশা বা অপ্রতুল উৎপাদন-সাধনের কথা তাঁদের জানা আছে সেখানে আমিন-রা যেন (ফসলের) অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা দুই-পঞ্চমাংশ কিংবা কিছু কম-বেশি হারে 'গল্ল-বখ্শি' (ফসল ভাগ) করিয়ে নেন।'[১৭১] সুলিখিত, বিস্তৃত পত্রের উপর্যুক্ত অংশ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে রায়তগণ তাদের ভূমিরাজস্ব প্রদানের পদ্ধতি নির্বাচনের অধিকারী ছিলো। মোরল্যান্ডের বক্তব্যানুসারে তা রাজস্ব নির্ধারকগণের একচেটিয়া ছিলো না। এখন মোরল্যান্ডের দ্বিতীয় মন্তব্য, ভূমিরাজস্ব আদায়ের সময় কতোখানি কঠোরতা দেখানো হতো বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে রায়তদের 'চাবকানো' হতো কি-না? বস্তুত এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে। এক. আগেই বলেছি আওরঙ্গজেব ভূমিরাজস্ব নিরূপণে শেরশাহের বিখ্যাত ও যুক্তিসঙ্গত নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তবে এর অর্থ এটা নয় যে প্রজাহিতৈষী সম্রাট প্রাকৃতিক বা রায়তের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত কারণে শস্য উৎপাদন কম বা ব্যাহতকালে 'জমা'র 'হাসিলে' আদৌ ছাড় দিতেন না। বরং এই দু'জন শাসকই শুধু নয়, ভারত তথা বাংলার সকল শাসকই ছিলেন এ বিষয়ে অত্যন্ত নমনীয়। এ ধরনের দুর্যোগকালে সম্রাট আওরঙ্গজেবও রায়তের ভূমিরাজস্ব মওকুপ করতেন এবং 'তাকাবি' দিতেন। তিনি স্বাভাবিক সময়েও কোনও রায়তের নিরূপিত রাজস্বের পরিমাণ অতিরিক্ত হয়েছে বা তার সামর্থ্যের বাইরে গেছে—এ জাতীয় প্রমাণ পাওয়া গেলে তা পুনর্বিন্যস্ত বা ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত গৃহীত রাজস্ব ফিরিয়ে দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন : 'যখনই স্বয়ং পরগণাগুলির সঠিক পরিস্থিতি জানতে বেরোবেন তখন প্রতিটি গ্রামে কৃষির হাল, ফসল,

১৭০ From Akbar to Aurangzeb, pp. 254.
১৭১ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭।

কৃষকের কর্মদক্ষতা এবং জমার পরিমাণ নিরীক্ষা করুন। যদি দেখেন জমার ভাগবিন্যাসে প্রত্যেক ব্যক্তিগত করদাতার ক্ষেত্রে ন্যায্য ও সঠিক গণনা অনুসৃত হয়েছে তো ভালো; অন্যথায়—যদি চৌধুরি বা মুকদ্দম বা পটওয়ারিরা উৎপীড়ন করে থাকে তাহলে—কৃষককে আশ্বস্ত করুন ও তার প্রাপ্য ফিরিয়ে দিন; এবং 'মুৎগল্লিন' (ক্ষমতাবান)-দের 'গুঞ্জাইশ' (সুবিধা) কেড়ে নিন।'[১৭২] দুই. আওরঙ্গজেবের এই কাগুজে আদেশাবলি কতোটুকু বাস্তবায়িত হতো সেটা আলোচিত হলেই বোঝা যাবে পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের এমন কি আকবরের সময়ের চেয়েও এই আমলে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার আইন-বিধিমালা ও বাস্তবতা তথা প্রয়োগের মধ্যে অধিক সামঞ্জস্য ছিলো। স্মরণীয় যে আওরঙ্গজেবের মতো কঠোর সাম্রাজ্যবাদী ও নীতিবাগীশ শাসক স্বীয় নীতি-আদর্শ রূপায়ণ-বাস্তবায়নে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর আপন পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কই বলে দেয় তিনি নীতি, দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রশ্নে কতোটা কঠোর ও নির্মম হতে পারেন।[১৭৩] সুতরাং তাঁর আমলে সম্রাটের লিখিত আইন-ফরমান রাজস্ব কর্মচারীরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করবে না তা ভাবাই যায় না।[১৭৪] তবে ব্যত্যয় যে ছিলো না তা বলা যাবে না। তবে সেক্ষেত্রে কৃত অপরাধ প্রমাণিত হলে তার জন্য অবধারিত ছিলো কঠোরতম শাস্তি, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত। পূর্বোক্ত পত্রে সম্রাটের আরও নির্দেশ ছিলো : 'আমিন, করোড়ি ও ফোতদার-দের মধ্যে তাঁদের প্রত্যেকের নাম লিখুন যাঁরা বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠা সহকারে সেবা করেছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এতন্নির্দিষ্ট নিয়ম

১৭২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৪০।

১৭৩ যতদূর জানা যায় আওরঙ্গজেবের উল্লেখযোগ্য স্ত্রীদের গর্ভে তাঁর ১০ জন সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে। প্রধানা মহিষী দিলরাজ বানুর গর্ভে—জেব-উন-নিসা (মৃত্যু ১৭০২), জিনা-তুন-নিসা (সম্রাটের মৃত্যুর পরে জীবনাবসান), জুবদাত-উন-নিসা (১৭০৭), মুহম্মদ আজম (১৭০৭) ও মুহম্মদ আকবর; রহমত-উন-নিসার গর্ভে–মুহম্মদ সুলতান (১৬৭৬), মুহম্মদ মুয়াজ্জম (পরে বাহাদুর শাহ) ও বদরুন-নিসা (১৬৭০); আওরঙ্গাবাদী মহল এর গর্ভে মেহেরুন-নিসা (১৭০৬) ও উদয়পুরী মহলের গর্ভে কামবখশ (১৭০৯)। উল্লেখ্য, এঁদের মধ্যে খোদ পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর শত্রুদের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটায় জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদ সুলতান সম্রাটের হুকুমে ১৮ বছর কারাগারে বন্দি থাকেন এবং কারাগারেই মৃত্যুবরণ করেন; মুহম্মদ আকবর প্রাণভয়ে সাম্রাজ্য ছেড়ে পারস্যে পলায়ন করেন এবং তদবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শাসকদেরকে সহযোগিতার জন্য মুহম্মদ মুয়াজ্জম প্রায় ৮/৯ বছর ও কনিষ্ঠ পুত্র কাম-বখশও কিছু কাল জেলে কাটান। অন্যদিকে কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা জেব-উন-নিসা আকবরের বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে জেলে বন্দি থাকেন দীর্ঘকাল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সম্রাটের কাছে রক্ত সম্পর্কের চেয়েও নীতি-আদর্শই বড় কথা, তাঁর কর্মচারীরাও এটা হাড়ে-হাড়ে জানতো ও উপলব্ধি করতো।

১৭৪ প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক Stanley Lane-Poole-ও এ কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'Akbar established an admirable agricultural department, and laid down rules for periodical valuation of the land, and for the allowance to be made for impoverishment, bad seasons, and the like. These rules prevailed in the reign of Aurangzeb,... there is no doubt that the system was equitable in theory, and was strictly enforced wherever the Emperor's (Aurangzeb) influence and inspection reached.' (Aurangzeb and the Decay of the Mughal Empire, pp.123).

অনুসরণপূর্বক প্রশংসনীয় কাজ করেছেন, যাতে তাঁদের বিবেক ও বিশ্বস্ততার পুরস্কার মেলে। যদি কেউ নিয়মের বাইরে চলেন তবে শাহী দরবারে সেটি জ্ঞাপিত করুন যাতে তাঁদের পদচ্যুত করা যায় এবং উচিত দণ্ড দেওয়া যায়।' এ থেকে অবশ্য নতুন আরেকটি বিষয় জানা যাচ্ছে যে, একনিষ্ট ও কর্তব্যপরায়ণ রাজস্ব কর্মচারীদেরকে উপযুক্ত ভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদের কাজের স্বীকৃতি তথা পুরস্কার প্রদান করা হতো। যা হোক, এক্ষণে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে স্বীয় নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের কঠোর মানসিকতার কারণে তাঁর আমলে জারিকৃত রাজস্ব সম্পর্কিত বিধিবিধান সবচেয়ে অধিক প্রতিপালিত হওয়ার সম্ভাবনা (আগের শাসকদের তুলনায়) যেহেতু ছিলো, সেহেতু তাঁর সূত্রেই (রসিকদাসকে লিখিত ফরমান প্রভৃতি) মনে করা যায় যে, সমকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ছিলো কৃষকের স্বার্থানুকূল ও কৃষি-উন্নয়নমুখি। আমাদের এ মতের সমর্থনে উক্ত ফরমানের আরও দু'টি অংশ[১৭৫] উদ্ধৃত করে অন্য আলোচনায় যাবো।

২ সংখ্যক অধিনিয়মে পাই : 'আমিল-রা যেন বছরের প্রথমেই গ্রামে গ্রামে লাঙল সংখ্যার সাথে সাথে কৃষকের (সংখ্যা) এবং আরজি-র পরিসীমা গণনা করেন। সচ্ছল কৃষকদের জন্য যেন এমন বন্দোবস্ত করা হয় যাতে তারা সকলেই, নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী, 'বুবাই'-এর অন্তর্গত জমি বাড়ানোর আয়াস করে, এবং এইভাবে, গত বছরের 'জিন্স-ই অদনা' (নিম্নবর্গের ফসল)-র চাষগুলিকে 'জিন্স-ই আলা' (উচ্চ বর্গের ফসল) চাষে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি কর্ষিত জমির পরিসীমা বাড়াতে পারে, কৃষিযোগ্য জমি যেন—যতদূর সম্ভব—'অফতাদ' (অকর্ষিত) পড়ে না থাকে। যদি কোনো 'কারিন্দ' (কৃষক) পলাতক হয় তবে (আমিল) যেন প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করেন এবং জন্মস্থানে তাকে ফিরিয়ে আনার সব রকম প্রচেষ্টা নেন। এইভাবে সর্বত্র থেকে কৃষকদের এনে একত্র করার জন্য তাঁরা যেন শান্তি ও সৌহার্দ্যের দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ নেন। 'বঞ্জর' (কৃষিযোগ্য পতিত) জমির জন্য এমন 'দস্তুর' (রাজস্ব হার) ধার্য করুন যাতে সেগুলিতে চাষ শুরু হয়।'

অধিনিয়ম ৩-এ রয়েছে এই নির্দেশ : 'পরগণাগুলির আমিন-রা যেন প্রতি বছর গ্রামে গ্রামে 'আসামী-ওয়ার' (কৃষক প্রতি) কৃষির 'মৌজুদান' (বাস্তব অবস্থা, সম্পত্তি)-এর হিসাব নেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাইয়ের পর প্রশাসনিক 'কিফায়ৎ' (মিতব্যয়) ও কৃষক জনতার কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে জমা নির্ধারণ করেন, এবং জমা-র 'ডৌল' (খাতা) অনতিবিলম্বে শাহী কার্যালয়ে পাঠিয়ে দেন।'

আওরঙ্গজেবের ভূমিরাজস্ব নীতির আরেকটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে তা ছিলো যথেষ্ট রকমের ইসলামি অনুশাসন-নির্ভর। নিজে যেমন গোঁড়াপন্থী বিশুদ্ধ মুসলমান ছিলেন[১৭৬], তেমনি অঘোষিতভাবে হলেও চাইতেন প্রশাসনের সর্বস্তরে ইসলামি নীতি-

---

১৭৫ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯।

১৭৬ প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের নীচের কয়েকটি বর্ণনাই এটা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট।

আদর্শের প্রতিফলন ঘটুক। এই কারণে একদিকে সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরপরই তিনি যেমন বেশ কিছু অবৈধ সেস ও 'আবওয়াব' (এর কয়েকটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে) বাতিল করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি মুসলিম রাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ 'জিজিয়া' কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। বলাবাহুল্য 'জিজিয়া' সম্বন্ধে আগেও প্রচুর বলা হয়েছে, ফলে এখানে শুধু আমরা এটি আওরঙ্গজেব কর্তৃক পুনঃচালুকরণের কারণ ও তা যে কোন ধর্মীয় বিদ্বেষপ্রসূত বা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেদের অযথা হয়রানি করার জন্য ব্যবস্থিত হয়নি সেটা দেখানোর চেষ্টা করবো।

প্রথম কারণ সম্রাটের ব্যক্তিগত ধর্ম-প্রীতি ও ইসলামি অনুশাসন প্রবর্তনার অন্তর্গত তাগিদ। দ্বিতীয় কারণ এবং এটিই সম্ভবত আসল, আশু ও জোরালো, তা হলো যদি বলা হয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ভারতের এ যাবৎকালের সর্বাপেক্ষা অধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের কাল তা হলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। একদিকে সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমা বেড়ে চলেছিলো অপ্রতিহত গতিতে ও ক্রম-উত্তুঙ্গে[১৭৭], অন্যদিকে এর অনিবার্য ফলস্বরূপ প্রতিনিহিত সম্রাট জড়িয়ে পড়ছিলেন একটার পর একটা যুদ্ধে ও বিদ্রোহী কর্মকাণ্ড দমনে। এর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ ছিলো তাঁর জন্যে সবচেয়ে ব্যয়বহুল, রক্তক্ষয়ী ও মারাত্মক।[১৭৮] উল্লেখ্য এটি তাঁর ব্যক্তিজীবন তথা শরীর-স্বাস্থ্যের জন্যও খুব ক্ষতিকর

নিকোলা মানুচি বলেন, 'Aurangzeb practised saintly austerities and self-abasement and went regularly and even ostentatiously through all the observances of his religion.' (quoted from 'Mughal Rule in India', Dr. Mahajan, pp. 198).

ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'He was well versed in Quran, Hadis, Tafsir, and the Hanafi fiqah, and had studied a good deal of ethics and literature. He possessed a marvellous memory.... to learn the Quran by heart.' (The Mughal Empire, pp. 613). সম্রাটের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকার স্যার যদুনাথ সরকারের ভাষায়, 'His private life,—dress, food and recreations,—were all extremely simple, but well-ordered. He was absolutely free from vice and even from the more innocent pleasures of the idle rich.' (A Short History of Aurangzib, pp. 387).

১৭৭ ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে (ফেব্রুয়ারি ২০) আওরঙ্গজেব যখন মৃত্যুর বরণ করেন তখনকার মোগল সাম্রাজ্যের সীমানা ছিল, 'প্রায় সমগ্র ভারত-উপমহাদেশ এবং তা দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছিল সুদূর পেন্নোর ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত আর উত্তরে তার অন্তর্ভুক্ত ছিল কাশ্মীর এবং কাবুল ও গজনি-শহর সহ আফগান প্রদেশগুলি। একমাত্র কান্দাহার তখনও পর্যন্ত পারস্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।' (ভারতবর্ষের ইতিহাস, কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্গার্দ-লেভিন ও গ্রিগোরি কতোভস্কি, পৃষ্ঠা ৩৫৮)।

১৭৮ দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের সঙ্গে আওরঙ্গজেব প্রায় ২৫ বছরের মতো ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ফলে, এডওয়ার্ডস ও গ্যারেটের কথায়, 'All the resources of the Empire were concentrated in the Deccan, to meet the challenge thrown down by the Marathas;... The struggle was disastrous for the Empire, ...' (Mughal Rule in India, pp. 101). দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা'র বিজয়ী হন তিনি সত্য, কিন্তু বাস্তবে, '...war in the Deccan... had brought him no permanent advantage. The army was in a wretched condition; it had endured great misery and privations, and its morale had become low on account of failure and want of discipline. The roads were flooded and transport difficulties enormous..... The price of grain had risen, and the imperial camp felt the pinch more than any one else.' (The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 620).

পরিগণিত হয়েছিলো।[১৭৯] যা হোক, উপর্যুপরি এই সকল যুদ্ধের ব্যয় মিটানোর জন্য সম্রাটের যে অঢেল অর্থের প্রয়োজন হতো ও তাঁর রাজকোষ সর্বদাই প্রচণ্ড চাপের মুখে থাকতো তা না বললেও চলে। ড. কোকা আন্তোনভা বলেন, 'তাঁর দীর্ঘ রাজত্বের আমলে (১৬৫৮ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ) আওরঙ্গজেব অনবরত লিপ্ত ছিলেন যুদ্ধ-বিগ্রহে, কখনও উত্তরে কখনও-বা পূর্ব ভারতে সেনাবাহিনী পাঠাতে হচ্ছিল তাঁকে এবং সর্বদা ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ দমনের কাজে।.... আর এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হচ্ছিল।'[১৮০]

প্রসঙ্গত মুর্শিদকুলি খানের কথা বলা যায়। ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ব্যাপারে খান অত্যন্ত কঠোর ও ক্ষমাশীল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন—এটা আওরঙ্গজেব ভালো করেই জানতেন। তথাপি তাঁর প্রবল দুর্দিনে বাংলার মতো একটি রাজস্ব ঘাটতিপূর্ণ[১৮১] (মুর্শিদকুলির অব্যবহিত পূর্বের প্রেক্ষিত বিবেচনায়) সুবার সার্বিক প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ-অন্তে বার্ষিক ১ কোটি টাকারও ওপরে অর্থ সম্রাটকে প্রেরণের ফলে তিনি খানের প্রতি যারপরনাই ছিলেন অত্যন্ত প্রীত।[১৮২] স্বভাবতই মুর্শিদকুলি খানের রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত অনেক অনিয়মও সম্রাট জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও নির্বিকারে মেনে নিয়েছিলেন। সম্ভবত এ

১৭৯ ড. আবদুল করিম বলেন, 'মারাঠা নীতির ফলে তিনি (আওরঙ্গজেব আলমগির) পরাজয়, গ্লানি ছাড়া আর কিছু লাভ করেন নাই।' (ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, পৃষ্ঠা ৪০০)। এটি ছিলো সম্রাটের মানসিক বিপর্যয়ের দিক। রাজধানী থেকে বহুদূরে (সদর দপ্তর দাক্ষিণাত্যে স্থানান্তর করেও) রাজপুত, শিয়া, মারাঠা প্রভৃতির সঙ্গে বছরের পর বছর ক্লান্তিহীন যুদ্ধের ফলে তাঁর শরীরের অবস্থা কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। ২৭শে এপ্রিল, ১৭০৫ খ্রিস্টাব্দে বিদরের রাজধানী 'ওয়াজিনজেরা' বিজয়ের পর সম্রাট আর মাত্র বছরের দুয়েকের মতো জীবিত ছিলেন। Vincent A. Smith তাই নিঃসন্দেহে বলেন, 'The Deccan, from which he never returned, was the grave of his reputation as well as of his body'. (The Oxford History of India, pp.423).

১৮০ ভারতবর্ষের ইতিহাস, কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্ গার্দ-লেভিন ও গ্রিগোরি কতোভ্স্কি, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৪৮।

১৮১ মুর্শিদকুলি খান ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলায় দিওয়ান নিযুক্ত হয়ে আসেন তখন বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থায় ছিল চরম বিশৃঙ্খলা। প্রদেশের প্রায় সমুদয় ভূভাগ কর্মচারীদের জায়গির হিশেবে (বেতনের পরিবর্তে) বণ্টিত ছিল। ফলে ভূমিরাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রের আয় ছিল বলতে গেলে শূন্যের কোটায়। বাণিজ্য শুল্কই ছিল সরকারের প্রধান আয়-সূত্র। অন্য প্রদেশ থেকে অর্থ এনে বাংলায় অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যয় মিটাতে হতো। মুর্শিদকুলি এই অবস্থার অবসান ঘটান। তাঁর ব্যাপক রাজস্ব সংস্কারের (পরে আলোচিত) ফলে বাংলার রাজস্ব ঘাটতি দূর হয়ে বার্ষিক ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা সাশ্রয় হয় যা থেকে তিনি সম্রাটকে তাঁর দুর্দিনে ১ কোটি ৩ লাখ টাকা প্রতি বছর নিয়মিত পাঠাতে সমর্থ হন।

১৮২ সম্রাট তাঁর এই সুযোগ্য দিওয়ানের ওপর কতোখানি নির্ভরশীল ও খুশী ছিলেন তা বোঝা যাবে স্যার যদুনাথ সরকারের এ গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যে : 'The endless war in the Deccan exhausted his treasury; the Government turned bankrupt; the soldiers starving from arrears of pay, mutinied; and during the closing years of his reign the revenue of Bengal, regularly sent by the able Diwan Murshid Quli Khan, was the sole support of the emperors's household and army and its arrival was eagerly looked forward to.' (History of Aurangzib, quoted from 'Mughal Rule in India', Dr. Mahajan, pp. 192-3). অতিরঞ্জন থাকলেও ঐতিহাসিকের এ সব উক্তি একেবারে মিথ্যা নয়।

সম্পর্কে তাঁর কিছু করারও তখন কোন উপায় ছিলো না। কারণ তাঁর তখন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আসলে এ কথাগুলি বলার এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আওরঙ্গজেবের অর্থের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো। তৃতীয়ত ইতোপূর্বে মোগল রাজস্ব আয়ের অ-প্রধান উৎস বলতে স্বীকৃত-অস্বীকৃত যা ছিলো, তার অনেকগুলি আদতেই অবৈধ (আবওয়াব) এবং কিছু রায়ত ও জনসাধারণের জন্য অকল্যাণকর বিবেচিত হওয়ায় সম্রাট বাতিল বা রহিত করে দিয়েছিলেন।[১৮৩] এর ফলে রাজকোষের প্রায় ১ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছিলো।[১৮৪] সঙ্গত কারণেই তাঁকে এই বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ঘাট্তি পূরণের জন্য বিকল্প পথের সন্ধান করতে হয়েছিলো। 'জিজিয়া' ছিলো এ রূপ একটি পথ মাত্র। চতুর্থত আগেও বলেছি যে মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলমান নাগরিকদের জন্য রাষ্ট্র চাইলে সৈন্যবিভাগে যোগ দান ছিলো বাধ্যতামূলক। কিন্তু একই রাষ্ট্রে বসবাস করেও অতি প্রয়োজনের সময়েও হিন্দু নাগরিকদের জন্য তা ছিলো নিতান্তই স্বেচ্ছামূলক। অথচ বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে প্রতিরক্ষার প্রশ্নে রাষ্ট্রকে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের নিরাপত্তা দিতে হতো। ফলে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা না করে যদি রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে বিচার করা হয় তবে দেখা যাবে এই ব্যবস্থা নাগরিক নির্বিশেষে সুষম ছিলো না। বরং উল্টো মুসলমানদের জন্য ছিল বাড়ৃতি ঝামেলাকর। অবশ্য যদি বলা হয় মুসলমান রাষ্ট্রে মুসলমানদেরকে এ বাড়ৃতি করের কষ্টটুকু স্বীকার করে নিতে হবে, তবু দেখা যাবে এটি ছিলো প্রকৃতই মুসলমানদের জন্য কিছুটা চাপের। কারণ হিন্দু ও অপরাপর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রায়তদের মতো মুসলমানরা যেমন ভূমিরাজস্ব দিতো, সেই সঙ্গে তারা আওরঙ্গজেবের সময়ে ধর্মীয় কর 'জাকাত'ও দিতো আবশ্যিকভাবে। অথচ 'জাকাত' মুসলমান ছাড়া অন্যদের জন্য ধর্মীয় কারণেই প্রদেয় ছিলো না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সম্রাট 'জিজিয়া'কে সামরিক কর হিশেবে প্রবর্তন করেছিলেন (বলাবাহুল্য 'জিজিয়া'র পেছনে ধর্মীয় মূল্যবোধও তাই), যে জন্য নৈতিক দায়ও এক্ষেত্রে তাঁর ছিলো না। অধ্যাপক অমূল্যভূষণ সেন বলেন, 'প্রকৃত কথা, জিজিয়া হল রাজ্য জয় কর। জিজিয়া জুলুম নয়। কোনো সমর্থ মুসলমান রাজ্য রক্ষায় যুদ্ধার্থে না গেলে তাকেও উহা প্রতিপালন করতে হতো। উহা নাগরিক অধিকার রক্ষণের একটি বিশেষ কর।'[১৮৫] শ্রী সেনের এই শেষোক্ত মন্তব্য যে যথার্থ আওরঙ্গজেবের 'ফতুহাত-ই-আলমগিরি' ('হেদায়া') থেকেও এর প্রমাণ দেয়া যায়। 'যে অ-মুসলিম নাগরিক জিজিয়ার আনুগত্য মেনে নিলো তখনই একজন সাধারণ নাগরিকের (এক্ষেত্রে মুসলমান) ন্যায় তারও অধিকার স্বীকৃত হলো।'[১৮৬] পঞ্চমত 'জিজিয়া' সম্রাট আওরঙ্গজেবের কোনও নতুন প্রবর্তনা ছিলো না। তাঁর পূর্বে সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ করে সুলতান ফিরোজশাহ তুগলক এটি ধার্য করেছিলেন এবং আমরা দেখেছি এ বিষয়ে তিনি ছিলেন খুবই একরোঁখা ও অনমনীয়।

---

১৮৩ বিস্তারিত রাজার জন্য দেখুন স্যার যদুনাথ সরকারের বিখ্যাত 'Mughal Administration' পুস্তকের ৫ম অধ্যায়।

১৮৪ আওরঙ্গজেব : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম, সেখ আজিবুল হক, পৃষ্ঠা ১৭১।

১৮৫ ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (পথের সন্ধান পত্রিকা), সংগৃহীত 'আওরঙ্গজেব ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম', পৃষ্ঠা ১৭১।

১৮৬ সংগৃহীত 'আওরঙ্গজেব : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম', পৃষ্ঠা ১৭২।

বাস্তবে 'জিজিয়া' ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই অনুসৃত হলেও এটি ছিলো 'ইসলাম পূর্ব-যুগের আরোপিত কর'।[১৮৭]

ইসলাম যেহেতু এটিকে স্বীকার করেছিলো তাই বিভিন্ন কারণে আওরঙ্গজেব তাঁর পূর্বসূরী জ্যেষ্ঠ মোগলরা তা প্রত্যাহার করলেও তিনি সেই ধারা অব্যাহত রাখতে পারেননি বা রাখেননি।

১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২রা এপ্রিল সম্রাট আওরঙ্গজেব তদানীন্তন মোগল সাম্রাজ্যব্যাপী অ-মুসলিমদের ওপর 'জিজিয়া' পুনরারোপ করেন।[১৮৮] ড. ঈশ্বরীপ্রসাদ বলেন, 'The Jeziya was levied with great rigour and a large staff of officers employed to collect it. .... Women, children below 14 years of age and paupers who were destitute were exempt; blind men, cripples and lunatics paid only when they possessed wealth and religious men like heads of monastic establishments paid when they had wealth.'[১৮৯] 'জিজিয়া' কর আদায়ে সম্রাট কোন্ ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন সে সম্বন্ধে ড. প্রসাদ সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি। তবে কাফি খানের সূত্রে যে ঘটনার কথা তিনি বর্ণনা করেছেন তা সংক্ষেপে এ রকম : 'জিজিয়া' কর পুনঃ প্রবর্তনের পর দিল্লি ও অন্যান্য এলাকার হিন্দু অধিবাসীগণ রাজপ্রাসাদের সামনে নদী তীরে দলে দলে উপস্থিত হয়ে সম্রাটের কাছে তা প্রত্যাহারের আবেদন করেন। কিন্তু সম্রাট তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। পরে একদিন হিন্দুরা শুক্রবারে সম্রাটের মসজিদে গমনের রাজপথে একত্রিত হয়। বিভিন্ন পেশার হাজার হাজার হিন্দু জনতা ক্রমশ সমবেত হওয়ার ফলে সম্রাটের যাতায়াতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। উপায়ান্তর না দেখে তিনি তখন হাতিশাল থেকে হাতি আনতে নির্দেশ দেন এবং হাতি এলে হাতির পায়ের তলে পিষ্ট হয়ে অনেকে নির্মমভাবে প্রাণ হারায়। সম্রাট তথাপি 'জিজিয়া' প্রত্যাহারে রাজি হননি।

হাতির ঘটনাটি অবশ্যই একটি দুঃখজনক অধ্যায়। কিন্তু তথাপি আমরা যদি বিচার করি নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নে তাঁর আপোষহীন মনোভাবের কথা যা আগেও উল্লেখ করেছি তা হলে অবশ্যই বলতে হবে মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে সার্বভৌম সম্রাটের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করার এ ছাড়া তাঁর কোনও বিকল্প ছিলো না। জনদরদী শাসক সুলতান ফিরোজশাহ তুগলকও 'জিজিয়া' প্রত্যাহারের জন্য ব্রাহ্মণদের অগ্নিতে জীবন্ত আত্মাহুতির হুমকি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইতিহাসাভিজ্ঞ আওরঙ্গজেবের নিশ্চয় তা অবিদিত ছিলো না।

'জিজিয়া' কর আদায়ে তিনি হিন্দুদেরকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন—ধনী, মধ্য ও গরিব।[১৯০] গরিবের জন্য মাথাপিছু বাৎসরিক হার ছিলো ১২ দিরহাম, মধ্য শ্রেণীর

১৮৭ এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন সেখ আজিবুল হকের 'আওরঙ্গজের :ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম' পুস্তকের ৭ম অধ্যায়।

১৮৮ ড. জহিরুদ্দিন ফারুকি বিভিন্ন তথ্য-ঘটনা দ্বারা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'জিজিয়া' প্রবর্তিত হয়েছিল তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন (Aurangzeb & His Times, Chapter V, Appendix C, pp. 161-163). আরও দেখুন, The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 596; A History of India, Sinha & Ray, p. 352.

১৮৯ The Mughal Empire, pp. 597.

১৯০ A Short History of Aurangzib, Sir JaduNath Sarkar, pp. 131; The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 597

জন্য ২৪ দিরহাম ও ধনীদের ৪৮ দিরহাম।[১৯১] গরিবদের জন্য এটি প্রযুক্ত হতো তখন যখন তাদের আয় জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সীমা অতিক্রম করতো।

ড. প্রসাদ বলেছেন এটি কোনও 'নামমাত্র কর' ছিলো না।[১৯২] এক গুজরাট থেকেই বছরে প্রায় ৫ লাখ তঙ্কা'র মতো আসতো। তারপরও আমরা যদি ৮০টি সেস বাতিলজাত ১ কোটি টাকা রাজকোষের ক্ষতির কথা মনে রাখি তবে এটিকে নামে মাত্রই বলতে হবে। কারণ প্রথমত উক্ত সেসগুলি পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিলো এবং রায়তসাধারণ তা একপ্রকার মেনেও নিয়েছিলো। সুতরাং সম্রাট সেগুলি বাতিল না করেও নতুন কর হিশেবে 'জিজিয়া' প্রবর্তনের ঝুঁকি নিতে পারেতেন। দ্বিতীয়ত ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ কালে সম্রাটের অধীনে যে প্রদেশগুলি ছিলো তার মোট সংখ্যা ছিল ২১টি[১৯৩], তন্মধ্যে একটি উর্বর প্রদেশ হিশেবে 'গুজরাটে' বার্ষিক ৫ লাখ টাকার মতো 'জিজিয়া' থেকে আয় হলেও ছোট ও কম উর্বর এবং যুদ্ধ-বিগ্রহপূর্ণ প্রদেশগুলি থেকে নিশ্চয়ই সে পরিমাণ কর আদায় হতো না। তারপরও যদি যুক্তির খাতিরে ধরে নিই যে, প্রতিটি প্রদেশ থেকে গড়ে ৪ লাখ টাকা আয় হতো তবে তার মোট পরিমাণ হতো ৮৪ লাখ অর্থাৎ ক্ষতির চেয়েও অনেক কম। যা হোক, এখন আমরা আওরঙ্গজেবের 'জিজিয়া' পুনঃ প্রবর্তন যে ধর্মীয় বিদ্বেষ-প্রসূত ছিলো না এবং নিকোলা মানুচি প্রমুখ পর্যটক ঐতিহাসিকদের ভ্রান্ত ধারণানুযায়ী[১৯৪] হিন্দু ধর্মাবলম্বীদেরকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত তথা মুসলিম করণে বাধ্য হওয়ার জন্য ব্যবস্থিত হয়নি, সেটা প্রমাণের চেষ্টা করবো।

এ সম্পর্কে প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই যে 'জিজিয়া' কর আপামর হিন্দু জনসাধারণের ওপর আরোপিত হয়নি। যে কোন বয়েসী নারী, বালক, কপর্দকশূন্য তথা ভিখারি,

১৯১ স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'The rates of taxation were fixed at 12, 24 and 48 dirhams a year for the three classes respectively— or Rs. $3\frac{1}{3}$, Rs $6\frac{2}{3}$ and Rs. $13\frac{1}{3}$.' (A Short History of Aurangzib, pp. 131).

১৯২ The Jeziya was not a nominal tax.' (The Mughal Empire, pp. 597).

১৯৩ বিখ্যাত ভারতীয় মুদ্রা-তত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড টমাস-এর মতে এই ২১টি প্রদেশ বা 'সুবা' হলো : পুরোনো ১৯টি— (১) দিল্লি (২) আগ্রা (৩) আজমির (৪) এলাহাবাদ (৫) পাঞ্জাব (৬) আউধ ব অযোধ্যা (৭) মুলতান (৮) কাবুল (৯) কাশ্মির (১০) গুজরাট (১১) বিহার (১২) সিন্ধু (১৩) দৌলতাবাদ (১৪) মালওয়া ১৫) বেরার (১৬) খান্দেশ (১৭) বিদার (১৮) বাংলা (১৯) ওড়িশা এবং নতুন ২টি— (২০) হায়দরাবাদ ও (২১) বিজাপুর। (The Revenue Resources of the Mughal Empire in India, published with 'The Chronicles of the Pathan Kings of Dehli', pp. 50). যদুনাথ সরকারের মতে হিন্দুস্তানীয় সুবা ১৪টি, যথা : (১) আগ্রা (২) আজমির (৩) এলাবাহাদ (৪) বাংলা (৫) বিহার (৬) দিল্লি (৭) গুজরাট (৮) কাশ্মির (৯) লাহোর (১০) মালওয়া (১১) মুলতান (১২) ওড়িশা (১৩) আউধ (১৪) থাট্টা বা সিন্ধু, এবং দাক্ষিণাত্যের ৭টি—(১৫) খান্দেশ (১৬) বেরার (১৭) ঔরঙ্গাবাদ (পুরোনো আহমদনগর) (১৮) বিদার (পুরোনো তেলিঙ্গনা) (১৯) বিজাপুর (২০) হায়দরাবাদ ও (২১) কাবুল (উত্তর আফগানিস্তান)। (A Short History of Aurangzib. pp. 398).

১৯৪ মানুচি, আওরঙ্গজেব কর্তৃক 'জিজিয়া' পুনঃ প্রবর্তনের পশ্চাতে দু'টি কারণ ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'Aurangzeb did this for two reasons. First, because by this time his treasures had begun to shrink owing to expenditure on his campaigns; secondly, to force the Hindus to become Mohamadans.' (Mogul India or Storia Do Mogor, Vol. II., pp. 234).

পুরোহিত[১৯৫], যুদ্ধে গমন-অক্ষম বৃদ্ধ, ন্যূনতম জীবিকাধারী দরিদ্র, স্থায়ীভাবে অসুস্থ তথা পঙ্গু প্রভৃতি এর আওতামুক্ত ছিলো। এক কথায় অবস্থাপন্ন ও সামর্থ্যবানেরাই অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ অংশই ছিলো 'জিজিয়া' করের আওতাধীন। এর মধ্যেও আবার যারা সৈন্যবিভাগের চাকুরিতে ও অন্যান্য রাজ কার্যে নিয়োজিত ছিলো তাদেরকে 'জিজিয়া' দিতে হতো না।[১৯৬] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এটা কোনও ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর ব্যবস্থিত হয়নি, বরং সমাজ-নাগরিকদের একটি বিশেষ অংশের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হয়েছিলো। দ্বিতীয়ত 'জিজিয়া' যে হিন্দু ধর্মের প্রতি আওরঙ্গজেবের বিদ্বেষ ও হিন্দু বিদ্রোহী বিশেষত মারাঠাদেরকে শায়েস্তা করার লক্ষ্যে বিশেষ অস্ত্রস্বরূপ প্রযুক্ত হয়নি, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সম্রাট যে ৮০ ধরনের আইনি-বেআইনি কর অবলোপ করেছিলেন তার কয়েকটির প্রকৃতি বিশ্লেষণে ধরা পড়ে।

আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর থেকে প্রচলিত যে সব কর তুলে দিয়েছিলেন তার কয়েকটি হলো তীর্থ কর, চিতা-ভস্মের কর, গঙ্গা স্নানের কর, মন্দির থেকে প্রাপ্তি ইত্যাদি। এগুলি অনেক আগে থেকেই প্রায় গা-সওয়া হিশেবে চলে আসছিলো এবং এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একার্থে তা হিন্দু ধর্মীয় বিধানের ওপরই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছিলো। অথচ 'জিজিয়া' কোনও অবস্থায়ই তদ্রূপ ধর্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ ছিলো না, অন্তত ভারতে তো নয়ই। যে আকবর 'জিজিয়া' তুলে দিয়েছিলেন বলে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেন ঐতিহাসিকগণ, প্রকৃতার্থে তাঁর সময়েও বিজাপুরে এটি চালু ছিলো।[১৯৭] পূর্বে বর্ণিত করগুলিরও কোন কোনটি তখনও বর্তমান ছিলো। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 'জিজিয়া' তুলে দিয়ে কিন্তু এগুলি বহাল রেখে সম্রাট আকবর যেখানে সকলের বিশেষ করে হিন্দু ও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের প্রশংসা লাভ করেছেন, সেখানে সম্রাট আওরঙ্গজেব এগুলি ছাড়াও প্রায় ৮০টির মতো আইনি-বেআইনি কর তুলে দিয়ে কিন্তু শুধু 'জিজিয়া'র পুনঃপ্রচলন ঘটিয়ে হিন্দু-খৃস্টান নির্বিশেষে এই দুই সম্প্রদায়ের প্রায় সকল ঐতিহাসিকেরই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক তাই যথার্থই বলেছেন, 'When Aurangzib abolished about eighty taxes, no one thanked for his generosity,

১৯৫ আওরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দু পুরোহিতশ্রেণীকে 'জিজিয়া' কর দিতে হতো কি-না, এ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোনও প্রমাণ বা বর্ণনা সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। ফলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যদুনাথ সরকার মনে করেন গরিব সন্ন্যাসীরা এর আওতামুক্ত ছিল কিন্তু তাঁরা কোন বড় ও আয়-রোজগার ভালো এমন মঠ-মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত হলে 'জিজিয়া'র আওতায় এসে যেতো। (A Short History of Aurangzib, p. 131) কিন্তু ঐতিহাসিকের এই ধারণা দু'টি কারণে সম্ভবত ঠিক নয়। এক. সম্রাট মন্দির থেকে তোলা বন্ধ করেছিলেন (৮০ ধরনের রহিত করের একটি); সন্ন্যাসী-পুরোহিত ইত্যাদির আয় সেই মন্দিরের উপজাত, যা গ্রহণ করলে সম্রাটের জন্য মূর্তি পূজাকে উৎসাহিত করা হয়। (Aurangzeb and His Times, Dr. Z. Faruki, pp. 151). দুই. খ্রিস্টান পাদ্রিরা এ যুগে 'জিজিয়া' দিতো না বলে জানা যায়। সুতরাং এ থেকে ধারণা করা দোষের নয় যে, হিন্দু বা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী-পুরোহিত শ্রেণী এর আওতা বহির্ভূত ছিল। কারণ সেক্ষেত্রে নীতিবান সম্রাটের পক্ষে একই দেশে অ-মুসলিম পুরোহিতশ্রেণীর জন্য একই রকম বিধান প্রতিপালন করা বিধেয় হয়।

১৯৬ Aurangzeb and His Times, pp. 151-52.

১৯৭ Ibid, pp. 154.

but when he imposed only one tax, not heavy at all, people, began to show their displeasure.'[১৯৮] এটি তাই বলা যায়, হয় আওরঙ্গজেবের দুর্ভাগ্য (ভালো কাজ করেও তিনি প্রশংসা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন), আর না হলে তাঁর সমগ্র শাসনকালে হিন্দু বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত কারণে গৃহীত নির্মম পদক্ষেপের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া যাতে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকও আক্রান্ত হয়েছেন।

তৃতীয়ত আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগতভাবে কখনই হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না, যদ্যপি গোঁড়াপন্থী বিশুদ্ধ মুসলমান হিশেবে তাঁর খ্যাতি ছিলো সমধিক। এ সম্পর্কে বেশ কিছু নজির উপস্থাপন করা যায়। আমরা এখানে শুধু দু'টির উল্লেখ করবো। এক. সম্রাটের অধীনে প্রচুর সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগে কর্মরত উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গ, হিন্দু কানুনগো ও পাটোয়ারিদের সংখ্যাধিক্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক 'মনসবদার'[১৯৯] -এর অবস্থান বলে দেয় যে তিনি তথাকথিত হিন্দু বিদ্বেষী আদৌ ছিলেন না। শাসনকার্যে তাঁর প্রিয়ভাজন হওয়ার একটাই ছিলো মাপকাঠি—আনুগত্য, যোগ্যতা ও কর্মনিষ্ঠা, হিন্দু-মুসলিম বলে সেখানে কোন বাছবিচার ছিলো না। হিন্দুদের মধ্যে যারাই এ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন তারাই বর্ণনির্বিশেষে প্রশাসনের নিম্ন পদ থেকে উচ্চ পদে আসীন হয়েছিলেন। দুই এবং একমাত্র এই ঘটনাটি দিয়েও প্রমাণ করা যায় আওরঙ্গজেবের হিন্দু বা অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষহীনতা। একদা ধান্দেরা'র জমিদার ইন্দ্রমোহন তার অবাধ্যতার কারণে সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক আসিরের দুর্গে বন্দি হয়েছিলেন। যুবরাজ আওরঙ্গজেব যখন সম্রাটের প্রতিনিধি হিশেবে দাক্ষিণাত্যে যান তখন ইন্দ্রমোহন নিজের মুক্তির জন্য ৫০,০০০ টাকা পণ দিতে চান ও আজীবন সম্রাটের বাধ্য হয়ে থাকবেন বলে তাঁকে জানান। আওরঙ্গজেব তখন প্রীত হয়ে ইন্দ্রমোহনের মুক্তির জন্য সম্রাটের কাছে কড়া সুপারিশ করে পত্র দেন। কিন্তু শাহজাহান সুস্পষ্ট জানিয়ে দেন যে বন্দির একটাই মাত্র মুক্তির পথ, তা ইসলাম গ্রহণ। আওরঙ্গজেব তখন উপায়ান্তর না দেখে 'উজিরে আলা' সাদুল্লা খানকে অনুরোধ করে লেখেন তিনি যেন ইন্দ্রমোহনের বিষয়টি নিয়ে সম্রাটকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং তার ধর্মান্তরিত করণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন। কিন্তু সম্রাট ছিলেন ইন্দ্রমোহনের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত, তিনি পুত্রের অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন ও স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। যা হোক, পরে যখন আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্বে যোগ দিতে দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করে দিল্লি অভিমুখে রওনা হন তখন ইসলাম গ্রহণ ব্যতিরেকেই জমিদার ইন্দ্র মোহনকে মুক্তি দেন ও যোগ্য 'মনসব' দানে ভূষিত করেন। ঘটনাটি এখানে এই জন্য বিবৃত করা হলো যে, সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং দোষ নিজের ওপর পড়তো না জেনেও যেখানে আওরঙ্গজেব ইন্দ্রমোহনকে তার ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করেননি, সেখানে স্বীয় প্রজাদের বৃহদংশকে অসন্তুষ্ট ও বিক্ষুব্ধ করার দুরভিসন্ধিতে তিনি 'জিজিয়া' পুনঃ প্রচলন করবেন এটা মেনে নেয়া যায় না। গোঁড়া

---

১৯৮ A Vindication of Aurangzib, pp. 130. Quoted from 'আওরঙ্গজেব : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৭২, ১৯৫।

১৯৯ 'তাজকিরাত-উল-উমারা' নামীয় গ্রন্থের বর্ণনা মতে আওরঙ্গজেবের ৫৩৯ জন মনসবদারের (৭,০০০ থেকে ৫০০) মধ্যে ১০৪ জন ছিল হিন্দু অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ; স্মর্তব্য যে, বিখ্যাত 'করোড়ি' রসিক দাসও ছিলেন রাজস্ব বিভাগের একজন করিৎকর্মা হিন্দু কর্মচারী।

মুসলিম আওরঙ্গজেবের ধর্ম নীতিও তা অনুমোদন করে না। আসলে 'জিজিয়া' ছিলো একটি সামরিক কর,—আওরঙ্গজেব স্ব-উদ্যোগে নয়, বরং ঘনিষ্ঠ ও উচ্চ পদস্থ অমাত্যদের প্ররোচনায়[২০০] ও কিছুটা পুণ্য লাভের মানসে (স্মরণ করা যাক, প্রাক-ইসলামি রীতি হলেও প্রথম থেকেই মুসলিম রাষ্ট্রে তা অনুসৃত হয়েছিলো) এবং মুখ্যত আইনি-বেআইনি মিলিয়ে প্রায় ৮০টি কর অবলোপে রাজকোষের ঘাটতি সামান্য হলেও পূরণের লক্ষ্যে এটি পুনঃ চালু করেছিলেন। শেষোক্ত কারণটি সুবিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক নিকোলা মানুচিও (১৬৩৯-১৭১৭) তাঁর 'স্টোরিয়া দো মোগর' নামীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে স্বীকার করেছেন।

এ পর্যায়ে আমরা 'জিজিয়া' আদায়ে ড. ঈশ্বরী প্রসাদের তথাকথিত কড়াকড়ি আরোপের অভিযোগ সম্বন্ধে একটু বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করবো।

আসলে 'জিজিয়া' আদায়ে 'great rigour' এবং 'a large staff of officers' কিছুই লাগানো হয়নি। ড. জহিরুদ্দিন ফারুকি বলেন, 'The jizyah was not mercilessly collected. The poor were required to pay only when their income left a surplus over and above the cost of maintaining themselves and their families.'[২০১] গরিবরা ৪ ও মধ্যবিত্তরা ২ কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে পারতো। এমন কি ইচ্ছে করলে নগদ অর্থের পরিবর্তে দ্রব্যেও তা দেয়া যেতো। গতানুগতিক রাজস্ব কর্মচারীরা 'জিজিয়া' আদায় করতো। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে কোনও বছরের ধার্য 'জিজিয়া' কর্মচারীদের গাফলতি ব্যতীত অন্য কোনও কারণে বকেয়া হলে এবং ইত্যবসরে পরবর্তী অর্থ বছর শুরু হয়ে থাকলে পূর্বের বকেয়া মওকুপ করা হতো। কিন্তু কেউ অবাধ্যতা প্রকাশ করলে তার কাছ থেকে উভয় বছরেরই 'জিজিয়া' আদায় করা হতো।[২০২] ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায় 'জিজিয়া' ভীতি ছিলো অমূলক, এটি কোনও উৎপীড়ন ধর্মী (Oppressive) কর ছিল না এবং মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে এ জন্যে হিন্দু বিদ্বেষী বলাটাও একান্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

যা হোক এখন আমরা বাবর থেকে শুরু করে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ মোগলদের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার নিতান্ত অপরিহার্য কিছু দিক যেমন বিভিন্ন সময়ে অনুসৃত ভূমিরাজস্বের হার, রাজস্ব দাখিলের মাধ্যম ও সময়, ভূমির শ্রেণীকরণ, রাজস্ব প্রদাতাদের বিন্যাস ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো।

ভূমিরাজস্বের হার

মোগল আমলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে ভূমিরাজস্ব দাবি ('জমা') করা হতো এবং তদনুপাতে তা আদায় ('ওয়াসিল') করা হতো। তবে মূল দাবির পরিমাণে যতো তারতম্যই ঘটুক না কেন, ভূমিরাজস্ব ধার্যের সময় রাষ্ট্র দু'টি জিনিসকে অবশ্যই বিবেচনায় নিতো। প্রথমত রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন,—আকবর ও জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে বিভিন্ন খাতে

---

২০০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Aurangzeb and His Times, pp. 149-50.

২০১ Aurangzeb and His Times, pp. 153.

২০২ Ibid., pp. 154.

সাম্রাজ্যের রাজস্ব ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময়ে স্বভাবতই তা ছিল উর্ধমুখি। এটি শুধু যুগের চলমান চাহিদাই ছিল না, বরং তা শেষোক্ত দুই সম্রাটের গৃহীত নীতির অনিবার্য পরিণতি হিশেবেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের বিশেষত প্রতিরক্ষা খাতে (যুদ্ধাভিযানই প্রধান) প্রচুর ব্যয় বাড়িয়েছিল। বলাবাহুল্য ব্যয় অনুসারে রাষ্ট্রকে উত্তরোত্তর আয়ও বাড়াতে হয়েছিল। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন আকবরের রাজত্বকালে আগ্রার রাজস্ব আয় ছিল ১,৩৬,৫৬,২৫৭ টাকা, শাহজাহানের সময়ে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ২,২৫,০০,০০০ টাকায় এবং আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দিকে ৩,৪১,১৫,০৫২ ও শেষের দিকে ২,৮৬,৬৯,০০৩ টাকায়।[২০৪] এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বের প্রথম ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রের মোট আয় বাড়লেও পরবর্তীতে তা অনেকখানি কমে গিয়েছিল। এর কারণ যাই থাক সে আলোচনায় আমরা এখানে যাবো না। বস্তুত আমরা উদ্ধৃত পরিসংখ্যানগুলি তুলে ধরে এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, পর্যালোচ্য যুগে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় মোগল সম্রাটদের এক-একজন এক-এক পরিমাণ রাজস্ব উশুল করেছিলেন; সমগ্র সাম্রাজ্যের আয়তনিক হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রশাসনিক কর্ম তৎপরতা, আইনি-বেআইনি উৎসসমূহের সংকোচন-প্রসারণ, প্রাকৃতিক অবস্থা (বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির হওয়া-না হওয়া), ভূমিরাজস্ব প্রদাতাগণের সহযোগিতা তথা অনুকূল আবহ ইত্যাদি এতে ব্যাপক প্রভাব রাখলেও সম্রাটদের স্ব স্ব ধার্য হার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা বলাইবাহুল্য।

দ্বিতীয়ত রায়তদের আর্থিক অবস্থা বা ভূমিরাজস্ব প্রদানের সঙ্গতি-সামর্থ্যও মোগল সম্রাটগণ তাঁদের রাজস্বনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকালে সর্বদা খেয়াল রাখতেন যেটা আগেই আমরা দেখিয়েছি। বন্যা-খরা-দুর্ভিক্ষে কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির আনুপাতিক হারে ধার্য রাজস্ব যেমন কম নেয়া হতো বা একেবারেই নেয়া হতো না, তেমনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কৃষককে 'তাকাবি' ঋণ প্রদান করেও তাকে নবোদ্যমে উঠে দাঁড়াতে সহযোগিতা করা হতো। অন্যদিকে ছিল জমির উর্বরতা শক্তির স্থানীয় মান তথা মাটির গুণাগুণ, জলবায়ুর প্রভাব, সেচের সুবিধা-অসুবিধা, শস্যোৎপাদনে কৃষকের বিনিয়োগ প্রভৃতিও ভূমিরাজস্বের হার কম-বেশি করায় যথেষ্ট ভূমিকা রাখতো। এতে করে দেখা যেতো একই সম্রাটের অধীনে একটি নির্দিষ্ট প্রথা-পদ্ধতিতে কোনও অঞ্চলে যে হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করা হতো, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই ঐ অঞ্চলের অন্যত্র বা অন্য প্রদেশে সেই হারে রাজস্ব আদায় করা হতো না বরং কম-বেশি হতো। এ সম্পর্কিত দু'টি উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলো।

সম্রাট আকবরের কথাই ধরা যাক। একটি নির্দিষ্ট প্রথা যেমন 'ফসল-ভাগ' পদ্ধতিতে তাঁর আমলে কাশ্মিরে রাষ্ট্রের পাওনা বাবদ আদায় করা হতো উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক পরিমাণ[২০৫], কিন্তু আজমিরে, সম্ভবত মরু এলাকায়, একের সাত বা আট ভাগ।[২০৬] অথচ আকবরের সময়ে গড়পরতা ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার ছিল উৎপন্ন শস্যের একের-

---

২০৪ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'The Revenue Resources of the Mughal Empire in India', Edward Thomas, pp. 12,28,50.

২০৫ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, ড. ইরফান হবিব, পৃষ্ঠা ২০৫; মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৩৬।

২০৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০৫; ৩৬।

তিন ভাগ। অন্যদিকে অধিকাংশ আধুনিক ইতিহাসবেত্তার ধারণানুযায়ী সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে ভূমিরাজস্বের মোটামুটি হার ছিল উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক; কিন্তু সেটাও যে স্থান ও সময় বিশেষে ব্যাপক তারতম্যাধীন ছিল তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রসিকদাসকে লেখা সম্রাটের বহুলকথিত ফরমান যাতে একই অঞ্চলে ও একই পদ্ধতিতে প্রয়োজনে তিন বা ততোধিক হারে ভূমিরাজস্ব নিরূপণের কথা বলা হয়েছে। ফরমানে বলা হয়েছে : 'যে-সমস্ত গ্রামে কৃষকের দুর্দশা বা অপ্রতুল উৎপাদন-সাধনের কথা তাঁদের জানা আছে সেখানে আমিন-রা যেন (ফসলের) অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা দুই-পঞ্চমাংশ কিংবা কিছু কম-বেশি হারে 'গল্ল-বখ্‌শি' (ফসল ভাগ) করিয়ে নেন।'[২০৭]

আসলে এগুলি ছিল পরিস্থিতি বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় পাওনায় ছাড় দেওয়ার রীতি বা প্রক্রিয়া, কোনও বিধিবদ্ধ সাধারণ নিয়ম নয়। এ পর্যায়ে তাই আমরা যে আলোচনা করবো তাতে মোটামুটি ফুটে উঠবে মোগল যুগের ভূমিরাজস্ব হারের আপাত গ্রহণযোগ্য চিত্র।

বাবর দিয়েই শুরু করা যাক। আগেই জানিয়েছি যে সম্রাট বাবরের সময়ে ভূমিরাজস্বের প্রকৃত হার কতো ছিল তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। যেহেতু বিকাশমান মোগল সাম্রাজ্যের শৈশবাবস্থায় তাঁর অধীনে—'A large part of the Empire was scarcely controlled at all, and the polity of Hindustan under his (Babar) rule was simply the strong hand of military power where it could be used. The lands and cities of the more settled regions were parcelled out among his officers, or jagirdars, who levied the land-tax from the peasant cultivators, ...'[২০৮] ফলত প্রশাসনিক এই বিন্যাসে তাঁর পক্ষে অধীন ইকতাদার-ওয়াজদার-জায়গিরদার প্রভৃতির কাছ থেকে বার্ষিক এককালীন থোক রাজস্ব গ্রহণ করাই সমীচীন, যার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় এভাবে যে সম্রাট কখনও কখনও এদের কাছ থেকে গড়ে ৩০% ভূমিরাজস্বও আদায় করতেন অর্থাৎ প্রায় একের তিন ভাগ।[২০৯] এটির আপাত গ্রাহ্যতা আরেক দিক থেকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, বাবর প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগের অভাবে তাঁর গৃহীত প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রচলিত তথা পূর্ববর্তী সুলতানদের অনুসৃত ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলেন। স্মর্তব্য, সুলতানদের গড়পরতা ভূমিরাজস্বের হারও ছিল উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর কম-বেশি $\frac{১}{৩}$ অংশ। তবে ওয়াজদার-জায়গিরদাররা যে কৃষকদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করতো তা বলা যায়। কারণ পরবর্তীকালের মতো এদের ওপর রাষ্ট্রীয় কঠোর নিয়ন্ত্রণ তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, নিজের নড়বড়ে রাজনৈতিক অবস্থানের কারণে বাবরের পক্ষে তা প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব ছিল না।

২০৭ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৭।
২০৮ Babar, Stanley Lane-Poole, pp. 185.
২০৯ মধ্যবাংলার তৎকালীন শাসক সুলতান নসরত শাহও সম্রাট বাবরকে 'পেশকাশ' পাঠিয়েছিলেন। (Babar, Stanley Lane-Poole, pp. 185).

সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্বকাল পিতা বাবর অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক হলেও বস্তুত তাঁর অপেক্ষাকৃত কম মেধাজাত প্রশাসনিক অভিজ্ঞান, অস্থিরমতি মানসিকতা ও প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার যুগোপযোগী সংস্কার সাধনে উদ্যোগের অভাব স্বভাবতই আমাদের এই ধারণা পোষণে উদ্বুদ্ধ করে যে, তিনি ভূমিরাজস্বের হার নির্ধারণে গতানুগতিক হিসাব-ই বেছে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত ড. ঈশ্বরী প্রসাদের একটি উদ্ধৃতি এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'Every harvest the land was measured afresh, and a share felt to the Muqaddam (headman). The assessments were carefully fixed according to the kind of grain, so that the interests of the cultivators might be safeguarded.'[২১০] শস্য ভাগ প্রথায় যেহেতু সম্রাটকে শুরু থেকেই যথেষ্ট সতর্ক হতে এবং একই সঙ্গে রায়তদের স্বার্থও অক্ষুণ্ন রাখার দিকে নজর দিতে হয়েছিল, সুতরাং ধারণা করা যায় সুলতানদের আমলের গড়পরতা ভূমিরাজস্ব হার-ই এ যুগে প্রচলিত ছিল। কারণ মুসলিম শাসনে এক-তৃতীয়াংশ বা কমবেশি অনুরূপ হারেই রাজস্ব প্রদানে ততোদিনে প্রজারা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। $\frac{১}{৩}$ এর বেশি অর্থাৎ সুলতান আলাউদ্দিন খল্জি ও সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক এই আমলে ধার্য না হওয়ার স্বপক্ষে বড় যুক্তি এই যে, উল্লিখিত শাসকদের রাজত্বকালের মতো হুমায়ুনের সময়ে প্রজা বিদ্রোহের ঘটনা খুব কম, এবং তাঁর যুদ্ধাভিযানের সংখ্যাও ছিল সীমিত।

এবার সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ভূমিরাজস্বের হার নিয়ে আলোচনা করবো। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমান শাসকদের মধ্যে সর্বপ্রথম তাঁর সময়েরই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত লিখিত দলিলপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষিত ও প্রথাবদ্ধ। বিখ্যাত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা'র তথ্য-পঞ্জির ভিত্তিতে সে যুগের অনেক কিছুই প্রমাণিত করা এক প্রকার সহজ ও সম্ভব। তারপরও বিতর্কের বহু সুযোগ থেকে যায়, সত্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকগণ তা যথাস্থানে উল্লেখ করতেও দ্বিধা করেননি। তবে মীমাংসিত অনেক কিছুর মতোই অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক-এর সঙ্গে এক মত হয়ে আমরা বলতে চাই যে, তাঁর সময়ে গড়পরতা ভূমিরাজস্বের হার ছিল উৎপাদিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ।[২১১]

২১০ The Life and Times of Humayun, pp. 165.

২১১ The Land Systems of British India, Vol. I., Baden-Powell, pp. 275;W.H.Moreland, India at the Death of Akbar, pp. 93; From Akbar to Aurangzeb, pp. 248; The Agrarian System of Moslem India, pp. 91; The Revenue Resources of the Mughal Empire in India, pp. 10; A Short History of Muslim Rule in India, Dr. Prasad, pp. 329; The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 331; The Muslim Epoch, J.D. Rees, pp. 124; A History of India : From Earliest Times to the Present Day, Michael Edwardes, pp. 171; The History of India, MountStuart Elphinstone, pp. 529; Indian Land System, Dr. RadhaKumud Mookerjee, pp. 162; History and Incidents of Occupancy Right, Dr. RadhaRomon Mookerjee, pp. 42; History of Freedom Movement in India, Vol. I., Dr. Tara Chand, pp. 105; Commercial Policy of the Moguls, Dr. D. Pant, pp. 61; Indian Economic Life : Past & Present,

অবশ্য ড. ইরফান হবিব কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে, 'হিন্দুস্তান-এর......প্রদেশের বাইরে (যেমন কাশ্মীর, সিন্ধু প্রভৃতি) আকবরের প্রশাসন কাগজে-কলমে রাজস্ব-দাবি ঠিক করেছিল উৎপন্নের একের-তিন ভাগ, কিন্তু বাস্তবে তা গিয়ে দাঁড়াত দু-এর তিন ভাগে। আকবর আদেশ দিয়েছিলেন যে অর্ধেকই দাবি করতে হবে। থাট্টা প্রদেশে একের-তিন ভাগ আদায় হতো ভাগচাষের মারফতে। কিন্তু ১৬৩৪ সালে লেখা সিন্ধু প্রদেশের প্রশাসন সংক্রান্ত একটি রচনা 'মজহার-এ শাহজাহানী' অনুযায়ী, 'আইন' লেখার সময় থাট্টার জাগীর যাদের এখতিয়ারে ছিল সেই তরখানরা "চাষীদের কাছ থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেকের বেশি নিত না এবং কোন কোন জায়গায় একের-তিন বা একের-চার ভাগও নিত। এর থেকে মনে হয়, প্রমাণহার সত্যিই ছিল উৎপন্নের অর্ধেক।'[২১২] আমরা আগেই বলেছি যে সম্রাট আকবর সম্রাট শেরশাহেরই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত ও পরিশীলিত রূপ এবং যুগের উপযোগী মজবুত গণভিত্তি দিয়েছিলেন, সুতরাং ড. হবিবের শেষোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটুকুই শুধু বলা যায় যে সাম্রাজ্যিক চাহিদা ও স্বীয় জনপ্রিয়তা—এ উভয় দিক রক্ষাকল্পে আকবরের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের প্রমাণহার ছিল উৎপন্ন শস্যের একের-তিন ভাগ, যদিও স্থান ও কালবিশেষে এই হারের যথেষ্ট ওঠানামা হতো। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি তাই যথার্থই বলেছেন, 'Akbar fixed a third of the gross produce as the state demand; but from the beginning the level was not uniform in all parts of the empire.'[২১৩] তবে এর অর্থ এটা নয় যে ধার্য $\frac{১}{৩}$ হার প্রকৃত প্রস্তাবে আদায়কালে উৎপন্নের

Dr. Brij Narain, pp. 35; Akbar The Great Mogul, V.A. Smith, pp. 271; Akbar The Greatest Mogul, S.M. Burke, pp. 161; The Provincial Government of the Mughals, pp. 279; The New Cambridge History of India : The Mughal Empire, John F. Richards, pp. 85; The Administration of the Moghul Empire, Dr. Qureshi, pp. 170; Mughal Polity, Dr. Jagadish Narayan Sarkar, pp. 293; Land Revenue Administration under the Mughals, Dr. N.A. Siddiqi, pp. 43; The Mughal Government, Dr. U.N. Day, pp. 124; Policies of the Great Mughals, pp. 11; History of India, Dr. Anil Chandra Banerjee, pp. 401; Mughal Rule in India, Edwardes & Garrett, pp. 203; Mughal Rule in India, Dr. V. D. Mahajan, pp. 109; The Mughal Empire, S.M. Jaffar, pp. 154; Land Revenue in India, Ed. by Dr. R.S.Sharma, pp. 36; Report of the Land Revenue Commission, Vol. I., pp. 9; History of India, Drs. Narendra Krishna Sinha & Nisith Ranjan Ray, pp. 321. ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম-শাসন, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ৩১৯; মুঘল অর্থনীতি : সংগঠন এবং কার্যক্রম, ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার, পৃষ্ঠা ২৮৩; মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ, ড. গৌতম ভদ্র, পৃষ্ঠা ৬০; বাংলাদেশে কৃষির বিবর্তন, কৃষকসমাজ ও সাহিত্য, ড. তাপস বসু, পৃষ্ঠা ৪৬; বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ড. আবদুল্লাহ ফারুক, পৃষ্ঠা ১৬৬; ভারতবর্ষের ইতিহাস, ড. কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৮।

২১২ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২০৪-৫।

২১৩ The Administration of the Moghul Empire, pp. 170.

$\frac{১}{৬}$ ভাগে গিয়ে দাঁড়াতো, যেমনটা ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেছেন— 'The Emperor Akbar made a theoretical demand of one-third of the gross produce; but it may safely be asserted that the revenue he actually obtained did not come up to even a sixth of the gross produce of his Indian Emipre.'[২১৪] কারণ তদবস্থায় সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্য চালানোই তাঁর পক্ষে দায় হয়ে দাঁড়াতো।

আকবরের আমলের এই হার সম্ভবত জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালেও অব্যাহত ছিল[২১৫], তবে পরবর্তীকালে সেটা তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল এ ধারণা করা যায়। ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন, 'The rate grew moderately higher under Jahangir.'[২১৬] নির্ভরযোগ্য তথ্য-প্রমাণের অভাবে যদিও সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ে ভূমিরাজস্বের প্রকৃত হার কতো ছিল তা বলা মুশকিল, তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর সময়ে 'খালিশা' জমির পরিমাণ যথেষ্ট রকমে কমে যাওয়ায় এই হার প্রচলনের এলাকাও পূর্বের তুলনার সীমিত হয়ে এসেছিল।[২১৭] আনন্দবিলাসী ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ গ্রহণে অনুৎসাহী জাহাঙ্গির প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের পরিবর্তে জায়গিরদার-জমিদার প্রভৃতির ওপর ক্রমশ বেশি করে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন বিধায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার অনেকটাই চলে যায় শেষোক্তদের কব্জায়। ফলে তাদের পক্ষে রায়তদের কাছ থেকে সুবিধা মতো হারে ভূমিরাজস্ব আদায় করা অসম্ভব নয়। জাহাঙ্গিরের মতো শাহজাহানের রাজত্বকালেও পর্যালোচ্য বিষয়ের ওপর বিশেষ কোনও তথ্য সমকালীন ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না।[২১৮] ফলে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে সকলেই নীরবতা পালন করেছেন। দু'একজন কিছুটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করলেও বলা যায় সেটা একান্তই অনুমাননির্ভর। যেমন ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার[২১৯] ও ড. এম. পি. শ্রীবাস্তবের[২২০] মতে শাহজাহানের সময়ে ভূমিরাজস্বের সাধারণ হার ছিল উৎপন্নের অর্ধেক। তবে আমাদের বিবেচনায় এটি $\frac{১}{৩}$ থেকে $\frac{১}{২}$ অংশ হওয়াই সম্ভব। কারণ আওরঙ্গজেব এর রাজত্বকালের প্রথম দিককার কিছু নথিপত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, 'in Shah Jahan's time, the general rule was to assess the village through the headman at a sum calculated to yield the equivalent of from 1/3 to 1/2 of the

২১৪ Famines and Land Assessments in India, pp. 236.
২১৫ Policies of the Great Mughals, pp. 15.
২১৬ Mughal Polity, pp. 293.
২১৭ আকবরের আমলের 'রায়তওয়ারি ব্যবস্থা' পরবর্তীকালে বিশেষ করে জাহাঙ্গিরের সময়ে ক্রমান্বয়ে সংকুচিত হয়ে পড়েছিল। ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী বলেন, 'It is apparent from the record that the part of Akbar's revenue system which aimed at Ryotwari Settlements did not at all prosper after him.' (Indian Land System, pp.167).
২১৮ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩৬।
২১৯ Mughal Polity, pp. 293.
২২০ Policies of the Great Mughals, pp. 17.

produce, and that this rule applied, at least formally, to assigned as well as reserved areas.'[২২১] 'কানকূট' প্রথায় স্বভাবতই এই হার কিছুটা কম হতো।[২২২]

শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত দিওয়ান মুর্শিদকুলি খান যখন এতদঞ্চলে 'ফসল ভাগ' পদ্ধতিতে রাজস্ব নির্ধারণ করেন তখন তিনি জমি থেকে নিতেন উৎপন্নের অর্ধেক, কুয়ো সেচের জমি থেকে ১/৩ এবং উঁচু শ্রেণীর জমির উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর ১/৪ অংশ বা তারও কম।[২২৩] জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের সময়েই ভূমিরাজস্বের হার ছিল সবচেয়ে বেশি। অবশ্য রাজস্ব ধার্যের এই মাত্রা বা প্রবণতা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল, তিনি তা রাষ্ট্রীয়ভাবে সাধারণ প্রথাবদ্ধ করেছিলেন মাত্র। আগেই দেখিয়েছি যে এই আমলে নানা কারণে প্রশাসনিক ব্যয় বেড়ে ছিল মোগলদের অন্য যে কোনও শাসকের সময়ের চেয়ে বেশি। স্বভাবতই সেই প্রভূত ব্যয় নির্বাহের জন্য গোঁড়াপন্থী সম্রাট ইসলামি আইনানুমোদিত চূড়ান্ত সীমা অর্থাৎ উৎপাদিত শস্যের অর্ধেক পর্যন্ত ধার্য করতে পিছপা ছিলেন না। তবে তার মানে এই নয় যে সম্রাট এই মাত্রায় ভূমিরাজস্ব আদায়ের বেলায় খুব কঠোর ও অনমনীয় ছিলেন। বরং ইতোমধ্যে আলোচিত রসিকদাসের কাছে লিখিত পত্রের আলোকে আমরা এটা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি যে, সম্রাট এ ব্যাপারে রায়তদের অবস্থা ও সামর্থ্য বৈচিত্র্যে ব্যাপক ছাড় দানেও যত্নশীল ছিলেন। বস্তুত 'মিরাত-ই-আহমাদি' নামীয় পুস্তকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের এতদসংক্রান্ত যে সব ফরমান গ্রন্থিত হয়েছে এবং যদি ড. নোমান আহ্‌মদ্ সিদ্দিকীর কথায় আমরা ধরে নিই যে, 'সাম্রাজ্যের সর্বত্র বলবৎ করার উদ্দেশ্যেই এই ফরমানের বিধিগুলি রচিত হইয়াছিল, এবং ইহাদের বয়ান ছিল এমন যাহাতে ভূমি-রাজস্ব নিরূপণ ও সংগ্রহে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাগুলির মোকাবিলা করা যায়'[২২৪] , তা হলে ড. রাধাকুমুদ মুখার্জী-র সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, 'The share claimed by the State (under Aurangzeb) was not uniform. It varied with the crop and irrigation.'[২২৫] তিনি আরও বলেন, 'Land irrigated by rain paid 1/2, from wells 1/3, and 1/4— 1/9 where it grew valuable crops like sugarcane or poppy.'[২২৬]

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা জরুরি বলে মনে হয়, সম্রাট আকবরের সময়ে ভূমিরাজস্বের প্রচলিত সাধারণ হার কাগজে-পত্রে যেমন ছিল ১/৩ ভাগ, অথচ ড. হবিব সূত্র উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ আদায় কালে তা কখনও কখনও ২/৩ ভাগে গিয়েও দাঁড়াতো। অন্যদিকে প্রায় সকল আধুনিক ঐতিহাসিক যাঁরাই এই হারের উল্লেখ করেছেন তাঁরা স্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের যুগে

২২১ Indian Land System, pp. 168.
২২২ Mughal Polity, pp. 293.
২২৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২০৭।
২২৪ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩৮।
২২৫ Indian Land System, pp. 168.
২২৬ Ibid., pp. 168.

ভূমিরাজস্বের হার ছিল সর্বোচ্চ, এবং এর পরিমাণ উৎপন্নের অর্ধেক[২২৭] ; কিন্তু এঁদের কেউই, এমন কি সম্রাটের ঘোর সমালোচক ঐতিহাসিকও এই হার কখনও কোনও অবস্থায়ও $\frac{১}{২}$ এর সীমা অতিক্রম করেছিল তা বলেননি।

আওরঙ্গজেবের কঠোর রাজস্ব-নীতির এটাই সার্থকতা।

পরিশেষে ড. সিদ্দিকীর চমৎকার সূত্র-গ্রন্থনা দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গের নির্ধারিত আলোচনা শেষ করতে পারি। তাঁর ভাষায়, 'উপসংহারে একথা বলা যায় যে, প্রথমত বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক ও কৃষি অবস্থা অনুযায়ী ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হইত এবং এই পরিমাণের অঙ্ক এক-চতুর্থাংশ হইতে অর্ধেকাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। দ্বিতীয়ত, অর্ধাংশ হারই সর্বনিম্ন নয়, সর্বাধিক বলিয়া গণ্য হইত। তৃতীয়ত, ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করিবার সময় সাধারণত স্থানীয় কৃষি-অবস্থা ও কৃষকের রাজস্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা বিচার করিয়া দেখা হইত। যে ক্ষেত্রে রাজস্ব বৃদ্ধি করিলে কৃষকের ভূমি হইতে উৎক্ষিপ্ত ও কৃষিকার্যের ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা দেখা যাইত, সেইরূপ রাজস্ব বৃদ্ধি স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হইত।'[২২৮]

ভূমিরাজস্ব প্রদানের মাধ্যম

মধ্যযুগের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কিত যে সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ, রাজকীয় ফরমান, লেখচিত্র তথা এক কথায় তথ্যসূত্র এ যাবৎ পাওয়া গেছে তাতে দেখা যায় নিরূপিত ভূমিরাজস্ব মূলত দু'ভাবে দেয়া যেতো— এক. নগদ অর্থে (সাধারণত প্রচলিত মুদ্রায়) ও দুই. উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীতে। সুলতানি শাসনামলের আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রধান প্রধান সুলতানি শাসকগণ নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব আদায় করলেও, শস্য মাধ্যমেও সেটা গ্রহণে তাঁদের উৎসাহ কম ছিল না। বিশেষ করে শেরশাহের পূর্বের সর্বাপেক্ষা কীর্তিমান সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জি তো শেষোক্ত মাধ্যমটিকে রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে উপযোগী ও কার্যকর মনে করতেন। কিন্তু মোগল সম্রাটদের প্রবণতা ছিল এ ক্ষেত্রে উল্টো। তাঁরা উৎপন্ন দ্রব্যে ভূমিরাজস্ব গ্রহণ করলেও তাঁদের প্রধান ঝোঁক ছিল নগদ অর্থের প্রতি। অবশ্য এর কারণও ছিল। একটি কারণ (প্রধানও বলা যায়) এই ছিল সুলতানদের সময়ের চেয়েও এ যুগে সাম্রাজ্যের আয়তন ও পরিধি বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্বভাবতই সুবাগুলি থেকে কেন্দ্রে রাজস্ব বাবদ দ্রব্যসামগ্রী প্রেরণ ছিল ব্যয়বহুল ও অসুবিধাজনক। কিন্তু নগদ অর্থ প্রেরণে এই ঝামেলা ছিলই না বলা যায়। নিয়মিত বিরতিতে উপযুক্ত সৈন্য প্রহরায় বস্তা পুরে প্রচলিত মুদ্রা দূত মারফত প্রেরণ করলেই চলতো।

২২৭ মুঘল অর্থনীতি : সংগঠন এবং কার্যক্রম, পৃষ্ঠা ২৮৩; ভারতবর্ষের ইতিহাস, ড. কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৮; From Akbar to Aurangzeb, pp. 254 প্রভৃতি। তবে যে যাই বলুক আমাদের মনে হয় এ ক্ষেত্রে ড. এম. পি. শ্রীবাস্তবের উক্তিই সঠিক। তিনি বলেন, 'As a general rule the minimum demand was one-third or one-fourth while the maximum was one-half.' (Policies of the Great Mughals, pp. 22).

২২৮ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩৯।

নিরূপিত ভূমিরাজস্ব নগদ অর্থে গ্রহণে আকবরের নীতি ছিল খুবই স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ। ব্যতিক্রম ব্যতীত অর্থাৎ যে সব ক্ষেত্রে বিকল্প ছিল না সেগুলি ছাড়া, অন্য সকল পর্যায়ে তিনি রাজস্ব কর্মচারীদের নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ড. ডি. পান্থ বলেন, 'Akbar laid stress on the officials being paid in cash and dealing directly with the individual peasant cultivators.'[২২৯] সাধারণত নগদ আদায় সুপ্রচলিত ছিল সেই সব এলাকায় যেখানে 'জবতি' ও 'নাসক' পদ্ধতিতে রাজস্ব ধার্য করা হতো।[২৩০] যেমন আগ্রা, দিল্লি, আজমির, এলাহাবাদ, আউধ, লাহোর, বাংলা প্রভৃতি। উল্লেখ্য, বাংলা ব্যতীত পূর্বোল্লিখিত সুবাগুলিতে প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে রাজস্ব আদায়-প্রক্রিয়া সরাসরি রায়তদের সঙ্গে সম্পন্ন হলেও (বহুলকথিত 'রায়তওয়ারি প্রথা') বাংলায় তা হতো মূলত বড় বড় ভূ-স্বামী বা জমিদারদের সঙ্গে (পরে আলোচিত)। বাংলার ভূঁইয়াগণ বার্ষিক চুক্তি মোতাবেক প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে সম্রাটকে এককালীন বেশ মোটা অঙ্কের 'পেশকাশ' প্রেরণ করতেন। তবে আকবর ভূমিরাজস্ব নগদে গ্রহণের পক্ষপাতী থাকলেও প্রজাদের পছন্দ-অপছন্দকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, রাজস্ব শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে প্রদানের ক্ষেত্রে আকবরের যে 'দহসালা বন্দোবস্ত' নীতিমালা ছিল, তা প্রজাদের জন্য ছিল তুলনামূলক স্বার্থ-হানিকর। একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপারটি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা হলো। ধরা যাক 'ক' অঞ্চলে বিঘা প্রতি নির্ণীত ধানের উৎপাদনের গড়-মাত্রা ১২ মণ এবং উৎপন্নের $\frac{১}{৩}$ হারে রাষ্ট্রের পাওনা (১২ ÷ ৩)= ৪ মণ। তৎসহ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতি মণ ধানের মূল্য আগেই নির্দিষ্ট করা বা ধরা হয়েছে ১৫ 'দাম'। সে হিসাবে রায়তের দেয় (১৫ × ৪)= ৬০ দাম। কিন্তু বাস্তবে ফসল কাটার মৌসুমে মূল্য হঠাৎ পড়ে যাওয়ায় কৃষকের বিপুল শ্রমে-ঘামে উৎপাদিত ধানের বিক্রয় মূল্য গিয়ে দাঁড়ালো ১২ 'দাম'-এ। এখন সরকারি দেয় ৬০ 'দাম' পরিশোধ করতে গেলে তাকে খোলা বাজারে বিক্রয় করতে হচ্ছে ৫ মণ ধান (৫ × ১২= ৬০) অর্থাৎ বিঘা পিছু এক মণ ধানের ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে। স্বভাবতই রায়তগণ অনেক সময়ে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদানে অনীহা দেখাতো। সম্রাটের সহজ নীতি ছিল এ ক্ষেত্রে রায়তদের স্ব স্ব পছন্দ মেনে নেয়া, জোর করে কোনও একটি বিশেষ পদ্ধতি চাপিয়ে দেয়ার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। 'আইনে' তাই রাজস্ব কর্মচারীদের জন্য সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে : 'Let him not make it a practice of taking only in cash payments but also in kind.'[২৩২] তবে পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনায় একটা ধারণা করা যায় যেটি ড. হবিবও বলেছেন, 'মনে হয়, রাজস্ব যখন জিনিসেও নেওয়া হতো, তখনও সময় বিশেষে সেটিকে তৎক্ষণাৎ বাজারে বেচে, তার বদলে নগদ টাকা নিয়ে আসাই কাম্য বলে মনে করা হতো।'[২৩৩]

এ পর্যায়ে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানের বেলায় কোন্ ধরনের মুদ্রাকে পর্যালোচ্য যুগে মান হিশেবে গণ্য করা হয়েছিল?

২২৯ The Commercial Policy of the Moguls, pp. 60.
২৩০ Mughal Polity, pp. 278.
২৩২ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 47.
২৩৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৫১।

উত্তরে প্রথমেই বলতে হয় আকবরের রাজত্বকালে প্রধান প্রচল মুদ্রা ছিল 'দাম' (তামার পয়সা বা মুদ্রা)।[২৩৪] পরবর্তীকালে চালু হয়েছিল 'রূপী'। যা হোক বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিশেষত মুদ্রাতত্ত্ববিদ এডওয়ার্ড টমাস[২৩৫] ও ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যান্ড[২৩৬] -এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে ১ 'দাম' ছিল ১ রূপী'র $\frac{১}{৪০}$ বা একের-চত্বারিংশাংশ। রায়তগণ তাদের পছন্দসই মুদ্রায়— 'দাম' (তাম্র মুদ্রা) বা 'রূপী' (রৌপ্য মুদ্রা) বা স্বর্ণ মুদ্রায় আনুপাতিক হারে ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করতে পারতো, কারণ সম্রাটের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—'the treasurer does not demand any special kind of coin, but take what is of standard weight and proof.'[২৩৭] প্রচলিত মুদ্রার বাইরে বিশেষ করে প্রাচীন মুদ্রাগুলিকে 'বুলিয়ান' (Bullion) হিশেবে গণ্য করা হতো।[২৩৮]

এ যুগের ভূমিরাজস্ব বিনিময়ের আর একটি লক্ষ্যণীয় মাধ্যম ছিল 'হাতি'। এটি মুখ্যত মধ্যভারতের মালওয়া সুবার অন্তর্গত 'গারহা' এলাকায় প্রচলিত ছিল। জ্যারেট অনূদিত 'আইন'-এ সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— 'Garha (in Malwa Subah) is a separate State, abounding with forests in which are numerous wild elephants. The cultivators pay the revenue in mohurs and elephants.'[২৩৯] অবশ্য 'আইনে'র এই অংশের জ্যারেটকৃত অনুবাদ নিয়ে বিতর্ক আছে। মূল ফারসি শব্দ 'পিল' এর ইংরেজি অনুবাদ জ্যারেট (সম্পাদনা স্যার যদুনাথ সরকার; স্মর্তব্য তিনি এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করেননি) 'এলিফ্যান্ট' করলেও ড. ইরফান হবিব মূল ফারসি 'পিল'-র স্থলে 'পুল' হবে বলে মনে করেন এবং তদনুসারে এর অর্থ করেন 'তামার পয়সা'। তাঁর ভাষায়, "মূলের পাঠে আছে 'মুহুর ও পীল', কিন্তু আমার মনে হয় পুল'-এর জায়গায় ভুল করে 'পীল' লেখা হয়েছে। জ্যারেট (সম্পা. যদুনাথ সরকার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭), মনে হয়, কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই বাক্যটির তর্জমা করেছেন : "চাষীরা 'মুহুর' এবং হাতী দিয়ে রাজস্ব দাখিল করে"।"[২৪০] কিন্তু আমাদের বিবেচনায় জ্যারেটের অনুবাদই সম্ভবত সঠিক। যুক্তি হিশেবে দু'টি সূত্র উল্লেখ করা যায়। প্রথমত তিনি (হবিব)

২৩৪ এর প্রচলন আকবরের সময়ের আগে থেকে। সম্ভবত শেরশাহের আমলে লেনদেন কার্যক্রমে এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আকবর তা প্রচলিত অন্যান্য মুদ্রার সঙ্গে চমৎকারভাবে সমন্বিত করেন। 'দাম'-এর আরও দু'একটি নাম, যেমন 'পয়সা' বা 'পেসা', 'ফুলুস' প্রভৃতি। এর অর্ধেককে বলা হতো 'আধেলা' (মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪০৭)। বিভিন্ন মোগল সম্রাটদের সময়ের 'দাম'-এর প্রকৃত ওজনে সামান্য কিছু হেরফের হতো, তবে এর মোটামুটি ওজন ছিল—৩২৩.৫ গ্রেন বা প্রায় ২১ গ্রাম (Akbar the Great Mogul, Smith, pp. 281), বা ১ তোলা ৮ মাশা ৭ রত্তি (The Chronicles of the Pathan Kings of Dehli, Thomas, p. 360)। খ্যাতনামা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ তৎকালে প্রচলিত অন্যান্য মুদ্রার সঙ্গে 'দাম'-এর বিনিময় হার নির্ণয়ের চেষ্টা করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তার গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্ননিরপেক্ষ নয়। (The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 256).

২৩৫ The Chronicles of the Pathan Kings of Dehli, pp. 360, 407, 441.

২৩৬ The Agrarian System of Moslem India, pp. 271; From Akbar to Aurangzeb, pp. 261; India at the Death of Akbar, pp. 51.

২৩৭ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 41.

২৩৮ Dr. Keyamuddin Ahmad, Land Revenue in India, pp. 42.

২৩৯ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 207.

২৪০ মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৫২, 'ফুট নোট'।

নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে মূল ফারসি শব্দকে 'বিকৃত' ('বিকৃত'ই বলবো একে) করেছেন অর্থাৎ 'পিল'-কে মনগড়াভাবে 'পুল' করে নিয়েছেন। যেহেতু বিকল্প চিন্তার সুযোগ আছে, সেহেতু আমরা মনে করি, সেটিকে আগে যাচাইবাছাই করে তবেই মূলের ভুল প্রতিপন্ন করা উচিত ছিল। মধ্যযুগের প্রাপ্ত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি গুলিতে অনেক সময় এ জাতীয় ভুল হতো। কিন্তু ড. হবিব এর কোনটিই উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা বলে মনে করি, যে অঞ্চলের কথা 'আইনে' এখানে বলা হয়েছে, বলাবাহুল্য বনপাদপ-সমাচ্ছন্ন উক্ত অঞ্চলে প্রাকৃতিক কারণেই প্রচুর হাতি লভ্য ছিল। তাছাড়া মালওয়া সুবা'র অপরাপর 'সরকার' (মোট ১২টি)-এর তুলনায় 'গারহা' সরকারে যে কৃষিজাত দ্রব্য কম উৎপন্ন হতো তার প্রমাণ এর রাজস্ব আয়। যেমন উজ্জয়িনী সরকারের ১০টি মহাল (সুয়ুরগল ছাড়া) থেকে রাজস্ব আসতো ৪,৩৮,২৭,৯৬০ 'দাম', চান্দেরির ৬১টি মহাল (সুয়ুরগল ছাড়া) থেকে ৩,১০,৩৭,৭৮৩ 'দাম', সারঙ্গপুরের ২৪টি মহাল (সুয়ুরগল ছাড়া) থেকে ৩,২৯,৯৪,৮৮০ 'দাম', বিজাগড়ের ২৯টি মহাল থেকে ১,২২,৪৯,১২১ 'দাম', নন্দরবারের ৭টি মহাল (সুয়ুরগল ছাড়া) থেকে ৫,০১,৬২,২৫০ 'দাম' ইত্যাদি। অথচ 'গারহা' সরকারের ৫৭টি মহাল থেকে পাওয়া যেতো মাত্র ১,০০,৭৭,০৮০ 'দাম'। মোট ১২টি সরকারের মহাল সংখ্যার দিক থেকে এর অবস্থান ছিল দ্বিতীয়, কিন্তু রাজস্ব আয়ের দিক থেকে চতুর্থ। তাছাড়া কোনও সুয়ুরগলও ছিল না। ফলে এখানকার রায়তরা উৎপন্ন ফসল সাংবাৎসরিক খরচ মিটানোর জন্য নিজেদের ঘরে তুলে রেখে বিকল্প পন্থায় অর্থাৎ হাতির বিনিময়ে সরকারি পাওনা পরিশোধ করতো, এটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। ড. হবিবের মতের বিপক্ষে এখানে আরও একটি যুক্তি উপস্থাপন করা যায়। তিনি 'পুল' (মূল 'পিল')-এর অনুবাদ করেছেন 'তামার পয়সা'।[২৪১] সেক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সরকারি মুদ্রা তথা 'তামার পয়সা' বলতে 'আইনে' আবুল ফজল যেখানে সর্বত্রই 'দাম'-এর উল্লেখ করেছেন, সেখানে এই একটি ক্ষেত্রে তিনি কেন প্রতিশব্দের আশ্রয় নেবেন? আসলে মূল ফারসি শব্দটি 'পুল' নয়, 'পিল'-ই, জ্যারেট তা যথার্থই অনুবাদ করেছেন। কেননা ভূমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাইরেও বিকল্প পদ্ধতিতে মোগল আমলে ভূমিরাজস্ব পরিশোধের সুযোগ ও ব্যবস্থা—দুটোই ছিল। সাধারণত কোনও এলাকায় সচরাচর যে জিনিস সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয় বা সহজলভ্য, পণ্য বিনিময় প্রথায় লোকজন সেটাকেই প্রধান অবলম্বন করতে চায়, এবং সেটাই স্বাভাবিক। মালওয়া সুবার 'গারহা'র ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। যেমন মধ্য যুগে বাংলার ভূমিরাজস্ব প্রধানত নগদ অর্থে প্রদান করা হতো। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে সিলেট অঞ্চলের রায়তরা অভাব বা অন্য যে কোনও কারণে নিজেদের সন্তানদের মোগল 'হারেম'-এ 'খোজা' হিশেবে পাঠাতে চাইতেন।[২৪২] হবিব নিজেও বলেছেন, 'মুসলিম অভিজাতদের হারেমের জন্য খোজাদের যে বিরাট বাজার ছিল, তার হিসেবে নিঃসন্দেহে এরা ছিল নগদ টাকার সমান।'[২৪৩] সুতরাং এই আমলে ভূমিরাজস্ব পরিশোধের বেলায় অঞ্চল ও অবস্থা বিশেষে নগদ অর্থ বা শস্যের পরিবর্তে হাতি, ঘোড়া বা অন্য কিছু প্রদানের চলও যে ছিল, তা ধারণা করা দোষের নয়। তবে এর চল ও প্রচলন এলাকা ছিল নিতান্তই সীমিত।

২৪১ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৫২।
২৪২ 'তুযুক-ই-জাহাঙ্গিরী', পৃষ্ঠা ৭১-৭২। সংগৃহীত হবিব, ঐ, পৃষ্ঠা ২৫৩।
২৪৩ মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৫৩।

যা হোক, আকবর-পরবর্তী মোগল শাসকদের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়কার এতদ সংক্রান্ত যে সব দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্র, ফরমান প্রভৃতি পাওয়া যায় তাতে প্রতীয়মান হয় যে, বরাবরের মতো—নগদ অর্থ ও শস্য—উভয় মাধ্যমে কৃষকরা তাদের প্রদেয় খাজনা পরিশোধ করতে পারতো। তবে রাষ্ট্রের প্রধান ঝোঁক ছিল নগদ অর্থ-মাধ্যমের প্রতি। এর কারণ আগেই বলেছি। ড. নোমান আহ্‌মদ সিদ্দিকী বলেন, 'আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষাংশে ও তাহার পরবর্তী যুগে যে-সকল তথ্য পাওয়া যায়, তাহা হইতে এই অনুমান দৃঢ় হয় যে সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলে সাধারণভাবে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদানের প্রণালী প্রচলিত ছিল। প্রশাসনিক পুঁথিপত্রে রাজস্ব নির্ধারণের যে সকল হিসাব নিকাশের খসড়া আছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, যে সকল অঞ্চলে কান্‌কুট ও ভাওয়ালি প্রথার প্রচলন ছিল, সেই সকল অঞ্চলেও সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব শস্যের হারে নির্ধারিত হইলেও ঐ পরিমাণ নগদ মুদ্রার বিনিময়ে স্থির করা হইত।'[২৪৪] এখন দেখা যাক, ঐ নগদ মুদ্রাটি আসলে কী ছিল। এক কথায় তা ছিল 'আলমগিরি মুদ্রা'। ভারতবর্ষের মুসলিম শাসকদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অনেক প্রতীকের মধ্যে অন্যতম দু'টি ছিল নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন ও খুতবা পাঠ। সম্রাট আওরঙ্গজেব যেহেতু সুদীর্ঘকালব্যাপী সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্রাধিপতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং স্ব নামে একাধিক মুদ্রার প্রচলন ঘটিয়েছিলেন, স্বভাবতই ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়-বাণিজ্যের লেন-দেন-এ তাঁর নামীয় মুদ্রাই বাজারে চালু ছিল। নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানে এটারই প্রাধান্য বা গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বাধিক। তবে অন্য মুদ্রাও রাজস্ব কর্মচারীদের কাছে অপাঙ্‌ক্তেয় ছিল না, যদিও এ বিষয়ে কিছু নিয়ম-কানুন উভয়পক্ষকে মানতে হতো। সম্রাটের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল (রসিকদাসকে লিখিত পত্র) : 'এই ব্যবস্থা করুন যাতে 'ফোতখানা' (কোষাগার)-র ফোতদার (কোষাধ্যক্ষ) সৌভাগ্যসূচক আলমগিরি মুদ্রাই কেবলমাত্র গ্রহণ করেন। অকুলানের সময়ে বাজারে চালু মুদ্রা শাহজহানী চলান (তদবধি প্রচলিত শাহজাহানের মুদ্রা) গ্রহণ, এবং 'সর্ফ-ই সিক্কা'-র 'অবওয়াব' (শুল্ক) আদায় করলেও যেন কখনোই কম গুরুত্বের মুদ্রা—যা বাজারে অপ্রচলিত, না নেন। তবে, যদি এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, দোষযুক্ত মুদ্রা ক্রমাগত বাতিল করতে থাকলে 'তহসিল'-এ (রাজস্ব সংগ্রহ) বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা, তখন যেন ন্যায্য বাটা নিয়ে (করদাতাদের) উপস্থিতিতে দোষযুক্ত মুদ্রাগুলিকে চালু মুদ্রায় বদলে নেন।'[২৪৫] বস্তুত এ ক্ষেত্রেও সম্রাট, রাষ্ট্র ও রায়ত—উভয়পক্ষেরই স্বার্থ চিন্তা করেছিলেন তা বলাইবাহুল্য।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, মোগল আমলে এ যাবৎ যে সকল তথ্য-প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে 'এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে নগদ মুদ্রায় রাজস্ব প্রদান প্রথাই সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। তবে স্থানীয় রীতি-নীতি ও প্রথা অনুযায়ী এবং কোন বিশেষ অঞ্চলের কৃষি-ব্যবস্থার ফলে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত এবং সেই সকল ক্ষেত্রে শস্যের হারে ('বা অন্য কোনও ভাবে') রাজস্ব প্রদানের সম্ভাবনাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেওয়া চলে না।'[২৪৬]

২৪৪ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৮।
২৪৫ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪০।
২৪৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৪৯।

ভূমিরাজস্ব আদায়ের সময় ও কিস্তি

কানকূট, বাটাঈ প্রভৃতি ফসল ভাগ প্রথা প্রচলিত এলাকায় ভূমিরাজস্ব যে কৃষকদের ফসল কাটার মৌসুমে উশুল করা হতো তা না বললেও চলে। বছরে মোটামুটি দু'বার এই আদায় কার্যক্রম চলতো। 'রবি' বা বসন্তকালীন শস্যের ক্ষেত্রে 'হোলি' (এই উৎসব সাধারণত মার্চ মাসে পড়তো[২৪৭]) এবং 'খরিপ' বা হৈমন্তিক শস্যের ক্ষেত্রে 'দাসেরা' (এটির শুরু হতো মূলত অকটোবরে[২৪৮]) উৎসবের সময় থেকে দু'পর্বে এই আদায় শুরু হতো। উল্লেখ্য পরবর্তীকালে যখন ভূমিরাজস্ব উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে ব্যাপকভাবে নগদ অর্থে গ্রহণের রাজকীয় তাগিদ শুরু হয়, তখনও যে সকল অঞ্চলে পূর্বোক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল এবং রাষ্ট্রীয় কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না, সেখানে 'হোলি' ও 'দাসেরা'র সময়েই আদায়ের কাজ চলতো। সচরাচর এর ব্যত্যয় ঘটতো দু'-এর অধিক উৎপাদনক্ষম ফসলের জমির ক্ষেত্রে। তখন তৃতীয় ফলনের সময় (খুব কম ক্ষেত্রে এটা ঘটতো) রাজস্ব কর্মচারীরা সরেজমিনে গিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের ভাগ বুঝে নিতো।

অন্যদিকে নগদ অর্থ মাধ্যমে আদায় প্রক্রিয়া রাজস্বের উচ্চহার বিশেষ করে রাষ্ট্রের ভাগের শস্যকে প্রচলিত মুদ্রায় পরিবর্তিতকরণ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ভয়াবহতার কারণে (এ ক্ষেত্রে কৃষককে উৎপন্ন শস্য বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হতো, এবং আগেই দেখিয়েছি যে, এতে অধিকাংশ সময়ই সে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, ফলে কৃষক স্বভাবতই গড়িমসি করতো) এককালীন সম্পন্ন হতো না। কৃষককে তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে কয়েকটি সহজ কিস্তির আশ্রয় নিতে হতো। রাষ্ট্রও তা মেনে নিতো। এই কিস্তির সাধারণ মাত্রা ছিল ৩টি। আওরঙ্গজেবের বিখ্যাত ফরমানের ৪সংখ্যক অধিনিয়মে বলা হয়েছে : 'জমা নির্ধারণের পর এমন ব্যবস্থা নিন যাতে 'নিয়ত' (পদ্ধতি) অনুসারে প্রত্যেক পরগণায় 'মাল'-ই ওয়াজিব' (পরিশোধ)-এর কিস্তি তৈরি হয়ে যায়। এ-ব্যাপারে (আমিল-দের) নির্দেশ দিন যাতে 'মহসুল' আদায় ঠিক সময়ে শুরু হয়, এবং নির্ধারিত মেয়াদ অনুসারেই চাহিদা পেশ করা হয়; এবং (সংগ্রহের) সাপ্তাহিক বিবরণী স্বয়ং দেখুন। এমন নির্দেশ দিন যাতে ধার্য কিস্তির কিছুই অনাদায়ী না থাকে। প্রথম কিস্তির একেকটি ভাগ একত্র না-করা গেলে সেটা দ্বিতীয় কিস্তির সঙ্গে যেন উসুল করা হয়, এবং তৃতীয় কিস্তিতে—কোনও বকেয়া না রেখে—পুরো আদায় করে নিতে হবে।'[২৪৯] তবে 'কৃষকের অবস্থা ও কর্মদক্ষতা অনুসারে' এই কিস্তির মাত্রা কখনও কখনও ৪ থেকে ৫, এমন কি ৬-এ গিয়েও দাঁড়াতো।[২৫০] প্রতি কিস্তিতে কী পরিমাণ ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করতে হবে সে ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে লিখিত চুক্তি হতো, এবং ইজারা দলিলগুলিতেও তার উল্লেখ থাকতো।[২৫১] সাধারণত নিয়মিত আদায়ের বেলায় পূর্বের পাওনা তথা বকেয়া আদায় শেষ

---

২৪৭ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৫৫; Dr. Keyamuddin Ahmad, Land Revenue in India, pp. 40.
২৪৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৫; pp. 40.
২৪৯ মধ্যকালীন ভারত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৯।
২৫০ দেখুন, 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ৪৯।
২৫১ ফারহাজ-ই-কারদানি, পৃষ্ঠা ৩৪ ক, খ; ৩৫ ক; দস্তুর-উল-আমাল-ই-বেকাস, পৃষ্ঠা ৬৭। সংগৃহীত 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ৪৯-৫৩।

হবার পর চলতি সনের আদায় শুরু হতো, এতে করে পূর্বাপর আদায় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকতো।[২৫২] কোনও রূপ অতিরিক্ত আদায় কোনও কারণে হয়ে থাকলে সেটিকে পরবর্তী বছরের আদায়ের সঙ্গে আনুপাতিক হারে সমন্বয় করা হতো।[২৫৩]

আমিল বা তার সহযোগী রাজস্ব কর্মচারীরা সরেজমিনে কৃষকদের কাছ থেকে সন ও কিস্তিওয়ারি রাজস্ব আদায় করে সরকারি 'ফোতাখানা'য় (কোষাগার) জমা দিতো। আবার কৃষকরাও সরকারি ফোতাদারের (খাজাঞ্চি) কাছে গিয়ে পূর্ব নির্ধারিত রাজস্ব যথা সময়ে পরিশোধ করতে পারতো।[২৫৪] উভয় ক্ষেত্রে রাজস্ব প্রদাতাগণ খাজনা পরিশোধ সংক্রান্ত সরকারি রসিদ পাওয়ার হকদার ছিল। তবে কোনও কারণে যদি তারা রসিদ না পেতো, এবং কৃষকের অভিযোগে রাজস্ব কর্মচারীদের দোষ বা গাফলতি প্রমাণিত হতো, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো। এক কথায় রাজস্ব প্রদানে 'bureaucratic harassments and over-right embezzlement'[২৫৫] থেকে শান্তিপ্রিয় রায়তগণকে রক্ষা করাই ছিল মোগল রাষ্ট্রের লক্ষ্য।

ভূমির শ্রেণীবিভাগীকরণ

সম্রাট আকবরের শাসনামলে ভূমিরাজস্ব নিরূপণের সুবিধার্থে সাম্রাজ্যের সকল ভূমিখণ্ডকে মোট ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল।[২৫৬] এই ধারা পরবর্তী মোগল সম্রাট যেমন জাহাঙ্গির, শাহজাহান, আওরঙ্গজেবের সময়েও অব্যাহত ছিল।[২৫৭] বিভাগগুলি হলো—(ক) পোলাজ, (খ) পরৌতি, (গ) চাচর ও (ঘ) বঞ্জর। 'আইন' থেকে জানা যায় সম্রাট এগুলির প্রতিটির জন্যই প্রদেয় রাজস্বের মাত্রা নির্দিষ্ট করেছিলেন।[২৫৮] 'পোলাজ' হলো সেই ধরনের ভূমি যাতে প্রতি বছরই চাষাবাদ হতো এবং একটার পর একটা ফসল উৎপাদিত হতো। এর বিশেষত্ব ছিল এটিকে কোনও অবস্থাতেই অ-কর্ষিত ফেলে রাখার অনুমতি দেয়া হতো না।[২৫৯] এর রাজস্বের হার ছিল এক-তৃতীয়াংশ[২৬০] বা অর্ধেক।

'পরৌতি' ভূমিতেও স্বাভাবিক চাষাবাদ হতো। তবে এর উৎপাদিকা শক্তি ধরে রাখার জন্য মাঝেমধ্যে তাতে চাষ-বিরতি দেয়া হতো। এই বিরতি একাধিক্রমে দু'বছরের অধিক সচরাচর হতো না। এর বিশেষত্ব ছিল যখন তা চাষের আওতায় আসতো তখন

২৫২ Mughal Polity, pp. 278.
২৫৩ Ibid., pp. 278.
২৫৪ Dr. Keyamuddin Ahmad, Land Revenue in India, pp. 41.
২৫৫ Ibid., pp. 41.
২৫৬ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 68.
২৫৭ Policies of the Great Mughals, pp. 15, 19; History of Jahangir, Dr. Beni Prasad, pp. 113; Aurangzeb & His Times, Dr. Faruki, pp. 455; The Wonder That Was India, Vol. II., pp. 186.
২৫৮ 'His Majesty had....classified the lands and fixed a different revenue to be paid by each.' (The Ain, Vol. II., pp. 68).
২৫৯ Ibid., pp. 68.
২৬০ Administration under the Mughals, pp. 129

তাতে রাজস্বের হার হতো 'পোলাজ'-এর অনুরূপ[২৬১], কিন্তু অনাবাদি সময়ের জন্য কোনও রাজস্ব দিতে হতো না।[২৬২] এখানে উল্লেখ্য যে, 'পোলাজ' ও 'পরৌতি'—এ দুই শ্রেণীর[২৬৩] ভূমির উৎপাদনকে আবার ভালো, মাঝারি ও মন্দ পর্যায়ভুক্ত করা হতো। বিঘা প্রতি এদের মোট উৎপাদনকে ৩ দিয়ে গড় করে তাকে $\frac{১}{৩}$ বা প্রচল হারে ভাগ করে রাষ্ট্রীয় পাওনা নিরূপণ করা হতো। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় হচ্ছে ভূমিরাজস্ব শস্যে বিভক্ত হলেও রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত মূল্য হারে তা নগদ মুদ্রায় পরিশোধে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করা হতো।[২৬৪] 'চাচর' ভূমিতে একবার চাষ হলে তা পরবর্তী ৩ বা ৪ বছর কর্ষণবিহীন ফেলে রাখা হতো। 'বঞ্জর' ভূমিও একবার চাষ হলে পরবর্তী প্রায় ৫ বা ততোধিক বছর পতিত পড়ে থাকতো। এই শেষোক্ত দু'শ্রেণীর ভূমি সাধারণত প্রায়ই বন্যাগ্রস্ত হতো অর্থাৎ এর ফসল নষ্ট হতো, ফলে চাষীরা তা চাষে অনাগ্রহী হতো, অথবা এটি হতো পাহাড়-জঙ্গলের ঢালু বা পাদদেশের জমি যেখানে চাষাবাদ ছিল কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল। সুতরাং কৃষকদেরকে তা চাষাবাদে উৎসাহী করার জন্য তাতে বিভিন্ন রকমের ছাড়ু দেয়া হতো। নাম-কা-ওয়াস্তে যেমন এর রাজস্ব গ্রহণ করা হতো, তেমনি কৃষকগণ ভূমিরাজস্ব পরিশোধের সময় তাদের পছন্দসই মাধ্যম—শস্য ও নগদ—বেছে নিতে পারতো।[২৬৫]

এক্ষণে উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মোগল আমলে বিশেষত এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট আকবরের শাসন-পর্বে এক কথায়, 'Land was classified according to continuity or discontinuity of cultivation and not on the modern principle of fertility or nature of the soil.'[২৬৬] পর্যালোচ্য যুগে স্থিত জনসংখ্যার তুলনায় মাথাপিছু ভূমির বরাদ্দ ছিল অধিক ও সহজলভ্য, এ কারণে ভূমি-ব্যবস্থাপনায় বর্তমানের নীতি-আদর্শ মধ্যযুগের রাষ্ট্রীয়-মালিকানার প্রেক্ষাপটে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় অনুসরণ করা একদিকে যেমন সম্ভব ছিল না, অন্যদিকে সত্য বলতে, এর প্রয়োজনও ছিল বলে মনে হয় না।

মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিশেষ কয়েকটি দিক

এ বিষয়ে আগেই বিভিন্ন আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু কিছু আভাস দেয়া হয়েছে। তথাপি আমাদের মনে হয় এগুলি আরেকটু নির্দিষ্ট ও বিশদভাবে বর্ণনা করা প্রয়োজন, না হলে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌলিক বাতাবরণ সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করা সহজতর হবে না। *এটা ঠিক যে মোগল রাষ্ট্র তার সার্বিক প্রশাসনিক ব্যয় ও অন্য সকল ধরনের খরচাদি নির্বাহের জন্য রাজস্ব আয়ের ওপরই নির্ভর করতো।* এবং এটা স্বাভাবিকও বটে। কিন্তু

২৬১ Parauti land when cultivated, pays the same revenue as Polaj.' (The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 72).
২৬২ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 276.
২৬৩ মিঃ পাওয়েল এই দুই শ্রেণীর সঙ্গে 'চাচর'কেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেখুন, 'The Land Systems', pp. 275, যদিও 'আইনে' দু'টিরই কথা বলা হয়েছে।
২৬৪ The Provincial Government of the Mughals, pp. 278.
২৬৫ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 73, 75.
২৬৬ Mughal Polity, pp. 277.

আজকে যেখানে আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্রের রাজস্ব আয়ের জন্য বিভিন্ন উৎসমুখ উন্মুক্ত এবং রাষ্ট্র ভূমি রাজস্ব ব্যতীত অন্য উৎসকে অবলীলায় প্রধান সূত্র হিশেবে বিবেচনা করছে, সেখানে মোগল রাষ্ট্রের সামনে বর্তমানে প্রচল বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উৎস থাকলেও মূলত ভূমিরাজস্বই ছিল তার প্রথম ও প্রধান আয়সূত্র।[২৬৭] স্বভাবতই বিভিন্ন শ্রেণীর রায়ত এবং তাদের উৎপাদিত ফসলই হতো তার মূল লক্ষ্য। যতো উৎপাদন, ততোই তার আয়। সর্বাবস্থায় রাষ্ট্র তাই চাইতো রায়তসাধারণ যে কোনও উপায়ে হোক অধিক সংখ্যক অনাবাদি ও পতিত ভূমিখণ্ড চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটাক এবং তাতে অপেক্ষাকৃত উন্নত জাতের ফসল উৎপাদন করুক। প্রসঙ্গত 'নিগরনামা-ই-মুনশি' নামীয় গ্রন্থের কথা বলা যায়। এ থেকে দেখা যায় 'রাজকর্মচারিদের ওপর (সম্রাট আওরঙ্গজেবের) সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, তাদের দায়িত্ব হলো নিজের এলাকায় এক টুকরো জমিও যাতে অকর্ষিত না থাকে তা দেখা এবং কৃষকদের ক্রমশ অপকৃষ্ট মানের শস্যের থেকে উৎকৃষ্ট মানের শস্য উৎপন্ন করতে উৎসাহ দেওয়া।'[২৬৮] উভয়পক্ষের স্বার্থ তথা রাজকোষের আয় যেন কোনও অবস্থায়ও কমে না যায়, বরং উত্তরোত্তর তার সমৃদ্ধি ঘটে, এবং অন্যদিকে রাজস্ব প্রদাতাশ্রেণী আপামর কৃষককূল ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে মোটামুটি সুখে-শান্তিতে কালাতিপাত করতে পারে, সেটাই হতো রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব নীতির মূল কথা। ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশির কথায় বলা যায়, 'The agrarian administration of the Moghul empire played no mean a part in keeping the peasant contented and happy.'[২৬৯] বস্তুত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় উপরোল্লিখিত নীতি-আদর্শের বাস্তবায়নে মোগল সম্রাটগণ রাজস্ব-প্রদাতা রায়তশ্রেণীকে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দিতেন সেটিই এখন আলোচনা করবো।

এক. আগেই বলেছি মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় আপৎকালে রায়তদের খাজনাই শুধু মওকুপ ও ঋণ ('তাকাবি') মঞ্জুর করা হতো না, উপরন্তু রাষ্ট্রীয় সহযোগিতার এই হাত তাদের আপদ-দুর্দশা ছাড়া অন্য সময়েও সমান ভাবে সম্প্রসারণের ব্যবস্থা ছিল।[২৭০] প্রয়োজনে রাষ্ট্রীয় খরচে লাঙ্গলও দেয়া হতো।[২৭১]

২৬৭ রাষ্ট্রীয় আয়ে ভূমিরাজস্বের প্রাধান্য কী বিপুল পরিমাণ ছিল তার একটি নমুনা তুলে ধরা যায় আওরঙ্গজেবের সময়ে সুবা গুজরাটের বাৎসরিক রাজস্ব আয় থেকে— ভূমিরাজস্ব ১ কোটি ১৩ লক্ষ রূপী, জিজিয়া ৫ লক্ষ রূপী ও সুরাট বন্দরের কাস্টম শুল্ক বাবদ ১২ লক্ষ রূপী (A Short History of Aurangzib, Sarkar, pp. 399).

২৬৮ দেখুন, 'মুঘলযুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ', ড. ভদ্র, পৃষ্ঠা ৫৩। ড. কেয়ামুদ্দিন আহমদও নিঃসন্দেহে বলেছেন, 'Extension of agricultural land and the increase of high grade crops were the two major objectives of the agrarian policy under the Mughals. Various devices aimed at the achievement of these objectives were incorporated in the system of land revenue administration.' (Land Revenue in India, p. 51).

২৬৯ The Administration of the Moghul Empire, pp. 179.

২৭০ Aurangzeb and His Times, pp. 456.

২৭১ মুঘল যুগে কৃষি-অর্থনীতি ও কৃষক-বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা ৫৬।

দুই. সাধারণত পাইকাস্ত, 'মুজারিয়ান' বা 'কলজানা' শ্রেণীর কৃষকেরা অর্থাভাবে যখন ভোগ-দখলাধীন ভূমি চাষ করতে সক্ষম হতো না, রাষ্ট্র তখন তার সেই ভূমি বা ভূমিখণ্ড অন্য অবস্থাপন্ন কৃষককে চাষের জন্য শর্তাধীন ইজারা দিতো। এক্ষেত্রে ফসল কর্তন শেষে শর্ত মোতাবেক ইজারাপ্রাপ্ত কৃষককে রাষ্ট্রের প্রাপ্য ছাড়াও মূল ভূম্যধিকারীকে কিছু ফসল প্রদান করতে হতো। পরবর্তী সময়ে অভাবী কৃষকের অবস্থার উন্নতি হলে সংশ্লিষ্ট ভূমি তাকে নিঃশর্ত ফেরৎ প্রদান করা হতো।

তিন. আগেই বলেছি রায়তগণ প্রদেয় রাজস্ব নগদ অর্থ ও উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীতে অর্থাৎ নিজস্ব পছন্দ মতো দু'ভাবেই দিতে পারতো। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য যদিও ছিল নগদ অর্থ মাধ্যমের প্রতি, তবে কোনও অবস্থাতেই রায়তদের ওপর কিছু জোর করে চাপিয়ে দেয়ার নীতিতে তার বিশ্বাস ছিল না। তবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রায়ত চাইলে নির্ধারিত খাজনা (প্রচলিত ভাষায় 'মুয়াজ্জফ') প্রদানের পথ পরিহার করে শস্য-ভাগ ('মুকাসিমা') পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারতো।

চার. জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটদের মধ্যে ভূমিরাজস্ব হারের আধিক্য ও নতুন করে 'জিজিয়া' আরোপের জন্য অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক বিশেষ করে হিন্দু লেখকদের রচনায় সম্রাট আওরঙ্গজেবকে প্রবল বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু কিছুটা কড়াকড়ি সত্ত্বেও তাঁরই আমলে যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় ন্যায়-নীতির পরাকাষ্ঠা স্থাপিত হয়েছিল যার প্রমাণ পাওয়া যায় মুহম্মদ হাশিমকে লিখিত সম্রাটের পত্রে, তার কোনও বিবরণ এই শ্রেণীর লেখকদের রচনায় পাওয়া যায় না।

যা হোক, পূর্বসূরীদের মতো আওরঙ্গজেব-এর সময়েও নগদ অর্থে ভূমিরাজস্ব প্রদানকারী কৃষকগণ যখন তাদের ক্ষেতখামারের শস্য বন্যা-খরা ইত্যাকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত হতো, অন্যদের (শস্য-ভাগীদের) মতো তারাও আনুপাতিক হারে খাজনা মওকুপের সুযোগ পেতো। কিন্তু মুহম্মদ হাশিমকে লেখা সম্রাটের সংশ্লিষ্ট ফরমানে আনুপাতিক হার প্রয়োগের সীমারেখায়ও আওরঙ্গজেব এমন নীতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন যা আপাত দৃষ্টিতে রাজকোষের জন্য ক্ষতিকর মনে হলেও চূড়ান্ত বিচারে রাষ্ট্রের জন্যই ছিল অনুকূল। বস্তুত যে রায়ত তথা মানবশ্রেণীকে নিয়ে রাষ্ট্র, তারই স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার মধ্য দিয়ে সম্রাট এ ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির বিজয় ঘোষণা করেছিলেন। ফলত এতে তাঁর মহানুভবতারও প্রকাশ ঘটেছিল। ফরমানে নির্দেশিত দেখা যায় যে সব এলাকায় বিঘাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ গড়ে ১০ মণ এবং ভূমিরাজস্বের হার $\frac{১}{২}$ ভাগ; প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হয়তো রায়ত সেখানে ফসল পেলো মাত্র ৬ মণ। স্বাভাবিকভাবে এতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য হওয়া উচিত ৩ মণ। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রীয় আইন বা অভ্যস্ততা যাই বলা হোক না কেন, এ ক্ষেত্রে রায়ত ঐ পরিমাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ন্যায়পরায়ণ সম্রাট আদেশ দিয়েছিলেন এই ধরনের রায়তের কাছ থেকে মাত্র ১ মণ গ্রহণ করতে। সুতরাং দেখা যায় নির্ধারিত গড় উৎপাদনের মাত্রা ১০ মণের অর্ধেক হিশেবে রায়তের প্রাপ্য তিনি ঠিকই রেখেছিলেন, ক্ষতির দিকটা (দ্বিগুণ পরিমাণ, ২ মণ ছেড়ে দিয়েছেন, ইচ্ছে করলে পুরো ৩ মণ-ই তিনি দাবি করতে পারতেন) রাষ্ট্রের কাঁধে বহন করেছিলেন।[২৭২]

২৭২ দেখুন 'Studies in Mughal India' সংগৃহীত, Aurangzeb and His Times, pp. 456.

পাঁচ. 'নগদি' রায়ত খাজনার আওতাধীন ভূমি চাষাবাদের আগে মৃত্যু বরণ করলে এবং সংশ্লিষ্ট ভূমি বা ভূমিখণ্ড উত্তরাধিকারীদের ওপর বর্তানো সত্ত্বেও তারা যদি তা চাষের জন্য পর্যাপ্ত সময় না পেতো, তবে তা ঐ বছরের জন্য খাজনামুক্ত ধরা হতো।[২৭৩]

ছয়. রায়তগণ (প্রধানত 'খুদকাস্ত') যেমন রাষ্ট্রীয় অনুমতি ক্রমে নিজস্ব ভোগ-দখলাধীন 'জমি বিক্রি ও হস্তান্তর করার'[২৭৪] অধিকারী ছিল, তেমনি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তারা তা ভাড়া খাটাতে ও বন্ধক রাখতে পারতো।

সাত. মোগল যুগে বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের সময়ে অধিক হারে (উৎপাদনের $\frac{১}{২}$ ভাগ মূলত উর্বর এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল) রাজস্ব ধার্য করা হলেও কার্যত প্রায় কোনও অবস্থাতেই খাজনা অনাদায়ের কারণে রায়তকে তার আবাসভূমি থেকে উচ্ছেদ বা উৎখাত করা হতো না। বরং আওরঙ্গজেবের নীতি ছিল কোনও কারণে ভূমি ছেড়ে চলে যাওয়া রায়তকে তার স্বস্থানে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা ও কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্রবিত করা।

পরিশেষে বলতে পারি যে উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহের প্রায় 'কোনটাই নতুন না হইলেও সুদক্ষ ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনযন্ত্রের দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হইলে তাহাদের সমবেত ফলাফল (যে) মোটেই নগণ্য ছিল না'[২৭৫]—সেটাই আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে মোগল যুগের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করবো।

২৭৩ *Aurangzeb and His Times*, pp. 456-57.

২৭৪ তবে এই জাতীয় অধিকার প্রয়োগের নিদর্শন খুবই বিরল। যেটুকু হতো তা 'খুদকাস্ত' শ্রেণীর রায়তেরাই করতো

২৭৫ *মুঘল দরবারে দল ও রাজনীতি*, ড. সতীশচন্দ্র, পৃষ্ঠা ৮।

সপ্তম অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব প্রশাসন (মোগল আমল)

সুলতানি শাসনামলের ন্যায় মোগল পর্বেও সমগ্র সাম্রাজ্য ছিল কতকগুলি প্রশাসনিক একক বা ইউনিটে বিভক্ত। মূলত ভূমিরাজস্ব নিরূপণ এবং তা যথামাধ্যমে নিয়মিত আদায়ের লক্ষ্যে পূর্ববর্তী সুলতানদের বিশেষত লোদি বংশীয় শাসকগণ ও সম্রাট শেরশাহের অনুসৃত প্রশাসনিক অবকাঠামোর ওপরই ভিত্তি করে আকবর এই ব্যবস্থা অত্যন্ত সফলভাবে চালু ও বিভিন্ন স্তরে প্রয়োগ করেছিলেন। তবে সত্যি বলতে স্থিত ব্যবস্থাকে মোগল সম্রাট আরও সুবিন্যস্ত, মজবুত ও কেন্দ্রানুগ করেন। এডওয়ার্ড ও গ্যারেট যথার্থই বলেছেন, 'The principles and system of Mughal administration in the sixteenth and seventeenth centuries were mainly the product of the genious of Akbar,...'[১]

আকবর-পরবর্তী মোগল সম্রাটগণ বিশেষ করে জাহাঙ্গির, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেব মূলত তাঁর রেখে যাওয়া ব্যবস্থাটিকেই যুগের প্রয়োজনে সামান্য কিছু পরিবর্তন-সংযোজন ও সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রায় সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।[২] মোগলদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনা তাই একার্থে সম্রাট আকবর এর সময়কার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার আলোচনা বললে অত্যুক্তি হয় না।[৩]

এ অধ্যায়ে আমরা এখন জ্যেষ্ঠ মোগলদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করবো। উল্লেখ্য মধ্যবাংলা যেহেতু মোগল সাম্রাজ্যের একটি অন্যতম বৃহৎ ও ঘটনাবহুল সুবা বা প্রদেশ ছিল, এবং পর্যালোচ্য বিষয়ের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপকতা পরিহার করা প্রয়োজন, সেহেতু আমরা এখানে মোগলদের প্রাদেশিক স্তরের ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট থাকবো। তবে মূল আলোচনায় অনুপ্রবেশের আগে সামগ্রিক মোগল প্রশাসন সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা জরুরি বলে মনে করি।

প্রথমত প্রকৃতিগতভাবে মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল একনায়কতান্ত্রিক। ক্ষমতাসীন সম্রাট ছিলেন এর মূলস্তম্ভ এবং প্রকৃত ক্ষমতার উৎস; বস্তুত তাঁকে কেন্দ্র

১ Mughal Rule in India, pp. 158.

২ ড. রিজভি বলেন, 'In the reign of Akbar's successors the revenue rates were revised from time to time, but the broad framework evolved under Akbar remained the same.' (The Wonder that was India, pp. 186).

৩ ড. ইবনে হাসান বলেন, 'Akbar's reign is a period of evolution and development of all the institutions which can be termed Mughal.' (The Central Structure of the Mughal Empire, pp. 124).

করেই সবকিছু আবর্তিত ও পরিচালিত হতো। সম্রাটের মুখ নিঃসৃত আদেশই ছিল আইন। মোগল আমলের অন্যতম ইতালীয় পরিব্রাজক দ্য লায়েট-এর ভাষায় বলতে পারি, 'The (Mughal) Emperor of India is an absolute monarch. There are no written laws : the will of the Emperor is held to be law.'[৪] এই প্রেক্ষাপটে শাসক-শ্রেণীর চরিত্র স্বাভাবিকভাবেই হওয়ার কথা অত্যাচারী ও জনগণের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনকারী। কিন্তু মোগল সম্রাটগণ প্রত্যেকেই একনায়ক হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবে তাঁরা ছিলেন জনকল্যাণকামী। ড. পরমাত্মা সরণ বলেন, 'Thus the Mughal government —from the time of Akbar, at any rate— was conceived in a spirit of benevolence, and in the attitude of a parent. The King regarded the subjects as his children and hence felt himself responsible for their safety, health, happiness and progress.'[৫]

দ্বিতীয়ত মোগল প্রশাসন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই স্তরে বিভক্ত ছিল।[৬] এর কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির ওপর সম্রাটের সরাসরি তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু প্রাদেশিক স্তরের বিভিন্ন বিভাগসমূহের ওপর তাঁর কোন প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তবে এর অর্থ এই নয় যে প্রাদেশিক প্রশাসন ছিল স্বাধীন ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। বরং উল্টোটাই সত্য। কেন্দ্রীয় প্রশাসন একে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ ও ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থ বলেন, 'The Central Government controlled the provincial machinery by dividing the authority, by reducing the duration of the office of the Subahdar, and by frequent transfers. It kept itself informed of what happened in the provinces by means of news-reporters, in public as also in secret.'[৭] সকল প্রকার অঞ্চলাধিকারী তথা স্থানীয় শাসক-রাজন্যবর্গ, ভূঁইয়া বা জমিদার প্রভৃতির ওপর সম্রাটের ছিল একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দিওয়ান বা উজিরের মাধ্যমে প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের যাবতীয় কার্যক্রমের ওপর তিনি 'a close and strict supervision upon all matters regarding agriculture.' জারি রাখতেন। ফলত পরবর্তী আলোচনায় আমরা বেশ তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবো যে বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে এক ধরনের অলিখিত ভারসাম্যপূর্ণ দ্বৈত কর্তৃত্বই ছিল প্রাদেশিক শাসন-কাঠামোর আন্তর বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়ত সাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তৃতি বা বিশালতা এবং এই সূত্রে অঞ্চল বিশেষের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব ও জনচিত্তের নানা চাহিদা মোগল প্রশাসনকে সর্বত্র কোন একক ও নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে দেয়নি। ড. উপেন্দ্রনাথ দে বলেন,

৪ The Empire of the Great Mogol : De Laet's Description of India and Fragment of Indian History, pp. 93.

৫ The Provincial Government of the Mughals, pp. 153-54.

৬ A History of India : From the Earliest Times to the Present Day, Michael Edwardes, pp. 171.

৭ History of India, pp. 381-82. Also see, A History of India, Dr. N.K. Sinha & N.R. Ray, p. 323

'DISTINCT CHARACTERISTICS in the topography of the sub-continent of India pose diverse administrative problems which necessitate varied solutions to meet them. The vastness of the area and the diversity of the problems made the application of any uniform pattern in all its details to the entire land simply impracticable'.[৮] সত্যি বলতে, 'The Mughal empire was by no means a homogeneous political entity. In some parts of it, the imperial fiscal system was excluded by the prerogative of local chiefs and land-holders.'[৯] ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়করণে এই সব স্থানীয় রাজন্যবর্গ ও ভূম্যধিকারীগণ নিজস্ব প্রশাসনিক পদ্ধতি অবলম্বন করলেও তাঁরা মূলত রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শের বাইরে যেতে পারতো না। ফলে এদের অনুসৃত প্রথাপদ্ধতির বাইরে আমরা এখানে সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি 'খালিশা'-এর ক্ষেত্রে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করবো।

চতুর্থত ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মোগল রাজত্বের শুরু থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত জ্যেষ্ঠ মোগলদের প্রশাসনিক যন্ত্রের যে বিভাজন ও তাতে কর্মরত বিশাল কর্মচারীমণ্ডলের যে স্তর-বিন্যাস লক্ষ্যগোচর হয়, সেগুলিকে মোটামুটি ৩টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। ড. সুলেখ চন্দ্র গুপ্ত-এর ভাষায়, 'The machinery of revenue collection under the Mughals, consisted of several layers of intermediaries, bearing different names, ranks and designations..........There were thus three distinct cadres in the revenue administration of the Mughals, viz, (1) full-fledged officials of the imperial administration, who were used both to assist and control the assignees, (2) the officials and agents of the assigness, and (3) the permanent local officials, partly hereditarty and partly subject to imperial authority and unaffected by transfers of assigness.'[১০]

প্রশাসনিক স্তরবিন্যাস

সমগ্র মোগল সাম্রাজ্য মূলত 'সুবা' বা প্রদেশ এবং প্রদেশসমূহ কয়েকটি 'সরকার'-এ, সরকার কয়েকটি 'পরগণা'য় এবং পরগণাসমূহ কতকগুলি 'গ্রাম' বা 'মৌজা'য় বিভক্ত ছিল।[১১] এটি ছিল প্রশাসনের সাধারণ ক্রম-বিন্যাস। কখনও কখনও এই পরিকাঠামোর

৮ The Mughal Government, pp. 67.
৯ Mughal Kingship and Nobility, Dr. Ram Prasad Khosla, pp. 294.
১০ Agrarian Relations and Early British Rule in India, p. 17-19.
১১ A Short History of Hind-Pakistan, Pakistan History Board, pp. 259; Akbar The Greatest Mogul, S. M. Burke, pp. 157; Mughal Polity, Dr. Sarkar, pp. 142; The Wonder that was India, Dr. Rizvi, pp. 194. পরগণাকে 'মহাল'ও বলা হতো (Akbar The Great Mogul, Smith, pp. 269; From Akbar to Aurangzeb, Moreland, pp. 247; The Mughal Empire, S.M. Jaffar, pp. 146; The Provincial Government of the Mughals, Dr. Saran, pp. 192). গ্রাম ও মৌজাকে

ভিতোরেই আকবর-পরবর্তী জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটগণ পরীক্ষামূলকভাবে কিছুটা পরিবর্তন আনলেও কালের বিচারে তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি, বা অন্য কথায় অব্যবহিত পরবর্তী সম্রাট তা অক্ষুণ্ন রাখা সমীচীন মনে করেননি। সুতরাং আমরা বলতে পারি উপরিউক্ত ক্রম-বিন্যাসই ছিল স্বাভাবিক, অধিক ও সর্বত্র প্রচল প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

এ পর্যায়ে প্রথমেই আমরা 'সুবা' বা প্রাদেশিক প্রশাসন নিয়ে আলোচনা করবো।

সুবা বা প্রদেশ

কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সুবা-ই ছিল সর্ববৃহৎ প্রশাসনিক ইউনিট। সম্রাট আকবর থেকেই মূলত মোগল সুবা ব্যবস্থার শুরু। কেননা তাঁর পূর্ববর্তী জ্যেষ্ঠ দুই মোগল সম্রাট বিশেষ করে বাবর-এর শাসনকালে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিম্নস্থ বিভাগগুলিকে সুবা-র বদলে 'সরকার' নামে অভিহিত করা হতো। তৎকালীন মোগল অধিকৃত এলাকাসমূহকে তিনি মোট ২২টি 'সরকার'-এ বিভক্ত করেছিলেন বলে জানা যায়।[১২] তিনি বলা যায় লোদি শাসকদেরই ব্যবস্থা অব্যাহত রেখেছিলেন।[১৩] সম্রাট হুমায়ুন ও সম্রাট শেরশাহের সময়েও সরকার ব্যবস্থা বহাল ছিল, যদিও শেষোক্ত শাসকের স্বর্ণযুগে তা আরও বিস্তৃত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুদৃঢ় রূপ পরিগ্রহ করে। আকবর সামগ্রিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যস্ত করে সুবা চালু করেন। প্রসঙ্গত সুলতানি যুগের 'ইক্তা' (প্রদেশ)-এর সঙ্গে সুবার মৌলিক পার্থক্য নির্দেশ করা জরুরি। দু'ভাবে এই পার্থক্য চিহ্নিত করা যায়। এক. অবকাঠামোগত, ও এর ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণের দিক, এবং দুই. স্থানীয় প্রশাসনের কর্ম-বিভাজন দ্বারা। আয়তনের দিক থেকে সুলতানি যুগের ইক্তা-ইকলিম বা বাবরের সময়কার 'ওয়াজ' প্রভৃতি যেমন অতি ক্ষুদ্র আকারের ছিল, তেমনি অতি বৃহৎ ধরনেরও ছিল। তবে এগুলির ওপর বিশেষ করে বৃহৎ ইক্তা-ইকলিমের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল খুব শিথিল প্রকৃতির। বস্তুত রাষ্ট্র এদের কাছ থেকে বার্ষিক/এককালীন কিছু রাজস্ব ও প্রয়োজনের সময়ে সৈন্য-সহযোগিতা পেলেই সন্তুষ্ট থাকতো। ফলে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ-শিথিলতার কারণে ইক্তাদার-ওয়াজদারগণ অনেক সময় স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতো। কিন্তু মোগল সুবা প্রশাসনে রাষ্ট্রীয় কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কারণে কর্মচারীদের পক্ষে স্ব স্ব নির্ধারিত কর্ম-সীমার বাইরে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ ছিল নেহায়েতই কম, প্রায় ছিলই না বলা যায়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, রাষ্ট্রীয় রক্ত চক্ষু এড়িয়ে সুযোগসন্ধানী কর্মচারীরা কখনও কখনও তা হতো না। অন্যদিকে সুবা ব্যবস্থার সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় যেটি অর্থাৎ দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ক্ষমতার স্পষ্ট বিভক্তিকরণ এবং বিদ্যমান সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের স্বৈরাচারী হওয়া রোধের জন্য উভয়ের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রতিষ্ঠা যেটি সুলতানি আমলে প্রায় অনির্দেশ্য, তা মোগল সুবা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর বলে বিবেচিত হয়েছিল। সুতরাং এই দিক থেকে বিচার করলে এটা

'দিহ'ও বলা হতো (The Administration of the Moghul Empire, Dr. Qureshi, pp.227).

১২ Babur : Founder of the Mughal Empire in India, Dr. Mohibbul Hasan, pp.168.

১৩ Ibid., pp. 168.

বলতেই হবে যে, আকবরের সুবা ব্যবস্থা ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ইতোপূর্বে প্রচলিত প্রাদেশিক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নতুন সৃষ্টি। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ তাই যথার্থই বলেছেন, 'There was no provincial administration in the Mughal sense before Akbar.'[১৪] শুধু তাই নয়, সত্যি বলতে আকবরের কাল থেকেই, 'The Mughal Empire manifested a higher political organization than had previously existed in India.'[১৫]

আকবরই প্রথম ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে[১৬] গোটা সাম্রাজ্যকে প্রথমে ১২টি সুবা'য় বিভক্ত করেন, এবং পরবর্তীকালে আহমদনগর বিজিত হলে (১৬০০ খ্রিঃ) সুবা-সংখ্যা ১৫টিতে উন্নীত করেন। এখানে একটা কথা বলা দরকার যে সম্রাট আকবর যখনই কোন অঞ্চল বা রাজ্য জয় করতেন, তখন তাঁর প্রাথমিক চিন্তা ও কর্তব্য হতো সংশ্লিষ্ট এলাকায় যত দ্রুত সম্ভব একটি কেন্দ্রীভূত সমান্তরাল প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা। অতঃপর তদুদ্দেশ্যে যা যা করার দরকার তিনি করতেন। ড. আশিরবাদি লাল শ্রীবাস্তব বলেন, 'Akbar invariably followed the policy of giving an organised administration to his conquests. As soon as a principality or a province was reduced to submission, he took steps to establish therein complete order and peace, and to appoint civil officers to carry out a revenue settlement which was based on the principles of measurement and classification of land.'[১৭] আকবরের যুগ পর্যন্ত মোগলদের যে ১৫টি সুবার কথা জানা যায় সেগুলি হলো— (১) এলাহাবাদ (২) আগ্রা (৩) আউধ (অযোধ্যা) (৪) আজমির (৫) গুজরাট বা আহমদাবাদ (৬) বিহার (৭) বাংলা (৮) দিল্লি (৯) কাবুল (১০) লাহোর (১১) মুলতান (১২) মালওয়া (মালব) (১৩) বেরার (১৪) খান্দেশ ও (১৫) আহমদনগর।[১৮] উল্লেখ্য, 'আইন'-এ আহমদাবাদ ও আহমদনগরের নাম পাওয়া যায় না। সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে নতুন সুবা হিশেবে কাশ্মির ও কান্দাহার যুক্ত হয়ে এ সংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৭টিতে।[১৯] সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে সুবার সংখ্যা

১৪ A Short History of Muslim Rule in India, pp. 321; The Mughal Empire, pp. 320.

১৫ The Mughal Empire, S.M. Jaffar, pp. 382.

১৬ মিঃ বার্ক বলেন, 'In 1580 the revenue system as well as the provincial and local administration of the Empire were thoroughly reorganized and placed on a permanent footing.' (Akbar The Greatest Mogul, pp. 157) বার্কের উল্লিখিত ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দ এর সঙ্গে ড. তপন রায়চৌধুরী কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'In November, 1586 Akbar introduced uniform subah administration throughout his empire.' (Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 50).

১৭ Akbar The Great, Vol. I., chapter 20.

১৮ The Revenue Resources of the Mughal Empire in India, Edward Thomas, pp. 12-13; The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 320, fn.; The Mughal Government, Dr. Day, pp.68.

১৯ History of Jahangir, pp. 93; Mughal Polity, pp. 140.

হয় ২২টি।[২০] নবগঠিত ৫টি সুবা হলো —(১) থাট্টা (সিন্ধু) (২) বলখ (৩) বাদাখশান (৪) তেলিঙ্গানা (বালাঘাট) ও (৫) বাগলানা। এছাড়া আহমদাবাদের নতুন নামকরণ করা হয় দৌলতাবাদ। তবে বলখ ও বাদাখশান খুব স্বল্পকালের জন্য সুবা ছিল। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেব সুবাগুলিকে পুনর্গঠিত করে ২১টিতে সীমাবদ্ধ করেন। এগুলির পরিচয় পূর্বে দেয়া হয়েছে। আগেই বলেছি যে মোগল আমলে সুবা'ই ছিল সর্বোচ্চ প্রশাসনিক একক (Highest Administrative Unit). সুবাগুলির পরস্পরের মধ্যে আয়তনগত বিস্তর পার্থক্য ছিল। বৃহৎ সুবাগুলির মধ্যে যেমন বাংলার (ওড়িশা ব্যতীত) আয়তন ছিল ৮৮,০০০ বর্গ ক্রোশ, মুলতানের (সিন্ধু বা থাট্টা ব্যতীত) ৪৩,৫২৪ বর্গ ক্রোশ। অন্যদিকে বিহারের ১৩,২০০, অযোধ্যার ১৫,৫২৫, লাহোরের ১৫,৪৮০, খান্দেশের ২,৮৫০ বর্গ ক্রোশ ইত্যাদি।[২১] আয়তনের এই বিভিন্নতা ও ব্যাপক পার্থক্য সত্ত্বেও সুবাগুলিতে প্রশাসনিক যে অবকাঠামো ছিল তা প্রায় সর্বত্রই একই রকমের ছিল বলা যায়। এক কথায় এগুলি ছিল কেন্দ্রীয় প্রশাসনযন্ত্রের ক্ষুদ্রাকার কিন্তু অবিকল প্রতিরূপ। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের ভাষায় 'The Subah was a replica of the empire in every respect.'[২২] আরও নির্দিষ্ট করলে বলা যায় যে মোগল প্রশাসনযন্ত্রের কেন্দ্রে যে সকল দপ্তর সরকারের বিভিন্নমুখি কাজ-কারবার করতো তার প্রত্যেকটিরই একটি করে অনুবিভাগ প্রাদেশিক স্তরে কাজ করতো।[২৩] অনুবিভাগের রাজকর্মচারীগণ স্ব স্ব বিভাগের কেন্দ্রীয় প্রধানের মাধ্যমে সম্রাটের নিকট দায়বদ্ধ ছিল। সম্রাটের যে কোন আদেশ-নিষেধ তথা রাষ্ট্রীয় বিধিবিধান কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগীয় প্রধানদের দ্বারা সুবাস্থ অনুবিভাগগুলিতে সরাসরি প্রেরিত হতো এবং তদনুযায়ী প্রাদেশিক প্রশাসনের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালিত হতো। এ সব কাজকর্মের অগ্রগতির প্রতিবেদন তারা নিয়মিত কেন্দ্রে প্রেরণ করতো।

যা হোক, এ পর্যায়ে আমরা মোগল সুবা প্রশাসনের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনা, সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান রাজ-কর্মচারী তথা 'সুবাদার' ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে কোন-না-কোনভাবে জড়িত কর্মচারীবর্গের ভূমিরাজস্ববিষয়ক কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করবো।

সুবাদার

'আইন'-এর ভাষায় 'সুবাদার' ছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি বা 'the vicegerent of His Majesty.'[২৪] লিখিত রাজকীয় ফরমান ('ফরমান-ই-সাবাত্তি') বলে তিনি সম্রাট কর্তৃক

---

২০ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 123.

২১ তথ্য সংগ্রহ The Ain-I-Akbari, Vol. II.

২২ A Short History of Muslim Rule in India, pp. 322; The Mughal Empire, pp. 320. আরও দেখুন, Akbar The Great Mogul, pp. 275; Mughal Rule in India, Edwardes & Garrett, pp. 200.

২৩ স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'The Administrative agency in the provinces of the Mughal was an exact miniature of that of the Central Government.' (Quoted from Mughal Rule in India, Dr. Mahajan, pp. 257).

২৪ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 37.

সরাসরি নিযুক্ত হতেন।[২৫] সচরাচর তিনি হতেন সম্রাটের অতিপ্রিয়ভাজনদের একজন, প্রবল অনুগত, বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী ও রাজকীয় প্রশাসনের কাজকর্মে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনসবদার। ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন, সুবাদার 'Usually selected from high mansabdars of character, integrity, qualifications and experience, who were able military officers and also possessed executive ability,...'[২৬] অনেক সময় রাজ-পরিবারের সদস্যরাও সুবাদার নিযুক্ত হতেন।[২৭] নিযুক্তির পরপরই তাকে সম্রাটের পক্ষ থেকে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা (Guideline) দেয়া হতো যাতে লিখিত থাকতো— 'the responsibilities and the scope of the governor's work, contained advice as to his private and public conduct and instructions as to the method of work.'[২৮] এই লিখিত নির্দেশিকানুযায়ী সুবাদারকে দায়িত্ব পালন করতে হতো। এর কোনরূপ ব্যত্যয় হলে তাকে শুধু সম্রাটের কাছে জবাবদিহিতাই করতে হতো না, উপরন্তু তাৎক্ষণিক বদলি, এমন কি দৈহিক শাস্তিও পেতে হতো।

মোগল শাসনতন্ত্র প্রকৃতিগতভাবে যেহেতু ছিল সেনা-আমলানির্ভর, তাই প্রথম দিকে সম্রাট আকবর সুবাদারের আনুষ্ঠানিক পদবি নির্ধারণ করেন 'সিপাহ-সালার' (Commander of the Forces)[২৯]। এই পদবি থেকেই বোঝা যায় তার প্রাথমিক দায়িত্ব ছিল সুবা বা প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং তন্নিমিত্ত সৈন্য পরিচালনা ও জনসাধারণের দেখভাল। 'আইন'-এ তার দায়িত্ব-কর্তব্যের বিস্তৃত ফিরিস্তি দেয়া হয়েছে। আমরা শুধু এখানে এটুকু উদ্ধৃত করতে পারি : 'The troops and people of the provinces are under his orders and their welfare depends upon his just administration.....He must never lay aside the consideration of the people's prosperity...'[৩০] পরবর্তীকালে বিভিন্ন মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে সিপাহসালার পদবি পরিবর্তিত হয়ে কখনও 'সাহিব-ই-সুবা', কখনও 'নাজিম-ই-সুবা'[৩১] অথবা শুধুই 'নাজিম'[৩২], আবার কখনও 'সুবাদার' বা সংক্ষেপে শুধু 'সুবা'[৩৩] ইত্যাদিতে দাঁড়ায়। বলাবাহুল্য শেষোক্ত নামকরণে পদ ও পদবি একাকার হয়ে গিয়েছিল। যা হোক, সুবার ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সাথে তথা

২৫ The Provincial Government of the Mughals, pp. 163; Mughal Polity, pp. 143; The Mughal Government, pp. 71.
২৬ Mughal Polity, pp. 143.
২৭ H. G. Rawlinson বলেন, 'He (Subadar) was always a great noble, or a member of the Imperial family.' (A Concise History of the Indian People, pp. 181).
২৮ The Mughal Government, pp. 71.
২৯ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 37.
৩০ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 37-8.
৩১ The Administration of the Moghul Empire, pp. 228.
৩২ A History of India, Drs. Sinha & Ray, pp. 323; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 36; The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 123; Administration under the Mughuls, p.221.
৩৩ The Mughal Government, pp. 71; Mughal Polity, 143.

রাজস্ববিষয়ক কাজকর্মের সঙ্গে সুবাদারের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় আমরা এখানে তার ব্যাপক কর্মযজ্ঞ নিয়ে আলোচনা না করে প্রসঙ্গ বিবেচনায় শুধু এটুকু বলতে পারি যে, সুবাদার প্রাদেশিক 'দিওয়ান'-এর প্রয়োজনে বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রমে অনেক সময় সৈন্য সরবরাহ করে ও ভূমিরাজস্ব প্রদানে অনিচ্ছুক ও বিদ্রোহী ধরনের রায়তদের দমন করে সরকারের রাজস্ববিষয়ক নীতি-আদর্শের বাস্তবায়নে পরোক্ষ সহযোগিতা করতেন। ফলে প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসন কিছুটা হলেও তার ওপর নির্ভরশীল ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না।

দিওয়ান

প্রাদেশিক প্রশাসনে 'দিওয়ান' ছিলেন সুবাদারের পরবর্তী সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি এবং ভূমিরাজস্ব বিষয়ের সর্বেসর্বা।[৩৪] কোন কোন ঐতিহাসিক তাকে প্রদেশের 'Second officer'[৩৫] রূপে আখ্যায়িত করলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি ছিলেন সমকক্ষদের মধ্যে দ্বিতীয় (Second among the equals). ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সম্রাট আকবরের প্রাদেশিক সরকারে প্রশাসনিক গুরুত্বের দিক দিয়ে তিনি যদিও ছিলেন সুবাদারের অধীন[৩৬], কিন্তু পরবর্তী সময়ে তার অবস্থান হয় সুবাদার থেকে ঈষৎ নিম্ন-পদের (Inferior) বা 'next to the Subahdar in official rank'[৩৭] ; তবে কোন অবস্থাতেই সুবাদারের অধীনে ছিলেন না—'not in any way under his control'[৩৮] । ষোড়শ শতকের শেষ দিকে সামগ্রিক মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দিওয়ানের গুরুত্ব ও কাজের পরিধি এতো বেড়ে যায় এবং তার প্রভাব ও স্বাধীনতা সম্প্রসারিত হয় যে, দিওয়ানকে তা প্রায়শই সুবাদারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শক্রতে পরিণত করতো। কেন্দ্রীয় দিওয়ান-এর[৩৯] পছন্দে ও সুপারিশে (হাকিকাত) ক্ষমতাসীন সম্রাট প্রাদেশিক সরকারের দিওয়ান নিযুক্ত করতেন।[৪০] প্রসঙ্গত একটি বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, জ্যেষ্ঠ মোগলদের বিশেষ করে আকবরের সময়কার

৩৪ Murshid Quli Khan & His Times, Dr. A.Karim, pp. 65; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 52.

৩৫ The Mughal Government, pp. 75; Medieval History of India, pp. 259.

৩৬ Mughal Polity, pp. 146-47. এমন কি ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত সুবাদারই তাকে বাছাই করতেন (The Mughal Empire, Dr. Prasad, p. 321.)

৩৭ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 136.

৩৮ Ibid., pp. 136.

৩৯ কেন্দ্রীয় দিওয়ানকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদবিতে অভিহিত করা হতো। যেমন সম্রাট আকবরের সময়ে সাধারণত 'উজির' বা 'ওয়াজির', জাহাঙ্গিরের সময়ে প্রায় একইভাবে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে 'দিওয়ান-ই-কুল' (The Central Structure of the Mughal Empire, 148). এছাড়াও ছিল 'দিওয়ান-ই-আলা', 'দিওয়ান-ই-আশরাফ' প্রভৃতি।

৪০ Mughal Polity, pp. 147; The Mughal Government, pp. 75; Mughal Rule in India, Dr. Mahajan, pp. 258; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩। উল্লেখ্য, যে আদেশে প্রাদেশিক দিওয়ান নিযুক্ত হতেন তাকে বলা হতো 'পরওয়ানা-ই-খিদমাত-ই-দিওয়ানি' (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৬৫।

কেন্দ্রীয় দিওয়ানগণ এতো দক্ষ, কর্মঠ, রাজানুগত ও নির্ভরযোগ্য হতেন[৪১] যে সম্রাট সচরাচর তাদের প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে প্রাদেশিক দিওয়ানরূপে নিয়োগ দানে অস্বীকৃত হতেন না। ফলে বলা যায় যে সম্রাট কর্তৃক লিখিতভাবে প্রাদেশিক দিওয়ানগণ নিযুক্ত হলেও মূলত তারা নিজস্ব কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকতেন কেন্দ্রীয় দিওয়ানের কাছে।[৪২] দিওয়ানগণ নিয়মিত রিপোর্ট-রিটার্ন এবং প্রদেশের অর্থ ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যে কোন কাজের গোপন ফিরিস্তি ইত্যাদি সরাসরি কেন্দ্রীয় দিওয়ানের কাছেই প্রেরণ করতেন।

দিওয়ান-ই-সুবার কাজের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র ছিল প্রদেশের কৃষি, অর্থ ও ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়। ড. কোরেশি বলেন, 'The diwan was the head of the department of finance in the province and his main duty was to see that the agrarian administration in his charge was kept upto the mark.'[৪৩]

হিদায়েতুল্লাহ বিহারি রচিত 'হিদায়াত-উল-কাওয়াইদ', 'ফারহাঙ্গ-ই-কারদানি' ও 'মিরাত-ই-আহমাদি' প্রভৃতি গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটদের সর্বশেষ প্রতিনিধি সম্রাট আওরঙ্গজেবের ফরমানসমূহ থেকে প্রাদেশিক দিওয়ানের কাজের যে ফিরিস্তি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় প্রশাসনে বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এগুলিতে উল্লিখিত দিওয়ানের কাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

এক. পরগণাস্থ গ্রামগুলি যাতে আর্থিকভাবে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে সেজন্যে গ্রামের চাষাবাদের উন্নয়ন ও মানববসতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'দিওয়ান-ই-সুবা' কাজ করতেন। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের লিখিত আদেশ ছাড়া যেন কোনরূপ অর্থ ব্যয় না হয় সেদিকে তিনি নজর রাখতেন। বিভিন্ন উৎস থেকে বিশেষ করে ফোতাদারদের কাছ থেকে প্রাদেশিক খাজাঞ্চিখানায় যে অর্থ জমা হতো তার অনুকূলে যথাযথ প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র ('কবজ-উল-উসুল') প্রদান করতে হতো তাকে। এ ছাড়া আমিলরা যাতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সেস বা আবওয়াব আদায় করতে না পারে সেদিকেও তিনি খেয়াল রাখতেন।

দুই. তিনি ব্যক্তিগতভাবে প্রতি কৃষি মৌসুম শেষে স্বীয় দপ্তরস্থ মূল রেজিস্টার ('কাগজ-ই-খান')-এর দাবির সঙ্গে আমিল বা ভূমিরাজস্ব সংগ্রাহকদের প্রকৃত আদায়ের পরিমাণ মিলিয়ে তুলনামূলক পরীক্ষা করে দেখতেন। দাবি অনুপাতে আদায় কম হলে বা কোন প্রকার হিসাবের গড়মিল ও তহবিল তসরূপের ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলে সঙ্গে সঙ্গে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, আমিলদেরকে কম আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব পুনঃ আদায়ের ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দিতেন। এ ছাড়া অসৎ, অনুদ্যোগী ও দায়িত্ব-কর্মে অবহেলাকারী আমিল প্রভৃতির বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের দপ্তরে লিখিতভাবে

৪১ ড. ইবনে হাসান বলেন, 'On the whole, Akbar's divans were efficient, loyal and hard-working. They were men of learning and culture and possessed the character which education and the training of the mind is expected to build.' (The Central Structure of the Mughal Empire, pp.170).

৪২ Administration under the Mughuls, pp. 223; Mughal Polity, pp. 175.

৪৩ The Administration of the Moghul Empire, pp. 229-30.

রিপোর্ট প্রেরণ করতেন যাতে করে তাদেরকে বদলে সৎ, কর্মঠ ও দায়িত্ববান ভূমিরাজস্ব কর্মচারীদের তদস্থলে নিয়োগ দেয়া যায় অথবা ক্ষেত্রত শাস্তি প্রদান করে.প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যায়।

তিন. পরপর কয়েক বছর ধরে কোন আমিল নির্ধারিত ভূমিরাজস্ব-দাবি আদায়ে ব্যর্থ প্রমাণিত হলে তথা বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি নিজেই সরাসরি সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা রায়তের কাছ থেকে সহজ কিস্তিতে 'জমা' আদায়ের উদ্যোগ নিতেন।

চার. পূর্ববর্তী বছরে প্রদত্ত 'তাকাবি' ঋণ পরবর্তী বছরের প্রথম মৌসুমে শস্যোৎপাদনকালে আদায় না হলে দিওয়ান মাঠ আমিনদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন, এমন কি প্রয়োজনে তাদের কাছ থেকেই সেটা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করতেন।

পাঁচ. প্রাদেশিক দিওয়ানকে তার ব্যক্তিগত ও দপ্তরের প্রাত্যহিক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের দপ্তরে প্রেরণ করতে হতো।

সংক্ষেপে মোগল আমলের প্রাদেশিক দিওয়ানদের ক্ষমতা ও কর্ম-পরিধির বর্ণনা করতে গিয়ে 'রিয়াজ-উস-সালাতিন'-এর লেখক চমৎকার বলেছেন। তাঁর মতে, 'প্রশাসনিক এবং আর্থিক বিষয়াবলী, রাজস্ব ধার্য ও তাহার সংগ্রহ এবং সরকারী কোষাগারের আয়-ব্যয়ের তদারকির দায়িত্ব দেওয়ান-ই-সুবার হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রতি বৎসর সম্রাট যে দস্তুর-উল-অমাল (সংবিধান) জারি করিতেন, সেই সংবিধানের ধারা অনুযায়ী দেওয়ান প্রাদেশিক প্রশাসন (রাজস্ব) যন্ত্র পরিচালনা করিতেন।'[৪৪]

রাষ্ট্রীয় প্রাপ্য— তা সে ভূমিরাজস্ব হোক বা অন্য কোন পণ্য শুল্ক— প্রাদেশিক সকল আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল দিওয়ান-ই-সুবার কার্যধারা। তার অনুমোদন ব্যতীত কোন রাজ কর্মচারী এমন কি সুবাদার পর্যন্ত কেউ-ই রাজকোষের অর্থ ব্যয় করতে পারতো না। এ থেকেই বোঝা যায় প্রাদেশিক স্তরে তার ক্ষমতা কত গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ন্ত্রকের ছিল। আমাদের বিবেচনায় একার্থে তিনি কেন্দ্রীয় দিওয়ান অপেক্ষাও অধিক ক্ষমতাবান ছিলেন। কেননা কেন্দ্রীয় দিওয়ান যদিও ছিলেন রাজকোষের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রক, কিন্তু এর নিয়মিত পরিচালনা ও ব্যয় বরাদ্দ তাঁকে সম্রাটের আদেশ ও অনুমোদন নিয়েই করতে হতো। অন্যদিকে দিওয়ান-ই-সুবা প্রদেশে সঞ্চিত কোষের

৪৪ 'রিয়াজ-উস-সালাতিন', পৃষ্ঠা ২৪৪-৪৫। সংগৃহীত, 'মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা', পৃষ্ঠা ৬৭। ড. পরমাত্মা সরণ আরেকটু বিস্তৃত করে বলেন, 'His duties were : the collection of revenue from the Khalsa mahals and keeping the accounts of the balances and receipts and supervising the lands assigned for charitable endowments, the allotment and disbursing of salaries to officers of the province according to their rank (grades) and administering the financial business in relation to the jagirs assigned according to the royal sanads in the....sarkars. All the aforesaid transactions were to bear the seal of the provincial diwan. Besides these, similar other duties, both small and great and receipts and disbursements were part of his work.' (The Provincial Government of the Mughals, pp. 175).

একাই ছিলেন নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধায়ক। ব্যয় কার্য নির্বাহের জন্য প্রাদেশিক প্রশাসনের প্রধান হিশেবে সুবাদারের কোনরূপ অনুমোদন তার প্রয়োজন হতো না বা ছিল না। এ বিষয়ে তার একমাত্র দায়বদ্ধতা ছিল কেন্দ্রীয় দিওয়ানের কাছে।[৪৫] যা হোক, এখন দিওয়ান-ই-সুবার দপ্তরে ভূমিরাজস্ব বিষয়ক যে সব নথিপত্র বা রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হতো, সে সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা হলো।[৪৬]

এক. সাধারণ প্রশাসনিক বিভাগের সঙ্গে রাজস্ব বিভাগের প্রতিনিয়ত যে সকল পত্রাদি আদান-প্রদান হতো তার রেজিস্টার। কানুনগো ও জমিদারদের মোহরাঙ্কিত খালসা ভূমির রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রের নথি। 'করোড়ি'দের সীল মোহরাঙ্কিত 'রোজনামচা' ও 'আওয়ারিজা'সংযুক্ত সেই সকল দলিল-দস্তাবেজ যে গুলিতে বছরের সম্ভাব্য 'জমা' এবং তদনুযায়ী আদায় ও খরচের বিবরণী লিপিবদ্ধ থাকতো।

দুই. সম্রাট কর্তৃক বিলিকৃত জায়গিরগুলির (জায়গিরদারদের বেতন-ভাতার উচ্চ থেকে নিম্ন ক্রমানুসারে) বিস্তৃত তালিকাসম্বলিত রেজিস্টার। এতে খালসার মতো জায়গিরগুলিরও 'মাল' ও 'সাইর এর আদায় ও ব্যয়ের কানুনগো প্রত্যায়িত হিসাব লিপিবদ্ধ থাকতো।

তিন. প্রতিটি পরগণার কানুনগো কর্তৃক সংগৃহীত জলাশয় (Wells)-এর সম্পূর্ণ পরিসংখ্যান সম্বলিত রেজিস্টার। উল্লেখ্য জলাশয়ের হিসাব ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক সুবায় স্বতন্ত্র বিভাগও ছিল।

চার. 'ইনাম' জমির বিবরণী এবং সেই সঙ্গে গ্রাম-প্রধান, কানুনগো, চৌধুরি, মুকাদ্দাম প্রভৃতিকে দেয় কমিশনের হিসাবসংক্রান্ত নথিপত্র।

পাঁচ. পণ্যের মূল্য-হারের রিটার্ন যা সরেজমিনে কর-কর্মী (Rate-clerk)-রা প্রস্তুত করে সময়ে সময়ে (সাধারণত মাসে দু'বার) দিওয়ানের দপ্তরে প্রেরণ করতো।

ছয়. 'করোড়ি' ও ফোতাদারদের আদায়কৃত অর্থের জমা-তালিকা, যেগুলি তারা নিয়মিতভাবে দিওয়ানের দপ্তরে পাঠাতে বাধ্য ছিল।

সাত. সরকারি অর্থ আয়-ব্যয়ের দৈনন্দির বিবরণী বা রোজনামচা, ইত্যাদি।

উপরের বিবরণী থেকে প্রাদেশিক দিওয়ানের দপ্তরে রক্ষিত ও সংগৃহীত এই সকল রেজিস্টার, নথিপত্র প্রভৃতি দৃষ্টে একটা ধারণা নিঃসন্দেহে করা যায় যে, 'The office of the provincial Diwan had a big Daftarkhana or record-room where papers pertaining to all items in which some finance was involved, were preserved.'[৪৭]

ভূমি ও ভূমিরাজস্ব সম্পর্কিত প্রাদেশিক সকল বিভাগ যেমন খালিশা, জায়গির ও মাদাদ-ই-মাস, 'ইনাম', খাজাঞ্চিখানা, 'পেশকাশ' বা নির্দিষ্ট খাজনা প্রদানকারী জমিদারিসমূহ সরাসরি দিওয়ানের অধিকারে অথবা সেগুলিতে কোন-না-কোন ভাবে তার

৪৫ The Provincial Governmen(of the Mughals, pp. 175.

৪৬ ড. সরণ এগুলি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ফারসি কিতাবের ভিত্তিতে প্রস্তুত করেছেন। কোন একক পুস্তকে এগুলি পাওয়া যায় না।

৪৭ The Mughal Government, pp. 77.

কর্তৃত্ব থাকতো। 'মাদাদ-ই-মাস' পুনর্নবীকরণের (Renewal) বিভিন্ন কাগজপত্র তার দপ্তরেই সংরক্ষণ করা হতো এবং প্রয়োজনের সময়ে সেগুলির ভিত্তিতেই ব্যবস্থা নেয়া হতো। প্রাদেশিক. টাঁকশাল (Mint)-এর ওপর তিনি নজর রাখতেন এবং কাজি কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের যে সব কারাগারে অন্তরীণ রাখা হতো, সেখানকার খরচ ইত্যাদি নিরীক্ষা করতেন।[৪৮]

এ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যায় ভূমিরাজস্ব ও অর্থনৈতিক বিষয়ে দিওয়ানের এই একচ্ছত্রাধিকার সুবা প্রশাসনে দিওয়ানকে সুবাদারের প্রায় সমান্তরালে অধিষ্ঠিত করেছিল। এ কথা সত্য যে সুবাদার ছিলেন প্রদেশের প্রধান-নির্বাহি, সম্রাটের অতিপ্রিয়ভাজন মনসবদারদের একজন, অনেক সময় খোদ রাজ-পরিবারের সদস্যও বটে, তার ক্ষমতার রজ্জুও ছিল সুপ্রসারিত ও টানটান; তিনি অধস্তন কর্মচারীদেরকে ভূমি বন্দোবস্তি প্রদানের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করার জন্য দিওয়ানকে বলতে পারতেন[৪৯]। এছাড়া দিওয়ানকে নিয়মিত সুবাদারের দরবারে হাজিরাও দিতে হতো[৫০] এবং তার মনসবও ছিল সুবাদারের চেয়ে তুলনামূলক নিম্ন পর্যায়ের। ফলে এ সব কিছু বিবেচনা করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, 'he (diwan) was not his (Subahdar) equal in status or rank.'[৫১]। কিন্তু অন্যদিকে যখন দেখি সুবাদার দিওয়ানের অনুমোদন ব্যতীত প্রশাসনিক বা অন্য কোন বিষয়ে স্থানীয় রাজকোষ থেকে একটি অর্থও ব্যয় করার অধিকারী নন[৫২] বা ক্বচিৎ অতিরিক্ত খরচ করলেও তার ব্যয়োত্তর অর্থ-মঞ্জুরির জন্য দিওয়ানের মুখাপেক্ষী হতে হতো তাকে, তখন এটা স্বীকার না করে পারা যায় না যে, 'In matters financial, he (diwan) stood on a par with the governor (Subahdar).'[৫৩] এবং একই সাথে এটাও বলা যায়, 'The diwan acted as a check on the governor and prevented the latter from becoming too powerful.'[৫৪]

বস্তুত এভাবেই মোগল প্রাদেশিক শাসনকাঠামোয় ক্ষমতার দু'টি আপাতবিরোধী স্বতন্ত্র বলয় গড়ে উঠেছিল, যদিও অন্যদিক দিয়ে তারা ছিল প্রবলভাবে পরস্পর নির্ভরশীল (mutually inter-dependent)—সুবাদার যেমন দিওয়ানের অনুমোদন ছাড়া রাজকোষ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় করাতে পারতেন না তথা দিওয়ানের এ সংক্রান্ত নঞর্থক মনোভাব তার দৈনন্দিন আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজকর্মে অচলাবস্থার সৃষ্টি করতো, তেমনি একইভাবে সুবাদারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া দিওয়ান ও তার ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীরা স্থানীয় জনসাধারণকে মানিয়ে-বুঝিয়ে যথাসময়ে 'জমা'র তালিকা তৈরি করতে

---

৪৮ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭।
৪৯ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 126.
৫০ Mughal Polity, pp. 147.
৫১ The Provincial Government of the Mughals, pp. 181.
৫২ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩; বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৩।
৫৩ The Provincial Government of the Mughals, pp. 179; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 55.
৫৪ A Short History of Muslim Rule in India, pp. 323; The Mughal Empire, pp.321.

পারতো না। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রে সুবাদার বা তার কর্মচারীদের ভূমিকা হতো মূলত প্রচারণামূলক, যদিও বল প্রয়োগের প্রচ্ছন্ন ভীতিও তাতে থাকতো। ভূমি জরিপকালে রায়তদের সঙ্গে স্থানীয় রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের কোন বিরোধ সৃষ্টি হলে বা নিরূপিত ভূমিরাজস্ব আদায়ের সময়ে কোন গ্রাম বা অঞ্চলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিলে সে সব ক্ষেত্রে দিওয়ানের জন্য সুবাদারের শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না। সুবাদার তখন প্রশাসনিক ক্ষমতায় 'বখশি'র[৫৫] মাধ্যমে নির্দিষ্ট এলাকায় সৈন্য প্রেরণ করে বিদ্রোহ দমন করতেন।[৫৬] সর্বোপরি সুবা থেকে কেন্দ্রীয় রাজকোষে নিয়মিত অর্থ প্রেরণের সময় প্রয়োজনীয় প্রহরার ব্যবস্থা সুবাদারকেই করতে হতো। সুতরাং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে উপরিউক্ত বিষয়গুলিতে প্রাদেশিক দিওয়ান ছিলেন সুবাদারের ওপর পুরোটাই নির্ভরশীল। তাছাড়া সত্যি বলতে সম্রাটের দৃষ্টিতে প্রশাসনিক পদ ও মর্যাদায় সুবাদারের অবস্থান কিছুটা উচ্চস্থানীয় হওয়ায় দিওয়ানও সচরাচর চাইতেন না তার সঙ্গে অনর্থক কোন জটিলতা বা কলহে জড়িয়ে পড়তে। এ রকম হলে সম্রাটের দরবারে তার মর্যাদা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ন হতো। তবে এর অর্থ এই নয় যে সম্রাট সবসময় সুবাদারকেই সমর্থন করতেন, বরং ক্ষেত্র বিশেষে উল্টোটাও ঘটতো, যার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার দিওয়ান মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সুবাদারদের বিরোধে মুর্শিদকুলির পক্ষে সম্রাটের সুস্পষ্ট সমর্থনে (যথাস্থানে আলোচ্য)। আসলে 'প্রাদেশিক প্রশাসনে দীউয়ান অর্থনৈতিক দায়িত্ব স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করবে' এটাই ছিল মোগল সম্রাটদের বিশেষ করে আওরঙ্গজেবের শাসননীতির লক্ষ্য।[৫৭] তবে আপাত স্বাধীনতার অন্তরালে উভয়ের মধ্যে এই যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, যা প্রকৃত বিচারে 'প্রতিবন্ধকতা ও ভারসাম্য নীতি' (Policy of check and balance)-র কাজ করতো তা ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে মোগলদেরই অবদান বলা যায়। ড. পরমাত্মা সরণ চমৎকার বলেছেন, 'The purpose of this ingenious administrative device was to create a most potent and reliable check on the highest officials of the province. The subahdar and the diwan kept a jealous watch over each other's activities and reported them to the headquarters. This need not, however, imply that the aim was to create a perpetual rift and clash between the two officials. On the contrary mutual co-operation and collaboration was the sine qua non of their success and efficiency.'[৫৮] দিওয়ান ও সুবাদারের মধ্যে

---

৫৫ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসরণে প্রত্যেক সুবায় একজন করে 'বখশি' থাকতেন। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল প্রাদেশিক সৈন্যবাহিনীর তত্ত্বাবধান করা। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'The Army of the Indian Moghuls : Its organization and Administration', William Irvine, Chapter IV.

৫৬ দিওয়ানেরও ব্যক্তিগত কিছু সংখ্যক সৈন্য ছিল। (Mughal Polity, p. 150) কেননা তিনি নিজেও ছিলেন একজন ক্ষুদে মনসবদার।

৫৭ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৫।

৫৮ The Provincial Government of the Mughals, pp. 180. আরও দেখুন, The Mughal Empire, pp. 312; A Brief Survey of Muslim Rule in India, Dr. Md. Mohar Ali, pp. 234.

বৈরিতা যখন চরম আকার নিতো অর্থাৎ প্রাদেশিক প্রশাসনের কাজকর্মে শৈথিল্য ও অচলাবস্থার সৃষ্টি হতো, তখন তাদের যে কোন একজনকে বা উভয়কে বদলি করা হতো, অথবা জরুরি তলবে কেন্দ্রে ডেকে পাঠানো হতো।[৫৯] প্রসঙ্গত সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময়ে বাংলার দিওয়ান মির্জা হোসেন বেগের সঙ্গে তৎকালীন সুবাদার কাসিম খানের (১৬১৪-১৭) বৈরী সম্পর্কের কথা বলা যায়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুবাদার ইসলাম খানের মতো কাসিম খানও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বটে, তবে প্রতিভাবান অগ্রজের সমান কর্মকুশলতা ও বিচক্ষণতার তার প্রবল অভাব ছিল। ফলে কর্মস্থলে দিওয়ানের সঙ্গে তার বিরোধ যখন তুঙ্গে ওঠে তখন কাশিম খান অকস্মাৎ বল প্রয়োগ করেন। তিনি সৈন্য পাঠিয়ে দিওয়ান বেগের প্রাসাদ ও সম্পদের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন, তার পুত্রদের কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্দি করে রাখেন, এমন কি দিওয়ানের সয়-সম্পত্তি পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেন। 'ওয়াকিয়া-নবিশ'[৬০]দের মাধ্যমে এই সংবাদ যখন সম্রাটের দরবারে পৌঁছায় তখন তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হন এবং অবিলম্বে সাদত খান ওরফে মির্জা লুতফিকে ঘটনা আদ্যোপান্ত তদন্তের জন্য প্রেরণ করেন। একটি জরুরি ফরমান প্রেরণ করে সম্রাট সুবাদারকে এ-ও জানিয়ে দেন যে, যদি তদন্তে তার অপরাধ প্রমাণিত হয় তবে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তিনি দিওয়ান বেগ ও তার পুত্রদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানে সন্তুষ্ট করার জন্যেও তাকে নির্দেশ দেন। যা হোক, পরে কাসিম খান মির্জা হোসেন বেগ ও তার পুত্রদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করেন এবং নগদ এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিওয়ানের সঙ্গে লিখিতভাবে আপোষ করেন। উল্লেখ্য কাসিম খান বিখ্যাত শেখ সেলিম চিশতির আত্মীয় হওয়ায় সম্রাট তার এই অপরাধকে কিছুটা সহনশীলতার দৃষ্টিতে বিবেচনা করেছিলেন, তথাপি সুবাদারকে দিওয়ানের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য করতে তিনি মোটেও কার্পণ্য করেননি।[৬১]

এখন আমরা দিওয়ান-ই-সুবা বিভিন্ন অঞ্চল ভেদে যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন সে সম্পর্কে কিছুটা আভাস দেয়ার চেষ্টা করবো। ড. ইউসুফ হাসান তাঁর 'The States of the Subadars and the Diwans of the Deccan in the time of Shahjahan' শীর্ষক প্রবন্ধে যুক্তিপ্রমাণসমেৎ দেখানোর প্রয়াস পেয়েছেন যে, মোগল যুগে কোন কোন অঞ্চলের প্রাদেশিক দিওয়ানগণ সাম্রাজ্যের অপরাপর অঞ্চলের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতা ও শান-শওকত ভোগ করতেন। উদাহরণত তিনি দাক্ষিণাত্যের কথা বলেছেন।[৬২] দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানগণ হরহামেশা 'উজিরাত-পানাহ' (আশ্রয়স্থল), 'মাদার-উল-মহাম' (সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কেন্দ্রস্থল[৬৩]) প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করতেন। বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দিওয়ানগণ অনুরূপ কোন উপাধি গ্রহণ করেছিলেন বলে জানা যায়

৫৯ The Provincial Government of the Mughals, pp. 181; The Mughal Government, pp. 77.

৬০ সরকারি সংবাদ লিপিবদ্ধকারী, সংগ্রাহক ও বাহক।

৬১ দেখুন 'বাহারিস্তান-ই গায়বী'।

৬২ See, Islamic Culture, 1946, pp. 389.

৬৩ Studies in the History of Medieval Deccan, Dr. Rafi Ahmad Alavi, pp. 81.

না।[৬৪] তবে বাংলা বহু দূরবর্তী প্রদেশ হওয়ায় এখানকার সুবাদারদের মতো দিওয়ানরাও যে প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করতেন তা অনুমানে কষ্ট হয় না।

কেন্দ্রীয় দিওয়ানের মতো প্রাদেশিক দিওয়ানের দপ্তরেও প্রদেশের অর্থ ও ভূমিরাজস্ববিষয়ক যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য পালন, বিভিন্ন বিভাগের খরচের হিসাব নিরীক্ষা (Auditting)[৬৫] , আমিল প্রভৃতির কাজ-কারবারের ওপর সার্বক্ষণিক তদারকি এবং সর্বোপরি সুবাদারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় রক্ষা ইত্যাদি কাজের জন্য এক বিরাট কর্মী-বাহিনী (Secretariat Staff) নিযুক্ত থাকতো। এরা দু'ভাবে নিযুক্ত হতো, এক. কেন্দ্রীয়ভাবে, ও দুই. প্রাদেশিক দিওয়ান কর্তৃক সরাসরি নিয়োগ দানের মাধ্যমে।[৬৬] তবে শেষোক্ত জনের মাধ্যমে যে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও নিম্নস্তরের পদগুলির ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রদান করা হতো তা বলাইবাহুল্য। যা হোক, কেন্দ্রীয় দিওয়ান কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে ছিল :

১. পেশকার — দিওয়ানের কর্মসচিব বা ব্যক্তিগত সহকারী;
২. দারোগা—দপ্তর তত্ত্বাবধায়ক, যিনি নিজেও ছিলেন একজন ছোটখাট মনসবদার। উল্লেখ্য, পেশকার ও দারোগা উভয়ই ছিলেন কেন্দ্রীয় দিওয়ানের সীল-মোহরধারী।
৩. মুন্সিফ—প্রধান করণিক। সাধারণত পরগণা বা মহাল পরিদর্শনের দায়িত্ব পালন করতেন।
৪. তহবিলদার-ই দপ্তরখানা— খাজাঞ্চি বা কোষাগারিক।

অন্যদিকে দিওয়ান-ই-সুবা কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে যেমন ছিল :

১. কাছারির মুনশি।
২. হুজুর-নবিশ—সম্ভবত কেন্দ্রীয় দিওয়ানের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বিভিন্ন কাগজপত্র তৈরির দায়িত্ব পালন করতেন।
৩. সুবা-নবিশ—ইনি সম্ভবত সুবাদারের সঙ্গে যোগাযোগের কাগজপত্র তৈরির কাজ করতেন।
৪. মুহাররিব-ই-খালসা—সংরক্ষিত ভূমির দেখভালকারী।
৫. মুহাররিব-ই-দপ্তর-ই-তান—বিভিন্ন বিভাগের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের বিষয় দেখাশুনা করতেন।
৬. মুহাররিব-ই-দপ্তর-ই পায়বাকি—বকেয়া ভূমিরাজস্ব গ্রহণকারী।
৭. মুহাররিব-ই ওজিফা—সকল প্রকারের বৃত্তির ব্যয় নির্বাহক।
৮. ওজন ও পরিমাপ পরিদর্শক।
৯. ভূমিরাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য শুল্ক ও কর ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীকুল।

৬৪ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 138.
৬৫ The Provincial Government of the Mughals, pp. 177.
৬৬ The Mughal Government, pp. 77.

উপরিউক্ত তালিকা বিশ্লেষণে আমরা এটাই দেখতে পাই, কর্মচারীরা মূলত দু'ধরনের দায়িত্ব-কর্তব্যের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। প্রথমত ভূমিরাজস্বসহ বিভিন্ন প্রকারের কর ও শুল্ক ধার্য ও বাজেট প্রণয়ন, এবং দ্বিতীয়ত নিরূপিত রাজস্ব যথাসময়ে আদায় করে রাজকোষে নীতকরণ।[৬৭]

পরিশেষে তাই এককথায় বলতে পারি যে বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব আয়-ব্যয় দিয়েই মোগল প্রাদেশিক দিওয়ান-এর কাজ শুরু ও শেষ হতো।

সরকার *

মোগল সুবার অব্যবহিত পরবর্তী প্রশাসনিক একক ছিল 'সরকার'। অন্যভাবে বললে এক-একটি সুবা গড়ে উঠতো কতকগুলি সরকারের সমন্বয়ে। এটা ঠিক যে ১৫৮০-পরবর্তী সময়ে সম্রাট আকবর চেয়েছিলেন যেন সমগ্র সাম্রাজ্যব্যাপী একই রকমের প্রশাসনিক অবকাঠামো বিস্তার লাভ করে[৬৮], কিন্তু বাস্তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড যেমনটা বলেছেন ততোটা নয়। তিনি বলেন, 'Akbar's administrative system was not entirely uniform throughout his dominions.'[৬৯] আগেই দেখিয়েছি ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রে আকবরের সময়ে অঞ্চল থেকে অঞ্চলে, এমন কি একই অঞ্চলের বিভিন্ন অংশে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য ছিল, যেটা না থাকাটাই অবাস্তব। কিন্তু মুখ্য প্রশাসনিক এককগুলির সমরূপতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক ও অভিন্ন ছিল, যার প্রমাণ আমরা পাই 'আইন'-এ। বলাবাহুল্য 'আইন'-এ সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায়[৭০], প্রতিটি সুবাকে 'সরকারে' এবং সরকারকে 'মহালে' বা 'পরগণা'য় বিভক্ত করা হয়েছে, এবং বলার বিষয় এটাই যে প্রশাসনিক এই বিভাজন 'আইনে'র সর্বত্রই সমানভাবে লক্ষ্যগোচর। সুতরাং 'আইন'-এর রূপরেখায় মোরল্যান্ডের উপর্যুক্ত উক্তি অন্তত আকবরের রাজত্বকালের প্রশাসনিক এককগুলির বিভাজ্যতার বেলায় সত্য বলে মনে হয় না। যা হোক প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্রমবিকাশের চূড়ান্ত পর্যায়ে 'সরকার'-এর যে স্বরূপ বা অবস্থান দাঁড়িয়েছিল তাতে দেখা যায় এটি ছিল একই সঙ্গে প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগ—'both an administrative and revenue unit'[৭১]। সরকার ব্যবস্থা প্রচলনের গোড়ার দিকে সম্রাটের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল প্রতিটি সুবাকে মোটামুটি ২২টি সরকারে এবং প্রতিটি সরকারকে অনুরূপভাবে ২২টি

৬৭ Mughal Polity,pp. 149.

* এই প্রশাসনিক একক বা ইউনিটটিকে অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই বর্তমানে প্রচল (বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের পূর্বেকার) জেলার সঙ্গে বিভিন্ন কারণে তুলনা করেছেন। অনেকে একে জেলা অপেক্ষাও বড় প্রশাসনিক ইউনিট বলে মত প্রকাশ করেছেন। দেখুন, The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 256. ভৌগোলিক বিবেচনায় আমাদের মতে উভয়পক্ষের বক্তব্য সঠিক, এর মূল কারণ মোগল 'সরকার'গুলি আয়তনের ব্যাপক অসমতা, যা আগেই দেখিয়েছি।

৬৮ Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 50.

৬৯ From Akbar to Aurangzeb. pp. 247.

৭০ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 129.

৭১ Murshid Quli Khan and His Times, pp. 62.

মহাল বা পরগণা'য় সন্নিবেশিত করার[৭২] ; কিন্তু নানা কারণে (যার মধ্যে ভৌগোলিক কারণই মুখ্য) এই লক্ষ্য কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সুবাগুলির আয়তনিক বিভিন্নতার মতো এর সরকার সংখ্যায়ও তাই বিস্তর পার্থক্য ছিল। যেমন সুবা এলাহাবাদের ছিল ১০টি সরকার, বাংলায় ২৪টি (ওড়িশার ৫টি সহ), মুলতানে ৩টি, অযোধ্যায় ৫টি, ইত্যাদি। অন্যদিকে সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যেও ছিল আয়তনগত অসমতা। যেমন সুবা আগ্রার আগ্রা সরকারের ছিল ৪৪টি পরগণা, খান্দেশ-এর দান্দেশ সরকারের ৩২টি মহাল, বাংলার সরকার সোনারগাঁও-এর ৫২টি মহাল, জান্নাতাবাদ বা লক্ষ্মণাবতীর ৬৬টি মহাল, ঘোড়াঘাটের ৮৪টি মহাল, কিন্তু বাকলা ও সিলেট সরকার গঠিত হয়েছিল যথাক্রমে মাত্র ৪ ও ৮টি মহাল নিয়ে। আসলে একটি অন্যতম প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে সরকারের আয়তনগত পার্থক্য যতোই থাক, এগুলিতে প্রশাসনিক অবকাঠামো (Administrative Framework/ Set-up)-এর যে চিত্র পাই তা প্রায় সর্বত্রই একই রকমের ছিল, এবং সেটাও অনেকটা সুবা প্রশাসনের অনুরূপ। ড. তপন রায়চৌধুরী বলেন, 'The administration of the sarkar.....was in certain ways a miniature replica of the subah administration.'[৭৩]

জ্যেষ্ঠ মোগলদের বিশেষ করে সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত সময়কালে মোগল সাম্রাজ্য উত্তরোত্তর যতোই সম্প্রসারিত হচ্ছিল, নিত্য নতুন দেশ, ভূখণ্ড ও সেখানকার আচার-বৈচিত্র্য শাসক-শ্রেণীর মূল নীতি ও আদর্শের সংস্পর্শে আসছিল, বা অন্যভাবে বললে মোগলরা প্রতিনিয়ত এ সকল কিছুর সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিল, ততোই শাসকশ্রেণীর কাছে সাম্রাজ্যিক অখণ্ডত্ব ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি সমন্বিত, একক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রশাসনিক বিন্যাস বা অবকাঠামো ও শৃঙ্খলা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। সুবা, সরকার, মহা ল বা পরগণা প্রভৃতি ছিল এই প্রয়োজনীয়তারই বহিঃপ্রকাশ। এগুলির প্রত্যেকটির নির্দিষ্ট সীমা ও তাতে কর্মরত রাজকর্মচারীদের অধিক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ তাই শুধু মোগলদের প্রশাসনিক চিন্তার অনন্যতারই দ্যোতক নয়, বরং তা থেকে এটিও প্রমাণিত হয় যে, জ্যেষ্ঠ মোগলগণ ভারতে তাঁদের ক্ষমতা ও আধিপত্য খুব সুদৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'The demarcation of sarkars and parganas presupposes an advanced stage in the consolidation of political authority.'[৭৪]

মোগল সরকার প্রশাসনে যে সকল রাজকর্মচারী কাজ করতো তাদের একটি ছক মোটামুটি নিম্নোক্তভাবে করা যায়, যদিও এই তালিকা সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ সকলে একমত নন। তথাপি আলোচনার সুবিধার্থে আমরা এদের তালিকা এভাবে করার পক্ষপাতী। যথা[৭৫] :

৭২ The Land Systems of British India, Vol. II., pp. 256, fn.
৭৩ Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 59.
৭৪ Ibid., pp. 58.
৭৫ তালিকা বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে করেছেন। ড. পরমাত্মা সরণের মতে 'সরকার'-এর প্রধান রাজকর্মচারীগণ হলো—ফৌজদার, আমলগুজার, কোতওয়াল ও কাজি (The Provincial Government of the Mughals, p. 196); ড. তপন রায় চৌধুরী মতে—ফৌজদার, দিওয়ান,

১. ফৌজদার
২. দিওয়ান-ই-সরকার বা আমলগুজার[৭৬]
৩. বিতিকচি[৭৭]
৪. খাজানাদার বা খিজানাদার
৫. বখশি
৬. কাজি[৭৮]
৭. কোতওয়াল[৭৯]
৮. ওয়াকিয়া-নবিশ, প্রভৃতি।

উপরিউক্ত তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং সর্বত্র এদের সংখ্যা ও পদবি একই রকম ছিল না। উদাহরণ হিশেবে বলা যায়, প্রশাসনের পর্যালোচ্য স্তরে রাজস্ববিভাগের প্রধানের পদবি আমলগুজার, আমিল, দিওয়ান-ই-সরকার, নাকি বিতিকচি ছিল তা নিয়ে যেমন ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তেমনি একই আমিল বা আমলগুজার পদবি সরকারসহ পরগণা প্রশাসনের প্রধানের বেলায়ও প্রচল ছিল কি-না, সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে সমকালীন বাস্তবতা যাই থাক, আমরা এখানে মূলত সরকারের দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের প্রধান হিশেবে ফৌজদার ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মুখ্য আধিকারিক 'দিওয়ান-ই-সরকার' (এটিই মূলত যথাযথ অভিধা)-এর ওপরই বর্ণনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবো।

বখশি, ওয়াকিয়া-নবিশ, কাজি, কোতোয়াল ও সদর (Bengal under Akbar and Jahangir, p. 59); ড. জগদীশ নারায়ণ সরকারের মতে—ফৌজদার, আমলগুজার বা আমিল বা করোড়ি, কাজি ও কোতওয়াল (Mughal Polity, p. 153-7); ড. উপেন্দ্র নাথ দে-র মতে-ফৌজদার, আমিল বা আমলগুজার, কোতওয়াল ও কাজি (The Mughal Government, p. 80-87); ড. এল পি শর্মার মতে— ফৌজদার, আমলগুজার, বিতিকচি, খাজানাদার, কোতওয়াল ও কাজি (History of Medieval India, p. 517-18); ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের মতে—ফৌজদার, কোতওয়াল, কাজি, আমিল বা আমলগুজার, করোড়ি ও বিতিকচি (Bengal in the Reign of Aurangzib, p.40-57); ড. মীরা সিংহের মতে—ফৌজদার, দারোগা, কোতওয়াল, আমিল ও করোড়ি (Medieval History of India, p. 380).

৭৬ 'আইনে' তাকে এই শিরোনামেই রাজস্ব সংগ্রাহকদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। দেখুন, The Ain-I-Akbari, Vol. II., p. 46.

৭৭ 'আইনে' তাকে সৎ ও সচেতন লেখক এবং দক্ষ হিসাবরক্ষক হিশেবে উল্লেখ করা হয়েছে—রাজস্ব সংগ্রাহকের সঙ্গে যার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল।

৭৮ প্রতিটি সরকারেই একজন করে 'কাজি' থাকতেন যার প্রধান দায়িত্ব ছিল বিচার কার্য নির্বাহ করা। তবে বিচার কার্য বহির্ভূত কিছু রাজস্ব সম্পর্কিত কাজ যেমন—রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অনির্দিষ্ট খবরদারি, সমুদ্র বন্দরসমূহের কাস্টম শুল্ক আদায়, মুখ্য সদর কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ 'মাদাদ-ই-মাশ' ভূমি বরাবরে ছাড় করা, এবং বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জাকাত ও জিজিয়া আদায়ের দায়িত্ব পালন। (Mughal Polity, pp. 156).

৭৯ ইনি মূলত ছিলেন নগর-পাল; নগর ও শহরতলীর মধ্যেই তার দায়িত্ব-কর্তব্য সীমিত ছিল। অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক তাকে 'সিটি ম্যাজিস্ট্রেট' হিশেবে বর্ণনা করেছেন। ভূমি বিষয়েও তার সামান্য কিছু ভূমিকা ছিল, তা হলো উত্তরাধিকারীবিহীন সয়-সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত নিষ্পত্তি। (Administration under the Mughuls, pp. 225).

ফৌজদার

মোটামুটি প্রতিটি সরকারেই একজন করে ফৌজদার নিযুক্ত থাকতেন।[৮০] ফৌজদার— এই শব্দ যৌগের মধ্যে 'ফৌজ' আরবি ভাষার শব্দ, অর্থ সৈন্য, এর সাথে ফারসি প্রত্যয় 'দার' (অর্থ 'অধিকারী') যুক্ত হয়ে এটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় 'সৈন্যাধ্যক্ষ'[৮১]। তবে মোগল প্রশাসনিক পরিভাষায় এর আরও ব্যাপকার্থ ছিল।[৮২] 'আইনে' ফৌজদার সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মহামহিম সম্রাট সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য প্রতিটি প্রদেশে একজন করে সৈন্যাধ্যক্ষ (a Commander of the forces) নিযুক্ত করেন।[৮৩] ঐতিহাসিক স্মিথ-এর মতে ফৌজদার ছিলেন— 'the deputy of the Sipahsalar or governor of the province.'[৮৪] এখানে 'province' সম্ভবত মোগল সুবার প্রতিশব্দ নয়। কেননা সুবার ক্ষেত্রে আগেই দেখিয়েছি প্রধান নির্বাহি ছিলেন 'সিপাহসালার'। স্মিথের ভাষ্যানুযায়ী ফৌজদার তার 'deputy' (সহযোগী বা সহকারি যা-ই বলি) ছিলেন সত্য, তবে সেটা প্রাদেশিক স্তরে থেকে নয়, বরং সুবার অব্যবহিত পরবর্তী ধাপ তথা সরকার প্রশাসনে থেকে। এর অন্যতম যুক্তি হিশেবে একই 'আইনে' আমরা পাই বেশকিছু পরগণার দেখাশুনার দায়িত্ব সম্রাট অর্পণ করেছিলেন ফৌজদারকে।[৮৫] সুতরাং পরগণা বা মহালের উপরস্থ ধাপের রাজকর্মচারী বলে ফৌজদারকে আমরা অনায়াসে চিহ্নিত করতে পারি। তিনি ছিলেন সরকারের দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের প্রধান ও এর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত মুখ্য রাজকর্মচারী।

প্রতিটি সরকারেরই একজন করে ফৌজদার থাকবে, জ্যেষ্ঠ মোগলদের সময়ে সর্বদা এই নীতি পালন করা হয়নি। অবশ্য এই জাতীয় কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মও ছিল না। ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'There was no strict rule that each sarkar must have a faujdar.'[৮৬] উদাহরণস্বরূপ আমরা সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের বাংলার কথা বলতে পারি। আকবরের আমলের ১৯টি সরকার এ সময়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৩৪টিতে।[৮৭] কিন্তু প্রশাসনিক এবং বিশেষ করে অর্থনৈতিক কারণে এই ৩৪টি সরকারকে ১২টি ফৌজদারির অধীন করা হয়েছিল।[৮৮] এগুলি হলো—(১) ইসলামাবাদ বা চাটগাঁও (২) শ্রীহট্ট বা সিলেট (৩) রংপুর (৪) হুগলি (৫) হিজলি (৬) রাঙ্গামাটি (৭) জালালগড় বা পূর্ণিয়া (৮) আকবরনগর বা রাজমহল (৯) বর্ধমান (১০) রাজশাহি (১১)

৮০ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৬।
৮১ বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃষ্ঠা ২৩৮।
৮২ সরকারের প্রধান হিশেবে ফৌজদারের অধীনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৈন্যদল থাকতো। সরকারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন শহর ও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে যে বিভিন্ন সেনাদল থাকতো তাদের পরিচালক বা অধিকর্তাকেও ফৌজদার বলা হতো, অর্থাৎ সম্পূর্ণ আভিধানিক অর্থে এটি ব্যবহৃত হতো। এছাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকেও ফৌজদার বলে অভিহিত করা হতো। (The Mughal Government, pp. 83).
৮৩ The Ain-I-Akbari, Vol. II.. pp.41.
৮৪ Akbar The Great Mogul, pp. 276.
৮৫ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 42.
৮৬ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 40.
৮৭ Ibid., pp. 40.
৮৮ Ibid., pp. 40.

বালাশোর ও (১২) মুর্শিদাবাদ। উল্লেখ্য নবাবি আমলে বাংলায় (বিহার ছাড়া) এক পর্যায়ে ৯টি ফৌজদারি দিয়েও কাজ চলতো বলে সৈয়দ গুলাম হুসেন খান-এর 'সিয়ার-উল-মুতাখখিরীন' নামক গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়। এগুলি— (১) চট্টগ্রাম বা ইসলামাবাদ (২) সিলেট (৩) রংপুর (৪) হুগলি (৫) রাঙ্গামাটি (৬) মেদিনীপুর (৭) রাজশাহি (৮) বর্ধমান ও (৯) জালালগড়-পূর্ণিয়া।[৮৯] ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটি ফৌজদারির অধীনে এক বা একাধিক সরকার ছিল।

ফৌজদারগণ কেন্দ্রীয়ভাবে সম্রাটের লিখিত ফরমান বলে নিযুক্ত হতেন এবং অপসারিতও হতেন একই প্রকারে।[৯০] তার নিযুক্তিনামায় বিভিন্ন রকমের আদেশ-নিষেধ লিপিবদ্ধ থাকতো যার বাইরে সচরাচর যাওয়ার তার হুকুম ছিল না। 'আইন-ই-আকবরী', 'মিরাত-ই-আহমাদি', 'সিয়ার-উল-মুতাখখিরীন' প্রভৃতির সূত্রে আমরা মোগল ফৌজদারদের কার্যাবলির একটা ছক এভাবে করতে পারি।

এক. প্রতিটি ফৌজদারকে নিজস্ব অধিক্ষেত্রের আইন অমান্যকারী ব্যক্তি ও প্রজা-বিদ্রোহের নেতা ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের গোপন আস্তানা ও দুর্গসমূহ ধ্বংস, জনসাধারণের চলাচলের রাস্তা ও তাদের সুরক্ষার দায়িত্ব পালন করতে হতো। ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ-মৌসুমে জায়গিরদারদের গোমস্তা প্রভৃতিকে প্রয়োজনীয় সৈন্য সহযোগিতা দিতে হতো।

দুই. কামাররা যাতে লোহা বা অন্য কোন ধাতু দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হতো। ফৌজদারির অধীন বিভিন্ন থানাদারগণ যাতে অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে, অন্যায়ভাবে কেউ বৈধ সম্পত্তি থেকে কাউকে উৎখাত ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সেস আদায় করতে সক্ষম না হয়, সে সকল বিষয়েও ফৌজদারকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হতো।

তিন. আমলগুজার বা আমিল ও জায়গিদারদের এজেন্টগণ তার কাছে লিখিতভাবে অনুরোধ বা আবেদন না করা পর্যন্ত তিনি স্ব-উদ্যোগে কোন বিদ্রোহী গ্রাম আক্রমণ করতে পারতেন না। কখনও কোন গ্রাম বা অঞ্চল পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের অনুরোধে যদি বা আক্রমণ করতে হতো, সেক্ষেত্রে দুষ্ট ও বিদ্রোহী লোকজন ছাড়া যেন কোন অবস্থাতেই নিরীহ মানুষজন সৈন্যদের দ্বারা নির্যাতিত না হয়, সে খেয়াল রাখা তার জন্যে জরুরি ছিল।

চার. নতুন সরকারে যখন কোন ফৌজদার প্রথম নিয়োগ পেতেন বা বদলি হয়ে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম তাকে স্থানীয় সেই সব লোকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে

৮৯ The Fifth Report, W.K. Firminger, pp. 323; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., Dr. A. C. Banerjee, pp.55.

৯০ কাগজে-পত্রে ফৌজদারগণ সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হলেও এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা সরাসরি কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা রাখতেন (The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, p. 145) স্বীকার করে নিলেও বাস্তবে ফৌজদারগণ প্রকৃত দায়বদ্ধ ছিলেন সুবাদার (পরবর্তীকালে নবাব)-এর কাছে (Bengal in the Reign of Aurangib, p. 43)। তিনি কেন্দ্রের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ করে যে কোন ফৌজদারকে বদলি বা চাকুরিচ্যুত করতে পারতেন। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, His (Faujdar) appointment or dismissal rested with the Subadar whom he was to assist in every way.' (The Mughal Empire, pp.322).

হতো যারা এলাকাটি ও তথাকার জনমণ্ডলীর চরিত্র সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন। এদের কাছ থেকেই তাকে গোপনীয়ভাবে জেনে নিতে হতো সৈন্য দলের কোন অংশ তাদের সেনাপতিদের দুর্বলতা বা অমনোযোগিতার সুযোগে বিদ্রোহের পাঁয়তারা করছে কি-না, কিংবা সুযোগসন্ধানী ও সাম্রাজ্যের বৈরী কোন জমিদারের সঙ্গে সৈন্যদের কোন আঁতাঁত গড়ে উঠছে কি-না, ইত্যাদি।

পাঁচ. নতুন এলাকার কোন্ কোন্ জমিদার নিয়মিত সরকারি পাওনা পরিশোধ করে এবং পূর্ববর্তী ফৌজদারদের সময়ে কারা কারা যথাসময়ে ভূমিরাজস্ব প্রদানে গড়িমসি করতো বা অস্বীকৃতি জানিয়েছিল—এটিও জেনে নেয়া ফৌজদারের অন্যতম কর্তব্য ছিল। এছাড়া তার নিজের কর্মকালে সরকারের বৈধ প্রশাসনিক ও অন্যান্য কার্যক্রমে যারা সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতো, এ সমস্ত লোকজনকে কঠোর হস্তে দমন করতে হতো। প্রয়োজনে তাদের শত্রুদের চিহ্নিত করে একে অন্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে হতো, এমন কি সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত জমিদারদের ভূ-দান (ইনাম) করে ও তাদের প্রয়োজনে সৈন্য দিয়ে অবাধ্য জমিদারদের দমন করতে হতো।

উপরের এই দীর্ঘ বর্ণনা থেকে আমরা মোগল আমলীয় ফৌজদার (সরকার-প্রধান হিশেবে)-দের ব্যাপক কার্যাবলিকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে পারি। যথা :

(১) সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব দান ও প্রয়োজনে যুদ্ধ পরিচালনা;

(২) অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার পরিপন্থী যে কোন দুষ্কর্ম ও ষড়যন্ত্র গোড়াতেই নির্মূল করা, এবং

(৩) ভূমিরাজস্বসহ অন্যান্য কর ও শুল্ক আদায় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা।

পরিশেষে বলা যায় যদিও ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে ফৌজদারের সরাসরি কোন সম্পর্ক বা দায় ছিল না, তথাপি সুবার ক্ষেত্রে দিওয়ান যেমন সুবাদারের কার্যকর সহযোগিতা ছাড়া অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য সর্বদা সুচারুভাবে পালন করতে পারতেন না, তেমনি আমলগুজার বা দিওয়ান-ই-সরকারও ফৌজদারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছাড়া অনেক সময়ই ফলপ্রসূ রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় অসহায় হয়ে পড়তেন।

দিওয়ান-ই-সরকার

মোগল সরকার প্রশাসনে ভূমিরাজস্ব দপ্তরের প্রধান রাজকর্মচারীর পদবি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। এর মূল কারণ প্রথমত 'আইনে' এ সম্পর্কে যথাযথ বর্ণনার অভাব, এবং দ্বিতীয়ত আকবর-পরবর্তীকালে বিশেষত সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে এর যে পদবি বিভিন্ন রচনায় পাওয়া যায়, তাতেও সর্বত্র প্রচল একক কোন অভিধা লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে সরকার স্তরের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের পদবি হিশেবে 'দিওয়ান-ই-সরকার' এখানে আপেক্ষিক অর্থেই গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। তিনি সম্রাট কর্তৃক কেন্দ্রীয় দিওয়ানের সুপারিশ ক্রমে সরাসরি নিযুক্ত হতেন,

যদিও তার বদলি ও অপসারণ বা চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে প্রাদেশিক দিওয়ানের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকতো। মূলত সুবাগুলিতে ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে দিওয়ানের যে ভূমিকা ছিল, সরকার স্তরে এরও ছিল সেই একই ভূমিকা। নীচে তার ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

এক. 'নিগারনামা-ই-মুনশি' নামক গ্রন্থে 'দিওয়ান-ই-সরকার'-এর কাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য ছিল স্বীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে বিভিন্ন রাজস্ব দপ্তর এবং সেখানে কর্মরত অসংখ্য কর্মীবাহিনীর কাজের তদারকি। ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'তাঁহার কর্তব্য ছিল তত্ত্বাবধান করা এবং তাঁহার এলাকাধীন বিভিন্ন পরগণায় যে সকল কর্মচারিগণ কাজ করিতেন তাঁহাদের কাজের উপর নজর রাখা। কোন সরকারি কর্মচারী যাহাতে রায়তের নিকট হইতে উৎপন্নের অর্ধেকাংশের অধিক রাজস্ব হিসাবে আদায় না করেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য দেওয়ানের প্রতি আদেশ ছিল।'[৯১]

দুই. তার নিয়ন্ত্রণাধীন কর্মচারীদের কেউ রাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী কাজ করলে ও রায়তদের অনর্থক হয়রানি করার জন্য প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত হলে তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে বদলি বা অপসারণ করতে পারতেন। কোন কর্মচারী অর্থ তসরূপের ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে প্রতীয়মান হলে তিনি তাকে বা তাদেরকে দপ্তরে তলব পূর্বক কৈফিয়ত দাবি করতেন। এছাড়া পরগণাস্থ আমলগুজার বা আমিলরা যাতে অর্থ তসরূপের কাজে লিপ্ত না হয় সে জন্যে তিনি কানুনগো, চৌধুরি প্রভৃতির কাছ থেকে এই মর্মে মুচলেকা গ্রহণ করতেন যে, তারা এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত হওয়া মাত্র তাকে অবহিত করবে।

তিন. এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে 'দিওয়ান-ই-সরকারে'র দপ্তরে বেশ বড় সংখ্যক একদল কর্মীবাহিনী কাজ করতো। এরা বিভিন্ন সূত্রে এলাকার অনেক গোপন খবর জানতে পারতো যেগুলি সাধারণ প্রশাসনের লোকেরা অনেক সময় জানতে পারতো না। ফলে এ সকল খবরের মধ্যে যেগুলি সরকারের জন্য ক্ষতিকর ও জনস্বার্থ ও শৃঙ্খলাবিরোধী সেগুলি যথাসময়ে দিওয়ান ফৌজদারকে জানিয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় সহযোগিতা করতেন। দুরাচারী ব্যক্তি ও রাজবিদ্রোহীদেরকে চিহ্নিত করণের কাজেও তাকে ফৌজদারকে সময়ে সময়ে সহায়তা করতে হতো। বলাবাহুল্য এতে তারই লাভ হতো সবচেয়ে বেশি।

চার. সম্ভবত কোতওয়ালের অবর্তমানে তিনি বিচার বিভাগীয় ও পুলিশি দায়িত্বও পালন করতেন।[৯২]

যা হোক এখানে একটি কথা বলা দরকার যে, মোগল সরকার প্রশাসন সম্পর্কে 'আইন-ই-আকবরী'তে সমকালীন ইতিহাসকারের আশ্চর্যরকম নীরবতা, এবং একাধিক স্তরের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের সমান বা প্রায় একই ধরনের পদবি বা অভিধার লভ্যতা আমাদেরকে বাস্তবিকই 'দিওয়ান-ই-সরকারে'র বিস্তৃত ভূমিকা আলোচনায় বারিত করে তা বলাইবাহুল্য।

৯১ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৬৯
৯২ Mughal Polity, pp. 155-6.

পরগণা

সুলতানি শাসনামলের মতো মোগল যুগেও পরগণা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর প্রশাসনিক ইউনিট।[৯৩] মাঠ পর্যায়ে রায়তের সঙ্গে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন ও কৃষির উন্নয়নে প্রতিটি পরগণার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। ভারতীয় উপমহাদেশে সমগ্র মুসলিম শাসনামলের প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাসে পরগণার যে অবস্থান, সে সম্বন্ধে নির্দেশ করতে গিয়ে ড. কোরেশি বলেন, 'The parganah was the hub of rural administration under the Muslim rulers of the sub-continent. It was as important as the district under the British.'[৯৪]

মোগল যুগের পরগণাকে আরও অনেকেই আধুনিককালের জেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ড. এস. এ. রশীদ[৯৫], অধ্যাপক এস. এম. বার্ক[৯৬] প্রমুখ। কিন্তু ড. বেণীপ্রসাদ[৯৭] ও ড. সরকার[৯৮] মনে করেন এটি ব্রিটিশ আমলের 'তহসিল'-এর অনুরূপ ছিল। মোগল আমলে পরগণার অনুরূপ প্রশাসনিক ইউনিট হিশেবে 'মহাল'ও প্রচলিত ছিল। উল্লেখ্য পরগণার আরবি প্রতিশব্দ হলো মহাল।[৯৯] কতকগুলি গ্রামের সমন্বয়ে এক-একটি পরগণা বা মহাল গঠিত হলেও গ্রামগুলির সংখ্যার কোন সুনির্দিষ্টতা ছিল না। তবে সাধারণত ২০ থেকে ২০০টি গ্রাম, মৌজা বা 'দিহ' নিয়েই এগুলি গঠিত হতো বলা যায়।[১০০] প্রতিটি পরগণায় বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। কখনও কখনও একটি বিশেষ জনমণ্ডলী নিয়েই এগুলি গড়ে উঠতো। যেমন উত্তর ভারতে কিছু কিছু পরগণা শুধু রাজপুত বা জাট বা অনুরূপ জাতির লোকদের নিয়েই সৃষ্ট হয়েছিল এবং এরা পরস্পর শুধু সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালীই ছিল না, বরং নিজেদের মধ্যে বৈরীভাবও সময়ে-সময়ে জিইয়ে রাখতো।[১০১] স্বভাবতই এদের এই পারস্পরিক শত্রুতা ও একে-অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা সাধারণ রায়ত শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রসারিত হতো। এর ফলে তারাও অনেক সময় এক পক্ষের অংশ হয়ে অন্যপক্ষের বিরুদ্ধে কেবল লড়াই-ই করতো না, স্থানীয় সরকারি প্রশাসনের বিরুদ্ধেও বিভিন্ন পুরোনো অজুহাতে বিদ্রোহ করে বসতো, বা ভূমিরাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানাতো। তবে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে এই সমস্যা খালিশাবহুল পরগণাগুলিতে অপেক্ষাকৃত কম ছিল। যা হোক এখানে এ সমস্ত বিষয় উল্লেখ করার কারণ এই যে, মাঠ পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসন এবং

৯৩ আমাদের মতে প্রশাসনিক গুরুত্বের দিক দিয়ে পরগণা ছিল ইংরেজ আমলের মহকুমা প্রশাসনের অনুরূপ; তবে ভূমিরাজস্বের অধিক্ষেত্র ও আয়তনের দিক বিবেচনা করলে এটাকে বর্তমানের থানা বা উপজেলা সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে।

৯৪ The Administration of the Moghul Empire, pp. 231.

৯৫ The Mughal Empire, pp. 167.

৯৬ Akbar the Greatest Mogul, pp. 158.

৯৭ History of Jahangir, pp. 100.

৯৮ Mughal Polity, pp. 157.

৯৯ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩

১০০ The Mughal Empire, John F. Richards, pp. 79.

১০১ Ibid., pp. 79.

বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনকে যে নাজুক অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হতো, এবং ভূমিরাজস্ব প্রদাতাশ্রেণীর সঙ্গে যে কৌশলগত কিন্তু সদা সতর্কতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে কাজ করতে হতো সেটাই বুঝানো। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীদের কোন ভুল সিদ্ধান্ত বা ভুল পদক্ষেপ যে কোন সময় শান্তিপূর্ণ প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে পারতো। সুতরাং সহজেই অনুমেয় মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাসে পরগণা বা মহালের গুরুত্ব কী অপরিসীম ছিল।

পরগণা প্রশাসনের ভূমিরাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের কর্মকাণ্ড আলোচনার আগে আমরা এখানে দু'টি বিষয় পরিষ্কার করে নিতে চাই। প্রথমত মোগল পরগণা প্রশাসনের প্রধান কর্মচারী কে ছিলেন—'শিকদার', 'আমলগুজার' বা 'আমিল', না অন্যকেউ? দ্বিতীয়ত পর্যালোচ্য সময়ে পরগণা বা মহালের সংখ্যা। পরগণা প্রশাসনের প্রধান নির্বাহির পদবি নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে। জ্যেষ্ঠ মোগলদের মধ্যে সম্রাট বাবরের সময়ে সুলতানি শাসনামলের অনুসরণে পরগণার প্রধান প্রশাসনিক ও সামরিক অধিকর্তা ছিলেন 'শিকদার'।[১০২] এটি মোটামুটি সর্বজনগ্রাহ্য মত। তবে হুমায়ুনের আমলে শিকদারের পাশাপাশি কোথাও কোথাও পরগণা প্রধান হিশেবে 'আমিল'ও ছিলেন বলে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ উল্লেখ করেন।[১০৩] তবে সমগ্র মোগল যুগে কেউ বলেন ইনি ছিলেন 'আমিল' (যেমন ড. কোরেশি[১০৪]), কেউ 'আমলগুজার' (অধ্যাপক বার্ক[১০৫]), 'আমিল' ও 'আমলগুজার' (ড. সিদ্দিকী[১০৬], ড. রহিম[১০৭]), 'চৌধুরি' (ড. বেণীপ্রসাদ[১০৮]), 'শিকদার' (ড. কে.এম. করিম[১০৯], ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়[১১০] , ড. তপন রায়চৌধুরী[১১১] , ড. মহাজন[১১২], ড. আবদুল করিম[১১৩], ড. মীরা সিংহ[১১৪]), 'শিকদার' ও 'চৌধুরি' (ড. সরকার[১১৫]), 'জমিদার' বা 'দেশমুখ' (ড. ফারুকি[১১৬]), 'কানুনগো' (অধ্যাপক জাফফার[১১৭]) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সমকালীন কোন কোন দলিল-দস্তাবেজে শিকদার ও আমিল বা আমলগুজার কখনও কখনও প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও আমরা মনে করি যে, জ্যেষ্ঠ মোগলদের অধিকাংশ সময়ই এ দুই

১০২ Babur : Founder of the Mughal Empire in India, pp. 168.
১০৩ The Life and Times of Humayun, pp. 165.
১০৪ The Administration of the Moghul Empire, pp. 231-32.
১০৫ Akbar the Greatest Mogul, pp. 157.
১০৬ Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 80.
১০৭ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৭
১০৮ History of Jahangir, pp. 100.
১০৯ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 146.
১১০ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 47.
১১১ Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 58.
১১২ Mughal Rule in India, pp. 263.
১১৩ Murshid Quli Khan and His Times, pp. 62.
১১৪ Medieval History of India, pp. 380.
১১৫ Mughal Polity, pp. 158.
১১৬ Aurangzeb and His Times, pp. 444.
১১৭ The Mughal Empire, pp. 382.

পদবিধারী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ছিলেন—যেমন প্রতিটি সুবায় 'সুবাদার' ও 'দিওয়ান', সরকারে 'ফৌজদার' ও 'দিওয়ান-ই-সরকার' বা 'আমলগুজার', তেমনি পরগণায় (বা মহালে) 'শিকদার' ছিলেন দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের ও 'আমিল' বা 'আমলগুজার' ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের প্রধান। এখানে আমরা সেভাবেই আলোচনা করবো।

প্রধান প্রধান মোগল শাসকদের সময়ে সাম্রাজ্যে মোট পরগণার সংখ্যা বিভিন্ন রকমের ছিল, যদিও সত্য যে, এ সম্পর্কিত বিস্তারিত সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আবার এটাও ঠিক যে এই সংখ্যা সাম্রাজ্যের সীমা সম্প্রসারণ-সঙ্কোচনের সঙ্গে ওঠানামা করতো। ড. ঈশ্বরী প্রসাদের দেয়া তথ্য থেকে জানা যায়, সম্রাট হুমায়ুনের আমলে সমগ্র (তৎকালীন) মোগল সাম্রাজ্যে মোট ১,১৬,০০০টি পরগণা বা মহাল ছিল।[১১৮] 'আইন-ই-আকবরী'র রচনাকালে আকবরের সময়ে মোট পরগণা ও মহালের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩,০০৬টি ও ৩,২১০টি।[১১৯] এর মধ্যে ওড়িশার ৫টি সরকারের অধীনে বিন্যস্ত ৯৯টি ব্যতীত বাংলা সুবার ১৯টি সরকারের অধীনে ছিল ৬৮২টি।[১২০] তন্মধ্যে সরকার মাহমুদাবাদের অধীনে সর্বোচ্চ সংখ্যক ৮৮টি ও সর্বনিম্ন সরকার বাকলায় ৪টি।[১২১] পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের সময়ে বাংলার সরকার সংখ্যা বেড়ে যখন ৩৪টিতে দাঁড়িয়েছিল তখন স্বাভাবিকভাবে মহালের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। তখন মহাল ছিল সম্ভবত ১৩৫০টি।[১২২] এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড পরগণা বলতে ফৌজদারের অধীনে একটি প্রশাসনিক ইউনিট এবং মহালকে স্বতন্ত্র রাজস্ব ইউনিট[১২৩] হিশেবে উল্লেখ করলেও লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, 'আইনে' কোথাও এই ধরনের স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত পার্থক্য নির্দেশ করা হয়নি। সেখানে একই সুবার কোন সরকারকে যেমন অব্যবহিত পরবর্তী প্রশাসনিক স্তর হিশেবে পরগণায় বিভক্ত করা হয়েছে, তেমনি সেই সুবারই অন্য কোন সরকারকে মহালে বিভক্ত করার প্রমাণ বিদ্যমান। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে সুবা আজমির-এর নাম করতে পারি। এর আজমির সরকারের অধীনে দেখা যায় ২৮টি পরগণা, সরকার চিতোরে ২৬টি পরগণা, কিন্তু সরকার রণথম্ভরে ৭৩টি

১১৮ The Life and Times of Humayun, pp. 165.

১১৯ জ্যারেট অনূদিত ও যদুনাথ সরকার ব্যাখ্যাকৃত 'আইন-ই-আকবরী'র দ্বিতীয় খণ্ডে কিছু অস্পষ্টতা সত্ত্বেও কমবেশি এই পরিমাণই পাওয়া যায়।

১২০ ড. রহিম পরগণা বা মহাল সংখ্যা উল্লেখ করেছেন ৬৮৮টি (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭৩), এবং ড. অতুল সুর উল্লেখ করেন ৬৮৯টি (বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন, পৃষ্ঠা ২৯৯)। তবে ড. রহিম 'বাংলাদেশের ইতিহাসে' (পৃষ্ঠা ৩৪৬) এই সংখ্যা ৬৮২টি বলে উল্লেখ করেছেন। 'আইন' মতে এটিই সঠিক। পুরো তালিকা এখানে সন্নিবেশিত হলো : (১) সরকার উদম্বরে ৫২ (২) জান্নাতাবাদ বা লক্ষ্মণাবতী ৬৬ (৩) ফতেহাবাদ ৩১ (৪) মাহমুদাবাদ ৮৮ (৫) খলিফাতাবাদ ৩৫ (৬) বাকলা ৪ (৭) পূর্ণিয়া ৯ (৮) তাজপুর ২৯ (৯) ঘোড়াঘাট ৮৪ (১০) পিঞ্জরা ২১ (১১) বারবকাবাদ ৩৮ (১২) বাজুহা ৩২ (১৩) সোনারগাঁও ৫২ (১৪) সিলেট ৮ (১৫) চট্টগ্রাম ৭ (১৬) শরিফাতাবাদ ২৬ (১৭) সুলায়মানাবাদ ৩১ (১৮) সাতগাঁও ৫৩ ও (১৯) মান্দারণ ১৬= ৬৮২টি।

১২১ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 145 & 147.

১২২ The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 143.

১২৩ See, Mughal Polity, pp. 157.

মহাল, সরকার যোধপুরে ২২টি ইত্যাদি।[১২৪] পরগণা ও মহালগুলিতে রাজস্ব ও অন্য সব বিষয়ের যেমন সুয়ুরগল, বিঘার পরিমাণ, সৈন্যসামন্তের সংখ্যা ইত্যাদির যে তথ্য দৃষ্ট হয় তাতে এ দু'টির মধ্যে মোরল্যাণ্ড কথিত পার্থক্যের লেশ মাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরন্তু পরগণা ও মহালের আয়তনগত বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ্য করা যায় না। কারণ কোন সরকারে কখনও পরগণার চেয়ে যেমন মহালের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি ছিল অর্থাৎ সাধারণভাবে ধরতে পারি যে পরগণা এক্ষেত্রে আয়তনে কিছুটা হলেও বড় ছিল, তেমনি, অন্যত্র এর একেবারে ভিন্ন চিত্রও ছিল। উদাহরণ হিশেবে প্রথমে অযোধ্যা সুবার কথা বলতে পারি। এর ৫টি সরকারে যদিও ছিল ৩৮টি পরগণা[১২৫], কিন্তু মহাল ছিল ১৩৩টি।[১২৬] অর্থাৎ পরগণা এখানে যে মহাল অপেক্ষা বৃহৎ তা সহজেই অনুমেয়। আবার অন্যদিকে সুবা গুজরাটে দেখা যায় এর ৯টি সরকারের অধীনে ১৯৮টি পরগণা[১২৭] থাকলেও মহাল ছিল বস্তুত ১৩৮টি।[১২৮] এক্ষেত্রে পরগণার চেয়ে মহাল যে বড় ছিল সেটা না বললেও চলে। সুতরাং পরগণা ও মহালগুলির মধ্যে মোরল্যাণ্ড প্রস্তাবিত বিভেদের কথা আমরা অস্বীকার করে বরং বলতে পারি সমকালীন ইতিহাসকার পরস্পর বদলিযোগ্য শব্দযমজকে নিছক একে-অপরের প্রতিশব্দ স্বরূপই 'আইনে' ব্যবহার করেছিলেন। অন্তত আকবরের যুগে এদের মধ্যে এই জাতীয় কোন পার্থক্য ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

শিকদার

পরগণা প্রশাসনে মূলত দু'ধরনের রাজকর্মচারী ছিলেন—এক. কেন্দ্রীয় সরকারকর্তৃক নিযুক্ত যেমন শিকদার, আমলগুজার বা আমিল, বিতিকচি বা কারকুন, খাজানাদার বা ফোতাদার, আমিন এবং স্থানীয়ভাবে নিযুক্ত যেমন চৌধুরি, কানুনগো প্রভৃতি। তবে শেষোক্ত কর্মচারীরাও ছিল স্থায়ী প্রকৃতির।[১২৯] শিকদার ছিলেন দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের প্রধান (Executive Head)। তার মুখ্য কাজ ছিল ফৌজদারের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে[১৩০] পরগণার অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা।[১৩১] পরগণা বা মহালের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলের অপেক্ষাকৃত বড় গ্রাম বা শহরসদৃশ এলাকায় (কসবা'য়) তার সদর-দপ্তর

১২৪ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 278, 279 & 281.
১২৫ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 184.
১২৬ The Ain-I-Akbari, Vol. II.; সরকার অযোধ্যায় মহাল সংখ্যা ২১টি, গোরকপুর ২৪, বাহরাইচ ১১, খয়রাবাদ ২২ ও লক্ষ্মৌ ৫৫ = ১৩৩টি।
১২৭ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 257.
১২৮ The Ain-I-Akbari, Vol. II.; সরকার আহমদাবাদে ২৮, পঠ্‌ঠান (উত্তর) ১৬, নন্দদ (উত্তর) ১২, বরোদা (দক্ষিণ) ৪, ব্রোচ (দক্ষিণ) ১৪, চাম্পানের ৯, সুরাট ৩১, গোদরা ১২ ও সোরাত ব সুরাট (কাথিয়াওয়াড়) ১২ = ১৩৮টি।
১২৯ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 21.
১৩০ Mughal Polity, pp. 158.
১৩১ The Provincial Government of the Mughals, pp. 196; Mughal Polity, pp. 158; The Mughal Government, pp. 88.

থাকতো[১৩২], গ্রামের নামেই পরগণার নামকরণ করা হতো যাকে মূলত 'পারওয়া' বলা হতো।[১৩৩] এখানে বসেই তিনি তার যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্য সুচারুরূপে পালন করার চেষ্টা করতেন। তবে যেহেতু পরগণা-স্তরে বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য মোগল প্রশাসনিক অবকাঠামোয় অন্য কোন কর্মচারীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না, স্বভাবতই বলা যায় প্রশাসনের মুখ্যাধিকারিক হিশেবে শিকদারকেই এই দায়িত্ব পালন করতে হতো। তার কাজের মধ্যে তাই একাধারে সরকার-স্তরীয় ফৌজদার ও কোতওয়ালের ভূমিকার সমন্বয় ঘটেছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। ড. সরণ বলেন, 'the shiqdar combined the functions which were divided in the sarkar between the faujdar and kotwal. He was thus in charge of law and order as well as criminal justice in the parganah.'[১৩৪] তবে বিচারিক কাজকর্মে তিনি খুব সীমিত ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন।[১৩৫] যেহেতু সুনির্দিষ্ট প্রথা-পদ্ধতি ও আইনকানুন মেনে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট পেশার কোন রাজকর্মচারী (কাজি ইত্যাদি) পরগণায় নিয়োগ করা হতো না অথচ বিচার কার্য সম্পাদন করা প্রয়োজন, সেহেতু অপেক্ষাকৃত সীমিত ক্ষমতা দিয়ে শিকদার কর্তৃক এই দায়িত্ব পালনে মোগলদের অগ্রসর চিন্তারই প্রতিফলন ঘটে। না হলে বল্গাহীন অশ্বের মতো শিকদারের পক্ষে অধিক ক্ষমতায় স্বৈরাচারী হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। এমনিতেও তারা নিতান্ত কম ক্ষমতা ভোগ করতো না। বরং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে মুকুটবিহীন অঘোষিত রাজার মতোই ছিল এদের এক-একজনের আচার-আচরণ।

শিকদারের অন্য একটি কাজ ছিল নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা পরগণাস্থ জনসাধারণের নাম, পেশা এবং বাসস্থানভিত্তিক সেনসাস তালিকা তৈরি করা।[১৩৬] তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বাইরে তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ ছিল তা অনেকটা সুবায় সুবাদারের, সরকারে ফৌজদারের কাজের অনুরূপ। তিনি পরগণা বা মহালের অভ্যন্তরে নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে যে সব এলাকায় রায়তরা অনেক সময় ভূমিরাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃত হতো বা বিদ্রোহ করতো তাদেরকে দমনের কাজে পরগণার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতেন।[১৩৭] সত্যি বলতে এটিও ছিল তার আইনশৃঙ্খলা রক্ষা কাজেরই অংশবিশেষ।

১৩২ The Mughal Empire, John F. Richards, pp. 80.

১৩৩ 'Meaning and Usage of Some Terms of Land Revenue Administration', a treatise by Dr. Qeyamuddin Ahmad, published in 'Medieval India : A Miscellany', Vol. II., pp. 279.

১৩৪ The Provincial Government of the Mughals, pp. 196.

১৩৫ The Provincial Government of the Mughals, pp. 197; The Mughal Government, pp. 89; The Provinces of Bihar and Bengal under Shahjahan, pp. 146; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 47.

১৩৬ Mughal Polity, pp. 158; The Mughal Government, pp. 88.

১৩৭ The Provincial Government of the Mughals, pp. 196-97.

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে সাধারণ প্রশাসনের মুখ্য নির্বাহি ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি[১৩৮] হিশেবে পরগণার অন্যান্য সরকারি বিভাগ ও ভূমিরাজস্ব আদায়কারী জমিদারশ্রেণী প্রভৃতির ওপর শিকদারের একটি সর্বজনীন আবেক্ষণিক ক্ষমতা (General Supervision) থাকতো।[১৩৯]

আমিল বা আমলগুজার

সমগ্র মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ ছিল আমিল বা আমলগুজারের। যদিও একই নামে উপরের স্তরেও এই পদবির রাজকর্মচারী ছিল বলে ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ ধারণা করেন এবং তা খুব অমূলকও মনে হয় না, তথাপি এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে পরগণা আমিল বা আমলগুজারই ছিলেন আপামর রায়তের সবচেয়ে কাছের ভূমিরাজস্ব কর্মকর্তা। সেই হিশেবে তার কাজের পরিধি যেমন ছিল অত্যন্ত ব্যাপক তেমনি জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'The Amil had multifarious duties to discharge.'[১৪০] তার এই জটিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্বাহের কারণে অধ্যাপক বার্ক তাকে ইংরেজ আমলের জেলা কালেকটরের পথিকৃৎ হিশেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'At the parganah level the most important official was the AmlGuzar (Collector of revenue). His duties, in fact, were wider than the mere collection of revenue. He was the forerunner of the collector of a district in the British administration of India, exercising revenue as well as executive and magisterial powers. It was his duty to assess and collect revenue; to protect the rights of the cultivator and make himself easily accessible to him; to encourage greater production by money to husbandmen and bringing wasteland under cultivation.'[১৪১] আমাদের মনে হয় অল্প কথায় বার্ক খুব চমৎকার বলেছেন। তথাপি আমরা আমিল বা আমলগুজারের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে আর একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে চাই।

আমিল বা আমলগুজারের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল পরগণা বা মহালের ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায় করা। তার অধীন বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীরা যাতে যথাসময়ে ক্ষেতে-মাঠে গিয়ে প্রয়োজনে রায়তদের সঙ্গে কথা বলে ও তাদের চাষযোগ্য জমির হাল-হকিকত যাচাই করে রাষ্ট্র নির্ধারিত প্রথা-পদ্ধতিতে 'জমা'* নিরূপণ করে—তা আমিলকে

১৩৮ ড. সরণ বলেন, 'In matters pertaining to general administration the shiqdar and not the amil or any other official, was the representative of the government.' (The Provincial Government of the Mughals, pp. 197).

১৩৯ The Provincial Government of the Mughals, pp. 197; The Mughal Government, pp. 88.

১৪০ The Mughal Empire, pp. 321.

১৪১ Akbar The Greatest Mogul, pp. 157-58.

* এই 'জমা'কে সাধারণত 'তুমার-ই-জমাবন্দি' বা 'জমা-তুমারি' বলা হতো। এটি প্রস্তুত হওয়ার সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে এর একটি 'Abstract' কেন্দ্রীয় দিওয়ানের দপ্তরে পাঠাতে হতো। (*The Mughal Government, pp. 83; Bengal in the Reign of Aurangzib,*

প্রত্যক্ষভাবে পরখ করতে হতো। অতঃপর বছরের নির্দিষ্ট সময়গুলোতে অর্থাৎ ফসল পাকা ও কাটার মৌসুমে রায়তের অঙ্গীকার মতে শস্যে দেয় হলে উৎপাদিত শস্যে বা নগদে তা উশুলের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হতো। মোগল রাজস্ব আয়ের সর্বপ্রধান ও অনেক ক্ষেত্রে প্রায় একক উৎস ছিল যেহেতু ভূমিরাজস্ব, স্বভাবতই রায়ত যাতে করে প্রতিনিয়ত অধিক পরিমাণ ভূমি বা ভূমিখণ্ড চাষাবাদের আওতায় এনে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটায় ও রাজস্ব আয়ের পথ সদা সচল ও উর্ধগতি-সম্পন্ন রাখে, সেটা নিশ্চিত করাই ছিল আমিল বা আমলগুজারের গুরুদায়িত্ব।[১৪২] 'পাইকাস্ত' বা অস্থায়ী শ্রেণীর রায়তদেরকে বিভিন্ন প্রকারের সুযোগ-সুবিধা বা 'ইনসেনটিভ' দিয়ে তিনি বনজঙ্গল পরিষ্কার করিয়ে 'নয়াবাদ' সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। তবে অনাবাদি ও পতিত জমিতে চাষ হোক বা না হোক, 'পোলাজ' শ্রেণীর ভূমি যেন কোন অবস্থায়ই অনাবাদি না থাকে, অর্থাৎ প্রতি বছরই তাতে যথাসময়ে যেন চাষ হয় এবং তা থেকে রাষ্ট্রীয় পাওনা নিয়মিত উশুল হয়, সে বিষয়ে আমিল বা আমলগুজারকে সার্বক্ষণিক কঠোর নজর রাখতে হতো। খরা, বন্যা বা অতিবৃষ্টির ফলে কোন এলাকায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হলে সেক্ষেত্রে আমিল পরগণা-আমিনকে দিয়ে সরেজমিনে অবস্থা যাচাই করে ক্ষতিগ্রস্তদের 'তাকাবি' ঋণ দানের ব্যবস্থা করতেন এবং এভাবে রায়তকে নতুন করে উঠে দাঁড়াতে ও উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করতেন।[১৪৩] উল্লেখ্য আমিলের সময়োপযোগী দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণে অবহেলা বা তার উদ্যোগের অভাবে এ সকল ক্ষেত্রে ফসলোৎপাদন কম হলে তাকে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হতো।[১৪৪] সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সর্বাবস্থায় চাষাবাদের প্রক্রিয়া চালু রাখাই ছিল রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব নীতির মূল লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত ভূমিরাজস্ব বাবদ আদায়কৃত শস্য ও নগদ অর্থ যাতে নিয়মিতভাবে রাষ্ট্রীয় শস্যাগারে ও আমিন ও ফোতাদারের যৌথ জিম্মায় কোষাগারে সংরক্ষিত হয় সেটা দেখাও ছিল আমিলের অন্যতম দায়িত্ব।[১৪৫] আমিল নিজ সীলমোহরে কোষাগার তালাবদ্ধ করতেন।[১৪৬] পরে জমাকৃত রাজস্ব তিনি শিকদারের কাছ থেকে সৈন্য নিয়ে তাদের

---

p. 53). পরবর্তীকালে এর অনুকূলে ভূমিরাজস্ব আদায়-পর্ব শেষ হলে আদায়-বহি ('রোজনামচা' ও 'অরসথ') 'মুহাসিব' প্রভৃতি স্থানীয় স্থায়ী রাজস্ব কর্মচারীদের দিয়ে পরীক্ষা করানো হতো। (Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 20). গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যতীত এতে কোন কম বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে আমিলকেই এর জন্যে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হতো। উল্লেখ্য আমিল ভূমিরাজস্ব আদায় বাবদ যে কমিশন (সাধারণত আদায়ের ৫% ভাগ, Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 42) বা এর কিছু কমবেশি (Agrarian Relations and Early British Rule in India, p. 20) পেতেন তা থেকেই মূলত ঘাটতির সম-পরিমাণ অর্থ কেটে নেয়া হতো। কখনও কখনও তাকে বন্দি করাসহ শারীরিক শাস্তিও দেয়া হতো।

১৪২ ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'The primary function of the Amil was to ensure *the cultivation of all cultivable land...*' (Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 81).

১৪৩ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 46-50.

১৪৪ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 20.

১৪৫ Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 82.

১৪৬ Ibid., pp. 82.

প্রহরায় ফোতাদারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের দপ্তরে তথা রাজকোষে পাঠাতেন। তবে সাধারণত জমাকৃত নগদ অর্থের পরিমাণ ২ লক্ষ 'দাম' (৫,০০০ টাকা) হলেই তা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিতে হতো। সেই সঙ্গে প্রেরিত অর্থের যথাযথ পরিমাণ-জ্ঞাপক একটি স্মারক-পত্র বা 'মেমোর‍্যানডাম'ও সংযুক্ত করে দিতে হতো।[১৪৭] বলাবাহুল্য এ ব্যাপারে কোনরূপ ব্যত্যয় বা অজুহাত সহ্য করা হতো না।

তৃতীয়ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে আমিল সময়ে-সময়ে নিম্নস্তরের রাজস্ব কর্মচারীদের দপ্তর ও তাদের কার্যাবলি পরিদর্শনে বের হতেন। পরিদর্শনকালে শুধু কর্মচারীদের কাজের খুঁটিনাটিই পরীক্ষা করতেন না, সেই সঙ্গে সুয়ুরগল[১৪৮] ও মাদাদ-ই-মাশ[১৪৯] ভূমিরাজস্ব প্রভৃতি এবং রায়তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন ও কৃষির হাল-হকিকত সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতেন। পরিদর্শনকালে কর্মচারীদের কাজে কোন ইচ্ছাকৃত শৈথিল্য ও আইন লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হলে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন; অথবা স্বীয় ক্ষমতা বহির্ভূত ক্ষেত্রে উর্ধতন মহলে রিপোর্ট পাঠাতে পারতেন। তবে সর্বাবস্থায়ই তার পরিদর্শনের একটি লিখিত বিবরণী আমিলকে কেন্দ্রীয় দপ্তর ও স্থানীয় রেজিস্ট্রি অফিসে প্রেরণ করতে হতো। প্রসঙ্গত আরও উল্লেখ্য যে আমিল তার এই পরিদর্শনকালে অধীন কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনরূপ অর্থ ও উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারতেন না।[১৫০] উপরন্তু কৃষকদের কাছ থেকেও তাকে এই জাতীয় কিছু গ্রহণের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হতো।[১৫১]

চতুর্থত পরগণার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রয়োজনে শিকদার যেমন আমিলকে প্রায়শই সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন, তেমনি শিকদারকেও তার আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে পালন করার স্বার্থে আমিল বিভিন্ন সহায়তা দিতেন।[১৫২] আমিল এই সহায়তা কখনও লোকবল সরবরাহ করে, আবার কখনও জনস্বার্থ-হানিকর গোপন সংবাদ দিয়ে করতেন। তিনি নিজেও কখনও কখনও চোর-ডাকাত ও আইন অমান্যকারীদেরকে শাস্তি দিতেন।[১৫৩] তবে তার এই শেষোক্ত ভূমিকা বা কর্ম-তৎপরতা এমন হতো না যাতে সেটা পুরোপুরি পুলিশি বা কোতওয়ালের কাজের সম-পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। ড. রফি আহমদ আলাভি তাই ঠিকই বলেছেন, 'But it appears as if they (Amils) did not undertake extensive police and municipal functions of the Kotwal on a large scale.'[১৫৪]

১৪৭ Akbar The Greatest Mogul, pp. 158; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp.53. 'আইনে' (Vol. I., pp. 14) উল্লেখ করা হয়েছে, 'Whenever a (provincial) treasurer had collected the sum of two lakhs of dams, he had to send it to the Treasurer General at the Court, together with a memorandum specifying the quality of the sum.'

১৪৮ The Mughal Government, pp. 84; Mughal Polity, pp. 155.

১৪৯ Akbar The Greatest Mogul, pp. 158.

১৫০ The Mughal Government, pp. 84.

১৫১ The Mughal Empire. Dr. Prasad, pp. 322.

১৫২ The Provincial Government of the Mughals, pp. 196.

১৫৩ Studies in the History of Medieval Deccan, pp. 86.

১৫৪ Ibid., pp. 86.

পঞ্চমত 'চৌধুরি', 'কানুনগো', 'মুকাদ্দাম' প্রভৃতি আধা-সরকারি কর্মচারীদের পারিতোষিক বা পারিশ্রমিকও আমিলকে নির্ধারণ করতে হতো। এদের সাধারণ কমিশন ছিল 'জমা' উশুলের শতকরা ২ $\frac{১}{২}$ ভাগ।[১৫৫] আমিল বছর শেষে মোট ধার্য রাজস্ব সংগৃহীত হওয়ার পর এগুলি তাদেরকে যথাযথ হিসাব নিকাশ করে পরিশোধ করতেন।[১৫৬]

ষষ্ঠত ভূমি জরিপের মৌসুমে আমিল সার্ভেয়ার, জমা নির্ণায়ক প্রভৃতির কাছ থেকে নির্ধারিত 'জামানত' গ্রহণ করতেন এবং তারা যাতে জরিপ কর্মে এক বিঘা ভূমিও গোপন করতে না পারে সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[১৫৭]

পরিশেষে আমরা দেখতে পাই, মোগল আমলে বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ মোগলদের সময়ে 'আমিল'কে যেহেতু সর্বাবস্থায় 'কৃষকের একজন বন্ধু' ('a friend of the agriculturist')[১৫৮] রূপে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হতো, এবং সমগ্র ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাটিই মুখ্যত তার 'efficiency, competence and resourcefulness'-এর ওপর অনেকখানি নির্ভর করতো[১৫৯] , স্বভাবতই এ কথা বলা যায়, 'Thus Amil was an important officer of the Mughal administration—an instrument through which the Central government felt the pulse of the people—and through him it looked after its economic interests in the country-side.'[১৬০]

আমিন

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় 'আমিন' শব্দটি বহুলব্যবহৃত। বিশেষ করে ভূমি জরিপ-এর সঙ্গে যারই কিছুটা পরিচয় রয়েছে তিনিই এই পদবিধারী ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে সম্যক অভিহিত। তবে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় আমিনের যে ভূমিকা দেখা যায় তাতে প্রতীয়মান হয় তার কাজের ক্ষেত্র শুধু জরিপের মধ্যেই সীমিত ছিল না, বরং কখনও কখনও তা আরও ব্যাপক ও জটিল ছিল।

'আমিন' আরবি শব্দ। প্রয়োগানুযায়ী এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে, যেমন 'তথাস্তু, বিশ্বস্ত, সত্যবাদী, জমি জরিপ কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, সালিসী বিচারক'[১৬১] । আমাদের পর্যালোচ্য আমিন শেষোক্ত দুই অর্থে গ্রহণীয়।

১৫৫ The Wonder That Was India, Vol. II., pp. 186.
১৫৬ Land Revenue Administration under the Mughals, pp.82.
১৫৭ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 322.
১৫৮ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 46
১৫৯ ড. রিজভি বলেন, 'The system's success depended upon the efficiency, competence, and resourcefulness of the amalguzar or the pargana revenue collectors, who were obliged to act in a friendly fashion to the peasants.' (The Wonder That Was India, Vol. II., pp. 186).
১৬০ The Mughal Government, pp. 85.
১৬১ বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ, পৃষ্ঠা ২৪

সুলতানি যুগের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অনেক পদ-পদবি আকবর হুবহু অক্ষুণ্ন রাখলেও তাঁর সময়ে সম্ভবত আমিন পদের গুরুত্ব লোপ পেয়েছিল।[১৬২] এর মূল কারণ হতে পারে আমিনের কাজের প্রায় সবটুকু আমিল নামীয় কর্মচারীর ওপর ন্যস্তকরণ। পরবর্তীকালে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে আমিন আবার স্ব-মূর্তিতে আবির্ভূত হয়।[১৬৩] এবং আওরঙ্গজেবের সময়ে তার কাজের গুরুত্ব ও ব্যাপকত্ব যে বেড়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রসিক দাসকে লিখিত পত্রে একাধিকবার 'আমিন' শব্দের ব্যবহার থেকে। যা হোক এখানে আমরা মোগল আমলের ভূমি জরিপ কর্মচারী হিশেবে আমিনের ভূমিকা ও তাদের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করবো।

আমিনের মুখ্য কাজ ছিল সরেজমিনে চাষযোগ্য জমি পরিমাপ করে ভূমিরাজস্ব নিরূপণ করা। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'আমীনের দায়িত্ব ছিল জমি মাপ করা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাপ করা।...... রাজস্ব নির্ধারণের জন্য জমি পরিমাপ করা হ'ত।..... পরিমাপ করাই ছিল তার কাজ।'[১৬৪] বছরের শুরুতে প্রতিটা গ্রাম এবং গ্রামের ভিত্তিতে সমগ্র পরগণা বা মহালে কী পরিমাণ ভূমিরাজস্ব ধার্য করা হবে, প্রাপ্ত তথ্য-পরিসংখ্যানের আলোকে তিনি তা নিরূপণ করে আমিলের দপ্তরে প্রেরণ করতেন। কোন ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ থাকলে তিনি সংশ্লিষ্ট জমি বা জমিখণ্ড পুনঃ জরিপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। উল্লেখ্য আমিন ও তার সহযোগীদের প্রস্তাবিত রাজস্ব কোন গ্রাম বা সেখানকার অধিবাসীদের কিয়দংশ দিতে অস্বীকৃত হলে তারা ভূমিরাজস্ব নিরূপণের অন্য যে কোন প্রণালী যেমন ফসল ভাগ ইত্যাদি বেছে নিতে পারতো।[১৬৫]

আমিনের উপরিউক্ত মূল কাজের বাইরে তার আরও কিছু ছোটখাট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল।

এক. পরগণার ভূমিরাজস্ব বিষয়ে রায়ত ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন প্রকার বিরোধ সৃষ্টি হলে সেক্ষেত্রে আমিনকেই তার মীমাংসা করতে হতো। সম্ভবত তার কাজের ধরন ও অভিজ্ঞতাই তাকে এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সহায়ক হয়েছিল। রায়তের ওপর যেন অন্যায় জুলুম না হয়, এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রের স্বার্থও অক্ষুণ্ন থাকে, তিনি সেভাবেই উভয়পক্ষের সমস্যা মিটানোর চেষ্টা করতেন। উপরন্তু বন্যা, খরা, বা অন্য কোন দুর্যোগে কৃষকের ফসল হানি বা উৎপাদন তুলনামূলকভাবে কম হলে আমিন তা সরেজমিনে যাচাই করে রায়তের কোন্ ভূমির রাজস্ব পুরো মওকুপ বা কম হবে বা আদৌ হবে না, এবং

১৬২ Mughal Polity, pp. 158। অবশ্য ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী সম্রাট আকবরের আমলে প্রাদেশিক স্তরে দিওয়ান, বকশি ও সদর-এর মতো অন্যান্য দায়িত্বপূর্ণ কর্মচারীর পাশাপাশি আমিনও ছিলেন সেটা প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন। (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৩)। কিন্তু পরগণার মতো প্রশাসনের নিম্নস্তরে আমিলের বর্তমানে আমিনের কাজের ক্ষেত্র বিশেষ না থাকায় ধারণা করা যায় আকবরের রাজত্বকালে মোগল পরগণা-আমিনের পদ বিলুপ্ত হয়েছিল। অবশ্য এই ধারণা মধ্যযুগীয় বাস্তবতায় আপেক্ষিক অর্থে গ্রহণ করাই সমীচীন।

১৬৩ Mughal Polity, pp. 158.

১৬৪ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১

১৬৫ The Agrarian System, pp. 135.

তৎসহ রায়ত 'তাকাবি' ঋণ পাওয়ার যোগ্য কি-না, ইত্যাদি বিষয়ে মতামত দিয়ে রিপোর্ট পাঠাতেন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ হিশেবে আমিলের দপ্তরে।

দুই. আমিন পরগণার সরকারি কোষাগারের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আমিল ও ফোতাদারের সঙ্গে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করতেন। সরকারি অর্থ-সম্পদ দেখভালে এটি ছিল তার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

তিন. আমিনের কাজ ভূমিরাজস্ব আদায়ের সাথে সম্পর্কিত না হলেও তিনি এই বিষয়েও বেশ একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করতেন। আমিল বা আমলগুজার (করোড়ির ক্ষেত্রে করোড়ি), চৌধুরি, কানুনগো, মুকাদ্দাম, জমিদার প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব আদায়ের সময়ে যেন রায়তদের কাছ থেকে কোনরূপ অবৈধ কর বা সেস আদায় করতে না পারে সে সম্পর্কে তাদের ওপর আমিন গোপনে নজর রাখতেন। তাদের এই জাতীয় কাজ সনাক্ত হওয়া মাত্র তিনি উর্ধতন মহল বরাবরে তা লিখে জানাতেন।

চার. ছোটখাট পরগণা বা মহালে আমিন ভূমিরাজস্ব বিভাগের মুখ্যাধিকারিকরূপেও কাজ করতেন। কিছু কিছু পরগণা বা মহাল ছিল যেগুলিতে কাজের চাপ কম ছিল, এবং আমিল না থাকলেও সেখানে ভূমিরাজস্ব সম্বন্ধীয় কাজকর্মে বিশেষ অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, বস্তুত এ জাতীয় পরগণায় আমিল ও আমিনের পদ পুরোপুরি একাকার হয়ে গিয়েছিল।[১৬৬] এক অর্থে এই পরগণাগুলির সাধারণ প্রশাসনের প্রধান নির্বাহি হিশেবেও আমিন কাজ করতেন।[১৬৭] এ অবস্থায় আমিনের পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা তার স্বাভাবিক মাত্রাকে অতিক্রম করে যেতো।

পরগণা-আমিনের বাইরেও আমরা পর্যালোচ্য সময়ে কয়েক ধরনের আমিনের দেখা পাই।[১৬৮] যেমন : প্রথমত এমন এক দল আমিন যারা রাজ আদেশে যে কোন সময়ে যে কোন স্থানে বিরোধ মিটানোর কাজে নিযুক্ত হতো। দ্বিতীয়ত এমন আমিন যারা সম্রাট কর্তৃক প্রদেশে সরকারি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রেরিত হতো, সেখানে কর্মরত সুবাদারের কাজকর্ম ও আচারব্যবহারের কোনরূপ দুর্বল দিক উদ্‌ঘাটিত হলে তা তৎক্ষণাৎ সম্রাটের গোচরে আনতো ও দরকারি রেকর্ডপত্র দেখাশুনা করতো। তৃতীয়ত প্রাদেশিক সরকার কর্তৃকও সময়ে-সময়ে দূরবর্তী এলাকার প্রজা-বিরোধ তদন্তের জন্যে আমিনদের নিযুক্ত করা হতো। এরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তদন্ত পূর্বক যে রিপোর্ট দিতেন তা সরকারের পরবর্তী করণীয় নির্ধারণে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতো।

বিতিকচি বা কারকুন

'বিতিকচি' (প্রধান হিসাব-লেখক) পদবির প্রচলন মোগলদের সময় থেকে। আগে এই পদটির নাম ছিল 'কারকুন'।[১৬৯] সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়েও কারকুন পদবির প্রচলন

১৬৬ The Administration of the Moghul Empire, 237; Mughal Polity, pp. 158.
১৬৭ Mughal Rule in India, Edwardes & Garrett, pp. 206.
১৬৮ Dr Keyamuddin in 'Medieval India : A Miscellany', Vol. II., pp. 277.
১৬৯ ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'পরগণার ভূমি-রাজস্ব প্রশাসনে কারকুন একজন গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী ছিলেন।' (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৪)

লক্ষ্য করা যায়।[১৭০] যতো দূর জানা যায় ভারতে মুসলিম শাসনের শুরু থেকেই 'কারকুন' পদ ছিল।[১৭১] সেই দিক দিয়ে বিচার করলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিতিকচির কাজ খুব পুরোনো, অন্তত সাতশ' বছরের তো বটেই। সম্রাট শেরশাহের রাজত্বকালে প্রতি পরগণায় দু'জন করে 'কারকুন' নিযুক্ত হতো। এদের একজন 'কাগজ-ই-খাম' (হিন্দিতে 'কাচ্চা-বহি', বাংলায় 'খসড়া') লিখতেন ও অন্যজন ফারসি ভাষায় তার অনুলিপি প্রস্তুত করতেন।[১৭২] এই ধারা পরবর্তীকালেও অব্যাহত ছিল, তবে কারকুন বা বিতিকচি মোগলদের সময়ে সর্বদা দুই জন ছিল না বলেই মনে হয়। ড. কোরেশি বলেন, 'Instead of the two karkuns in each parganah, one for keeping the records in Persian and the other in Hindi, Akbar kept only one bitikchi who kept the records in Persian.'[১৭৩] ড. জগদীশ নারায়ণ সরকারও কোরেশির এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত।[১৭৪] আকবরের সময়ে একজন বিতিকচি বা কারকুন থাকার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি এই যে, তাঁর রাজস্বমন্ত্রী টোডরমল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় হিসাব লেখার কাজে ফারসি ভাষা ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছিলেন। স্বভাবতই ফারসি ভাষাভিজ্ঞ একজন লোক দিয়েই লেখার কাজ চলে যেতো। ড. ইরফান হবিবও এ মত পোষণ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'আকবরের রাজত্বের ২৭তম বছরে আমিল-এর সঙ্গে যুক্ত দুজন বিতিকচি-র বদলে তিনি রেখেছিলেন মাত্র এক জন—এই ঘটনাটি তার দরুণও হয়ে থাকতে পারে।'[১৭৫] তবে ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী এঁদের এই ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে 'আইন-ই-আকবরী' (৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮১)-র সূত্র উল্লেখ পূর্বক বলেন, 'খালিসে আমিলের অধীনে কারকুন ও খাস-নবিশ নামক দুইজন 'বিতিকচি' থাকিতেন।'[১৭৬] সেক্ষেত্রে দুজন বিতিকচির একজন সম্ভবত স্থানীয় ভাষায় (Vernacular) এবং অন্যজন ফারসি তথা সরকারি ভাষায় হিসাব লেখার কাজ করতেন। যা হোক আমরা এখানে বিতিকচি'র কাজের সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করবো। অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার মতো তথ্য-প্রমাণও আমাদের হাতে নেই।

স্থানিক গুরুত্বের দিক থেকে ড. কোরেশি বিতিকচিকে পরগণা-আমিলের পরবর্তী পদের কর্মচারী হিশেবে চিহ্নিত করেছেন।[১৭৭] তিনি ছিলেন একাধারে প্রধান হিসাব-রক্ষক বা দলিল-লেখক ও পরগণা-রেজিস্ট্রার।[১৭৮]

প্রধান হিসাব-রক্ষক হিশেবে তার মুখ্য কাজ ছিল পরগণা-স্তরে রাষ্ট্র তথা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে রায়তদের মধ্যে সম্পাদিত সকল ধরনের লেনদেনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব

১৭০ The Administration of the Moghul Empire, pp. 235.
১৭১ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২
১৭২ Sher Shah and His Times, Dr. KalikaRanjan Qanungo, pp. 311.
১৭৩ The Administration of the Moghul Empire, pp. 235.
১৭৪ Mughal Polity, pp. 158.
১৭৫ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৯৯
১৭৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৪
১৭৭ The Administration of the Moghul Empire, pp. 235.
১৭৮ Ibid., pp. 235.

সংরক্ষণ করা, যাতে করে আমিলরা পরবর্তীতে যে কোন সময়ে এগুলির সাহায্যে গ্রাম-প্রধান, পাটোয়ারি, মুকাদ্দাম প্রভৃতির হিসাবের খাতা চুলচেরা পরীক্ষা করে তাদের ফাঁকি ও গরমিল উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হয়। তিনি রায়তদের নাম, দেয় রাজস্বের পরিমাণ, তাদের বরাবরে প্রদত্ত ভূমিস্বত্বের পরিচিতি ইত্যাদিও সংরক্ষণ করতেন।

অন্যদিকে পরগণা-রেজিস্ট্রার হিশেবে বিতিকচিকে রাষ্ট্রকর্তৃক জারিকৃত ও প্রাদেশিক দিওয়ানের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আইনকানুন ও বিধিবিধানসম্বলিত লিখিত ফরমান-এর কপি, গ্রামের চৌহদ্দি বিষয়ক বিবরণী, চাষযোগ্য ও পতিত ভূমির তালিকা, তহসিলদারদের নাম, ভূমি জরিপের সঙ্গে জড়িত কর্মচারীদের নাম, সার্ভেয়ার, থানাদার প্রভৃতির তালিকাও সংরক্ষণ করতে হতো। ফলত এই দিক দিয়ে বিচার করলে বিতিকচিকে পরগণা-আমিলের সঙ্গে নিতান্ত অবিচ্ছেদ্য (indispensible to the collector) একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী বলেই মনে হয়।

বিতিকচির আর একটি কাজ ছিল পরগণার অর্থ ব্যয়সংক্রান্ত। অবশ্য এই গুরুদায়িত্ব তিনি যৌথভাবে পালন করতেন। আমিল ও ফোতাদারের সঙ্গে মিলে বিতিকচি পরগণা-কোষাগারের গচ্ছিত অর্থের যথাযথ নিরাপত্তা রক্ষা ও রাজস্ব ব্যয়সংক্রান্ত বিধিবিধানের আওতায় তা ব্যয় করতেন। সাধারণভাবে দিওয়ানের পূর্বানুমোদন ব্যতীত তারা কোষ থেকে কোন অর্থ ব্যয় করার অধিকারী ছিলেন না। তবে কখনও কখনও তেমন করার প্রয়োজন হলে সম্মিলিত দায়িত্বে অর্থ ব্যয় করে ব্যয়োত্তর অনুমোদন দানের জন্য অবিলম্বে দিওয়ানকে লিখতেন। এই ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণও বিতিকচিকে সংরক্ষণ করতে হতো।

ফোতাদার বা খিজানাদার

সর্বযুগেই শাসকশ্রেণীর কাছে ভূমিরাজস্ব বাবদ আদায়কৃত অর্থের যথাযথ সংরক্ষণ ছিল একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মোগলদের সময়েও এর ব্যতিক্রম ছিল না। সত্যি বলতে তারা এ বিষয়ে পূর্বসূরীদের তুলনায় ছিল অধিক সচেতন ও কঠোর। তাই আমরা দেখতে পাই এক ধরনের নিবিড় সতর্কতা ও নিরাপত্তামূলক যৌথ ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে মোগলরা তাদের সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব সংরক্ষণ ও প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল। এই সংরক্ষণের মূল দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারীই ছিলেন ফোতাদার বা খিজানাদার (খাজানাদার)। তিনি 'খাজাঞ্চি' নামেও পরিচিত ছিলেন।[১৭৯] পদবি থেকেই বোঝা যায় তার কাজ ছিল খাজনা বা ভূমিরাজস্ব সংরক্ষণ ও হেফাজত করা। যা হোক, আমরা এখানে মোগল আমলে পরগণা স্তরে ফোতাদার বা খিজানাদারের তিন রকমের দায়িত্ব-কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করবো। এক. রায়ত এবং জমিদারদের কাছ থেকে নিয়মানুযায়ী রাজস্ব বাবদ নগদ অর্থ গ্রহণ; দুই. গৃহীত অর্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা ও তিন. সংরক্ষিত অর্থ যথাসময়ে কেন্দ্রীয় রাজকোষে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[১৮০] শেষোক্ত এই দায়িত্ব তিনি দু'ভাবে পালন

---

১৭৯ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২; বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৭

১৮০ The Provincial Government of the Mughals, pp. 269; The Mughal Government, pp. 128.

করতেন। প্রথমত স্থানীয় কোষাগারে সংরক্ষিত অর্থের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট কোটা (সাধারণত দুই লক্ষ 'দাম') অতিক্রম করলেই ফোতাদার সংশ্লিষ্ট পরগণা-আমিল, আমিন ও বিতিকচির সহযোগিতায় ও তাদের পরামর্শ ক্রমে 'দিওয়ান-ই-আলা' বা কেন্দ্রীয় দিওয়ানের দপ্তরে প্রেরণ করতেন; এবং দ্বিতীয়ত স্থানীয় প্রয়োজনে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালে জরুরি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমিল প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে ফোতাদার কোষাগারের অর্থ ব্যয় করতেন। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে কেন্দ্রীয় দিওয়ানের ব্যয়োত্তর লিখিত মঞ্জুরি-অনুমোদন গ্রহণ করতে হতো। বলাবাহুল্য শেষের এই কাজটি যেহেতু পদ্ধতিগতভাবেই ছিল যৌথ প্রকৃতির, স্বভাবতই এতে তার দায়-দায়িত্ব ছিল তুলনামূলক কম ও আংশিক। ড. সারণ বলেন, 'The duties of the treasurer were comparatively simple and far less onerous.'[১৮১]

রায়ত ও জমিদারগণ রাজস্ব বাবদ তাদের দেয় অর্থ সোনা, রূপা, তামা ও অন্য যে কোন মাধ্যমে বা মুদ্রায় প্রদান করতো এবং ফোতাদারকে তা অবলীলায় গ্রহণ করতে হতো। নির্দিষ্ট কোন ধাতব মুদ্রায় ভূমিরাজস্ব প্রদানের জন্য তিনি তাদেরকে বাধ্য করতে পারতেন না। তবে প্রচলিত মুদ্রার বাইরে আপাত অপ্রচল বা প্রাচীন মুদ্রায় কোন রায়ত বা জমিদার খাজনা প্রদান করতে চাইলে তিনি সেগুলিকে প্রথমত 'বুলিয়ন' হিশেবে গণ্য করতেন, এবং দ্বিতীয়ত মুদ্রার মান প্রচলিত মুদ্রাপেক্ষা কম বা নিম্ন পর্যায়ের হলে তিনি সেজন্যে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারতেন। এ প্রসঙ্গে রসিক দাসকে লিখিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের পূর্বোক্ত ফরমানের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি।

এক্ষণে উপরিউক্ত অবস্থায় যে ধরনের মুদ্রায়-ই ভূমিরাজস্ব আদায় হোক না কেন— প্রতিদিন সন্ধ্যায়ই ফোতাদারকে সংগৃহীত অর্থ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বাছাই ও গণনা করে আদায়ের ওপর একটি স্মারক-লিপি প্রস্তুত করতে হতো। এতদসহ বিতিকচির দপ্তরের কাগজপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পরীক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে তিনি প্রামাণ্যতা (Authentication)-র নিদর্শনস্বরূপ তাতে সীলমোহরাঙ্কিত স্বাক্ষর করতেন। পরে তাতে আমিল বা আমলগুজারের স্বাক্ষর নিয়ে আমিল ও বিতিকচি বা কারকুনের উপস্থিতিতে পরগণা কোষাগারে জমা করতেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, এই কোষাগারগুলি সচরাচর নির্মিত হতো অপেক্ষাকৃত উঁচু ও শুকনো ভূমিতে এবং শিকদার বা আমিলের সরকারি বাসভবনের বেশ নিকটবর্তী স্থানে[১৮২] , অবশ্যই খুব মজবুত ও সুরক্ষিত করে। প্রতিদিন এভাবে কোষাগারে নগদ অর্থ জমা করার পর কোষাগারের দরোজায় তালা লাগিয়ে আমিল তাতে সীলমোহরাঙ্কিত ছাপ দিতেন এবং দু'টি চাবির একটি ফোতাদার তার নিজের কাছে এবং অন্যটি আমিলের কাছে রাখতেন।[১৮৩] স্বভাবতই তালার চাবি দু'জায়গায় থাকায় আমিল ও ফোতাদারের মধ্যে কেউই একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া কোষাগারের বদ্ধ দরোজা খুলতে পারতেন না। পরদিন বা অন্য যে কোন দরকারি সময়ে কোষাগার খোলার প্রয়োজন হলে ফোতাদার, আমিল ও বিতিকচিকে যথারীতি আগেভাগে অবহিত করে তবেই তা খুলতে পারতেন।[১৮৪]

১৮১ The Provincial Government of the Mughals, pp. 269.
১৮২ Ibid., pp. 269.
১৮৩ Ibid., pp. 270.
১৮৪ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৫.

কানুনগো

মোগলদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে 'কানুনগো' পদের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ড. অনিলচন্দ্র ব্যানার্জী বলেন, 'The office of kanungo occupied a key position in the Mughal system of revenue administration.'[১৮৫] পদটি পুরোপুরি সরকারি ছিল, নাকি আধা-সরকারি, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে যতোদূর জানা যায় কানুনগো ছিলেন সরকারি কর্মচারী।[১৮৬] সাধারণত ভূমিরাজস্ববিষয়ক আইন-কানুন, বিধিবিধান সম্বন্ধে অত্যন্ত অভিজ্ঞ স্থানীয় লোকদের মধ্য থেকে স্থায়ীভাবে (permanent local official) তাকে নিযুক্ত করা হতো।[১৮৭] আরবি 'কানুন' অর্থ আইন-শৃঙ্খলা ও ফারসি 'গো' প্রত্যয় যোগে গঠিত 'কানুনগো' শব্দের আভিধানিক অর্থ আইনজ্ঞ বা আইনের ব্যাখ্যাতা।[১৮৮] তবে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় কানুনগোর অবস্থান ও গুরুত্ব এই অর্থের সীমা ছাড়িয়ে যেতো। মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে কানুনগোর কার্যাবলি আলোচনার আগে আমরা তার সম্পর্কে কয়েকজন আধুনিক ঐতিহাসিকের মত ও সংজ্ঞা এখানে উল্লেখ করে নিতে চাই। ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড-এর মতে কানুনগো ছিলেন, 'The pargana accountant and registrar.'[১৮৯] স্যার ব্যাডেন-পাওয়েল-এর মতও প্রায় অনুরূপ। তিনি বলেন, 'For each pargana there was a district accountant-registrar, called 'Kanungo' (Qanungo = one who declares the rule or standard).'[১৯০] এডওয়ার্ড ও গ্যারেট বলেন, 'Another important figure was the kanungo (lit.'expounder of the law'), ...as being the hereditary repository of all information relating to land and local custom.'[১৯১] অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মা বলেন, 'The Qanungo was the living dictionary of the qanun or regulations regarding land. He kept registers of the value, tenure, extent, and transfers of lands, reporting deaths and successions of revenue-payers , and explaining when required, local practices and public regulations'.[১৯২] ড. প্রসাদ বলেন, 'The Qunungo was a Pargana officer aquainted with all rural customs and rights of the peasantry.'[১৯৩] ড. তপন রায়চৌধুরী (Bengal under Akbar and Jahangir, pp. 72) ও ড. খন্দকার মাহবুবুল করিম (The provinces of Bihar & Bengal under Shahjahan, pp. 151)— দুজনই প্রায় একই ভাষায় বলেন, 'a hereditary class of local assessors who assisted (used to assist) the

---

১৮৫ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 189.
১৮৬ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪
১৮৭ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 21.
১৮৮ অধ্যাপক বার্ক-এর ভাষায়, 'Qanungo literally means interpreter of laws.' (Akbar The Greatest Mogul, pp. 158).
১৮৯ The Agrarian System of Moslem India, pp. 276.
১৯০ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 257.
১৯১ Mughal Rule in India, pp.205.
১৯২ Mughal Empire in India, pp. 184.
১৯৩ A Short History of Muslim Rule in India, pp. 325.

government in the preparation of the rent-roll.' ড. ইরফান হবিব বলেন, 'কানুনগো ছিল পরগণার রাজস্ব-আদায়, এলাকার পরিসংখ্যান, স্থানীয় রাজস্ব-হার এবং রীতি ও প্রথা সংক্রান্ত তথ্যের স্থানীয় ভাণ্ডারী। বাদশাহী প্রশাসনকে রাজস্ব এবং এলাকার অঙ্ক যোগান দিত সে-ই।'[১৯৪] সাধারণত প্রতিটি পরগণায় একজন করে কানুনগো থাকতো।[১৯৫] তবে স্থানবিশেষে একাধিক কানুনগো থাকার নজিরও বর্তমান।[১৯৬] কানুনগোর প্রধান কাজ ছিল ভূমিরাজস্বের অতীত ও বর্তমানের বিভিন্ন হিসাব-নিকাশ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ভূমিরাজস্ববিষয়ক বন্দোবস্ত, কৃষিবিষয়ক পরিসংখ্যান যেমন চাষযোগ্য ও পতিত ভূমির বিবরণ, শিকস্তি-পয়স্তির হিসাব[১৯৭], জমিদার ও ইজারাদারদের সঙ্গে সরকারের সম্পাদিত বিবিধ চুক্তিপত্রের অনুলিপি, পরগণার বিভিন্ন এলাকায় অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ধার্যের পদ্ধতি ও হারের বর্ণনা ইত্যাদি তার দপ্তরে সার্বক্ষণিকভাবে মজুত থাকতো। এছাড়া বিভিন্ন জমিতে কী ধরনের স্বত্ব বর্তমান, যেমন তা 'খালিশা' কি 'জায়গির' কি 'মাদাদ-ই-মাশ' বা 'সুয়ুরগল' প্রভৃতির তালিকা, ভূমি বিক্রয়, বন্ধক বা অন্য কোন প্রকারের হস্তান্তরের (নিঃস্বত্ব দান এর মধ্যে অন্যতম) মাধ্যমে ভূ-স্বত্ব পরিবর্তনের বিবরণও পরগণা-কানুনগোকে রাখতে হতো। মোটকথা স্বীয় পদবির সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই কানুনগো ও তার দপ্তরকে প্রকৃত অর্থেই ভূমিরাজস্ব বিষয়ক আইনকানুন, বিধিবিধান ও প্রথাপদ্ধতির জরুরি ও সার্বক্ষণিক ভাণ্ডার হিশেবে কাজ করতে হতো। বস্তুত এই কারণে ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম তাকে রাজস্ব রীতিনীতির একটি 'চলন্ত অভিধান' হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন।[১৯৮] বাস্তবে পরগণা-কানুনগো ছিলেনও তাই।

অন্যদিকে 'আইন'-এর ভাষায় কানুনগো ছিলেন কোন 'রায়তের আশ্রয়স্থল'—'the refuge of the husbandman.'[১৯৯] তিনি রায়তদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে রাষ্ট্রের সঙ্গে অনেক সময় দেন-দরবার করতেন। বস্তুত এলাকার লোক হওয়ার সুবাদে তাকে নিজ স্বার্থেও এই কাজগুলি করতে হতো। কেননা রাষ্ট্রের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে তাকে স্থানীয় জনমণ্ডলীর সমর্থন সর্বাগ্রে অর্জন করতে হতো। তবে এর অর্থ এটা নয় যে কানুনগো স্থানীয় জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে দেন-দরবার করতে গিয়ে সরকারি স্বার্থের ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখাতেন। বরং তিনি দু'তরফের মধ্যে এক ধরনের মীমাংসকের বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি যেমন রায়তের ভূমিরাজস্ব মওকুপের জন্য আমিলের কাছে সুপারিশ করতেন এবং তারা যাতে সহজে 'তাকাবি' ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা

১৯৪ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩০৮

১৯৫ এরা সচরাচর রাজকীয় 'সনদ' তথা অনুমোদনে (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৭) প্রাদেশিক সুবাদার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। (Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 60)। দুর্নীতি, শারীরিক ও মানসিক অযোগ্যতা, কর্তব্য-কর্মে অবহেলা বা পদ সংখ্যা সংকোচনের ফলে এরা পদচ্যুত হতেন। (Agrarian Relations, pp. 21).

১৯৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৭

১৯৭ Mughal Rule in India, Edwardes & Garrett, pp. 206.

১৯৮ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৭

১৯৯ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 72.

করতেন, অন্যদিকে তেমনি গৃহীত ঋণ যাতে রায়তগণ সময় মতো পরিশোধ করে সে বিষয়েও তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতেন। আবার অচেনা ও অবিশ্বস্ত রায়তদের ভূমিরাজস্ব যথাসময়ে পরিশোধের বেলায় কানুনগো তাদের পক্ষে জামিনদার হতেন।[২০০] অবশ্য সমগ্র বিষয়টির সঙ্গে কানুনগোর ব্যক্তি স্বার্থের প্রশ্নও জড়িত ছিল। কারণ বেতন-ভাতা বাবদ কানুনগোরা সাধারণত লা-খেরাজ জমি যেমন 'নানকার', 'ইনাম' প্রভৃতি লাভ করলেও[২০১] অনেক ক্ষেত্রেই এবং বিশেষ করে আওরঙ্গজেব-পরবর্তীকালে তারা আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের একটি সামান্যতম অংশ[২০২] পারিশ্রমিক হিশেবে পেতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আবুল ফজল সমকালে বিরাজমান ৩ শ্রেণীর কানুনগোর কথা বলেছেন।[২০৩] এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কানুনগোদের বেতন ছিল ৫০ রুপী, দ্বিতীয় শ্রেণীর ৩০ রুপী ও তৃতীয় শ্রেণীর ২০ রুপী[২০৪] এবং সেই সঙ্গে 'they have an assignment for personal support equivalent thereto.'[২০৫] তবে পর্যালোচ্য সময়ে, বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বাংলায় পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর কানুনগোর অস্তিত্ব ছিল কি-না সে সম্পর্কে কোনও কানও ঐতিহাসিক সন্দেহ পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ ড. অঞ্জলি চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলা যায়। তিনি বলেন, 'There is no evidence to show that in Bengal three ranks of qanungos were in existence.'[২০৬] এখানে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে কানুনগোর মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা একদিকে যেমন রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব আয় বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক হয়েছিল, তেমনি তা অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকরও বিবেচিত হয়েছিল। সৎ ও অনুগত কানুনগোগণ রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি মেনে কাজ করার ফলে যেমন সময় মতো ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় হতো, কেননা সাধারণ রায়তদের মধ্যে তাদের বেশ প্রভাব ছিল, তেমনি রাজস্বপ্রদাতাগণের কাছে তাদের মোগল ভূমিরাজস্ব নীতির গুণগত দিক ব্যাখ্যা করার ফলে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তিও প্রজাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতো। অন্যদিকে দুর্নীতিপরায়ণ ও সুযোগসন্ধানী কানুনগোরা নিজেদের অসৎ মনোবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে অনেক সময় সরকারের রাজস্ব নীতি সম্বন্ধে রায়তদেরকে ভুল ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করতো, এমন কি ভূমিরাজস্ব প্রদানের বিরুদ্ধে সক্রিয় অবস্থান নিতে প্রজাদের উস্কানি দিয়ে

২০০ Dr. Keyamuddin Ahmad in 'Medieval India : A Miscellany', Vol. II., pp.278.

২০১ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 22; মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮

২০২ সাধারণত এর পরিমাণ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায়ের শতকরা ১ ভাগ (The Ain-I-Akbari, Vol. II, p. 72) বা বড় জোর ২ ভাগ (মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮).

২০৩ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 72.

২০৪ The Mughal Empire, Dr. Prasad, pp. 323.

২০৫ The Ain-I-Akbari, Vol. II., pp. 72.

২০৬ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 60.

বিদ্রোহের পথে টেনে নিয়ে যেতো। যদিও এ সব ব্যাপারে তারা নিজেরা অধিকাংশ সময়ই থাকতো সকল সন্দেহ ও ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

পরিশেষে একটি বিষয়ের উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করবো। বলাবাহুল্য সমগ্র মুসলিম শাসনামলে প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগের তুলনায় রাজস্ব বিভাগে হিন্দুগণ যে মুসলমানদের চেয়ে (কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া) অধিক পারদর্শিতা ও নির্ভরযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিল তার একটি বড় প্রমাণ মিঃ জে. ডি. পিয়ারসন প্রণীত ও ঐতিহাসিক আর. বি. র‍্যামসবোথাম-এর 'Studies in the Land Revenue History of Bengal'-এর অন্তর্ভুক্ত 'Report on the office of Kanungo,' সংক্ষেপে 'Qanungo Report of 1787'। এই রিপোর্টে কানুনগোদের নামের যে তালিকা দেখা যায় তার প্রায় সবই হিন্দু শ্রেণীভুক্ত। ফলত এ থেকে ড. আবদুল করিম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, 'As the office of qanungo was hereditary, it may be assumed that the early 18th century qanungos in the Muslim period, were Hindus.'[২০৭] মন্তব্যটি যথার্থ ও নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

চৌধুরি

'চৌধুরি' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (হিন্দি 'চৌথ' অর্থ এক-চতুর্থাংশ + ফারসি 'দারি' অর্থ অধিকারী = চৌথ্দারি>চৌথধারি>চৌধারি>চৌধুরি) এক চতুর্থাংশের মালিক[২০৮] বা 'চারটি অংশ বা মুনাফার অধিকারী এবং গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি'।[২০৯] কখনও কখনও এর দ্বারা জমিদার ও তালুকদারদের সমশ্রেণীভুক্ত ভূসম্পত্তির মালিকও বুঝাতো।[২১০]

পদটি প্রাচীন; সুলতানি আমলের পূর্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে চৌধুরি যথাক্রমে 'দেশাই' ও 'দেশমুখ' নামে পরিচিত ছিলেন।[২১১] বাংলায় পাল ও সেন যুগে 'চৌরোদ্ধারণিক' (উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা) নামে এর অস্তিত্ব ছিল।[২১২] তবে মোগল আমলে চৌধুরি ছিলেন একান্তভাবেই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত একজন আধা-সরকারি আধা-বেসরকারি কর্মচারী।[২১৩] যদিও শেষ পর্যন্ত পদটি বংশগত (Hereditary) হয়ে দাঁড়িয়েছিল[২১৪], তবে প্রাথমিক নিয়োগে তাকে অবশ্যই রাজকীয় 'সনদ' বা কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন হাসিল করতে হতো।[২১৫]

২০৭ Murshid Quli Khan and His Times, pp. 70.
২০৮ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃষ্ঠা ২৯৮
২০৯ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮
২১০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭৮
২১১ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১০
২১২ Sher Shah and His Times, pp. 312, fn.
২১৩ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৪
২১৪ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১১
২১৫ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১২; Agraian Relations, pp. 22; Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 62.

ঐতিহাসিক মোরল্যান্ড চৌধুরিকে বলেছেন, 'The headman of a pargana.' কিন্তু তাঁর ধারণা যে সঠিক নয় তা আমরা আগেই দেখিয়েছি। তবে অবশ্যই স্বীকার্য যে, চৌধুরি স্বয়ং পরগণা-প্রধান না হলেও পরগণা স্তরে কানুনগো প্রভৃতির মতো তিনিও ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী। ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'পরগণা-স্তরে চৌধুরি একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইতেন এবং স্থানীয় ভূমি-রাজস্ব পরিচালনের সহিত তিনি একাধিকভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।'[২১৬]

সরেজমিনে চাষযোগ্য ভূমি জরিপ করে ভূমিরাজস্ব নিরূপণ করার দায়িত্ব ছিল আমিন-এর, কিন্তু বাস্তবে এই কাজে আমিনকে ও পরবর্তী পর্যায়ে কানুনগো, আমিল প্রমুখকে নানা উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা দিতেন চৌধুরি। কানুনগোর মতোই নিজ এলাকার ভূমিরাজস্ববিষয়ক খুঁটিনাটি ছিল তার নখ-দর্পণে, স্বভাবতই তিনি আমিনদের প্রচুর তথ্য যোগাতে পারতেন যা তাদের সঠিকভাবে 'জমা' নিরূপণে সহায়ক হতো। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে আবাদি জমির বিষয়ে চৌধুরি কোন তথ্য গোপন করলে বা আমিনদের নজর এড়িয়ে যেতে কাজ করলে সেক্ষেত্রে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হতো।[২১৭] কানুনগোর সঙ্গে তিনি বিভিন্ন জমাবন্দি দলিল ও কবুলিয়তে যৌথভাবে স্বাক্ষর করতেন। শুধু তাই নয়, তাকে এই মর্মেও প্রমাণপত্র দাখিল করতে হতো যে 'পরগণার ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ, তাঁহার, কানুনগোর ও মোকাদ্দামের সহিত পরামর্শ করিয়াই নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাতে তাঁহাদের সম্মতি রহিয়াছে।'[২১৮] এছাড়া চৌধুরির আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায় কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদেরকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা। এই দায়িত্ব তিনি দু'ভাবে পালন করতেন। প্রথমত রায়ত ভূমিতে আবাদ করার পর তিনি আমিলের দপ্তরে গিয়ে সে সম্বন্ধে লিখিতভাবে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতেন যে অমুক অমুক ভূমিতে চাষাবাদ করা হয়েছে।[২১৯] পরে রাজস্ব সংগ্রহ কালে তিনি রাজস্ব সংগ্রাহকদেরকে সেই সেই ভূমি বা ভূমিখণ্ডে নিয়ে গিয়ে ভূম্যধিকারীর কাছ থেকে নির্ধারিত হারে প্রাপ্য আদায় করতে সহযোগিতা করতেন। দ্বিতীয়ত চৌধুরি নিজেও যেহেতু পরগণার একজন 'leading and powerful zamindar'.[২২০] ছিলেন, ফলে তার পক্ষে অনেক সময় ছোটখাট জমিদার ও তালুকদারদের জন্য চুক্তি মোতাবেক ভূমিরাজস্ব প্রদানের জামিনদার হতে হতো।[২২১] অবশ্য এ জন্যে তিনি এদের কাছ থেকে কিছু পরিমাণ 'দস্তুরি' (সাধারণত আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের শতকরা ৫ ভাগ) লাভ করতেন।[২২২] তবে যে দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন, জামিনের এই কাজটি ছিল চৌধুরির জন্যে কখনও কখনও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। কেননা যাদের জন্য তিনি জামিনদার হতেন তারা অনেক সময় যথাসময়ে ভূমিরাজস্ব পরিশোধ করতো না। এ অবস্থায়

২১৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮
২১৭ The Administration of the Moghul Empire, pp. 237.
২১৮ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮
২১৯ The Administration of the Moghul Empire, pp. 237.
২২০ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp. 22.
২২১ Ibid., pp. 22.
২২২ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১৩

চৌধুরিকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হতো, এমন কি তাকে পদচ্যুত করে অন্তরীণ পর্যন্ত করা হতো।

আগেই বলেছি আর্থ-সামাজিকভাবে চৌধুরি ছিলেন একজন খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। যে কারণে একদিকে কৃষকের প্রয়োজনে যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে তাদের শস্য হানি বা উৎপাদন কম হলে তিনি তাঁদের জন্যে আনুপাতিক হারে বা সম্পূর্ণ রাজস্ব মওকুপ করার ব্যবস্থা করতে পারতেন, তেমনি প্রশাসনের কাছে দেন-দরবার করে তাদেরকে 'তাকাবি ঋণ' পাইয়ে দেওয়ার বিষয়েও জোর তৎপরতা গ্রহণ করতেন। ড. ইরফান হবিব বলেন, 'তার (চৌধুরি) প্রধান কর্তব্য রাজস্ব আদায় ছাড়াও, চৌধুরীকে কতক ছোটখাট কাজও করতে হতো। যেমন, 'মুকদ্দম'-এর সহযোগিতায় সে 'তকাবী' ঋণ বিলি করত ও ফেরতের জামিন থাকত। কানুনগো-র কাজে পালটা নজর রাখার জন্যও তাকে ব্যবহার করা হতো, কারণ কানুনগো-র সই করা 'মুওয়াজানা' কাগজপত্র ও স্থানীয় রীতিনীতির নথিপত্র বাদশাহী দরবারে পাঠানো হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারেও তাকে লক্ষ্য রাখতে হতো।'[২২৩] এ ছাড়া চৌধুরিকে তার এলাকার চোরডাকাত, অবাধ্য ও বিদ্রোহী শ্রেণীর লোকদের দমন ও শাস্তি প্রদানের কাজে সরকারি কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হতো।[২২৪] ফলে সার্বিক বিচারে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, 'The Chaudhuris...played an important part in the (Mughal) revenue administration.'[২২৫]

এখানে চৌধুরিদের বেতন-ভাতা সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা যায়। ড. হবিব বলেন, 'চৌধুরীদের বেতন হারে সম্ভবত যথেষ্ট তারতম্য ছিল।'[২২৬] হবিবের এই উক্তি স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় মোগল আমলে চৌধুরিগণ মোটামুটি রায়তের প্রাপ্যাংশের শতকরা ১ ভাগ[২২৭], বা কখনও কখনও দুই ভাগ[২২৮] পরিমাণ বেতন হিশেবে পেতেন। সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ লা-খেরাজ ভূমিস্বত্বও তাকে দেওয়া হতো।[২২৯] তবে এর পরিমাণ কখনই সমগ্র পরগণার ভূমিরাজস্ব আদায়যোগ্য ভূমির মোট পরিমাণের শতকরা ৭ $\frac{১}{২}$ ভাগের অধিক হতো না।[২৩০] উল্লেখ্য ছোটখাট পরগণা বা মহালে যখন কানুনগো ও চৌধুরির পদ একীভূত করা হতো[২৩১], তখন স্বভাবতই চৌধুরিগণ কানুনগোদের সমান সুযোগ-সুবিধা লাভ করতেন।

২২৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৩
২২৪ মোঘল ভারতে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৮
২২৫ Bengal in the Reign of Aurangzib, pp. 61.
২২৬ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১৩
২২৭ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৭৯
২২৮ Sher Shah and His Times, pp. 312.
২২৯ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ৩১৩
২৩০ কুমিল্লা জেলার ইতিহাস, আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, পৃষ্ঠা ২৯৮
২৩১ The Administration of the Moghul Empire, pp. 237.

এ পর্যায়ে আমরা মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সর্বশেষ স্তর গ্রাম ও তার কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনা করবো। তবে তার আগে এই পর্বের দু'টি উল্লেখযোগ্য বিষয়—'করোড়ি' ও 'চাকলা' সম্বন্ধে সামান্য আলোকপাত করা জরুরি বলে মনে করি। প্রথমটি ছিল ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় রাজকর্মচারী ও দ্বিতীয়টি রাজস্ব বিভাগ।

করোড়ি*

করোড়ি ব্যবস্থা ছিল একান্তভাবেই সম্রাট আকবরের সৃষ্ট একটি বিশিষ্ট ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা। সমগ্র ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার ইতিহাসে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ছিল মূলত সাধারণ প্রশাসনিক অবকাঠামোর মধ্যে স্থিত একটি ব্যবস্থা। ভূমিরাজস্বের জন্যে করোড়ি ব্যবস্থার আগে একান্ত আলাদাভাবে কোন ইউনিট বা একক চালু করা হয়নি। কিন্তু করোড়ি প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে সম্রাট পূর্বতন সেই ঐতিহ্য ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যবস্থা উপহার দেন, যদিও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যা হোক নবসৃষ্ট এই ব্যবস্থা সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

১৫৭৫-৬ খ্রিস্টাব্দে 'করোড়ি' পদ ও ব্যবস্থা প্রবর্তনের আগে সুলতানি যুগের যে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঐতিহ্যিক সূত্রে আকবর পেয়েছিলেন তা ছিল কিছুটা বিশৃঙ্খল ও দুর্নীতিপরায়ণ। এর মূল কারণ ছিল সম্রাট শেরশাহ্ পরবর্তী শাসককুলের এই ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ মনোযোগ ও দৃষ্টি দানের অভাব। যে কারণে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের কর্মচারীরা দিন-কে দিন স্বেচ্ছাচারী ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তরুণ মোগল সম্রাট তাদের কার্যকলাপের প্রতি ছিলেন বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। তাছাড়া এদের মাধ্যমে রাজকোষের যে আয় হচ্ছিল তা-ও সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ও চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করতে পারছিল না। সম্রাট তাই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় নতুন কিছু সৃষ্টির প্রণোদনা পাচ্ছিলেন যা শুধু তাঁর রাজ-ভাণ্ডারের চাহিদাই মিটাবে না, উপরন্তু প্রচলিত ব্যবস্থায় যথাসম্ভব সাম্য ও রাজস্বের প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। সেই সঙ্গে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার প্রতি জমে থাকা রায়তদের ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি বহুলাংশে হ্রাস করবে। বস্তুত এই দ্বিমুখী লক্ষ্যকে সামনে রেখে সম্রাট স্বীয় রাজত্বের ১৯তম বছরে করোড়ি প্রথা চালু করেন। উল্লেখ্য বাংলা, বিহার ও গুজরাট[২৩২] ছিল করোড়ি ব্যবস্থা বহির্ভূত। তথাপি আমরা এখানে এটিকে এই জন্যে আলোচনা করবো যে, তা আকবরের সামগ্রিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক চিন্তাকে অনেকখানিই প্রতিফলিত করে।

করোড়ি ব্যবস্থার মূল কথা ছিল দু'টি। প্রথমত সম্রাট বিদ্যমান ভূমিরাজস্ব বরাতি (Assignments) ব্যবস্থা বাতিল করে সাম্রাজ্যের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমিকে 'খালিশা'য় রূপান্তরিত করেন। দ্বিতীয়ত (এটিই মুখ্য) রূপান্তরিত খালিশা ভূমিকে (পূর্বোক্ত তিনটি সুবা ব্যতীত) নতুনভাবে ১৮২টি অঞ্চল বা ব্লকে বিভক্ত করেন। সম্রাটের অভীপ্সা ছিল এই

* অধ্যাপক শ্রীরাম শর্মা করোড়ি সম্বন্ধে বলেছেন, 'The Krori or 'collector of state dues' was the real Collector of revenue. (Mughal Empire in India, pp. 183). সম্রাট আকবরের শাসনযুগে অন্তত কিছুকালের জন্যে এ উক্তি যথার্থ ছিল।

২৩২ Akbar The Great Mogul, pp. 269.

কৃত্রিমভাবে বিন্যস্ত অঞ্চল[২৩৩] গুলির প্রতিটি থেকে বছরে ১ 'করোড়' বা কোটি 'দাম' ভূমিরাজস্ব বাবদ রাজকোষে আসবে। 'আইন'-এর ভাষায় বলা যায়, 'One hundred and eighty-two amils were sent off to take care of the Khalsa and as every amil was appointed over an extent of territory which yield a karor of dams they were popularly known by the name of Karori.'[২৩৪]

করোড়িদের কাজে প্রচুর স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল।[২৩৫] তাদের প্রধান কাজ ছিল অধিক্ষেত্র-এলাকার সামগ্রিক কৃষির উন্নয়ন ঘটানো ও তদনুযায়ী ভূমিরাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করা।[২৩৬] কিন্তু বাস্তবে তাদের অধিকাংশই প্রথমোক্ত করণীয় সম্বন্ধে ছিলেন উদাসীন। অবশ্য নবসৃষ্ট এই ব্যবস্থার দু'টি মৌলিক গলদও ছিল। এক. এতে গোটা সাম্রাজ্যকে (পূর্বোক্ত তিনটি ব্যতীত) ১৮২টি ভূখণ্ডে ('tract'[২৩৭]) প্রায় সমানভাবে ভাগ করার চেষ্টা করা হলেও এবং প্রতিটি থেকে রাষ্ট্রীয় পাওনা ১ কোটি 'দাম' বা ২,৫০,০০০ রুপী ধার্য করা হলেও ভূমিজ উৎপাদনের মূল যে বিষয়গুলি অর্থাৎ মৃত্তিকার গুণাগুণ, অন্য কথায় মাটির স্থানিক উর্বরতা বা উৎপাদনশীল শক্তির কারণে উৎপাদন হারের তারতম্য, প্রাকৃতিক অবস্থা যেমন বন্যা-খরা-অনাবৃষ্টির প্রভাব ও সেচের সুবিধা-অসুবিধা, শ্রম-ব্যয় প্রভৃতির ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়নি। সুতরাং বলা যায় এই বিভক্তি ছিল পুরোটাই অবাস্তব ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। দুই. করোড়ি ব্যবস্থায় পূর্বের মতো এর প্রশাসকদেরকে নিষ্কর ভূ-স্বত্ব প্রদান করা হয়নি। যে কারণে প্রশাসক-আমিলগণ সর্বদাই অতিরিক্ত আয়-উপার্জনের বিকল্প পথ খুঁজতো। এতে করে স্বভাবতই রায়তদের ওপর তাদের অত্যাচার ও নিষ্পেষণের মাত্রা আগের তুলনায় বেড়ে গিয়েছিল। Sir Wolseley Haig এর ভাষায় বলা যায় করোড়িরা প্রায় সূচনাতেই, 'They were expected both to collect the revenue and to improve it by encouraging the extension of cultivation, but they proved to be both inefficient and extortionate, and many were severely punished.'[২৩৮] বস্তুত করোড়ি ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও এর প্রশাসকদের দুর্নীতিগ্রস্ততার কারণে প্রত্যেক করোড়ির জন্য রাজকোষে বছরে ১ কোটি 'দাম' প্রেরণের কথা থাকলেও অনেকেই তা নিয়মিত ও পরিমাণ মতো সরবরাহ করতে পারতেন না। এর ফলে সামগ্রিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সম্রাট করোড়ি ব্যবস্থা চালু করণের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ২৪তম শাসন-বর্ষে করোড়ি ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নেন। তবে 'করোড়ি' নামের প্রচলন পরবর্তীকালেও থেকে গিয়েছিল। ড.

---

২৩৩ 'Purely artificial areas'— Smith, Ibid., pp. 269.

২৩৪ The Ain-I-Akbari, Vol. III., pp. 167. Quoted from 'The Mughal Government', pp. 116.

২৩৫ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৯২

২৩৬ Akbar The Great Mogul, pp. 99.

২৩৭ কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক (যেমন ড. ইরফান হবিব, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯২) 'করোড়ি'র অধীন এলাকাকে জেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে আমরা প্রকৃতিগতভাবে একে জেলা না বলে বরং 'ভূখণ্ড' বা স্যার উলসলে হেইগ-এর মতানুযায়ী 'tract' (The Cam. His. of India, Vol. IV., pp. 110) বলার পক্ষপাতী।

২৩৮ The Cambridge History of India, The Mughal Period, Vol. IV. p. 110.

ইরফান হবিব বলেন, 'করোড়ি পরীক্ষা' তুলে দিয়ে ফের যখন বরাত মঞ্জুর শুরু হয় তখনও কোন (কোন) পরগণা বা পরগণা-সমষ্টির সঙ্গে যুক্ত খালিসা-র 'আমিল' বা 'আমালগুজার'কে 'করোড়ী'ই বলা হতো।'[২৩৯] সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বেও এই পদবির ব্যবহার ছিল[২৪০] যার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রসিক দাসকে লিখিত পত্রে 'করোড়ি' শব্দের উল্লেখ। অবশ্য এই আমলের করোড়িদের সম্পর্কে একটি চমৎকার নতুন তথ্য যুগিয়েছেন ড. এম. আতহার আলি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Mughal Nobility under Aurangzeb'-এ। তিনি বলেন, 'the amils in the parganas of the jagirs or the princes were called Karoris (revenue collectors).'[২৪১]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি আকবরের শাসনামলে 'করোড়ি ব্যবস্থা' ছিল সম্রাটের একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা, ড. কোরেশি যাকে বলেছেন—'a fancy of the emperor'[২৪২] ; তথাকথিত এই পরিকল্পনার অসারতা তিনি যখন বুঝতে পারেন, এবং বুঝতে পারেন যে, যে কোন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার আশু সফলতার জন্যে 'regional disparities and local traditions'[২৪৩] -এর গুরুত্ব অপরিসীম অর্থাৎ এই বিষয়টি শাসকশ্রেণীকে অবশ্যই ধর্তব্যের মধ্যে নিতে হয়— এই বোধ যখন তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয় তখন অচিরেই সম্রাটের উর্বর মস্তিষ্ক তা থেকে সরে আসতে দ্বিধা করেনি, যুগোপযোগী চিন্তার অধিনায়ক আকবরের এটিও একটি বড় গুণ।

চাকলা

ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের একটি ইউনিট হিশেবে 'চাকলা'র সৃষ্টি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে।[২৪৪] তবে বাংলায় এর প্রচলন ঘটে নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়ে, যথাস্থানে তা আলোচনা করা হবে। আকবরের সময় থেকে প্রাদেশিক প্রশাসনের নিম্নস্তরের প্রশাসনিক এককগুলি ছিল সরকার, পরগণা বা মহাল ও গ্রাম বা দিহ। বস্তুত শাহজাহানের সময়েও এগুলি অব্যাহত থাকলেও প্রধানত ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সম্রাট তৎকালীন উজিরে আজম আল্লামা সাদউল্লাহ খানের পরামর্শে নতুন একটি বিভাগের সৃষ্টি করেন। এটিই চাকলা। ড. পরমাত্মা সরণ বলেন, 'it (Chakla) seems to have been created to facilitate and improve the realisation and assessment of revenue.'[২৪৫] সত্যি বলতে শুধুমাত্র ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উন্নয়নকে সামনে রেখে আকবর যেমন 'করোড়ি ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছিলেন, উত্তরকালে সেই একই লক্ষ্যকে বিবেচনায় এনে শাহজাহানও 'চাকলা ব্যবস্থা' প্রবর্তন করেছিলেন। তবে চাকলাগুলির গঠন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ড. ইরফান হবিবের

২৩৯ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৯২
২৪০ A Short History of Muslim Rule in India, Dr. Prasad, p. 511.
২৪১ pp. 82.
২৪২ The Administration of the Moghul Empire, pp. 234.
২৪৩ History of India, Dr. Anil Chandra Banerjee, pp. 401.
২৪৪ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 256.
২৪৫ The Provincial Government of the Mughals, pp. 212.

মতে, 'মহাল-সমষ্টি নিয়ে 'চাকলা' নামে এক নতুন আঞ্চলিক একক চালু করা হয়।'[২৪৬] ইংরেজ ঐতিহাসিক ব্যাডেন পাওয়েল মনে করেন চাকলা ছিল সুবার অনুবিভাগ ('division of the Suba')[২৪৭]। আবার তিনি একে সরকার-এর অনুবিভাগ হিশেবেও অন্যত্র বিবেচনা করেছেন। তবে সেক্ষেত্রে তিনি চাকলাকে আধুনিক জেলার চেয়ে বড় কিন্তু বিভাগের চেয়ে ছোট বলে মত প্রকাশ করেন।[২৪৮] ড. সরণ চাকলাকে পরগণা এর বিভক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'When Allami Sa'dullah Khan was appointed the chief minister (Wazir-i-'Azam) in the reign of Shah Jahan he divided parganahs into groups and called them Chaklas.'[২৪৯] ঐতিহাসিকের এ উক্তিতে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে বলে মনে হয়। কেননা একটি পরগণাকে বিভক্ত করে অনেকগুলি ভাগ করা হয়েছিল, নাকি স্থিত সমুদয় পরগণাকে একত্রিত করে পুনর্বিন্যস্ত আকারে আলাদা আলাদা করে 'চাকলা' চালু করা হয়েছিল, তা এখানে সুস্পষ্ট নয়। তবে পরে তিনি এ-ও বলেছেন যে, 'Possibly it was a substitute for a sarkar, or an intermediate division between the sarkar and parganah.'[২৫০] অন্যদিকে ড. ইসতিয়াক হুসেন কোরেশি মনে করেন কয়েকটি পরগণা নিয়ে 'চাকলা' গঠিত হয়েছিল। তাঁর ভাষায়, 'a chaklah,... included a number of parganahs. The sarkar was not abolished, so that the chaklah did not replace it.'[২৫১] আমাদের বিবেচনায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার গুরুত্বের দিক দিয়ে প্রতিটি 'চাকলা' ছিল সরকার-এর অনুরূপ একটি ইউনিট বা একক, তবে প্রশাসনিক গুরুত্বের দিক দিয়ে তা ছিল সরকার-এর চেয়ে ছোট।[২৫২] অবশ্য ড. কেয়ামুদ্দিন আহমদ অন্য একটি তথ্য দিয়েছেন যা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতে সর্বাধিক ২১টি বা তন্নিম্ন সংখ্যক পরগণা সমষ্টি নিয়ে গঠিত অঞ্চলকে 'চাকলা' বলা হতো, অন্যদিকে একুশটির অধিক পরগণা-সমন্বিত অঞ্চলকে বলা হতো সরকার।[২৫৩]

চাকলা-র প্রশাসনিক প্রধানকে সাধারণত 'চাকলাদার' বলা হতো। মোরল্যান্ড[২৫৪] ও ব্যাডেন পাওয়েল[২৫৫]-এরও এই মত। তবে কখনও কখনও চাকলাদার-কে 'ফৌজদার'ও বলা হতো। ঐতিহাসিক Firminger তাঁর সুবিখ্যাত 'The Fifth Report'-এ বলেন, 'a

২৪৬ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৯৪
২৪৭ The Land Systems of British India, Vol. I., pp. 256.
২৪৮ 'Chakla as a division of the Sirkar, somewhat larger than a modern district but less than a Commissioner's division.' (The Land System, pp. 256, fn.).
২৪৯ The Provincial Government of the Mughals, pp. 212.
২৫০ Ibid., pp. 212.
২৫১ The Administration of the Moghul Empire, pp. 227. ড. অনিলচন্দ্র ব্যানার্জীও এই মত পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'An Administrative area consisting of several parganas.' (The Agrarian System, Vol. I. 340).
২৫২ ড. ইরফান হবিবও বলেন, "চাকলাগুলোকে সাধারণত 'সরকার'-এর চেয়ে ছোট একক বলে ধরা হতো।' (মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ২৯৫)।
২৫৩ Medieval India : A Miscellany, Vol. II., pp. 279.
২৫৪ The Agrarian System of Moslem India, pp. 271.
২৫৫ The Land System, pp. 256.

"chuklah" (Chakla) as "the jurisdiction of a faujdar who receives the rent from the zemindars".'[২৫৬] ড. সরণের মতে প্রতি চাকলায় একজন করে 'আমিন' ও 'ফৌজদার' নিয়োগ করা হয়েছিল এবং 'করোড়িকে আমিনের অধীনে ন্যস্ত করা হয়।[২৫৭] অন্যদিকে ড. কেয়ামুদ্দিন-এর ধারণানুযায়ী 'মুৎসুদ্দি'কে চাকলা-এর ভূমিরাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে নিযুক্ত করা হয়েছিল।[২৫৮] তবে যেহেতু 'চাকলা' ব্যবস্থাপনা মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোর নিয়মিত একক ছিল না, স্বভাবতই এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যায় না।

গ্রাম

ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সর্বশেষ ও সর্বনিম্ন একক হিশেবে গ্রাম-এর গুরুত্ব ও অবস্থান প্রাচীন ও সুলতানি যুগের মতো মোগল আমলেও অক্ষুণ্ন ছিল। যদিও মোগল সম্রাটগণ, তাঁদের অভিজাতশ্রেণী এবং তৎকালীন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল প্রধানত নগরপ্রেমিক ও শহুরে জীবনের জাঁকজমকে অভ্যস্ত এবং ঠিক ততোটাই গ্রাম জীবনের প্রতি নির্মোহ[২৫৯], তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য যে, গ্রামের আপামর জনমণ্ডলী বিশেষত রায়তশ্রেণীর প্রতি মোগল শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যথেষ্ট কল্যাণকামী ও উদার। জ্যেষ্ঠ মোগলদের মধ্যে সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব— এঁদের প্রত্যেকেই চাইতেন রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে ভূমি রাজস্ব যথাযথভাবে আদায়ের পাশাপাশি যেন কৃষির উন্নয়ন ও রায়তকুলের সামগ্রিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বস্তুত এই লক্ষ্যে যা কিছু করা জরুরি, মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে তাঁরা তা করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন তা বলাইবাহুল্য। এ প্রসঙ্গে ড. পরমাত্মা সরণের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, 'from Sher Shah and Akbar downwards every single monarch was very careful about the welfare of the peasantry. They strictly enjoined it upon all their officers to encourage and improve agriculture by every possible means; to dig wells and canals, to extend moneytary help to the indigent farmer and bring new lands under cultivation.'[২৬০]

সর্বনিম্ন প্রশাসনিক একক হিশেবে পরগণা বা মহালের পরেই ছিল 'গ্রাম'-এর অবস্থান। ড. জগদীশ নারায়ণ সরকারের ভাষায়, 'The traditional, self-sufficient, autonomous village continued below the bottom of the administrative structure during the Sultanate and Mughal periods.'[২৬১] মোগল আমলে

২৫৬ pp. 324.
২৫৭ The Provincial Government of the Mughals, pp. 212.
২৫৮ Medieval India : A Miscellany, Vol. II., pp. 279.
২৫৯ Mughal Polity, pp. 161.
২৬০ The Provincial Government of the Mughals, pp. 219.
২৬১ Mughal Polity, pp. 160.

গ্রামগুলিকে সাধারণত 'মৌজা' বা 'দিহি' বলা হতো।[২৬২] মৌজা বলতে শুধু গ্রামই বুঝাতো না, বরং তা ছিল একাধিক ছোট ছোট গ্রামের সমষ্টি।[২৬৩] অন্যদিকে কয়েকটি মৌজা মিলে গড়ে উঠতো 'দিহি'।[২৬৪] তবে গ্রাম, মৌজা ও দিহির এই পারস্পরিক পার্থক্য সর্বত্র সমান ছিল না। কিন্তু গ্রামকে কেন্দ্র করেই মূলত ভূমি-রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের লক্ষ্যেই মৌজা ও দিহি প্রশাসন সক্রিয় ছিল[২৬৫] এবং তা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত টিকে ছিল বলা যায়।[২৬৬]

মোগল আমলে গ্রাম বলতে শুধু মানব-বসতিপূর্ণ কিছু বাড়িঘরকেই বুঝাতো না। বরং এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকতো চারদিকে বিস্তৃত চাষাবাদের জমি[২৬৭] অথবা অন্যভাবে বললে আবাদি ও বাস্তুভিটা, নাল জমি, খাল, নালা, পুকুর, ফলের বাগান এবং সর্বোপরি পতিত ও অনাবাদি ভূমিখণ্ড নিয়েই গড়ে উঠতো এক-একটি গ্রাম। তাছাড়া প্রতিটি গ্রামের চৌহদ্দি খুব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হতো।[২৬৮] এতে করে এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের সীমানা বিরোধ যেমন অনায়াসে এড়ানো যেতো, তেমনি তাদের প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা জমাবন্দি নিরূপণের কাজও অত্যন্ত সহজ হতো। গ্রামের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল 'পঞ্চায়েত' নামীয় একটি সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান বা পর্ষদের ওপর।[২৬৯] তবে এই পরিষদের সদস্যদের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ও সমর্থনের ওপর নির্ভর করে গ্রামের প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতেন 'গ্রাম-প্রধান', যিনি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। এই গ্রাম-প্রধান দু'ভাবে নিযুক্ত হতেন। এক. গ্রামের অধিকাংশ লোকের বিশেষ করে প্রভাবশালী ও অবস্থাপন্ন শ্রেণীর মানুষদের পছন্দে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়ে ও পরবর্তীকালে সরকারের অনুমোদনে, এবং দুই. যে সকল ক্ষেত্রে গ্রাম-প্রধান নির্বাচনে জটিলতা দেখা দিতো অর্থাৎ কোন একক ব্যক্তির পক্ষে গ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর সমর্থন পাওয়া যেতো না, সেখানে রাষ্ট্রই গ্রাম-প্রধান নিযুক্ত করে তার ওপর গ্রামের প্রশাসন পরিচালনার ভার অর্পণ করতো। ড. এস. এ. কিউ. হুসাইনি বলেন, 'The villagers managed their own affairs through their headman who was chosen from among themselves according to the custom of the locality. In those villages where a brotherhood did not exist, headmen were usually appointed by the Government.'[২৭০]

২৬২ A Short History of Hind-Pakistan, Ed. by Pakistan History Board, Karachi, pp. 259; The Administration of the Moghul Empire, pp. 227; Mughal Polity, pp. 160.
২৬৩ Sher Shah and His Times, pp. 313.
২৬৪ Ibid., pp. 313.
২৬৫ Ibid., pp. 313.
২৬৬ Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 8.
২৬৭ The Administration of the Moghul Empire, pp. 227.
২৬৮ Land Revenue Administration under the Mughals, pp. 8.
২৬৯ The Cambridge History of India : The Mughal Period, Vol. IV.pp. 451.
২৭০ Administration under the Mughuls, pp. 232.

উল্লেখ্য গ্রাম-প্রধান সমগ্র গ্রামের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব নির্বাহ করতেন।

এ পর্যায়ে মোগল আমলে গ্রামের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দুজন কর্মচারী (অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রাম-প্রধানও)—'মুকাদ্দাম' ও 'পাটোয়ারি' সম্বন্ধে নীচে আলোচনা করা হলো।

মুকাদ্দাম

'মুকাদ্দাম' আরবি শব্দ, এর আভিধানিক অর্থ 'যাকে প্রথমে বসানো হয়'।[২৭১] ভারতে মধ্যযুগের শুরু থেকেই এটি গ্রামের প্রধান বা মোড়ল (কোথাও কোথাও 'মুখিয়া', 'সরপঞ্চ', 'চৌধুরি', 'পাটিল', 'খুট', 'রায়', রায়আন', 'মাতব্বর' প্রভৃতি)— এই বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। তবে পর্যালোচ্য পর্বে গ্রাম-প্রধান হিশেবে মুকাদ্দামের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। কেননা যতো দূর জানা যায় রায়তি গ্রামগুলিতে তার ওপরই ভূমিরাজস্ব আদায় ও এর অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল। ড. ঈশ্বরী প্রসাদ বলেন, 'The muqaddam is an old officer well known in Indian history. His function was to keep order in the village and to help in the collection of the state dues.'[২৭২] অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার প্রশ্নে গ্রামের মধ্যে চুরি-ডাকাতি, খুন-খারাবি বা অনুরূপ গুরুতর অপরাধের জন্য তাকেই জবাবদিহি করতে হতো। অন্যদিকে আমিনদের দ্বারা নিরূপিত ভূমিরাজস্ব যথাসময়ে আদায় করে সরকারি দপ্তরে বা কোষাগারে পৌঁছানোর মতো গুরুদায়িত্বও ছিল মুকাদ্দামের। এ ব্যাপারে কোন রকম ব্যত্যয়ের জন্য মুকাদ্দামকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা হতো।[২৭৩] তিনি গ্রামের কৃষির উন্নয়নে বিশেষ করে পতিত ও অনাবাদি জমি যাতে কৃষকরা প্রতিনিয়ত চাষাবাদের আওতায় এনে রাষ্ট্রের ভূমিরাজস্ব পাওনার মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, সেটির জন্যও কাজ করতেন। সেই সঙ্গে ছিল গ্রামীণ কোষাগারের নিশ্ছিদ্র দেখাশুনার ভার।[২৭৪] আসলে এক কথায় মুকাদ্দাম ছিলেন রাষ্ট্র বা জায়গিরদার ও রায়তের মধ্যকার যোগাযোগের মূল সূত্র। ড. তারাচাঁদ যথার্থ বলেন, 'He (Muqaddam) was the representative of the whole community in all transactions with the government.'[২৭৫]

মুকাদ্দাম তার এই কাজের জন্য লা-খেরাজ ভূমিস্বত্বসহ আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের শতকরা ১ থেকে সর্বোচ্চ ২$\frac{১}{২}$ ভাগ পারিশ্রমিক বাবদ লাভ করতেন।

২৭১ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১৩৯
২৭২ The Mughal Empire, pp. 324.
২৭৩ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১৪১
২৭৪ বলাবাহুল্য পরগণা-কোষাগারের মতো এই স্তরে কোন কোষাগার ছিল না। তবে মুকাদ্দাম ও পাটোয়ারি যৌথভাবে যে ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন তা তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় কোষে জমা করলেও অবিলম্বে তা পরগণা-আমিলের দপ্তরে বা কোষাগারে পৌঁছাতেন।
২৭৫ Society and State in the Mughal Period, pp. 50-51.

পাটোয়ারি

'পাটোয়ারি' হিন্দি শব্দ[২৭৬] , যার আভিধানিক অর্থ 'যে খাজনা আদায় করে এবং তার হিসাব রাখে বা লাভ-লোকসান সম্বন্ধে যে বেশী বিচার করে'।[২৭৭] মোগল আমলে পাটোয়ারি ছিল 'চাষীদের প্রতিভূ এমন এক রকমের হিসাবরক্ষক'।[২৭৮] ড. নোমান আহমদ সিদ্দিকী বলেন, 'গ্রামের এক মুখ্য কর্মচারী হিসাবে পাটোয়ারি বা গ্রামীণ হিসাবরক্ষক পরিচিত ছিলেন।'[২৭৯] তবে সম্ভবত পাঠান সম্রাট শেরশাহ-এর পূর্বে বাংলায় 'পাটোয়ারি' নামের বা পদবির প্রচলন শুরু হয়নি।[২৮০] পরবর্তীকালে অবশ্য এটি মধ্যবাংলাব্যাপী ব্যাপকভাবে চালু হয়েছিল যার প্রমাণ এতদঞ্চলের লোকজনের নামের শেষে পাটোয়ারি শব্দের বহুল ব্যবহার থেকে অনুমান করা যায়।

মোগল যুগে পাটোয়ারির প্রধান কর্তব্য ছিল গ্রামের যাবতীয় আয়-ব্যয় ও ভূমিরাজস্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করা। তিনি মুকাদ্দাম ও কারকুনের সহায়তায় চাষীদের কাছ থেকে ভূমি-রাজস্ব বাবদ ফসল আদায় ও তার পরিমাপ করতেন।[২৮১] পরে এগুলি পরগণা-কোষাগারে নিরাপদে পৌঁছানোও ছিল তার কাজ।[২৮২] এক কথায় বলতে গেলে দেখা যায় পরগণা স্তরে 'কানুনগো'-এর যে কাজ বা দায়িত্ব-কর্তব্য ছিল, প্রায় অনুরূপ দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে হতো পাটোয়ারিকে তার এলাকায় অর্থাৎ গ্রাম পর্যায়ে।[২৮৩]

কানুনগোর মতো তিনি নিয়মিত সরকারি কর্মচারী ছিলেন না। গ্রামের পক্ষ থেকেই ছিল তার নিযুক্তি[২৮৪] , ফলে তার কাজের জবাবদিহিতাও ছিল মূলত গ্রাম-পঞ্চায়েতের কাছে অনেকটা সীমিত। কিছুটা গ্রাম-প্রধান হিশেবে মুকাদ্দামের কাছেও কখনও কখনও।[২৮৫]

পাটোয়ারি সরকারি নিয়মিত ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী না হলেও তার সামগ্রিক কাজের জন্য তিনি গ্রাম-পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সামান্য কমিশন বা সম্মানী পেতেন যার মোটামুটি পরিমাণ ছিল আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের শতকরা ১ ভাগ।[২৮৬]

এ পর্যায়ে আমরা মোগল যুগের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা চারিত্র্য (Characteristics) এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরে এ অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো।

২৭৬ The Agrarian System, pp.276.
২৭৭ শব্দ সঞ্চয়িতা : বাংলা অভিধান, ড. মিলন দত্ত ও অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৫৩৩; মিঃ আর. ই. হকিন্স-এর 'Common Indian Words in English' (pp. 73) অভিধানে তাকে 'village registrar' বলা হয়েছে।
২৭৮ মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১৩৪
২৭৯ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১০
২৮০ Sher Shah and His Times, pp. 312.
২৮১ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১০
২৮২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০
২৮৩ The Mughal Government, pp. 126.
২৮৪ Akbar The Greatest Mogul, pp. 158.
২৮৫ Agrarian Relations and Early British Rule in India, pp.47.
২৮৬ মোঘল রাজত্বে ভূমি-রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা, পৃষ্ঠা ১০

প্রথমেই এ যাবৎ আলোচিত প্রাদেশিক ও তদৃনিম্ন স্তরের প্রশাসনিক অবকাঠামোয় কর্মচারীদের একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো।

সুবাহ্	সরকার	পরগণা/মহাল	গ্রাম বা দিহি
সুবাদার/নাজিম*	ফৌজদার*	শিকদার*	মুকাদ্দাম
দিওয়ান	দিওয়ান-ই-সরকার	আমিল/ আমলগুজার	পাটোয়ারি
		আমিন	
		বিতিকচি/ কারকুন	
		ফোতাদার/ খিজানাদার	
		কানুনগো	
		চৌধুরি	

উপরের তারকাচিহ্নিত রাজকর্মচারীগণ যদিও সরাসরি ভূমিরাজস্ব নিরূপণ ও আদায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, তবে এই কাজে ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদেরকে তারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে পরোক্ষ ভূমিকা পালন করতেন। এই তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে মূলত পরগণা বা মহালই যে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় সবচেয়ে অধিক ও প্রত্যক্ষ গুরুদায়িত্ব পালন করতো তা পরগণা স্তরের রাজস্ব কর্মচারীদের সংখ্যাধিক্য থেকেই প্রমাণিত। এই সকল কর্মচারীদের স্ব স্ব দায়িত্ব ও কর্তব্য ইতোমধ্যে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি। এখানে তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডের ফলে তৎকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় যে মৌলিক বিষয় বা সূত্রগুলি ফুটে উঠেছিল সেগুলিই নীচে এক-এক করে তুলে ধরা হলো।

প্রথমত সাম্রাজ্যের আয়তনগত বিশালতা, ক্রম-সম্প্রসারণ (ক্বচিৎ সংকোচনও), স্থানিক বৈচিত্র্য, কৃষিকাজের উন্নয়ন ও রায়তশ্রেণীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং সর্বোপরি ভূমিরাজস্বজাত আয় বৃদ্ধি— মূলত এই বিষয়গুলিকে চিন্তায় রেখে মোগল শাসকগণ তাদের প্রাদেশিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যস্ত করেছিলেন। যদিও সত্য যে ভূমিরাজস্বের জন্য তাঁরা কোন আলাদা (করোড়ি এবং চাকলা ছাড়া) প্রশাসনিক অবকাঠামো তৈরি করেননি, বরং দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসনের সঙ্গেই ছিল তা একীভূত, তথাপি এটা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, মোগল শাসকদের সকল ধরনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অন্তর্মূলে ছিল ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক চিন্তা। অবশ্য মধ্যযুগীয় প্রেক্ষাপটে তা না হওয়ার কোন কারণও ছিল না। মুখ্যত ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তার যথাযথ আদায় নিশ্চিত করণার্থে যখন যেখানে যেটা করা উচিত বা ছাড় দেয়া জরুরি, স্থান-কাল-পাত্রের প্রয়োজনে মোগল শাসকগণ সেটাই করেছিলেন। যে কারণে জ্যেষ্ঠ মোগলদের শাসনকালের প্রাথমিক পর্বের উল্লেখযোগ্য স্থান-পরিসরে তৎকালীন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার কোন একক বা সর্বত্র প্রচল ও সুনির্দিষ্ট প্রশাসনিক অবকাঠামো যেমন দেখা যায় না, তেমনি তাতে দায়িত্ব পালনকারী কর্মচারীমণ্ডলীর সংখ্যা ও পদবির ক্ষেত্রেও ছিল কমবেশি পার্থক্য। তবে তার অর্থ এ নয় যে, এই বিভিন্নতা ছিল খুব ব্যাপক ও প্রকট। জ্যেষ্ঠ

মোগলদের চিন্তা, রুচি ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে এই পরিবর্তন ঘটেছিল।

অন্যদিকে স্থানবিশেষে কোন একটি ব্যবস্থা উপযোগী বিবেচিত না হলে বা যুগপৎ রাষ্ট্র ও রায়তের জন্য ক্ষতিকর মনে হলে শাসকশ্রেণী তা অচিরেই প্রত্যাহার করে নিতেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বাংলা সুবাহ্ ও 'করোড়ি' ব্যবস্থার কথা বলতে পারি। দেখা গেছে সুবা বাংলা সমগ্র মোগল শাসনামলে কখনই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের 'সুনিয়ন্ত্রণে' ছিল না। এখানকার সুবাদার ও পরবর্তীকালে নাজিম-দিওয়ানগণ প্রায়শই অনেকটা স্বাধীন শাসকের মতো সুবা পরিচালনা করেছেন। কেন্দ্র থেকে অতিদূর এবং মোগল শাসক[২৮৭] ও অভিজাতদের বসবাসের জন্য না-পছন্দের এই প্রদেশটিতে নিজেদের খুব শিথিল ধরনের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এটা জানা সত্ত্বেও তাঁরা শুধু বাৎসরিক ভূমিরাজস্ব (তা-ও এককালীন হোক) পেয়েই তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন। অথচ দিল্লি, আগ্রা, আজমির, এলাহাবাদ প্রভৃতি সুবায় তাঁরা প্রথম থেকেই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি সুদৃঢ় ভিত্তি ও অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার মাধ্যমে সেখানে মোটামুটি 'রায়তওয়ারি' প্রথা চালু হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় সেটা সম্ভব হয়নি। এখানকার জনচিত্ত ও জমিদারশ্রেণীর ভূমিকা সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়নি। মোগলরা তা মেনেও নিয়েছিল। আবার করোড়ি ব্যবস্থার বেলায় দেখা যায় সম্রাট আকবর ভেবেছিলেন এই ব্যবস্থা চালু করে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে (বাংলা, বিহার ও গুজরাট ব্যতীত) একটি একক ও সর্বত্র-সমান ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোর মধ্যে আনতে সক্ষম হবেন। কিন্তু প্রয়োগকালে যখন তাঁর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে করোড়ি ব্যবস্থা ব্যর্থ হলো তখন তা প্রত্যাহার করে নিতে সম্রাট বিন্দুমাত্র দেরী করেননি। অনুরূপভাবে সম্রাট শাহজাহানের সময়ে যখন পরীক্ষামূলকভাবে 'চাকলা' ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়, সেটাও যখন আশানুরূপ ফল দানে অনুপযোগী প্রতীয়মান হয়, সম্রাট তা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। সুতরাং এ সমস্ত দৃষ্টে আমরা নিঃসন্দেহে এ ধারণা করতে পারি যে শাসনযুগের প্রথম অংশে মোগল শাসকগণ সাম্রাজ্যবাপী কোন একক ও সর্বত্র সমানভাবে প্রচল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি। তবে উত্তরকালে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে 'প্রায়' সর্বত্র অনুসৃত একটি নির্দিষ্ট, একক ও সুবিন্যস্ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামো মোগলরা প্রবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তা বলা যায়।

দ্বিতীয়ত প্রাদেশিক ও তদ্‌নিম্ন স্তরের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে যারা মুখ্য ভূমিকায় থাকতেন যেমন দিওয়ান, আমিল বা আমলগুজার প্রভৃতি, এরা নিজেরা যেমন অর্পিত দায়িত্ব-কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালনে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না, তেমনি স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে পুরোপুরি অন্যের অধীনও ছিলেন না। বলা যায় সর্বদা তাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য

২৮৭ সুলতানি যুগের শাসকদের মতো মোগলরাও মধ্যবাংলাকে 'জান্নাতুল বিলাদ' বা 'স্বর্গনিবাস' বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু তাদের এই মন্তব্য যতোটা না এখানে বসবাসের উপযোগিতা থেকে সৃষ্ট, তার চেয়ে বরং বাংলার ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও আয়েসী-বিলাসী জীবন অতিবাহিত করণের ধারণা থেকে উদ্ভূত। প্রসঙ্গত সম্রাট বাবরের কথা বলা যায় যিনি বাংলাকে তো বসবাসের উপযোগীই মনে করেননি, উপরন্তু বাংলা সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্যও করেছিলেন, দেখুন, 'তুযুক-ই-বাবুরী'। কিন্তু বাংলার বিত্ত-বৈভবের প্রতি তাঁর ও অন্য মোগলদের লোভ ছিল ষোল আনা।

'Checks and Balances' নীতি কাজ করতো। পুনরাবৃত্তি হবে জেনেও এখানে উদাহরণ হিশেবে বলতে পারি প্রাদেশিক স্তরে সুবাদার ও দিওয়ানের সম্পর্কের কথা। দিওয়ান ভূমিরাজস্ব ধার্য ও আদায় অর্থাৎ রাজস্ববিষয়ক কার্যক্রমে সুবাদারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব আদায়কালে যখন স্থানীয় সমস্যা বা জটিলতার উদ্ভব হতো—কোন এলাকার রায়তগণ তা দিতে অস্বীকার করতো বা রাজস্ব কর্মচারীদেরকে সম্মিলিত শক্তিতে সেই স্থান থেকে বিতাড়িত করতো, তখন প্রজাদের এই বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহ সুবাদারকেই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন সৈন্যসামন্ত দিয়ে দমন করতে হতো। ফলে দেখা যাচ্ছে দিওয়ান তাঁর কার্যক্রমে স্বাধীন হয়েও অ-পরনির্ভরশীল নন। অন্যদিকে সুবাদার তাঁর দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। প্রদেশ-স্তরে এ ব্যাপারে দিওয়ান বা অন্য কোন রাজকর্মচারীর বাধ্যতামূলক পরামর্শের মুখাপেক্ষী তিনি ছিলেন না। অথচ প্রশাসনিক ব্যয় ভার, বিশেষ করে অতিরিক্ত ও বিধি বহির্ভূত খরচ মঞ্জুরির জন্য তাঁকে দিওয়ানের সঙ্গে নিজ প্রয়োজনেই সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হতো। নচেৎ দিওয়ানের কোন প্রকার অর্থাপত্তি সুবাদারের স্বাভাবিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারতো। অনুরূপভাবে সরকার স্তরে ফৌজদার ও দিওয়ান-ই-সরকার-এর সম্পর্কও ছিল পারস্পরিক বোঝা-পড়া ও সৌহার্দ্য-নির্ভর। সুতরাং এ কথা অনস্বীকার্য যে মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থায় কর্মচারীকুল-এর মধ্যে সর্বদাই একটা অন্তঃশীলা স্রোতের মতো পারস্পরিক 'বাধা ও ভারসাম্য' নীতি কাজ করতো। শাসকশ্রেণী তা অত্যন্ত সুচতুরভাবে প্রশাসনিক বিন্যাস ও পদ্ধতির মধ্যে গেঁথে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

তৃতীয়ত ছিল প্রাদেশিক ও তদ্‌নিম্ন ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের সুকঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং একই সঙ্গে এক স্তরের ওপর অব্যবহিত পরবর্তী বা উচ্চতর ধাপ বা স্তরের নিয়ন্ত্রণ ও তীক্ষ্ণ খবরদারি। কেন্দ্রীয় সরকার সুবাহ্‌ প্রশাসনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদেরকে হরহামেশা বদলি (যদিও বদলির স্বাভাবিক নিয়ম ছিল ২ থেকে ৩ বছর অন্তর অন্তর), পদচ্যুতির ভয়, বা প্রকৃতই গদিচ্যুত করে (অনেক সময় গুরুতর অপকর্মের জন্য শৃঙ্খলিতও করা হতো) ইত্যাদি পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক প্রশাসনের কর্মচারীদের সর্বদা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখার চেষ্টা করতো। উল্লেখ্য স্বয়ং সম্রাটও কখনও কখনও প্রাক-নির্ধারিত ও আকস্মিক ভ্রমণ ও পরিদর্শনে বের হতেন। কোন কোন বিভাগের বিশেষ করে ওয়াকিয়া-নবিশ-এর দপ্তরের কর্মচারীরা পূর্বনির্দিষ্ট কর্মসূচি ছাড়াই সম্রাটের ব্যক্তিগত দর্শন ও সাহচর্য লাভ করতে পারতেন। তারা তখন তাঁকে প্রদেশের বিভিন্ন ছোটখাট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবরাদি সরবরাহ করতো। মূলত তাদের মাধ্যমেই সম্রাট অনেক কিছু অবহিত হয়ে পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। অন্যদিকে সুবাদার, দিওয়ান প্রভৃতিও তাঁদের নিম্নস্তরের প্রশাসনিক বিভাগ ও অধীন দপ্তরসমূহ পরিদর্শন করতেন। প্রয়োজনে ছোটখাট কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক বদলি, পদচ্যুতি বা সাময়িক অপসারণ এবং ক্ষমতাবহির্ভূত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে তাঁদের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ তথা দিওয়ান-ই-আলা ইত্যাদির কাছে রিপোর্ট করতে পারতেন। এ সকল ক্ষেত্রে তাঁদের প্রেরিত সুপারিশ অধিকাংশ সময়ই কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করতেন। যা হোক প্রশাসনিক কর্মচারীদের ওপর তাদের উপরস্থ

কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পাশাপাশি স্থানীয় ভাবে তাদের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক এক ধরনের তদারকি ছিল যা পরগণা পর্যায়ে খুব প্রত্যক্ষরূপে আমরা দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি পরগণা-কোষাগারে ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য শুল্ক বাবদ যে নগদ অর্থ ও অন্যান্য দ্রব্য জমা হতো, তা দেখাশুনার মূল দায়িত্ব যদিও ছিল ফোতাদার বা খিজানাদারের ওপর, কিন্তু তিনি কখনই সেই দায়িত্ব এককভাবে পালন করতে পারতেন না। একদিকে তিনি যেমন আমিল ও কারকুনের (শেষোক্ত কর্মচারীর সহযোগিতা সর্বত্র জরুরি ছিল না) প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও তাদের সশরীরী উপস্থিতি ছাড়া কোষাগারের তালা খুলতে ও বন্ধ করতে পারতেন না, অন্যদিকে তেমনি পরগণার ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও আমিল, ফোতাদার ও কখনও কখনও কারকুনের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ও সম্মতি ছাড়া সেখান থেকে একটি 'দাম'ও নিতে পারতেন না। বস্তুত এই সকল কর্মচারী—এরা নিজেরাই নিজেদের (একে অন্যের) প্রহরা ও ঢাল হয়ে কাজ করতো। অধ্যাপক বার্ক বিষয়টিকে আরও সুন্দর করে বলেছেন। তাঁর ভাষায়, 'There were also the usual built-in checks and balances in the allotment of functions at all levels......In the parganah, the Treasurer was forbidden to receive any money from the cultivator without the knowledge of the Collector and he could not make any disbursements without the voucher of the provincial Diwan. The door of the local treasury was fastened with 'several locks of different construction'. The Collector was to hold the key of one of the locks while the Treasurer retained the rest of the keys.'[২৮৮] চূড়ান্ত বিচারে কর্মচারীদের দায়িত্ব-কর্তব্যের এই সুনির্দিষ্ট বিভাজন ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সর্বোপরি স্থানীয়ভাবেই একে-অপরের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-প্রক্ষেপ— মোগলদেরকে শেষ অবধি সাম্রাজ্যব্যাপী একটি সুদৃঢ়, যুগোপযোগী ও সুনিয়ন্ত্রিত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে ও তার সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব বিধানে সহায়ক হয়েছিল।

চতুর্থত আগেও বলেছি সমগ্র মধ্যযুগে ভূমিরাজস্বই ছিল রাষ্ট্রীয় আয়ের প্রথম ও প্রধান উৎস, এবং এর মূল যোগানদার ছিল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্তরের রায়তশ্রেণী। মোগল সম্রাটগণ এই বিষয়টি খুব ভালোভাবেই জানতেন। আর তাই আকবর থেকে আওরঙ্গজেব, সকলেই চাইতেন কৃষির উন্নয়ন ও আবাদি ভূমির সম্প্রসারণ। কেননা এ দু'টির যে কোন প্রকার উন্নতির অর্থই রায়তের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন এবং রাজকোষের আয় বৃদ্ধি। ফলত এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে গতানুগতিক গ্রাম প্রশাসনকে অস্পৃষ্ট (Untouched)[২৮৯] ও অক্ষুণ্ন রেখেও শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, অধিকাংশ স্থানেই রায়তওয়ারি প্রথার অনুসরণ, কঠোর হস্তে প্রশাসন পরিচালনা ও সর্বোপরি উপযুক্ত

২৮৮ Akbar The Greatest Mogul, pp. 158.

২৮৯ 'Akbar left untouched the ancient Indian institution of village self-government, known as the Panchayat System,....' (Akbar The Greatest Mogul, pp. 158).

সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে ছাঁটাই করে মোগলরা ঈপ্সিতকাম হতে পেরেছিল।

পঞ্চমত মোগলদের সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বের তথা সুলতানি যুগের তুলনায় জনবল কমেছিল। যেমন সম্রাট শেরশাহের সময়ে পরগণা-স্তরে কারকুন ছিলেন দুই জন একজন ফারসিতে ও অন্যজন হিন্দিতে বা স্থানীয় ভাষায় লেখালেখির জন্য, কিন্তু সম্রাট আকবরের সময়ে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছিল মোটামুটি একজনে—শুধু ফারসিতে লেখার জন্যে। এতে করে স্বভাবতই রাজস্ব কর্মচারীদের ওপর কাজের চাপ বেড়েছিল। যে কারণে অনেক সময় মনে হয় একই কাজ একাধিক কর্মচারী করছে, অথবা অন্যভাবে বললে, কোন কোন সময় ভূমিরাজস্ব বিভাগে কর্মরত এক পদবির কর্মচারীর কাজের সঙ্গে অন্য পদবির কর্মচারীর কাজের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের এই বক্তব্যের স্বপক্ষে তিনজন আধুনিক খ্যাতিমান ঐতিহাসিকের তৎকালীন তিনজন রাজস্ব কর্মচারী—আমিল বা আমলগুজার, আমিন ও বিতিকচি-এর ভূমিকা সম্বন্ধে উল্লেখ করে নেবো, পরে দেখানোর চেষ্টা করবো যে কিভাবে এই সকল কর্মচারীদের কাজ একীভূত হয়ে গেছে। 'আমিল'-এর বহুবিধ কাজের মধ্যে একটি সম্বন্ধে ড. জগদীশ নারায়ণ সরকার বলেন, 'He (Amalguzar or Amil) was to deal directly with individual husbandmen as regards fixing the rent of and realising the state's dues.'[২৯০] ড. সরকারের বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে রাষ্ট্রীয় দাবি নিরূপণ ও আদায়ে 'আমিলে'র ভূমিকা সরাসরি বা প্রত্যক্ষ। অন্যদিকে 'আমিন'-এর ভূমিকা সম্বন্ধে ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'আমিলের কাজে সাহায্যের জন্য পরগণায় আরও কয়েকজন কর্মচারী ছিল। ইহাদের মধ্যে আমীন, কারকুন, খাজাঞ্চী ও কানুনগো উল্লেখযোগ্য ছিলেন। আমীন প্রজাদের রাজস্ব নির্ধারণের দায়িত্ব বহন করিতেন।'[২৯১] আবার বিতিকচি (কারকুন)-এর কাজ সম্বন্ধে এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট বলেন, 'To assist him (Collector) in the revenue management of his district, the collector had a bitikchi or accountant, whose duty inter alia it was, when the survey of a village had been completed, to determine the assessment of each cultivator and specify the revenue of the whole village,..'[২৯২] এই শেষোক্ত উক্তিতেও আমরা দেখতে পাই চাষীদের ভূমিরাজস্ব নিরূপণের দায়িত্বে নিয়োজিত আর একজন কর্মচারীকে তথা বিতিকচিকে। আসলেই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনায় মোগল শাসকদের এতো বেশি 'Checks and Balances' বিভিন্ন পর্যায়ে ছিল যে তৎকালীন ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের অনেকের কাজের সঙ্গে খুব নিবিড় সাযুজ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদেরকে সে আলোচনায় প্রায়শই বিভ্রান্ত করে। ফলে তাঁদের অনেক আলোচনা সিদ্ধান্ত আপাত দৃষ্টিতে ভুল মনে হলেও হয় তো অন্যভাবে তা যথার্থ।

২৯০ Mughal Polity, pp. 154.
২৯১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৭
২৯২ Mughal Rule in India, pp. 206.

ষষ্ঠত যেটি খুব মূল্যবান বলে মনে হয় তা হলো মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে (সাধারণ প্রশাসনেও বটে) বিভিন্ন সময়ে, এমন কি একই শাসকের রাজত্বকালে বিভিন্ন অংশে একটি পদের বিপরীতে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন পদবি বা নামের অবতারণা ও প্রচলন অনেক ক্ষেত্রেই নামধারী ব্যক্তিদের ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে তাদের ভূমিকা ও অবস্থান বুঝে ওঠায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত আমিল বা আমলগুজার, করোড়ি ও চাকলাদার—এই তিন কর্মচারীর অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। কেউ কেউ বলেন আমিল বা আমলগুজার যেমন পরগণা স্তরে ছিলেন, ঠিক একই পদবির উর্ধতন কর্মচারী সরকার-স্তরেও ছিল। এ ধারণা অমূলক নয়। পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আমিল বা আমলগুজার মোটামুটি পরগণা-স্তরের ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় মুখ্য কর্মচারী ছিলেন। করোড়ি ও চাকলাদার যথাক্রমে আকবর ও শাহজাহানের সৃষ্ট বিশেষ ব্যবস্থায় আঞ্চলিক ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের প্রধান ছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন বা বিপত্তি সৃষ্টি হয় তখন যখন সম্রাট আওরঙ্গজেবের রসিক দাসকে লেখা পত্রে একই সঙ্গে আমিল এবং করোড়ির উল্লেখ করা হয়। সত্যি বলতে তখন বুঝে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় যে, তৎকালীন এই দুজন কর্মচারী কে, কোন্ পর্যায়ে ছিলেন এবং তাদের পারস্পরিক ভূমিকাই বা কী ছিল? অনুরূপভাবে চাকলা একক চালু হওয়ায় এবং একই কালে প্রচলিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা অব্যাহত থাকায় ফৌজদার ও দিওয়ান-ই সরকার-এর অবস্থান চাকলাদারের পাশাপাশি কী দাঁড়িয়েছিল সেটাও খুব স্পষ্ট জানা যায় না। কখনও মনে হয় তাদের ভূমিকা এক এবং পরস্পরের পদবির ভিন্নতা ছাড়া তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু পরক্ষণেই বাস্তবতা দৃষ্টে এই ধারণা অসমীচীন প্রতীয়মান হয়।

সপ্তমত মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের স্বার্থে যদিও সাম্রাজ্যের সমুদয় ভূমিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং সূক্ষ্ম দাগে তা ছিল— (ক) খালিশা (খ) জায়গির ও (গ) জমিদার ও স্থানীয় রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চল। মূলত খালিশা এলাকাতেই সরকারি প্রশাসন সরাসরি কাজ করতো। তা-ও সরকারি কর্মচারীরা কখনও নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে, এবং অন্য সময় ইজারাদারের মাধ্যমে খালিশা ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় করা হতো। উল্লেখ্য ইজারাদাররা বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার অঙ্গীকারে এক-একটি পরগণা ইজারা গ্রহণ করতো।[২৯৩] অন্যদিকে জায়গির এবং জমিদারি ও স্থানীয় সামন্ত প্রধানশাসিত অঞ্চলে সরকারি ভূমিরাজস্ব প্রশাসন সরাসরি কাজ না করলেও তাদের ওপর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের যেমন খবরদারি ছিল, তেমনি তাদেরকে ভূমিরাজস্ব বিষয়ক সরকারি আইন-কানুন ও বিধিবিধান অবশ্যই মানতে হতো।

অষ্টমত যেটা না বললে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে তা হলো মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো পারস্যদেশীয় লোক ও সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. কিশোরী শরণ লাল বলেন, 'With the coming of the Mughals, Persian element in administration became more prominent.'[২৯৪] তবে এই প্রাধান্যের সঙ্গত কারণও ছিল। স্যার যদুনাথ সরকার যথার্থই বলেছেন, 'The Persians

২৯৩ বাংলাদেশের ইতিহাস : মধ্যযুগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ২০৮-১০
২৯৪ The Lagacy of Muslim Rule in India, pp. 143.

were most highly valued for their polished manners, literary ability and capacity for managing the finance and accounts.'[২৯৫] পারশ্যদেশীয়দের এই প্রভাব বিভিন্নভাবে বেড়েছিল। পর্যালোচ্য ক্ষেত্রে আমরা দু'টির কথা উল্লেখ করতে পারি। এক. তদ্দেশীয় লোকেরা ভূমিরাজস্বসহ প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ে ক্রমশ স্থান করে নিয়েছিল, এবং দুই. প্রশাসনিক পরিভাষায় যেমন কর্মচারীদের বিভিন্ন পদবি ও নাম, অনুসৃত প্রথা-পদ্ধতির নতুন নামকরণে এই প্রভাব দিন-দিন স্পষ্ট হচ্ছিলো।

পরিশেষে আমরা মোগল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার কালজয়ী গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত দিয়ে এই অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করবো।

আগেই বলেছি যে মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক অবকাঠামোর নির্মিতি ছিল এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি আকবরের হাতে। উত্তরকালে তাঁরই কয়েকজন যোগ্য বংশধর এই ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত, পরিশীলিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, যদ্যপি মূল কাঠামো সেই একই ছিল। সত্যি বলতে সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ও পুনর্বিন্যস্ত ভূমিরাজস্ব প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এখানেই যে, তা পরবর্তীকালে নবাবি আমল তো বটেই, এমন কি ইংরেজ আমলেও একটা উল্লেখযোগ্য কাল-পরিসর পর্যন্ত টিকে ছিল, তৎকালীন ভিনদেশীয় শাসকশ্রেণী কর্তৃক সাদরে তা গৃহীত ও অনুসৃত হয়েছিল। এডওয়ার্ডস ও গ্যারেট তো অকুণ্ঠিতচিত্তে বলেই ফেলেছেন, আকবর তথা মোগলদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল— 'the basis of the administrative system of British India.'[২৯৬] ঐতিহাসিক স্মিথ আরও স্পষ্ট করে বলেন, '..from the time of Warren Hastings in the last quarter of the eighteenth century, the newly constituted Anglo-Indian authorities began to grope their way back to the institutions of Akbar. They gradually adopted the principal features of his system in the important department concerned with the assessment of the land revenue, or crown share of agricultural produce, known in Indian official language as the Settlement Department....The structure of the bureaucratic framework of government also still shows many traces of his handiwork. His institutions, therefore, are not merely of historical and antiquarian interest, but are in some degree the foundation of the system of administration now in operation.'[২৯৭]

২৯৫ Mughal Administration, pp. 120; quoted from 'The Legacy of Muslim Rule in India', pp. 144.

২৯৬ Mughal Rule in India, pp. 41.

২৯৭ Akbar The Great Mogul, pp. 257.

অষ্টম অধ্যায়

ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা (নবাবি আমল)

আগেই বলেছি সম্রাট আকবরের আমলে সমগ্র বাংলায় মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি।[১] তখনও মধ্য বাংলার বিভিন্ন অংশে পূর্ববর্তী সুলতানদের সময়কার প্রবল প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় ভূস্বামী-জমিদারশ্রেণী, যাঁদের অধিকাংশই ছিল আফগান-পাঠান বংশোদ্ভূত মুসলিম ও কিছু কিছু হিন্দু সামন্ত প্রধান বা প্রাচীন রাজন্যবর্গ; এঁরা কেন্দ্রীয় মোগল শক্তির সরাসরি প্রতিনিধি—প্রাদেশিক অধিকর্তা নাজিম-সুবাদারদের তাদের আধিপত্য বিস্তারের ঘোর প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করছিল। ড. আসকার ইবনে শাইখ বলেন, 'সুপ্রাচীন রাজবংশের সন্তান না হয়েও এ সব বীরেরা প্রবল পরাক্রান্ত দিল্লী-বাহিনীর কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ না করে তাদের মোকাবিলা করেছিলেন।'[২] সাধারণভাবে এঁরা 'বারো-ভূঁইয়া' বা 'বারো-ভূঁঞা' নামে পরিচিত ছিলেন।[৩] এঁদের উৎপত্তি মুসলমান শাসনামলে।[৪] সুলতানি যুগে সামরিক কর্মচারীদের তাদের বেতন-ভাতা বাবদ জায়গির দেয়ার রেওয়াজ ছিল। শাসকগণ ভূমিরাজস্ব আদায়ের প্রয়োজনে ইজারাদারও নিয়োগ করতেন। বস্তুত এই জায়গিরদার-ইজারাদারগণই বংশগতভাবে উত্তরকালে শক্তিশালী স্থানীয় জমিদার ও সামন্ত প্রধানে পর্যবসিত হন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এই তথাকথিত 'বারো-ভূঁইয়া'গণ স্বাধীনভাবে শাসন ক্ষমতার আস্বাদ লাভ করেন আফগান শাসক দাউদ খান কররানির মোগলদের হাতে পতনের পর অর্থাৎ ১৫৭৫-৭৬ এর পরে।[৫] তখন অনেক পাঠান সর্দার বাংলায় এসে আশ্রয় নেন ও বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন জমিদারি প্রতিষ্ঠা

১ তাঁর আমলে মোগল শাসন মূলত উত্তর-পশ্চিম বাংলার শহর ও দুর্গ এলাকায় মোটামুটি সীমাবদ্ধ ছিল। (বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৫৫)।

২ মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, পৃষ্ঠা ১৫২।

৩ এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'সুন্দরবনের ইতিহাস', এ এফ এম আবদুল জলীল, তৃতীয় খণ্ড; 'মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস', মোহাম্মদ সাইফ উদ্দিন সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪৭-৬২; 'বাংলাদেশের ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৩৪-৪৭; The History of Bengal, Vol. II., Chapter XIII; 'History of the Muslims of Bengal, Vol. IA', Dr. Muhammad Mohar Ali, Chapter XV; History of the Afghans in India, Dr Muhammad Abdur Rahim, pp. 217-33.

৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৫৫।

৫ 'All the sources agree in stating in one form or another that the Bara Bhuiyans were those who rose in Bengal after the fall of the Afghan ruler Da'ud Khan....' (History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp. 293).

করেন। সম্মিলিতভাবে যদিও এঁরা 'বারো-ভূঁইয়া' নামে পরিচিত ছিলেন বা অভিহিত হতেন, কিন্তু বাস্তবে তাদের মোট সংখ্যা ১২-এরও অধিক ছিল।[৬] এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন সোনারগাঁয়ের ঈসা খান ও তৎপুত্র মুসা খান, যশোরের প্রতাপাদিত্য, শ্রীপুর-বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভাওয়ালের ফজল গাজি ও তারা গাজি, বাকেরগঞ্জের কন্দর্পনারায়ণ ও তৎপুর রামচন্দ্র প্রভৃতি।[৭] যা হোক, এই সকল ভূস্বামী-জমিদারদের প্রায় একচ্ছত্র রাজত্বকালে জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটগণ সমগ্র বাংলা বিজয়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেনাপতি-সুবাদার নিয়োগ করেছিলেন। সম্রাট আকবরের নিযুক্ত ৯ জন[৮] ও সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালের প্রথম দিকের ২ জন[৯] সুবাদার; এরা কখনও যুদ্ধে জয়ী হয়ে, কখনও ষড়যন্ত্রমূলক কূটনীতির জোরে, আবার কখনও স্থানীয় অঞ্চলাধিকারীদের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি স্থাপন করে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মোগল অধিকার ও শাসন সম্প্রসারিত করেছিলেন। তবে সত্য বলতে মধ্যবাংলায় মোগল আধিপত্য (চট্টগ্রাম ছাড়া, চট্টগ্রাম মোগল অধিকার ভুক্ত হয় আরও পরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সুবাদার শায়েস্তা খানের শাসনামলে ১৬৬৬-৭ খ্রিস্টাব্দে[১০]) দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সতেরো শতকের গোড়ার দিকে সম্রাট জাহাঙ্গিরের রাজত্বে সুবাদার ইসলাম খানের শাসনামলে (১৬০৮-১৩)।[১১] এ প্রসঙ্গে ড. এম এ রহিম বলেন, 'সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কর্মঠ সুবাদার

৬ History of the Afghans in India, pp. 217. শব্দার্থানুযায়ী 'বারো ভূঁইয়া' দ্বারা ১২ জন জমিদারকেই বুঝায়। কিন্তু এই আক্ষরিক অর্থ, এর উৎপত্তির ইতিহাস ও প্রকৃত 'বারো ভূঁইয়া' কারা,—এ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক-ঐতিহাসিক নানারূপ মত প্রকাশ করায় এদের সম্পর্কে সত্যিই প্রচুর বিভ্রান্তি রয়ে গেছে।

৭ প্রথমোক্ত দু'জন ছাড়া অন্যদের খ্যাতির ইতিহাস প্রচুর স্থানীয় গল্পগাঁথা-কিংবদন্তীতে পূর্ণ থাকলেও ঈসা খানের সঙ্গে মোগল সুবাদার স্বনামখ্যাত রাজা মানসিংহের যুদ্ধের কথা সর্বজন স্বীকৃত এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

৮ সম্রাটে আকবরের নিযুক্ত ৯জন মোগল সুবাদার হলেন—(১) হুসেইন কুলি খান-ই জাহানি (১৫৭৬-৭৮), (২) ইসমাইল কুলি (১৫৭৮-৭৯), (৩) মুজাফফর খান তুরবাতি (১৫৭৯-৮০), (৪) সম্রাটের বিদ্রোহী ভ্রাতা খান-ই আজম মিরজা আজিজ কোকা (১৫৮০/৮১-১৫৮২/৮৩), (৫) শাহবাজ খান (১৫৮২/৮৩-১৫৮৪/৮৫), (৬) সাদিক খান (১৫৮৫-৬) (৭) ওয়াজির বা উজির খান (১৫৮৬-৭), (৮) সাইদ খান (১৫৮৭-৯৪), এবং (৯) রাজা মানসিংহ (১৫৯৪-১৬০৫/৬)। দেখুন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৫৬-৮; মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, পৃষ্ঠা ১৪৬-৭, ২৬৩; সপ্তদশ শতকের বাঙালির সমাজ ও সাহিত্য, ড. কবিতা ঘোষ, পৃষ্ঠা ১৯৮-৯৯; Imperial Gazetteer of India : Provincial Series : Bengal, Vol. I., pp. 27.

৯ ১) সুবাদার শেখ কুতুবউদ্দিন কোকা বা কোকালতাস (১৬০৬-৭) ও (২) সুবাদার জাহাঙ্গির কুলি (১৬০৭-৮); স্যার যুদনাথ সরকার এঁদের 'যুদ্ধজয়ী সেনাপতি' (Conquering generals) হিশেবে আখ্যায়িত করেছেন। দেখুন, মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৬৫।

১০ ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল এ সম্পর্কে যথার্থই বলেন, 'শায়েস্তা খানই সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন। সুবেদার পরে সম্রাটের অনুমতিক্রমে চট্টগ্রামের নাম রাখেন 'ইসলামাবাদ'।' (বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, পৃষ্ঠা ১৫)। চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ, আবদুল হক চৌধুরী; 'A History of Chittagong, Vol. I., Dr Suniti Bhushan Qanungo, Chapter XIII.

১১ তাঁর আগে-পরে অনেক সুবাদার মধ্য বাংলা বিজয়ে (অবশ্যই সীমিত কিছু অংশে) ভূমিকা রাখলেও চট্টগ্রাম ব্যতীত বাংলার অপরাপর অংশ বিজয়ে সুবাদার ইসলাম খান চিশতি'র কৃতিত্ব সর্বাধিক; ঐতিহাসিকদের ভূয়সী প্রশংসাও তিনি এ জন্য পেয়েছেন। ড. সুধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বলেন, 'It was

ইসলাম খানের প্রচেষ্টার ফলে বার ভূঁইয়াদেরকে দমন করা হয় এবং তাদেরকে বশীভূত করা হয় এবং চট্টগ্রাম ব্যতিরেকে সমগ্র বাংলায় মুগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।'[১২] তবে পূর্ব বাংলায় মোগলদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সূচনাকারীর প্রকৃত কৃতিত্ব অবশ্যই রাজা মানসিংহের প্রাপ্য। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পূর্ব বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থাপনের সূচনা করেন মানসিংহ।'[১৩] তিনিই 'বারো-ভূঁইয়া'দের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা ও আন্তঃ মধ্যকালীন বাংলার ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র ঈসা খানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন ও তাঁকে নামে মাত্র হলেও মোগলদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। ড. রহিম বলেন, 'ইহার পর (১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই সেপ্টেমবরে বিক্রমপুরের ১২ মাইল দূরবর্তী স্থানে মোগলদের সঙ্গে ঈসা খানের নৌযুদ্ধের পরে) মানসিংহের সহিত ঈসা খানের সন্ধি হয়। ঈসা খান মোগল বন্দীদেরকে মুক্তি এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন (১৫৯৭ খৃঃ)।'[১৪] যা হোক, সুবাদার ইসলাম খানের পর থেকে শুরু করে প্রাক-নবাবি আমল পর্যন্ত কমবেশি ১৮/১৯ জন[১৫] মোগল সুবাদার নিযুক্ত হন ও বাংলা মুলুক শাসন করেন। এঁদের অধিকাংশই নানারূপ স্থানীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও মগ-ফিরিঙ্গি প্রভৃতির অত্যাচার দমনে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পক্ষে দৈনন্দিন সাধারণ প্রশাসন এবং বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও এই সময়কালে সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বে শাহজাদা শুজা (১৬৩৯—৬০) সুবাদার হিশেবে তাঁর দীর্ঘ প্রায় ২১ বছরের শাসন পর্বে বাংলার ভূমিরাজস্বের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তবে প্রকৃত ও ব্যাপক রাজস্ব সংস্কার শুরু হয় নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-২৭)-এর আমলে।

Islam Khan who really conquered Bengal, organised a unified administrative system, and established the Mughal peace in the country. From this standpoint, he should be regarded as one of the makers of the Mughal Empire, and the greatest viceroy of the Bengal subah.' (The History of Bengal, Vol. II., pp. 288).

১২ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১০।

১৩ মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৬৮।

১৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৫৮।

১৫ এঁরা হলেন : (১) সুবাদার শেখ হোসাইন (১৬১৩-১৪), (২) শেখ কাশিম খান চিশতি (১৬১৪-১৭), (৩) প্রথম ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-২৪), (৪) দারাব খান (১৬২৪-২৫), (৫) মহব্বত খান (১৬২৫-২৬), (৬) শেখ মুকাররম খান চিশতি (১৬২৬-২৭), (৭) মিরজা হেদায়েতউল্লাহ ফিদাই খান (১৬২৭-২৮), (৮) কাশিম খান জুইনি (১৬২৮-৩২), (৯) মির মুহম্মদ বকর আজম খান (১৬৩২-৩৫), (১০) ইসলাম খান মাশাহেদি (১৬৩৫-৩৯), (১১) শাহজাদা শুজা (১৬৩৯-৬০), (১২) মির জুমলা (১৬৬০-৬৩), (১৩) দলির খান ও দাউদ খান (১৬৬৩-৬৪), (১৪) শায়েস্তা খান (প্রথম বার, ১৬৬৪-৭৮), (১৫) শাহজাদা মুহম্মদ আজম (১৬৭৮-৭৯), (১৬) শায়েস্তা খান (দ্বিতীয় বার, ১৬৭৯-৮৮), (১৭) খান-ই জাহান (১৬৮৮-৮৯), (১৮) ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-৯৭), (১৯) আজিমউদ্দিন ওরফে আজিম-উশ-শান (১৬৯৭-১৭১২), (২০) খান-ই আলম বা জাহান (১৭১২-১৩ এর জানুয়ারি পর্যন্ত), (২১) মির জুমলা (১৭১৩-১৭; *দ্বিতীয় বারের মতো মিরজুমলা দিল্লি থাকাবস্থায় বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হলেও কখনও বাংলায় আসেননি। এ পর্যায়ে পাটনা পর্যন্ত এসে তিনি আবার দিল্লি ফিরে যান।*)

এখানে বাংলার মোগল সুবাদারদের নিয়ে এই দীর্ঘ আলোচনা এ জন্যে জরুরি যে, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি প্রথমত তত্ত্বগতভাবে যদিও প্রাদেশিক স্তরে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনার মূল ও সার্বিক দায়দায়িত্ব ছিল দিওয়ান-ই-সুবা'র এবং রাষ্ট্রীয় নীতি-আদর্শের ওপর ভিত্তি করে তিনি এ ব্যাপারে যে কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণের একচ্ছত্রাধিকারী ছিলেন অর্থাৎ এই বিষয়ে তাঁর ওপর সুবাদারের কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না, কিন্তু মোগল সুবা শাসনের এই মৌলিক চারিত্র্য অন্যান্য সুবাগুলিতে অনেকাংশেই প্রতিপালিত ও অনুসৃত হলেও মধ্যবাংলা ছিল এ ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যতিক্রম। ভূমি রাজস্ব বিষয়ে এ অঞ্চলে দিওয়ান-ই সুবার চেয়ে সুবাদারই ছিলেন মূল চালিকাশক্তি ও প্রধান ব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ আমরা সুবাদার শাহজাদা শুজা ও দিওয়ান-সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের কথা বলতে পারি। আকবরের বিখ্যাত রাজস্বমন্ত্রী রাজা টোডরমলের পরে সুবাদার শাহজাদা শুজাই ছিলেন প্রথম মোগল প্রাদেশিক শাসনকর্তা যিনি বাংলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ 'জমা-ই আসল-তুমারি' বা ভূমিরাজস্বের খতিয়ান (Rent-Roll) তৈরি করেছিলেন, অতঃপর নবাব মুর্শিদকুলি খান প্রণয়ন করেছিলেন বাংলার তৃতীয় 'জমা-ই আসল-তুমারি'। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে শেষোক্ত সুবাদার অর্থাৎ মুর্শিদকুলি খান অন্ত্য-মধ্য বাংলার প্রবল ক্ষমতাধর দিওয়ান হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিগতভাবে সুবাদারি লাভের আগে পর্যন্ত তিনি এই জাতীয় কোন 'জমা-ই আসল-তুমারি' প্রস্তুত করার অনুকূল সুযোগ ও সুবিধা পাননি। বরং তিনি যখন নিজে সুবাদার হন এবং একই সঙ্গে দিওয়ান-ই সুবা'র ক্ষমতাও তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল, তখনই তাঁর পক্ষে সত্যিকার অর্থে একটি পূর্ণাঙ্গ 'জমা-ই আসল-তুমারি' তৈরি ও ব্যাপক রাজস্ব সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়েছিল (যথাস্থানে এটি তুলে ধরার চেষ্টা করবো)। সুতরাং চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আমরা দেখতে পাই যে, মোগল বাংলায় ভূমিরাজস্ব সংস্কারে প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা স্থানীয় সুবাদারদের অত্যন্ত গভীর, ব্যাপক ও অগ্রণী ভূমিকা ছিল। তাছাড়া এ আলোচনা থেকে এটাও প্রমাণিত হবে যে, মোগলদের সময়কার ভূমিরাজস্ববিষয়ক কেন্দ্রীয় বহু নীতি-নিয়মই অন্যান্য সুবা'গুলির তুলনায় বাংলায় অনেক কম অনুসৃত হতো।

'করোড়ি' ব্যবস্থা বাংলায় আদৌ প্রচলিত হয়েছিল কি-না এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের ব্যাপক সন্দেহ রয়েছে। রাজস্ব নিরূপণের বিভিন্ন প্রথাপদ্ধতির মধ্যে একমাত্র 'জবতি'ই ছিল এতদঞ্চলের প্রধান মাধ্যম। বস্তুত এই সবকিছুর মূলে অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে সবচেয়ে অধিক ও কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল স্থানীয় জমিদারি-ভূস্বামী ব্যবস্থা ও এ অঞ্চলের জন-মানুষের অভিরুচি। কেননা মোগলদের আগমনের অনেক আগে থেকে এ সকল ছোটবড় ভূস্বামী ও জমিদারগোষ্ঠী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল নিজেদের মধ্যে অলিখিত আপোষে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। সে মতে প্রচলিত প্রথা-নিয়মের অধীনে ভূম্যধিকারী কৃষকদের কাছ থেকে এরা রাজস্ব ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করতো। পরে মোগল প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে যখন এদের বিরোধ শুরু হয় তখন স্বভাবতই প্রবলের কাছে এরা মাথা নত করে। তবে এই নতি স্বীকার ছিল অনেকটা আনুষ্ঠানিক। অধিকাংশ জমিদার ও ভূস্বামী সামান্য 'নজরানা' ও বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণের 'পেশকাশ' দিয়ে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশক্তির আনুগত্য মেনে নিয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেকেই এরা স্ব স্ব গণ্ডীর মধ্যে ছিল এক-একজন প্রায় স্বাধীন নরপতি বা নির্বিচারী শাসকের প্রতিভূ।

এ পর্যায়ে আমরা বাংলার নবাবি আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার একটি আপাত গ্রহণযোগ্য চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

শাহজাদা মুহম্মদ শুজা (১৬৩৯-১৬৬০)

যদিও বাংলার প্রকৃত নবাবি আমলের শুরু নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময় থেকে, এবং এ পর্বে আমাদের আলোচ্য বিষয়ও তাঁর সময়কার ও তৎপরবর্তী নবাবকুলের রাজত্বকালে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, তথাপি আমরা মনে করি যে, মধ্যকালীন বাংলার ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যে কোন আলোচনায় সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ শুজার রাজত্বকাল সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাজা টোডরমলের পরে সর্বপ্রথম তাঁর সময়েই নতুনভাবে 'আসল তুমারি জমা' (Rent Roll) প্রস্তুত করা হয়, আর এটি ছিল মোগল বাংলার দ্বিতীয় রাজস্ব-বন্দোবস্ত। প্রথমটি অর্থাৎ টোডরমলেরটির চেয়েও এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। কারণ প্রথমত টোডরমলের রাজস্ব-বন্দোবস্ত ছিল পূর্ববর্তী সুলতানি শাসকদের ছেড়ে-যাওয়া নানা কাগজপত্র ও হিসাবনিকাশের ভিত্তিতে তৈরি করা, এবং এর সবচেয়ে দুর্বল দিক এই ছিল যে, তখনাবধি মধ্য বাংলার অনেক এলাকা মোগল অধিকার ভুক্ত না-হওয়া সত্ত্বেও সে সকল অঞ্চলের হিসাবও তাঁর বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। উদাহরণ হিশেবে চট্টগ্রামের কথা বলা যায়। বস্তুত আমরা আগেই দেখিয়েছি যে সম্রাট আকবরের যুগে চট্টগ্রাম মোগল অধিকারে আসেনি। অথচ টোডরমলের রাজস্ব-বন্দোবস্তে এই অঞ্চলের দাবিও লিপিবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে টোডরমলের ভূমিরাজস্ব তালিকায় বাংলার জন্যে প্রণীত হিসাব সম্পূর্ণ সঠিক ছিল না। অন্যদিকে শাহজাদা মুহম্মদ শুজার সময়ে তখন পর্যন্ত চট্টগ্রাম মোগল-অনধিকৃত থাকলেও বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ক্রমপ্রসারমান বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়েছিল। ফলে একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অঞ্চলের ভূমিরাজস্বের দাবি নির্ণয়ের সুযোগ পেয়েছিলেন শুজা। দ্বিতীয়ত শুজার দীর্ঘকালব্যাপী শাসন; বাংলায় মোগল সুবাদারদের দীর্ঘ তালিকায় তাঁর আগে আর কেউ এতো দীর্ঘ সময় (প্রায় ২০ বছর[১৬]) ধরে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন ও শান্তিপূর্ণভাবে বাংলার ন্যায় একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ শাসনের সুযোগ পাননি। Firminger-এর 'The Fifth Report'-এ তাই প্রকৃতই বলা হয়েছে, 'In after times the subahdari of Sultan Shuja came to be regarded as an epoch of good and equitable administraion, . .'[১৭] স্বভাবতই শুজার পক্ষে বাংলার জন্যে নতুনভাবে একটি রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রণয়ন করার

১৬ অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই শাহ শুজার রাজত্বকাল ২০ বছর বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, The History of Bengal, Vol. II., pp. 334; History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp. 370; Dacca : A Record of its Changing Fortunes, pp. 59; বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৬৮। তবে 'তাওয়ারিখে ঢাকা' গ্রন্থের লেখক মুনশী রহমান আলি তায়েশ শুজার রাজত্বকালের যে সময় নির্ধারণ করেছেন তাতে দেখা যায় তিনি প্রথম পর্যায়ে ৮ ও পরবর্তী পর্যায়ে ৯ বছর মোট ১৭ বছর রাজত্ব করেছিলেন বাংলায়। (পৃষ্ঠা ৫৬)। সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুরের গ্রন্থে প্রায় একই সময়ের উল্লেখ দেখা যায়— ১৬৩৯ থেকে ১৬৪৭ এবং ১৬৫২ থেকে ১৬৬০ (Glimpses of Old Dhaka, pp. 114)। অবশ্য শেষোক্ত সাল অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ নিয়েও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মত বিভক্তি রয়েছে। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ, পৃষ্ঠা ১৪৭), ড. অনিল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৭২) প্রমুখ ১৬৫৯ এর উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে প্রথমোদ্ধৃত গ্রন্থগুলিতে ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ পাই।

১৭ pp. 363; ড. অতুল সুরও বলেন, 'A great humanitarian Shuja's administration was marked by "great justice and propriety', Bengal had, indeed, a peaceful time during his rule,......' (History and Culture of Bengal, pp.115).

সময় ও সুযোগ—দুই-ই জুটেছিল। তৃতীয়ত শাহ্ শুজার রাজত্বকালে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলার এই নতুন রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রণীত হয়। পরবর্তী প্রায় সুদীর্ঘ ৬৪ বছর তথা নবাব মুর্শিদকুলির সময়ে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৃতীয় রাজস্ব-বন্দোবস্ত চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত এটি কার্যকর থাকে। উল্লেখ্য শেষোক্ত 'আসল তুমারি জমা' তৈরিতে একে ভিত্তি ধরে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-সংস্কার করা হয়। সুতরাং এ দিক দিয়েও শুজার রাজত্বকাল বাংলার রাজস্ব-ইতিহাসের জন্য সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ফলে এ অধ্যায়ে নবাবি আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাস আমাদের পর্যালোচ্য হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর ব্যবস্থা নিয়েও আমরা এখানে কিছুটা আলোকপাত করবো।

১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ শুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান।[১৮] তিনি ইসলাম খান মাশাহেদির স্থলাভিষিক্ত হন। মাশাহেদি তাঁর চার বছরের সুবাদারিকালে শেষ পর্যায়ে অহোম-রাজকে পরাজিত করে কামরূপ-আসামের ওপরও মোগল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। ফলে শুজা যখন কাবুল থেকে এসে[১৯] বাংলার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন ততোদিনে মোগল আধিপত্যের সীমা আরও সম্প্রসারিত হয়েছিল, যা বলাই বাহুল্য। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার যে, কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাটগণ তাঁদের পুত্রদেরকে প্রায়শই কোনও-না কোনও প্রদেশের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতেন। সঙ্গত কারণেই সেই প্রদেশের মর্যাদা ও গুরুত্ব তখন বৃদ্ধি পেতো। উল্লেখ্য শাহজাদা শুজা-ই ছিলেন বাংলার প্রথম মোগল সুবাদার যিনি একাধারে সম্রাট-তনয় ও কেন্দ্রকর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।[২০] ফলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, শুজার নিযুক্তি নির্দেশ করে সম্রাট শাহজাহানের কাছে এই সময়কার বাংলার গুরুত্ব পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ড. মুহম্মদ মোহর আলি বলেন, 'The appointment of a prince as viceroy in Bengal indicates that the emperor attached great importance to the good and effective administration of this frontier province.'[২১] উত্তরকালে শুজার এ নিযুক্তি ফলপ্রসূ হয়েছিল। কেননা শুজা তাঁর দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের তথা 'কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের' ব্যাপক সমৃদ্ধি সাধন করেছিলেন। বিশেষ করে মধ্যকালীন বাংলার চিরাচরিত নিস্তরঙ্গ সমাজ জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীল পরিবেশ সংরক্ষণ

১৮ ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ওড়িশা প্রদেশের সুবাদারির দায়িত্বও প্রদান করা হয়। শুজা এটি একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে শাসন কার্য অক্ষুণ্ন রাখেন। তবে সম্রাটের নির্দেশে তিনি ঢাকাসহ অন্যত্র ডেপুটিদের কার্যকলাপ সময়ে সময়ে পরিদর্শন করতেন।

১৯ শুজা যখন বাংলা সুবা'র দায়িত্ব পান তন্মুহূর্তে তিনি কাবুলে ছিলেন। ফলে তাঁর বাংলায় এসে দায়িত্ব গ্রহণাবধি অন্তবর্তী সময়ের জন্য বিহারের শাসনকর্তা সাইফ খান বাংলার সুবাদারি নির্বাহ করেন। (History of the Muslims of Bengal, Vol. IA. pp. 370).

২০ বাবর-পুত্র হুমায়ুন কর্তৃক গৌড় (বাংলা) অধিকার প্রসঙ্গ বাদ দিলে ইতোপূর্বে মোগল বংশের প্রত্যক্ষ রক্তের অধিকারী হিশেবে প্রথম সুবাদার পাওয়া যায় খান-ই আজম মিরজা আজিজ কোকা'কে। কিন্তু তিনি ছিলেন আকবরের ভাই, অন্যদিকে জাহাঙ্গির-পুত্র শাহজাহান যুবরাজ থাকাকালীন বাংলায় (রাজমহল) এলেও তিনি মূলত পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বল্পকালের জন্য রাজমহল অধিকৃত করেছিলেন। ফলে শাহজাদা শুজা'কেই আমরা প্রথম মোগল সুবাদাররূপে পাই'। ড. দানীও বলেন, 'Shah Shuja was the first Mughal prince posted in Bengal as viceroy.' (Dacca.., pp. 60).

২১ Op. cit., pp. 370.

শুজার শাসনের অন্যতম কৃতিত্ব। ঐতিহাসিক তাই যথার্থই উচ্চারণ করেন, 'With the coming of prince Shuja to Bengal as viceroy began a long period of peace for this province.'[২২]

বাংলায় সুবাদারি লাভ করে সর্বপ্রথমেই শুজা তাঁর রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন (১৬৩৯ খ্রিঃ)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তাঁর রাজত্বকালের সময়টুকু ছাড়া এ যাবৎ ও পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার ইসলাম খান কর্তৃক 'নিজামতের সব দপ্তর ও রাজ্যের সব উপকরণ রাজমহল থেকে ঢাকায় নিয়ে'[২৩] আসা থেকে শুরু করে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে আর এক সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর পর্যন্ত ঢাকাই ছিল বাংলার রাজধানী ও এতদঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। ড. আহমদ হাসান দানী বলেন, 'From 1608 to 1717 Dacca remained the seat of government, except for a break between 1639 and 1659, when the Mughal viceroy, prince Shah Shuja, shifted his residence to Rajmahal for his own personal and political reasons.'[২৪] রাজধানী হিশেবে রাজমহলের প্রসিদ্ধি আগেও ছিল। এর পূর্বের নাম 'আকবরনগর', যা মূলত রাজা মানসিংহ তাঁর সুবাদারিকালে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৯৪ খ্রিঃ)। ড. রাজীব নায়েন প্রসাদ বলেন, 'In order to ensure a better administration and stable government he (Raja Man Singh) founded a new capital for Bengal named Akbarnagar which later on came to be called Rajmahal. It was indeed a singular achievement on his part and very few Mughal governors had a contribution like this to his credit.'[২৫] তখন পর্যন্ত রাজমহল ছিল বাংলার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।[২৬] ইসলাম খান শাসনকার্যের সুবিধার্থে বিশেষ করে বিদ্রোহী জমিদারদের দমন ও পরাজিত করার অভিপ্রায়ে তৎকালীন বাংলার মোটামুটি মধ্যবর্তীস্থল হিশেবে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি ঢাকার নতুন নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গিরনগর'। কিন্তু শাহজাদা শুজার সময়ে আবার তা পূর্ববর্তী স্থানে অর্থাৎ রাজমহলে নীত হয়।[২৭] রাজধানী স্থানান্তরের এই নতুন সিদ্ধান্তে নবনিযুক্ত সুবাদারের যতোটা না প্রশাসনিক উদ্দেশ্য ছিল তার চেয়ে তাঁর 'ব্যক্তিগত' সুবিধা

২২ The History of Bengal, Vol. II., pp. 332.
২৩ তাওয়ারীখ-ই ঢাকা, পৃষ্ঠা ৫০।
২৪ Dacca : A Record of Its Changing Fortunes., pp. 31.
২৫ Raja Man Singh of Amber, pp. 139.
২৬ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৮।
২৭ ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম বলেন, 'সুজার সময়ে বাংলার রাজধানী ঢাকায় থাকিলেও তিনি নিজে রাজমহলে থাকিতেন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৬৮)। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ শুজা রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলেই নীত করেন এবং নিজে সেখানে বসবাস শুরু করেন। 'তাওয়ারীখ-ই ঢাকা'র লেখক মুনশী রহমান আলি তায়েশ ও 'Glimpses of Old Dhaka'-এর লেখক সৈয়দ মুহম্মদ তাইফুরের লেখায়ও এমন বর্ণনা পাওয়া যায়। তায়েশ : 'সুলতান মুহাম্মদ শুজা বাংলায় এসে প্রথমে ঢাকা থেকে নিজামতের দপ্তর রাজমহলে নিয়ে যান। তিনি সুসজ্জিত দালান কোঠা তৈরি করে ওই এলাকাকে আরো বেশি সুসজ্জিত করে তোলেন।' (পৃষ্ঠা ৫৬)। Taifur : 'It should be borne in mind that in his (Sultan Muhammad Shuja Bahadur) viceroyalty the seat of government was transferred from Jahangirnagar to Rajmahal.' (pp. 114).

ও 'রাজনৈতিক' অভিলাষ চরিতার্থ করার মানসিকতাই ছিল প্রধান। উল্লেখ্য ঢাকায় একজন ডেপুটি বা প্রতিনিধি নিয়োগ করে শুজা এতদঞ্চলে স্বীয় কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন।[২৮] যা হোক, শুজার রাজধানী স্থানান্তরের ব্যক্তিগত যে কারণ ছিল তা তাঁর একান্তই নিজস্ব ও সন্তানদের স্বাস্থ্য চিন্তাপ্রসূত, যা পিতা হিশেবে প্রত্যেকেরই থাকা স্বাভাবিক। আবহমান বাংলার লবণাক্ত ও বৃষ্টিসিক্ত জলবায়ু ও খাদ্যরুচি তাঁর নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের অনুকূল হয়নি। এ জন্যে তিনি সম্রাটের কাছে একাধিকবার অনুযোগও করেছিলেন। এমন কি রাজধানী রাজমহলে সরিয়ে নিয়েও তাঁর মনোতুষ্টি হয়নি। তাই সম্রাটের কাছে তিনি পাটনার (বিহার) তুলনামূলক কিছু উঁচু ও স্বাস্থ্যকর গ্রাম তাকে বসবাস করবার জন্য দিতে অনুরোধ জানিয়ে পত্রও দিয়েছিলেন[২৯], যাতে করে শরীর ও মনের সম্পূর্ণ সন্তোষ নিয়ে প্রদেশ শাসনের মতো গুরু দায়িত্ব তিনি পালন করতে পারেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁর সে প্রার্থনা মঞ্জুর করেননি।[৩০] রাজনৈতিক কারণের কথা বলতে গেলে বলা যায়, বৃদ্ধ সম্রাটের স্বাস্থ্যাবনতি ও কেন্দ্রীয় মসনদের বৈধ উত্তরাধিকার নিয়ে মোগল শাসনতন্ত্রের চিরাচরিত ঐতিহ্য তথা সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের অভাব, যার ফলে সম্রাট শাহজাহানের অবর্তমানে প্রবল পরাক্রান্ত পরবর্তী মোগল সম্রাট হওয়ার জন্যে তাঁর পুত্রদের মধ্যে গোপন দ্বন্দ্ব ও দরবারি রাজনীতির জন্যে শুজা চেয়েছিলেন সুদূর বঙ্গদেশে থেকেও যতোটা সম্ভব দিল্লির কাছাকাছি থাকতে। বলাবাহুল্য সবদিক বিবেচনায় বিহারের রাজমহলই ছিল তুলনামূলক উপযুক্ত স্থান। তবে সত্যি বলতে প্রশাসনিক দিক থেকে বিচার করলে শুজার এই রাজধানী স্থানান্তর সুবাদারির সুষ্ঠু পরিচালনায় কিছুটা হলেও ফলদায়ক হয়েছিল। কেননা পরবর্তীকালে তিনি যখন ওড়িশার সুবাদারিও লাভ করেন (১৬৪২ খ্রিঃ) তখন তাঁর সুবাদারির মোটামুটি মধ্যস্থলেই ছিল রাজমহলের অবস্থান, এবং এখানে অবস্থানের ফলে শুজার পক্ষে একদিকে যেমন দিল্লির ওপর নজর রাখা সম্ভবপর হয়েছিল, তেমনি অন্যদিকে বিদেশি বণিকদের ওপরও খবরদারি করা সহজ হয়। ড. মুহম্মদ মোহর আলি বলেন, 'At any rate his stay at Rajmahal enabled him to keep a closer eye on the foreign traders (the Portuguese, the Dutch and the English) who used to carry on their commercial activities mainly through the Hugli port and along the course of the river running from Patna (in Bihar) through Rajmahal and Makhsusabad (Murshidabad). The new capital also proved especially advantageous as Orissa was added to his jurisdiction in 1052/1642.'[৩১]

শুজার রাজত্বকালে বাংলায় 'নিরবচ্ছিন্ন শান্তি' বিরাজমান ছিল। আগের মতো আরাকান ও আসামের রাজারা বাংলা আক্রমণের সাহস করেনি। প্রচলিত ভূমিরাজস্ব নীতির অনুকূলে তিনি রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখলেও তার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলেন যদিও এ সম্পর্কিত পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তাঁর আমলে বাস্তব কারণেই ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেড়েছিল। দু'একজন ব্যতীত

২৮ শুজার শ্বশুর নবাব আজম খান ছিলেন এই প্রতিনিধি। (রিয়াজ-উস-সালাতীন, বঙ্গানুবাদ, বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ১৬৫)।

২৯ The History of Bengal, Vol. II., pp. 334.

৩০ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯।

৩১ Op. cit., pp.370-71.

অধিকাংশ জমিদার ও স্থানীয় রাজন্যবর্গ নিয়মিত কর ও উপঢৌকন প্রদান করতেন। বিশেষ করে হিজলির জমিদার বাহাদুর খান আগে কখনও নিয়মিত কর না দিলেও তাঁর সময়ে কর দিতে শুরু করেন। তবে শুজা তার করের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে খান ধার্য কর দিতে গড়িমসি করেন। ফলে তিনি তাকে সৈন্য পাঠিয়ে ধরে আনেন এবং ঢাকায় কয়েদ করে রাখেন। পরে উত্তরাধিকার যুদ্ধে শুজা জড়িয়ে পড়ল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময়ে খান ছাড়া পান। এ ছাড়া বাংলার দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বাকেরগঞ্জ এলাকায় আরাকানিদের উৎপাত বৃদ্ধি পেলে শুজা নৌযোদ্ধা প্রেরণ করে তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করেন। আরাকানিদের ভবিষ্যত আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি আধুনিক বরিশাল শহরের প্রায় ৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে শুজাবাদে (সম্ভবত তাঁর নামেই আবাদকৃত) বেশ কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করেন। উল্লেখ্য আরাকানিদের সঙ্গে সমরে যে সকল পাঠান-আফগান প্রাণ হারায়, তাদের পরিবারসমূহকে শুজা ৭৭ একরেরও অধিক নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি দান করেন।[৩২]

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'শুজার সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ শাসনের ফলে বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ধনসম্পদ বৃদ্ধি হয় (১৬৩৯-৫৯)।'[৩৩] শাহ্ শুজা যে তৎকালীন বাংলার কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন তার প্রমাণ সম্রাটকে লিখিত তাঁর পত্র। মোরং, কাছাড় প্রভৃতির বিদ্রোহী রাজাদেরকে নিয়মিত কর প্রদানের আওতায় এনে (পূর্ববর্তী সুবাদারদের সময়ে এঁরা প্রায়শই কর দিতো না বা অস্বীকার করতো) সম্রাটকে এ খোশখবর ও নিজ কৃতিত্ব জানানোর সঙ্গে সঙ্গে শুজা পত্রে এটাও উল্লেখ করেন যে, 'As promotion of cultivation and happiness of all people are known to be the particular objects of Your Majesty's attention. I have, during this time, made much effort to improve cultivation and reclamation of the country that both the subahs are showing every day signs of such labour.'[৩৪] অন্যদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারে শুজার প্রচ্ছন্ন সহযোগিতার বাতাবরণে ইউরোপীয় বণিকগণ বিশেষ করে ডাচ (ওলন্দাজ) ও ইংরেজরা যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিল। শুজা বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকা শুল্কের বিনিময়ে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি প্রদান করেন।[৩৫] যদিও সত্যি বলতে 'এই বিরাট সুবিধার ফলে ইংরেজ বণিকরা অল্প সময়ে বাংলায় বাণিজ্য বিস্তার করিয়া সমৃদ্ধ হইতে সুযোগ পায়'[৩৬], এবং কালে বাংলার জন্যে তা 'কাল' হয়ে দাঁড়ায়। যা হোক, এ পর্যায়ে আমরা শুজার সময়কার বাংলার রাজস্বের হিসাব 'আসল তুমারি জমা'র আলোচনা করবো।

৩২ Baqarganj District Gazetteer, Jack, pp. 16; The District of Bakarganj, Henry Beveridge, pp. 45, 188

৩৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্যযুগ, পৃষ্ঠা ১৪৭।

৩৪ Quoted from, 'History of the Muslims of Bengal, Vol. IA., pp. 372.

৩৫ শোনা যায় শুজার এক ঘনিষ্ঠ নিকটাত্মীয় গাব্রিয়েল ব্রাউটন নামক এক ইংরেজ চিকিৎসকের আন্তরিক সেবা-শুশ্রূষা-চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় তিনি তাদেরকে এই সুবিধা দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, History and Culture of Bengal, Dr. A. K. Sur, pp. 114.

৩৬ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৬৮।

শাহ্ শুজা তাঁর রাজত্বের শেষ দিকে সম্ভবত ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে[৩৭] প্রচলিত রাজস্ব তালিকা সংশোধন করে নতুন একটি বন্দোবস্ত প্রণয়ন করেন। মধ্য বাংলার সীমানা ততোদিনে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। নতুন অন্তর্ভুক্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য অঞ্চলগুলি হলো যেমন হিজলি, মেদিনীপুর, জলেশ্বর, পশ্চিম আসাম, কোচ বিহারের অংশবিশেষ, ত্রিপুরা প্রভৃতি। এ ছাড়া আগে কখনও রাজস্ব হিসাবের তালিকায় আসেনি এমন ভূখণ্ড হিশেবে এই প্রথম বাংলার সর্বদক্ষিণের সুন্দরবন অঞ্চলের কিছু অংশও শুজার বন্দোবস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।[৩৮] সঙ্গত কারণেই টোডরমলের প্রথম 'আসল তুমারি জমা'র চেয়ে শাহ্ শুজার দ্বিতীয় 'আসল তুমারি জমা'র পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এ কথা না বললেও চলে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, শুজার এই দ্বিতীয় 'জমা' লব্ধ কাগজপত্রের ভিত্তিতে অনুমান-এর নিরিখে, নাকি নিয়মিত জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্য এই হিসাবের 'প্রায় ক্ষেত্রেই (যে) আনুমানিক মূল্যায়ন রীতি অনুসরণ করা হয়েছিল', তা স্বীকার্য। কারণ '১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে সুজা উত্তরাধিকার যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সে সময়ে তার পক্ষে ধারাবাহিক জরীপ কার্য পরিচালনা করা সম্ভব ছিল না।'[৩৯] টোডরমলের সময়কার ১৯টি সরকার ও ৬৮২টি মহাল (পরগণা)-এর পরিবর্তে যথাক্রমে ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০টি মহাল (পরগণা)[৪০] -এর ভূমিরাজস্ব (মাল) ও 'সাইর'[৪১] হিসাব এই নতুন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, যার এক নজরে বিবরণ পাওয়া যায় জেমস গ্রান্টের অনুসন্ধানী রিপোর্টে :

সম্রাট আকবরের সময়ের তথা রাজা টোডরমলের ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দের রাজস্ব-হিসাব		
(জমিদারিসহ) খালসা জমির	৬৩,৪৪,২৬০	টাকা
জায়গির ভূমির	৪৩,৪৮,৮৯২	টাকা
মোট	১,০৬,৯৩,১৫২	টাকা
নতুন দখলকৃত ভূমির	১৪,৩৫,৫৯৩	টাকা
খালসা জমির ওপর প্রবৃদ্ধি	৯,৮৭,১৬২	টাকা
জায়গির ভূমিতে রূপান্তর	নাই	
সর্বমোট (শুজার নতুন বন্দোবস্ত)	১,৩১,১৫,৯০৭	টাকা

৩৭ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র কর্মচারী স্বনামখ্যাত জেমস গ্রান্টের সূত্রে অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই শুজার বন্দোবস্ত প্রণয়নের সন হিশেবে ১৬৫৮-কেই নির্দেশ করেছেন।

৩৮ A Statistical Account of Bengal, Vol. I., pp. 357.

৩৯ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, পৃষ্ঠা ১১২।

৪০ এই সময় বেশ কিছু সরকার ও মহালের সীমানা পরিবর্তিত হয়েছিল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, জেমস টেলর, 'কোম্পানী আমলে ঢাকা', অনুবাদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬, এবং 'Indian Land-System', Dr Radha Kumud Mookerji, pp. 208.

৪১ মোগল রাজধানী ঢাকা, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ৪৩।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এতে টোডরমলের হিসাবের চেয়ে অন্তর্বর্তী ৭৬ বছরে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে শতকরা ১৫ $\frac{১}{২}$ গুণ[৪২], যা সময় এবং অধিকৃত অঞ্চল তথা ভূমির পরিমাণ বিবেচনায় খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না। তবে 'আবওয়াব' ছিল এই হিসাবের বহির্ভূত। উল্লেখ্য শুজার আমলে কিছু কিছু আবওয়াব আরোপের নিয়ম থাকলেও তা ছিল অনিয়মিত, বস্তুত পরবর্তীকালে বিশেষ করে নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়ে সেগুলি প্রায় নিয়মিত 'কর'-এ পরিণত হয়েছিল।[৪৩]

উপসংহারে আমরা ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের 'A Statistical Account' থেকে একটি নাতিদীর্ঘ উদ্ধৃতির উল্লেখ করে শুজার আলোচনা শেষ করবো। হান্টার প্রকৃতই বলেন, "Shuja's assessment was followed during the long reign of Aurangzeb; at least we have no information of any improvement in the revenues of Bengal, with the exception, of course, of several additions arising from the conquest of Kuch Behar, the annexation of Chittagong and Western Assam (the latter temporarily), and the occupation of portions of the Morang. Aurangzeb was too much occupied with the affairs of the Dakhin, and was glad to leave the administration of Bengal in the hands of his grandson Azimushan, never demanding, as it appears, more than the established rental. But as the growing poverty of the imperial exchequer demanded strict regularity in the payment of this sum, Aurangzeb bestowed the diwani of Bengal on the well-known Jafar Khan, to whom he gave the title of Murshid Kuli Khan.'[৪৪] আমাদের পরবর্তী আলোচনা এই মুর্শিদকুলি খানকে নিয়েই।

নবাব মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭-১৭২৭)

ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচিত উত্তরাধিকার যুদ্ধে তৃতীয় ভ্রাতা আলমগির আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মিরজুমলার কাছে শুজার শোচনীয় পরাজয় ও সুবাদারি হারানোর পর প্রায় ৫৪ বছর ব্যাপী (মুর্শিদকুলির সুবাদারি লাভের পূর্বপর্যন্ত) ৮ জন সুবাদার বাংলায় দায়িত্ব পালন করেন। তবে এই দীর্ঘ কালপর্বের কোন স্বতন্ত্র 'আসল তুমারি জমা'র খবর ইতিহাসে অজ্ঞাত। বস্তুত 'শাহ্ সুজার পরে সতেরো শতকে আর কোন বন্দোবস্তের তথ্য পাওয়া যায় না।'[৪৫] স্বভাবতই ধারণা করা যায় যে, এই সময়ে প্রচলিত অর্থাৎ শাহ্ শুজার প্রণীত 'জমা'-ই অনুসৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, পরবর্তী তথা বাংলার তৃতীয় 'জমা কামিল তুমারি'র প্রণেতা স্বনামখ্যাত মুর্শিদকুলি খানের সুবাদারির একটা বৃহদংশ অবধি (১৭২২ খ্রিঃ) এটি কমবেশি কার্যকর ছিল।

---

৪২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩, ও ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০

৪৩ কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩৭।

৪৪ Vol. I., pp. 356-57.

৪৫ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১।

যা হোক, মিরজুমলার কাছে শুজার পরাজয় ও তাঁর আরাকানে পলায়নের (৬ই মে, ১৬৬০) খবর পাওয়ার পর সম্রাট আওরঙ্গজেব একই বছরে বিজয়ী সেনাপতি মির জুমলা-কেই বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন (৯ই মে)। নতুন সুবাদারের প্রায় ৩ বছরের শাসনকালের (৩১শে মার্চ, ১৬৬৩ খ্রিঃ) সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁর কোচবিহার ও আসাম অভিযান। ভ্রাতাদের সঙ্গে উত্তরাধিকার যুদ্ধে শুজা জড়িয়ে পড়ার সুযোগে এই দুই প্রাচীন রাজ্যের রাজা কামরূপের অধিকার নিয়ে মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, যা সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পর মিরজুমলাকে দিয়ে দমন করেন। মিরজুমলার সৈন্যাভিযানে কোচবিহারের রাজা অনেকটা সহজে পরাজয় বরণ করলেও অহোম-রাজ তাঁর বিরুদ্ধে বড় ধরনের প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে শেষ পর্যন্ত রাজা পরাজিত হন ও পলায়ন করেন।[৪৬] মিরজুমলার মোগল বাহিনী অহোম-রাজধানী 'গারগাঁও' জয় ও রাজপ্রাসাদ দখল করেন। অতঃপর—'It is said that Mir Jumlah opened a mint at Garhgaon and caused money to be struck there in the name of the Delhi Emperor. The Muhammadans occupied a number of villages, and the inhabitants soon began to accept the position and to settle down quietly under their new rulers'.[৪৭] তবে সত্যি বলতে অহোম-অভিযান মোগল বাহিনী এবং খোদ মিরজুমলার জন্যে আদৌ সুখকর হয়নি। বখতিয়ার খলজির তিব্বত অভিযান যেমন তাঁর নিজের ও সৈন্যবাহিনীর জন্য সমূহ ক্ষতির কারণ হয়েছিল তেমনি এই অভিযানও মিরজুমলা ও তাঁর নিজের ও সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রায় একই রূপ পরিণতি বহন করে এনেছিল। কেননা 'বর্ষা আসিলে সমস্ত দেশ জলে ডুবিয়া যাওয়ায় মুঘল ঘাঁটিগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং খাদ্য সরবরাহেরও কোন উপায় রহিল না। মুঘল শিবির জলে ডুবিয়া গেল, খাদ্যাভাবে বহু অশ্ব মারা গেল, সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিল এবং বহু সৈন্যের মৃত্যু হইল। সুযোগ বুঝিয়া অহোম্ সৈন্য পুনঃপুনঃ মুঘল শিবির আক্রমণ করিল। অবশেষে বর্ষার শেষ হইলে এই দুঃখ কষ্টের অবসান হইল। মীরজুমলা সৈন্যসহ অহোম্ রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অহোম রাজের সহিত সন্ধি[৪৮] করিয়া মুঘল সৈন্য বাংলাদেশে

৪৬ মিরজুমলার অহোম অভিযান ও যুদ্ধের বিস্তারিত জানান জন্য দেখুন, 'A History of Assam', E.A. Gait, pp. 126-137.

৪৭ A History of Assam, pp. 133.

৪৮ এই সন্ধির মুখ্য কয়েকটি শর্ত যেমন (ক) অহোম-রাজ জয়ধ্বজ সিংহ মোগল হেরেম-এ অবিলম্বে একজন রাজকন্যাকে সমর্পণ করবেন; (খ) সেই সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে বিজয়ী প্রতিপক্ষকে ২০ হাজার তোলা স্বর্ণ, ১ লক্ষ ২০ হাজার তোলা রৌপ্য ও ৪০টি হস্তী প্রদান করবেন; (গ) চুক্তি সম্পাদনের ১ বছরের মধ্যে ৩ লক্ষ তোলা রৌপ্য এবং ৯০টি হস্তী প্রদান করবেন; এছাড়া অনুরূপভাবে ২০টি করে হস্তী প্রতি বছর বাংলায় প্রেরণ করবেন; (ঘ) ব্রহ্মপুত্র নদীর দক্ষিণ তীরের কালং অঞ্চল এবং উত্তর তীরের ভারলি নদীর পশ্চিম কিনার অবধি ভূভাগ দিল্লির সম্রাটকে ছেড়ে দেবেন, প্রভৃতি। বিনিময়ে মিরজুমলা'কে যুদ্ধে সকল অহোম-বন্দি এবং বিশেষ করে বদৌলি ফুকান রাজপরিবারের সদস্যদেরকেও মুক্তি দিতে হয়। (A History of Assam, pp.136).

ফিরিয়া আসিল। কিন্তু ঢাকায়[৪৯] পৌঁছিবার পূর্বে মাত্র কয়েক মাইল দূরে[৫০] তাঁহার মৃত্যু হইল (মার্চ, ১৬৬৩)। এই সমুদয় গোলযোগের মধ্যে কুচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।'[৫১] তবে যুদ্ধের ফলাফল ও সুবাদারের ব্যক্তিগত পরিণাম যা-ই হোক না কেন, দুর্গম অহোম অভিযান যে বাংলাস্থ মোগল রাজকোষের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল তা বলাইবাহুল্য। তিনি যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি করেন। অধিক অর্থ সংগ্রহের অভিলাষে নিজেও ব্যবসায়-বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েন।[৫২] বিশেষ করে নিজের অনুগত অনুচরদের দ্বারা বাজার থেকে সুলভ মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে পরে তা অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্যে ব্যবসায়ীদের কিনতে বাধ্য করায় (ব্যবসায়ীরা পরে তা আরও চড়া মূল্যে বিক্রি করতো) তাঁর সময়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং জনজীবনে প্রকট অর্থাভাব দেখা দেয় এবং অনেকেই ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে অনাহারে মৃত্যুর শিকার হয়।[৫৩]

মিরজুমলার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে প্রায় বছর খানেক বাংলার প্রশাসনিক ও সমাজ জীবনে বেশ অশান্তি দেখা দেয়। ফলে জনজীবনের সেই দুর্গতি দূরীকরণ ও শাসনকার্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সম্রাট অনতিবিলম্বে তাঁর দরবারের 'সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি'[৫৪] —'a great magnate of the Imperial Court'[৫৫] —শায়েস্তা খান[৫৬] -কে সুবাদার করে পাঠান। অতঃপর নতুন সুবাদার প্রায় দীর্ঘ ২২/২৩ বছর (মাঝখানে ১৬৭৮ ছাড়া) বাংলায়

৪৯ বলাবাহুল্য, 'সুবেদার নিযুক্ত হয়ে মীর জুমলা আবার রাজমহল থেকে সুবেদারী দপ্তর ঢাকায় নিয়ে আসেন। এ শহরকে তিনি সারা বাংলার রাজধানীরূপে গড়ে তোলেন এবং উঁচু ইমারত ও নিত্যনতুন কল-কারখানা স্থাপন করে আরো সুসজ্জিত করে তোলেন।' ('তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা', পৃষ্ঠা ৫৮)। এই সময়ে সদ্য পরিবর্তিত রাজধানী হিশেবে ঢাকার গুরুত্ব অন্যবিধ কারণেও ছিল, যা ড. আবদুল করিম চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়,'বাংলার প্রায় সকল মোগল সুবাদার যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। সুতরাং ঢাকা রাজধানী এবং বিভিন্ন অভিযানের ভিত্তি হিসেবে মোগল ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।....আওরঙ্গজেবের অধীনে প্রথম সুবাদার মীর জুমলা কুচবিহার ও আসাম জয় করেন এবং শায়েস্তা খান চট্টগ্রাম জয় করেন। উভয় ক্ষেত্রে অভিযান প্রেরণের ভিত্তিভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয় ঢাকা।' (মোগল রাজধানী ঢাকা, পৃষ্ঠা ৪১)।

৫০ এই সময়ে তিনি নৌপথে ঢাকা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। পথিমধ্যে নারায়ণগঞ্জের কাছাকাছি খিজিরপুরে অসুস্থতার চরম অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হন (৩১শে মার্চ)। (ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৪৭)।

৫১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্য যুগ, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৪৮।

৫২ মিরজুমলা কর্ণাটকে থাকাকালীনও একইভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন। (Mughal Polity, Dr. Jagadish Narain Sarkar, pp. 348, & The Life of Mir Jumla, Dr. Jagadish N. Sarkar.) অবশ্য বাংলার মোগল সুবাদারদের জন্য এটা কোন নতুন ঘটনা ছিল না। তার আগে শাহজাদা শুজা এবং পরে শায়েস্তা খান, আজিম-উশ-শানও এই অনভিপ্রেত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন।

৫৩ বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল, পৃষ্ঠা ১৫।

৫৪ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৫।

৫৫ The Fifth Report, pp. 367.

৫৬ শায়েস্তা খান ছিলেন সম্রাজ্ঞী নূরজাহান বেগমের ভাই বিখ্যাত আসফ খানের পুত্র ও সম্রাট শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী বেগম মমতাজ মহলের ভাই, সেই সূত্রে আওরঙ্গজেবের আপন মামা। 'তিনি খুব উচ্চশিক্ষিত ছিলেন। রাজনীতিক হিসাবে তাঁহার খুব সুনাম ছিল। শাহজাহানের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কার্য করিয়া শায়েস্তা খান কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।' (ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৭৫)।

একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম রাখেন। তাঁর সময়ে কোচবিহারের রাজা প্রথম থেকেই প্রায় অবলীলায় মোগল বশ্যতা মেনে নেন এবং নিয়মিত কর প্রদান করেন। আরাকানি মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের নির্মমভাবে দমন করা হয়। শায়েস্তা খানের সুযোগ্যপুত্র বুজুর্গ উমেদ খানের নেতৃত্বে মোগলবাহিনী ফেনী নদী পার হয়ে তৎকালীন আরাকান রাজ্যের সীমানায় অনুপ্রবেশ করে এবং শেষ পর্যন্ত নৌযুদ্ধে আরাকানি ও মগ জলদস্যুদের পরাজিত করে চট্টগ্রাম জয় করে (২৭শে জানুয়ারি, ১৬৬৬)।[৫৭] শায়েস্তা খান-ই প্রথম মোগল সুবাদার যিনি চট্টগ্রামে মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনন্য গৌরব অর্জন করেন। এবং এটিই তাঁর সুবাদারি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি বললে অত্যুক্তি হয় না। কারণ, 'The Mughal conquest of Chittagong was not merely a remarkable military victory, but it marked the beginning of a new era. With the Mughal conquest the century-old isolation of the district from the main streams of political life of the subcontinent came to an end. A long Arakanese rule of nearly a century made Chittagong a part of the Arakanese territory and it would have continued to be so if the conquest had not taken place. As a result of the conquest, Chittagong was again unified with Bengal and the loss of Chittagong made Arakan, henceforth, an exclusively Burman territory. ....With the conquest of Chittagong by the Mughals, the district became a part of the Mughal India. With the Mughal conquest a new culture, a new style of architectural activities, a new official language were introduced in Chittagong. Besides these, the district received a new name (Islamabad). During the Mughal rule, Muslim culture again became predominant.'[৫৮]

মধ্যকালীন বাংলার সমাজ জীবনে দীর্ঘকালীন শান্তি ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা বিশেষত দ্রব্য মূল্য অত্যন্ত নীচু স্তরে রাখাও শায়েস্তা খানের আমলের অন্যতম ঘটনা।[৫৯] কথিত আছে, তাঁর আমলে টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেতো[৬০], যা আপাত অবিশ্বাস্য মনে হলেও অসত্য নয়। পূর্ববঙ্গ যেহেতু চাল-উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র ছিল, সে কারণে এখানে চালের মূল্য আরও কম ছিল বলে অনুমিত হয়।[৬১] চালের মতো অন্যান্য জিনিসপত্রের মূল্যও আনুপাতিক হারে

৫৭ এই যুদ্ধাভিযানের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল), মাহবুবুল আলম।

৫৮ A History of Chittagong, Vol. I., Dr. S. B. Qanungo, pp. 392.. ঐতিহাসিক এ.এফ. এম. আবদুল জলীলও বলেন, 'বঙ্গের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। তিনি ও তৎপুত্র বোজর্গ উমেদ খাঁ যেভাবে মগ-পর্তুগীজ দমনে অংশ গ্রহণ করিয়া প্রজা সাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা মুঘল ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।' (সুন্দরবনের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৫২৭)।

৫৯ 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা'র লেখক বলেন, 'শায়েস্তা খানের আমলে দেশে শান্তি ছিল। লোকজনের অবস্থা ভাল ছিল এবং সকলেই স্বচ্ছল জীবন যাপন করতো।' (পৃষ্ঠা ৬৩)।

৬০ The History of Bengal, Vol. II., Sir J.N. Sarkar, pp. 387.

৬১ The History of Bengal Vol. II., Sarkar, pp. 387, & বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, মধ্য যুগ, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৪৯।

সস্তা ছিল।[৬২] 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর সূত্রে জানা যায়, শায়েস্তা খান 'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের, দুঃস্থ বিধবাদের ও অন্যান্যদের গ্রাম ও জমি দান'[৬৩] করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সম্ভবত এই সকল কারণে 'শায়েস্তা খানের নাম বাংলাদেশে এখনও খুব পরিচিত।'[৬৪]

তবে প্রকৃত প্রস্তাবে জনকল্যাণে শায়েস্তা খান যতোই আত্মনিয়োগ করুন এবং প্রশাসক হিশেবে যতো সুখ্যাতিই তাঁর থাক, এ সব কিছুই অনেকখানি ম্লান হয়ে যায় তাঁর ব্যক্তিগত ধনলিপ্সা ও অর্থগৃধ্নুতার কারণে।[৬৫] তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ফি-বছর ৫ লক্ষ টাকার 'পেশকাশ' পাঠাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন।[৬৬] সম্রাটের নেকনজরে থাকার জন্য কখনও কখনও এর অধিক পরিমাণও দিতেন।[৬৭] স্বভাবতই এই প্রতিশ্রুত অর্থ ('পেশকাশ'), প্রদেশের প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত ভোগবিলাসের বিপুল বৈভব[৬৮] মিটাতে তাঁকে জনসাধারণের ওপর কর বৃদ্ধি করতে হয়েছিল।[৬৯] স্যার যদুনাথ সরকার বলেন, 'Such extravagance could be maintained only by squeezing the people. His subordinates were left free to raise money for him by every means that they could think of; merchandise was stopped at every outpost and ferry and custom duty charges over and over again in disregard of official permits; cesses (abwabs) abolished by imperial decree, still continued to be realised in practice. In addition the Nawab practised a monopoly of the sale of salt, betelnut, and some other prime necessaries of life. Thus, by grinding the masses, be amassed a vast treasure, besides building costly edifices at Dacca, the memory of which still lingers. Indeed,

৬২ 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা', পৃষ্ঠা ৬২।

৬৩ বাংলার ইতিহাস ('রিয়াজ-উস-সালাতীন'), বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ১৭৬।

৬৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৪৯।

৬৫ ইংরেজদের সমসাময়িক রিপোর্টগুলিতে তার এই অর্থগৃধ্নুতার বেশ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় (ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৪৯), যদিও এর কিছু কিছু যে অতিরঞ্জিত ছিল না তেমন বলা যাবে না। কেননা শেষের দিকে শায়েস্তা খানের অনেক যথাযথ পদক্ষেপে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ নষ্ট হয়েছিল, স্বভাবতই তারা ছিল ক্ষুব্ধ।

৬৬ The History of Bengal, Vol. II., pp. 373.

৬৭ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বারের সুবাদারি শেষে তিনি যখন ফিরে যান তখন সম্রাটকে এককালীন ৩০ লক্ষ টাকা নগদ ও তৎসহ ৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণালংকার প্রদান করেছিলেন। (The History of Bengal, Vol. II., pp. 374).

৬৮ কথিত আছে, তাঁর দৈনিক আয় ছিল ২ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় তার অর্ধেক অর্থাৎ ১ লক্ষ টাকা। (The History of Bengal, Vol. II., p. 375); এ সম্পর্কে ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেন, 'এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের পশ্চাতে যে দালান-ইমারত নির্মাণ জাঁকজমক, দান-দক্ষিণা, আশ্রিত-পোষণ প্রভৃতি ছিল তাহাই সম্ভবত শায়েস্তা খানের লোক প্রিয়তার কারণ।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫০)।

৬৯ তাঁর সময়ে চট্টগ্রাম বিজয়ের ফলে মোগল বাংলার ভূখণ্ডগত সীমা প্রসারিত হয়েছিল এবং সে কারণে রাজস্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল ধরে নিলেও সত্য বলতে এই যুগের রাজস্ব-হিসাবের কোন লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না।

Bengal's only attraction for him was the ease of administering such a soft population and the gold to be had here for the picking.'[৭০]

জানা যায় ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে শায়েস্তা খান কেন্দ্রে ৫৫ লক্ষ টাকা প্রেরণ করেছিলেন।[৭১] এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি যে তাঁর ব্যক্তিগত সঞ্চয় বা তহবিল থেকে দেননি তার প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি যখন প্রথমবার সুবাদারি শেষে চলে যান তখন তাঁর নিয়ে যাওয়া সঞ্চিত ৩৮ কোটি টাকা (মাত্র ১৩ বছরে)-র তথ্য থেকে।[৭২] অধিকন্তু রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানকালে যে ইংরেজ ও ডাচ বণিকদের কাছ থেকে তিনি হামেশাই 'ধন-জন, অস্ত্র-শস্ত্র এবং জাহাজ পর্যন্ত'[৭৩] গ্রহণ অর্থাৎ ব্যবহার করতেন, অর্থনৈতিক কারণে সেই বণিকদেরকেই বিশেষ করে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার শাহজাদা শুজা কর্তৃক প্রদত্ত অধিকার এবং তদহেতু দেশীয় ও অন্যান্য বিদেশি জাতির বণিকদের তুলনায় তাদের দ্রুত সমৃদ্ধি অর্জন রহিতকরণ[৭৪], এবং বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নানা স্থানে অবাধে কুঠি নির্মাণ বন্ধে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধাতে শায়েস্তা খান পিছপা হননি। তিনি তাদেরকে বাংলা মুলুক ছাড়তেও বাধ্য করেন। যে কারণে অধিকাংশ ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁর প্রাপ্য প্রশংসা করতেও সাতিশয় কুণ্ঠিত হয়েছেন।[৭৫] যা হোক, মোটামুটি একটা সুস্থির অবস্থার মধ্যে শায়েস্তা খান—'The greatest governor of Dacca'[৭৬] বাংলায় সুবাদারি শেষে দিল্লি ফিরে যান।[৭৭] অবশ্য ফিরে যাবার জন্য সম্রাটের দরবারে তাঁর তদ্বিরও ছিল।[৭৮]

শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবাদার হন আওরঙ্গজেবের ধাত্রীপুত্র খান-ই জাহান বাহাদুর (জুলাই, ১৬৮৮)। শাসক হিশেবে তিনি ছিলেন খুবই অযোগ্য। ফলে এক বছর পরেই (জুন, ১৬৮৯) সম্রাট তাঁকে পদচ্যুত করে তদস্থলে ইব্রাহিম খানকে নিযুক্ত করে পাঠান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মোগল সুবাদাররা মধ্যকালীন বাংলার বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে (এ-ও এক ধরনের লুণ্ঠন) যে ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনের পাহাড় গড়ে তুলতেন ও তুলেছিলেন, তার প্রমাণ পূর্বোক্ত এই অপদার্থ সুবাদারও বাংলা থেকে প্রত্যাবর্তন কালে ২

৭০ The History of Bengal, Vol. II., pp. 374.

৭১ Tavernier's 'Travels in India', Vol. I., pp. 114; quoted from'Bengal in the Reigh of Aurangzib', Anjali, 74; আরও দেখুন, 'বাংলায় বিদেশী পর্যটক', ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

৭২ The History of Bengal, Vol. II., pp. 375.

৭৩ বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, পৃষ্ঠা ১৫।

৭৪ ইংরেজ বণিকদের এই বাণিজ্য শুল্কগত সুবিধা রহিত করণে অবশ্য সম্রাটেরও সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল। (ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৮১)।

৭৫ History of Bengal, Charles Stewart, সংগৃহীত 'মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী', ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৩)।

৭৬ Dacca, Dr. Ahmad Hasan Dani, pp. 68.

৭৭ সুবাদারির প্রথম ১৩ বছরে যিনি ৩৮ কোটি টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয় করেছিলেন, পরবর্তী ৯/১০ বছরে তাঁর পক্ষে আরও কতো সঞ্চয় করা সম্ভব তা সহজে অনুমেয়। এই পর্বে তিনি বাংলা থেকে আগ্রায় বদলি হন।

৭৮ 'রিয়াজ-উস-সালাতীন', বাংলা একাডেমী, পৃষ্ঠা ১৭৬।

কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান।[৭৯] সুতরাং সহজেই অনুমেয় এঁদের কারও কারও শোষণের মাত্রা কী ভয়ঙ্কর মাত্রায় ছিল! নবনিযুক্ত সুবাদার ইব্রাহিম খান ছিলেন অপেক্ষাকৃত কোমল হৃদয়ের অধিকারী। যদিও ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি বিভিন্ন সুবা'র দায়িত্ব ভার পালন করেন, তথাপি বাংলায় যখন তিনি আসেন তখন তাঁর সেই মানসিক স্থৈর্য ও উদ্যম এবং প্রশাসনিক কুশলতা বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। 'His disposition was mild, his habits sedentary, and his sole passion was to read Persian books. Without military abilities, he desired to administer justice with strict impartiality and to encourage agriculture and commerce. The English traders called him "the most famously just and good nabob", and the Muslim historian records that "he did not allow even an ant to be oppressed (Riyaz, 223).'[৮০] কিন্তু তাঁর এই আত্মভোলা ভাব ও প্রশাসনিক জরুরি বিষয়গুলিতে শৈথিল্য প্রদর্শন বাংলার ন্যায় একটি সমৃদ্ধিশালী ও বিদ্রোহী জমিদার-ভূস্বামীশ্রেণী অধ্যুষিত প্রদেশ শাসনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সঙ্গত কারণেই সুযোগসন্ধানীরা এর পুরো সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয়নি। উল্লেখ্য ইব্রাহিম খানের সরলতা ও প্রশাসনিক ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের চন্দ্রকোণার (পূর্বে বর্ধমান জেলার অংশ) চিতুয়া-বরদার তালুকদার (একজন জমিদারও বলা যায়) শোভা সিংহ ১৬৯৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি নাগাদ মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দেন ওড়িশার পাঠান সেনানায়ক রহিম খান ও আরও কয়েকজন।[৮১] তারা বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণ রাম রায়কে পরাজিত ও নিহত করে বর্ধমান দখল করেন।[৮২] সুবাদার প্রথমে এটিকে সাধারণ বিদ্রোহ মনে করে এর প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপে বিরত থাকেন। ক্রমে যখন বিদ্রোহীদের শক্তি ও পার্শ্ববর্তী স্থানগুলিতে তাদের সংগঠিত অপতৎপরতা, লুটতরাজ ও ধ্বংসযজ্ঞ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদেরকে দমনের জন্য তিনি যশোহর-হুগলি-বর্ধমান অঞ্চলের ফৌজদার নূরউল্লাহ খানকে প্রেরণ করেন। কিন্তু নূরউল্লাহ ছিলেন ইন্দ্রিয়বিলাসী ও ভীরু প্রকৃতির সেনাপতি। তার না ছিল সংগঠিত সেনাদল, না যুদ্ধোপযোগী নৌবাহিনী। স্বভাবতই তিনি বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে নিজেই পরাজিত হয়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে

৭৯ The History of Bengal, Vol. II., pp. 391; বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৫০।

৮০ The History of Bengal, Vol. II., pp. 392.

৮১ তাঁর সঙ্গে অন্য যারা ছিল যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ, চন্দ্রকোণার অপর একজন তালুকদার রঘু নাথ সিংহ, ওড়িশার দশনামী শৈব সম্প্রদায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। (বর্ধমান : ইতিহাস ও সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, পৃষ্ঠা ১০৬)। শোভা সিংহ কোনো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দলেবলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত করেননি। বরঞ্চ 'ঐতিহাসিক সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত দেখে, রাজ্য লোভে ও কর্তৃত্ব বিস্তারের বাসনায়, তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন।' (পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি, ২য় খণ্ড, বিনয় ঘোষ, পৃষ্ঠা ১১৬)।

৮২ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরাম রায়ের ওপর এই সময় বর্ধমান অঞ্চলের সরকারি ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার ছিল। (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ঐ, পৃষ্ঠা ১১৬)। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবকে ১ লক্ষ টাকার 'নজরানা' দিয়ে সম্রাটের ১৬৯৫-৬ খ্রিস্টাব্দের এক ফরমান বলে এই জমিদারি হাসিল করেন। (Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, Professor John R. McLane, pp. 137).

আসেন।[৮৩] বিদ্রোহীরা তখন অনায়াসে হুগলি দখল করে, এবং পরে একে একে মুকসুসাবাদ (পরবর্তী কালের মুর্শিদাবাদ), রাজমহল ও মালদহ দখল করে সন্নিহিত অঞ্চলসমূহে অবাধে লুণ্ঠনসহ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।[৮৪] উল্লেখ্য সম্রাট আওরঙ্গজেব এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। তিনি বিদ্রোহের খবর, ফৌজদারের ন্যক্কারজনক পরাজয় ও সুবাদারের অপদার্থতার সংবাদ পাওয়া মাত্র ইব্রাহিম খানকে পদচ্যুত করেন এবং তদস্থলে স্বীয় পৌত্র (শাহজাদা মুয়াজ্জমের পুত্র) আজিমউদ্দিন ওরফে আজিম-উশ-শান-কে সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। ইত্যবসরে তিনি নতুন সুবাদারের আসা অবধি বিদ্রোহীদেরকে দমন ও নির্মূল করার জন্য পদচ্যুত সুবাদারের পুত্র জবরদস্ত খানকে দায়িত্ব দেন।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ থেকে সুবাদার ইব্রাহিম খান স্থায়ীভাবে অন্তর্হিত হলেও বস্তুত তার সময়েই এ দেশের ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এমন একটি নীরব অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে যা প্রায় গুরুত্বহীন মনে হলেও বাস্তবে এর ফল ও প্রভাব— দুই-ই ছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। নানা কারণে শায়েস্তা খান ইংরেজদেরকে বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। সাময়িকভাবে তারা বাংলা ত্যাগ করে সত্য, কিন্তু তারা নীরবে বসে থাকেনি। বাংলার ন্যায় একটি বিশাল সম্পদবহুল ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রবল অনুকূল প্রদেশ ছেড়ে স্থায়ীভাবে দূরে থাকা তাদের জন্য কখনই মঙ্গলজনক ছিল না, এটা ইংরেজরা ভালোভাবেই বুঝতো। তাই তারা সম্রাটের কাছে বিভিন্নভাবে দেনদরবার শুরু করে। সম্রাটও এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠা ও অন্যান্য জাতির সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। স্বভাবতই তাঁর পক্ষে অগ্রপশ্চাৎ অনেক কিছুই বিবেচনা করা সম্ভব হয়নি। তিনি ইংরেজদেরকে মোগল ভারতের সর্বত্র নির্ধারিত শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন। সুবাদার ইব্রাহিম খান তাদেরকে বাংলায় আমন্ত্রণ জানান। বলাবাহুল্য নতুন এই সুযোগটিকে সুচতুর ইংরেজের দল পুরোপুরি কাজে লাগায়। তারা কলকাতায় ফিরে এসে বাণিজ্য কুঠির পুনর্নির্মাণ শুরু করে এবং সেগুলিকে অত্যন্ত মজবুত ও সুরক্ষিত করে গড়ে তোলে। তাদের দেখাদেখি অন্যান্য বিদেশি বণিকেরাও বিশেষ করে ফরাসি ও ওলন্দাজ বণিককুল স্ব স্ব প্রভাবাধীন এলাকায়[৮৫] বাণিজ্য কুঠি ও দুর্গ নির্মাণ ও সুরক্ষিত করে। পরবর্তীকালে এই কুঠি ও দুর্গগুলি বিদেশিদের সঙ্গে বিশেষত ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে বাংলার নবাবদের যুদ্ধে যে মজবুত প্রতিরক্ষা ব্যূহের ও গভীর ষড়যন্ত্রের আখড়া হিশেবে কাজ করেছিল, তা বাঙালি মাত্রেরই জানা।

৮৩ এদের এই বিদ্রোহ ও যুদ্ধের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, *হুগলী জেলার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড, সুধীর কুমার মিত্র, পৃষ্ঠা ৬১৬-২৪, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, ঐ, পৃষ্ঠা ১১৪-১৭; *যশোর জেলার ইতিহাস*, আসাদুজ্জামান আসাদ সম্পাদিত।

৮৪ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৫১; *মেদিনীপুর : ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন*, ১ম খণ্ড, বিনোদশঙ্কর দাশ সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৬২।

৮৫ ইংরেজরা কলকাতায়, ফরাসিরা চন্দননগর ও ওলন্দাজরা চুঁচুড়ায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আরও দেখুন এই লেখকের 'বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, ২য় খণ্ড'।

আজিম-উশ-শান ১৬৯৭ থেকে ১৭১২ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছর বাংলার সুবাদার ছিলেন।[৮৬] তাঁর সময়েই ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদের সুযোগ্য দিওয়ান কারতালব খান (পরবর্তীকালের স্বনামখ্যাত নবাব মুর্শিদকুলি খান[৮৭])-কে সম্রাট আওরঙ্গজেব সুবে বাংলার দিওয়ান নিযুক্ত করে পাঠান। এক কথায় তিনি ছিলেন 'খুব দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মচারী'[৮৮]। অন্যদিকে রাজরক্তের প্রত্যক্ষ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সুবাদার আজিম-উশ-শান প্রশাসক হিশেবে যতোটা না দক্ষ, যোগ্য ও আস্থাশীল ছিলেন, তার চেয়ে অধিক ছিলেন শঠ, ধূর্ত ও প্রজা-নিপীড়ক। যেনতেন প্রকারে রাজস্ব উশুল এবং অর্থ হাসিলে তার জুড়ি খুব কমই ছিল। অবশ্য এর কিছুটা কারণও ছিল। আজিম-উশ-শান জানতেন যে, বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যু হলে মোগলদের ঐতিহ্যানুসারে সিংহাসন নিয়ে আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অনিবার্য গৃহযুদ্ধ বাঁধবে, তখন অর্থই হবে ক্ষমতার উৎস ও মুখ্য নিয়ন্ত্রক। এই কারণে তিনি 'নানা অবৈধ উপায়ে এবং অনেক সময় প্রজাদের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন।'[৮৯] কিন্তু যেহেতু দিওয়ান মুর্শিদকুলি খান ছিলেন প্রশাসনিক কাজেকর্মে পূর্বাভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ এবং প্রদেশের রাজস্ব ও অর্থনৈতিক বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন তথা সুবাদারের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত, সঙ্গত কারণে প্রথম থেকেই সুবাদারের বিভিন্ন অপকর্মের পথে, বিশেষ করে আর্থিক দুর্নীতির পথে তিনি প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। শুরু হয় দু'জনের ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতার লড়াইয়ের রশি টানাটানি, যার চূড়ান্ত ফল প্রকাশ পায় আজিম-উশ-শান কর্তৃক সুকৌশলে মুর্শিদকুলি খানকে হত্যা প্রচেষ্টার ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্য দিয়ে।[৯০] খান বিষয়টি আনুপূর্বিক লিখিতভাবে বর্ণনা করে সম্রাটকে জানান। এবং অধীন

৮৬ শেষ ১০ বছর তিনি বিহার প্রদেশেরও সুবাদার ছিলেন এবং ১৭০৪ থেকে পাটনায় বসবাস শুরু করেন।

৮৭ 'তাহার কর্ম দক্ষতায় খুশি হইয়া ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেব তাঁহাকে 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি দান করেন।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪)। পরবর্তীকালে তিনি আরও উপাধি পান, যেমন জাফর খান নাসিরি, নাসির জঙ্গ, মুতামিন-উল মুলুক আলাউদ্দৌলা আসাদ জঙ্গ। তবে ইংরেজদের কাছে তিনি 'জাফর খান' এবং ইতিহাসে 'মুর্শিদকুলি খান' নামেই সমধিক পরিচিত।

৮৮ বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, মধ্য যুগ, ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৫২।

৮৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৫১-৫২।

৯০ মুর্শিদকুলি খানকে উচিৎ শিক্ষা দেয়ার মানসে সুবাদার আজিম-উশ-শান বেশ কিছুদিন থেকে তার ঘনিষ্ঠ অনুচরদের নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র করছিলেন। এরই বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ একদিন প্রভাতে সুবাদারের দরবারে নিয়মিত দর্শনীর অংশ হিশেবে মুর্শিদকুলি যখন ঢাকার রাজপথ দিয়ে সপ্রহরা যাচ্ছিলেন তখন আজিম-উশ-শানের পাঠানো অনুচর ও নগদি সৈন্যদের দলপতি জনৈক আবদুল ওয়াহিদের নেতৃত্বে একদল অবাধ্য সৈন্য দিওয়ানের পথ রোধ করে ও তাদের বকেয়া বেতনের (নানা কারণে অ-প্রদেয়) জন্য তাঁকে জোর চাপাচাপি করে। তারা এক পর্যায়ে দিওয়ানকে প্রাণে মেরে ফেলার উপক্রম করে। কিন্তু দিওয়ান তাঁর সঙ্গীয় সশস্ত্র প্রহরীদের তৎপরতায় কোন রকমে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হন এবং স্পষ্টত বুঝতে পারেন যে, এ গুলি সবই সুবাদারের অসৎ চাল। তিনি তৎক্ষণাৎ সুবাদারের দরবারে গমন করেন এবং কোনপ্রকার সৌজন্য প্রদর্শন ছাড়াই তাঁকে সরাসরি এ কাজের জন্য অভিযুক্ত করেন ও দিল্লিতে সম্রাটকে জানানোর হুমকি দেন। আজিম-উশ-শান জানতেন যে, সম্রাট যারপরনাই মুর্শিদকুলির ওপর প্রসন্ন, এবং এ ষড়যন্ত্রের খবর জানতে পারলে তাঁর জন্যে বিষম বিপদ হবে। তাই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দিওয়ানকে নিবৃত্ত করেন এবং দোষীদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের অঙ্গীকার করেন।

রাজস্ব কর্মচারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ও সম্রাটের অনুমতি নিয়ে দিওয়ানি বিভাগের সকল দপ্তর ও স্থাপনা ঢাকা (সুবাদারের তৎকালীন হেড কোয়ার্টার) থেকে 'মুকসুদাবাদ'[৯১]-এ স্থানান্তরিত করেন।

মুর্শিদকুলি খান বাংলার দিওয়ান হিশেবে আসার পর সুবে বাংলার ভূমিরাজস্ব ও আর্থিক প্রশাসনে অভূতপূর্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোপূর্বেকার বেশ কয়েকজন অন্তর্বর্তীকালীন সুবাদারের অযোগ্যতা, মধ্য কালীন বাংলার অধিকাংশ খাজনাপ্রদায়ী ভূমি জায়গির হিশেবে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জমিদারদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা এবং বিশেষ করে আজিম-উশ-শানের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের কারণে বাংলার আর্থিক জীবনে ও প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। অন্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে এখানকার প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহ করা হতো। কিন্তু নতুন দিওয়ান আসার পরে এই অবস্থার দ্রুত ও সমূহ পরিবর্তন ঘটে। মুর্শিদকুলির বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে বাংলার রাজকোষে বার্ষিক বিপুল পরিমাণে অর্থ সঞ্চিত হয়। ফলে প্রদেশের আয়ের অর্থ থেকে তিনি শুধু প্রদেশের যাবতীয় প্রশাসনিক ব্যয় মিটাননি, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত ও প্রতিনিয়ত অর্থ সংকটের সম্মুখীন সম্রাটকে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকার নিয়মিত 'পেশকাশ' প্রেরণ করতেও শুরু করেন। স্বভাবতই বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেব দিওয়ানের প্রতি যারপরনাই প্রীত ও আস্থাশীল হন। অচিরেই তিনি এর পুরস্কারও দেন তাঁকে।

এ পর্যায়ে মুর্শিদকুলি খানের দিওয়ান ও সুবাদার হিশেবে উত্থানের কাহিনী সংক্ষেপে নীচে বিবৃত করা হলো।

মুর্শিদকুলির বাল্যবেলার ইতিহাস অজ্ঞাত। শোনা যায় তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান।[৯২] অল্প বয়সে তাঁকে হাজি সফি ইসফাহানি নামক এক ব্যক্তি ক্রয় করেন এবং তাঁকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে স্বদেশ পারস্যে নিয়ে যান। উত্তরকালে মুর্শিদকুলি যে একজন অত্যন্ত উঁচুদরের ভূমিরাজস্ব বিশেষজ্ঞ হতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিল এই হাজি

৯১ অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিক 'মুর্শিদাবাদ'-এর সাবেক নাম হিশেবে 'মুকসুদাবাদ'-এর উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৩য় খণ্ড : ২য় পর্ব, ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ৫; বঙ্গে মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গীর অত্যাচার, পৃষ্ঠা ১৮; বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৯১; মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, ড. আসকার ইবনে শাইখ, পৃষ্ঠা ১৬৩; A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 173; A Comprehensive History of India, Vol. IX., pp.168; British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay, p. 27; তবে 'মুকসুসাবাদ'-এর উল্লেখকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, Sir JaduNath Sarkar, 'The History of Bengal, Vol. II., pp. 404; Murshid Quli Khan and His Times, Dr. Abdul Karim, pp. 21; অবশ্য ড. করিম এটিকে 'মকসুদাবাদ' বলেও উল্লেখ করেছেন। (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৬)। তবে দু'টি উচ্চারণই সম্ভবত সঠিক, কারণ যার নামে মূলে এটি নামকরণকৃত হয় সেই মাকসুস বা মখসুসখান ('রিয়াজ-উস-সালাতীন', পৃষ্ঠা ২২-২৩) এর নাম ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে 'মখসুদ' এবং সেই সূত্রে মাকসুসাবাদ, 'মুখসুদাবাদ' হওয়াও অসম্ভব নয়। (দেখুন, 'A Bengal District in Transition : Murshidabad, 1765-1793, Dr. Khan Mohammad Mohsin, pp. 4).

৯২ A Statistical Account of Bengal, Vol. I., pp. 357; The History of Bengal, Vol. II., pp. 399-400.

ইস্ফাহানির অবদান। হাজি সফি তাঁকে শুধু ইসলামি নাম 'মুহম্মদ হাদি'-ই উপহার দেননি, উপরন্তু তিনি তাঁকে উপযুক্ত শিক্ষাও প্রদান করেন। হাজি ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্যের 'দিওয়ান-ই-তান' নিযুক্ত হন। তিনি অল্প কিছুকালের জন্য বাংলা ও দাক্ষিণাত্যেরও দিওয়ান নিযুক্ত হন। পরে ১৬৮৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় দিওয়ান-ই-তান নিযুক্ত হন এবং ৭ বছর উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য তাঁর এই দিনগুলিতে মুহম্মদ হাদি তথা ভাবিকালের বিখ্যাত মুর্শিদকুলি খান হাজির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থেকে দিওয়ানের কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। স্বভাবতই ধারণা করা যায় যে, বাল্যকাল থেকে কর্মজীবনে প্রবেশের আগ পর্যন্ত যে পারিবারিক সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক পরিমণ্ডলের ভিতোরে মুর্শিদকুলি বেড়ে উঠেছিলেন, তা ছিল তাঁর ভবিষ্যত কর্মজীবনের উপযুক্ত নির্দেশিকা স্থল ও ভিত্তিস্বরূপ। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে হাজি সফির মৃত্যু হলে অভিভাবকহীন মুর্শিদকুলি পারস্য থেকে ভারতে ফিরে আসেন। তিনি বেরা-র প্রদেশের দিওয়ান হাজি আবদুল্লাহ খোরাসানির অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। এখানে থাকাকালে রাজস্ববিষয়ক কাজে-কর্মে তিনি কঠোর একনিষ্ঠতা ও মুন্‌শিয়ানার পরিচয় দেন। ইত্যবসরে সম্রাট আওরঙ্গজেব মুহম্মদ হাদির বিষয়ে জানতে পারেন। তিনি তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু খোঁজখবর নেন, পরে সম্রাট সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে হায়দারাবাদের দিওয়ান ও ইলকুন্ডার ফৌজদার নিয়োগ করেন (১৬৯৮ খ্রিঃ)। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীনই সম্রাট তাঁকে 'কারতালব খান' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর মুর্শিদকুলির রাজস্বসংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার আরও ব্যাপক বহিঃপ্রকাশ ঘটলে, এবং তৎকালীন বাংলার বিশৃঙ্খল ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে তাঁর মতো সুযোগ্য ও বিচক্ষণ লোকের আবশ্যকতা অনুভূত হলে সম্রাট 'কারতালব খান'কে বাংলার দ্বিতীয় শীর্ষ পদে তথা দিওয়ান করে পাঠান—'In this post (as diwan of Haidarabad and faujdar of Yelkondal), directly under the Emperor's eyes, he further heightened his reputation, and when a highly capable officer was needed for reforming the revenue administration of Bengal, Md. Hadi was selected by Aurangzib for the post (Nov. 1700).'[৯৩] তাঁকে একই সঙ্গে মুকসুদাবাদের ফৌজদারের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়।

বাংলার দিওয়ান হিশেবে মুর্শিদকুলি খান ছিলেন প্রাদেশিক রাজস্ব বিভাগের সর্বময় কর্তা। তিনি এখানকার হাল-হকিকত বুঝে প্রদেশের ভূমিরাজস্বের উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা করেন। বলা যায় রাজস্ব সংক্রান্ত তাঁর গৃহীত কর্মপদ্ধতিতে খুশি হয়েই সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় তাঁকে সিলেট, মেদিনীপুর, বর্ধমান ও কটকের ফৌজদার, সুবাদার আজিম-উশ-শানের বাংলাস্থ জায়গিরের দিওয়ান (১৭০১ খ্রিঃ), সোয়া ১ বছরের মাথায় ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁকে প্রথমে ওড়িশার ডেপুটি সুবাদার ও কিছু পরে পূর্ণাঙ্গ সুবাদারিও দেয়া হয় এবং তাঁর 'মনসব' সংখ্যাও দেড় হাজার জাট থেকে দু'হাজারে উন্নীত করা হয়। পরের বছর তিনি বিহারের দিওয়ানিও লাভ করেন। বলাবাহুল্য এই সকল পদের দায়-দায়িত্ব মুর্শিদকুলি প্রায় একক ভাবেই পালন করতেন, এবং সেটাও অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে। প্রসঙ্গত এখানে ড.

৯৩ The History of Bengal, Vol. II., pp. 400.

আবদুল করিমের একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করা যায়। তিনি চমৎকার বলেছেন যে, 'তাঁর নিযুক্তির প্রথম থেকে মাত্র চার বছরের মধ্যে মুর্শিদকুলি খান এক প্রদেশের (ওড়িশার) সুবাদার, বাংলা বিহার ও ওড়িশা এই তিন প্রদেশের দীউয়ান এবং পাঁচটি সরকারের ফৌজদারের পদ লাভ করেন। এই নিযুক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় সম্রাট তাঁকে কতটা সুনজরে দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন।'[১৪] অধিকন্তু এই নিযুক্তিসমূহের লক্ষণীয় তাৎপর্য এটাও ছিল যে, '..thus holding an important position in the three subas of Bengal, Bihar and Orissa Murshid Quli enjoyed supreme influence with the imperial government till the last days of Aurangzib.'[১৫]

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের গোড়াতে (ফেব্রুয়ারি ২০) সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে মুর্শিদকুলির মাথার ওপর থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়ের সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে। কেন্দ্রীয় মোগল সাম্রাজ্যের তথা দিল্লির মসনদের দখলদারিত্ব নিয়ে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যখন যুদ্ধ বাঁধে তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি কিছুটা বেহাল অবস্থার মধ্যে পড়েন। তথাপি স্বীয় দূরদর্শিতা ও অবিচল আদর্শের কারণে তিনি সে বিপর্যয় কাটাতে সক্ষম হন। তাঁর অনুসরণীয় আদর্শ এই ছিল, তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাটের একনিষ্ঠ সেবক এবং মসনদাধিকারীর একান্ত আজ্ঞাবাহী। ফলে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যে তৈমুর বংশের যখন যিনি দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেছেন বা তা দখল করেছেন তাঁকেই মুর্শিদকুলি সম্রাট বলে মেনে নিয়েছেন এবং নিয়মিত 'পেশকাশ' প্রেরণ করেছেন। সঙ্গত কারণে আওরঙ্গজেব পরবর্তী কেন্দ্রীয় মোগল শাসকশ্রেণীও তাঁদের রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থায় তাঁকে (মুর্শিদকুলি) ভুল বুঝলেও অচিরেই আবার তাঁকে আপন করে নিয়েছে। তাই দেখা যায় যে আজিম-উশ-শানের সঙ্গে বাংলার দিওয়ান থাকাকালীন মুর্শিদকুলির প্রবল বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁরই পিতা শাহজাদা মুয়াজ্জম (আওরঙ্গজেবের জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র) যখন 'শাহআলম বাহাদুর শাহ' উপাধি নিয়ে মোগল সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন প্রথম দিকে মুর্শিদকুলি বাংলার ডেপুটি সুবাদার নিযুক্ত হলেও (জুলাই ১৫, ১৭০৭) শীঘ্রই আজিম-উশ-শানের পূর্ব শত্রুতা ও কারসাজিতে তিনি বাংলার দিওয়ানি ও মুর্শিদাবাদের ফৌজদারি হারান (অক্টোবর ৮, ১৭০৭) এবং ওড়িশার সুবাদারের পদ থেকেও অপসারিত হন (জানুয়ারি ১৯, ১৭০৮)। কিন্তু এতদ সত্ত্বেও বাস্তবতা এই যে, এ অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় পদগুলি হারালেও মুর্শিদকুলির রাজস্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতা ও অসাধারণ কর্মকুশলতা তাঁকে শাসককুলের পুরোপুরি নিগৃহীতের তালিকায় ছুঁড়ে ফেলেনি যা সচরাচর এ সকল ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ১৭০৮ থেকে ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পূর্ণ দু'বছর কাল তিনি দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানগিরি করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসকশ্রেণী এরপরেই আবার মুর্শিদকুলিকে তাঁর আসল বিচরণ ক্ষেত্র বাংলায় ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। শুধু তাই নয়, শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের প্রয়োজনেই একে একে তাঁর সকল হৃত পদ ও গৌরব ফিরিয়ে দেয়, বরঞ্চ বেশিই দেয়। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানকে পুনরায় বাংলার দিওয়ানি ও আজিম-উশ-শানের জায়গির তত্ত্বাবধানের

১৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৭।

১৫ Bengal in the Reign of Aurangzib, Dr. Anjali, pp. 35.

ভার দেয়া হয়। পরের বছর তাঁকে মেদিনীপুর ও হিজলির ফৌজদার, ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দের সেপটেমবরে বাংলার ডেপুটি সুবাদারি, ১৭১৪-র মে মাসে ওড়িশার সুবাদারি এবং 'জাফর খান নাসিরি' উপাধি দেয়া হয়। পরিশেষে সম্রাট ফররুখ শিয়র (১৭১৩-১৭১৯) মুর্শিদকুলি খানকে ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দের অকটোবর[৯৬] মাসে বাংলার পূর্ণাঙ্গ সুবাদার হিশেবে নিযুক্ত করেন এবং অত্যন্ত ভূয়সী প্রশংসাসূচক উপাধি 'মুতামুন-উল-মুল্ক আলাউদ্দৌলা জাফর খান বাহাদুর, নাসিরি, নাসির জঙ্গ'-এ ভূষিত করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর 'মনসব'ও সাত হাজারে উন্নীত করেন। ফলত এইভাবে নবাব মুর্শিদকুলি খান কার্যত বাংলা ও ওড়িশার সর্বোচ্চ পদের অধিকারী হন, এবং বাংলার দিওয়ান পদে তাঁর অনুগত সৈয়দ আকরম খান বাহ্যিকভাবে দায়িত্ব পালন করলেও বস্তুত সামগ্রিক সাধারণ ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও ব্যবস্থা এক যোগে তাঁর কর্তৃত্বাধীন চলে আসে। অতঃপর ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে জুন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।[৯৭]

এটা ঠিক যে, 'অজ্ঞাতকুলশীল মুর্শিদকুলি নীল রক্তের অধিকারী ছিলেন না, (এবং) তাঁর উন্নতির মূলে ছিল (ব্যক্তিগত) কর্মদক্ষতা'।[৯৮] সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মাত্র সিকি শতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যখন কেন্দ্রীয় মোগল সরকারে ও দরবারে একের পর এক শাসক বদল হয়েছে, এবং বিশেষ করে ১৭১৭ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত মুর্শিদকুলির সুবাদারি আমলের মধ্যে ৪ জন শাসকের মধ্যে ক্ষমতা রদ-বদল হয়— রাজনৈতিক সেই ডামাডোলের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া যখন মোগল সাম্রাজ্যের অপরাপর প্রদেশগুলিকে কমবেশি আক্রান্ত করে, তখনও বাংলার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ছিল এক প্রকার নিস্তরঙ্গ, নিরুদ্বেগ ও শান্ত। সত্যি বলতে এর মূল কারণ ছিল ঝানু রাজনীতিক ও বিচক্ষণ আমলা মুর্শিদকুলির অনন্যসাধারণ শাসন নৈপুণ্য ও কেন্দ্রের প্রতি তাঁর একক ও অবিভাজ্য নীতি, যা আগেই বলেছি।[৯৯] এই নীতি অনুসরণের ফলে আমরা দেখেছি আওরঙ্গজেব-উত্তর সময়ে 'দিল্লীর ভগ্নপ্রায় মোগল তখ্ত যেই অধিকার করুক, বাংলাদেশের শাসন-ব্যবস্থা মুর্শিদকুলী খাঁর বিচক্ষণ কঠিন হস্তেই থাকে; দিল্লীর ভাগ্য বিপর্যয় তখন বাংলাকে তাই স্পর্শ করেনি।'[১০০]

৯৬ বাংলার সুবাদার পদে মুর্শিদকুলির নিযুক্তির তারিখ ১৯শে অকটোবর, ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দ বলে স্যার যদুনাথ সরকার মত প্রকাশ করলেও (The History of Bengal, Vol. II., p. 399) তাঁর নিযুক্তির প্রকৃত তারিখ নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। দেখুন, Murshid Quli Khan and His Times, Dr. A. Karim, pp. 54.

৯৭ উইলিয়ম হান্টার সম্ভবত ভুল করে তাঁর মৃত্যু সন হিশেবে ১৭২৫ এর উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'Murshid Kuli Khan ruled at Murshidabad in almost undisturbed quiet from 1704 till his death in 1725.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 174).

৯৮ মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১২৮।

৯৯ ড. করিমও বলেন, 'মুর্শিদকুলী খানের সর্বাপেক্ষা বড় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তৈমুর বংশের যিনিই সিংহাসনে বসুন না কেন, তিনি তাঁর প্রতি অনুগত থাকতেন। এই কারণেই সম্রাট (গণ) তাঁর প্রতি সদ্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে পদোন্নতি দেন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২)।

১০০ বাংলা সাহিত্যের রূপ-রেখা, ১ম খণ্ড, গোপাল হালদার, পৃষ্ঠা ১৭০।

আজ বাংলার 'নবাবি আমল' বলতে যাকে আমরা বুঝি (মূলত ১৭১৭ থেকে ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত; এই চল্লিশ বছর বাংলার নবাবেরা কার্যত স্বাধীন ছিলেন), অষ্টাদশ শতকে এর গোড়াপত্তন বস্তুত মুর্শিদকুলি খানকে দিয়েই হয়েছিল। কেন্দ্রীয় রাজধানীতে ক্ষমতার লড়াইয়ে শাসকশ্রেণী যখন নিজেরাই ছিল নিজেদের নিয়ে ঘোরতর ব্যস্ত এবং একে অন্যের ভয়ে যারপরনাই তটস্থ, বাংলার মতো অত্যন্ত দূরবর্তী প্রদেশের হাল-হকিকতের খবর পর্যন্ত নেয়ার সময় তাদের ছিল না, তখন মুর্শিদকুলি খান ইচ্ছা করলে মোগলদের অপরাপর কয়েকটি সুবার মতো বাংলাকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তৈমুর বংশীয়দের প্রতি প্রবল আনুগত্য প্রদর্শনই ছিল তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা না-করার পিছনে কারণ। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই আনুগত্য বার্ষিক নিয়মিত 'পেশকাশ' প্রেরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কারণ ততোদিনে কেন্দ্র থেকে প্রদেশে সুবাদার নিয়োগ ও বদলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শাসকশ্রেণীর সে ক্ষমতাও তখন ছিল না। সঙ্গত কারণে মুর্শিদকুলি খানের পক্ষে কেন্দ্রের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ মুক্ত পরিবেশে প্রশাসনকে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে ঢেলে সাজানোর সুযোগ হয়। বলা যায় এই সময়ে 'বাংলার প্রশাসনিক সকল কর্মকাণ্ড মুর্শিদকুলী খানকে ঘিরে আবর্তিত হয়। তিনি একদল অনুগত, বিশ্বস্ত এবং দক্ষ কর্মকর্তার মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। এই কর্মকর্তারা হয় আত্মীয়তাসূত্রে বা তাদের নিযুক্তির কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁর প্রতি অনুগত ও বাধ্য ছিলেন। ওড়িশা এবং ঢাকার ডেপুটি সুবাদারি এবং বাংলার দীউয়ানি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে সংরক্ষিত রাখা হয়।... তাছাড়া ১৭২৭ সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কেন্দ্রে বাংলার রাজস্ব পাঠাবার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব মুর্শিদকুলী খান নিজে বহন করেন, যদিও ১৭১৬ সালের পর তিনি আর দীউয়ান ছিলেন না।...কিন্তু যেভাবে মুর্শিদকুলী খান সারা জীবন রাজস্ব সংগ্রহে এবং কেন্দ্রে রাজস্ব প্রেরণে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন এবং যেভাবে তিনি দীউয়ানের পদটি স্বীয় আত্মীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি সুপরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছিলেন।'[১০১] আর এভাবেই নিজে হয়েছিলেন, 'the founder of an independent provincial dynasty.'[১০২]

যা হোক, এখানে মুর্শিদকুলি খানের রাজনৈতিক উত্থানের এই আলোচনা এ জন্যে করা হলো যে, আমরা মূলত দেখাতে চাচ্ছি কোন্ পরিবেশের মধ্যে মুর্শিদকুলি খান বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক এইচ ব্লকম্যান যাঁকে 'বাংলার টোডরমল' (the TodarMall of Bengal)[১০৩] আখ্যায় ভূষিত করেছেন, তিনি তাঁর বহুল আলোচিত ভূমিরাজস্ব সংস্কার করেছিলেন যা আঠারো শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তথা অন্ত্যমধ্য বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনে এক ধরনের অন্তঃশীলা উপপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তাঁর প্রণীত ও অনুসৃত ব্যবস্থাই ছিল পরবর্তীকালের বিশেষ করে ইংরেজ আমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌল ভিত্তি ও প্রেরণা। ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহের ভাষায়,

১০১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ড. আবদুল করিম, পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫।
১০২ The History of Bengal, Vol. II., pp. 397.
১০৩ A Statistical Account of Bengal, Vol. I., pp. 357.

'The land revenue system taken over by the British was in the main his (Murshid Quli) creation.'[১০৪] এ পর্যায়ে নীচে সেটাই আলোচিত হলো।

মুর্শিদকুলি খানের ভূমিরাজস্ব সংস্কার

আমরা আগেই দেখিয়েছি যে, দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধরত অশীতিপর সম্রাট আওরঙ্গজেব কী প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে বাংলার দ্বিতীয় শীর্ষ পদে দিওয়ান মুর্শিদকুলি খানকে নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন এবং অতঃপর ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে সুবাদার হওয়ার পরবর্তী মাত্র এক দশকের মধ্যে খান বাংলা, বিহার ও ওড়িশার আর্থ-রাষ্ট্রনৈতিক তথা সর্বময় ক্ষমতা একক হস্তে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের এই প্রক্রিয়া তাঁর অনেক আগেই শুরু হয়েছিল যখন বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর ক্ষমতা-পাগল অযোগ্য উত্তরাধিকারীগণ দিল্লির মসনদ নিয়ে নিজেরাই ছিল দিশাহারা। বস্তুত মুর্শিদকুলি খানের রাজনৈতিক উত্থানের মূলে ছিল দিওয়ান বা অর্থ ও ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় প্রধান হিশেবে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার চরম সফলতা, যার প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছিলেন সম্রাটের জীবদ্দশায়, এবং অধিকাংশই ১৭১৭-পরবর্তী জীবনে বিশেষ করে ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে বাংলার তৃতীয় রাজস্ব বন্দোবস্ত (তৎকালীন সরকারি পরিভাষায় 'জমা কামিল তুমারি') প্রস্তুতকরণের মধ্য দিয়ে। তবে সত্যি বলতে দিওয়ান থাকাকালীন স্থিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পদ্ধতিগত ও মৌলিক যে পরিমাণ সংস্কার সাধন তাঁর অভিপ্রায় ছিল, তার অধিকাংশই তিনি করতে পারেননি তৎকালীন সুবাদারদের বিশেষ করে আজিম-উশ-শানের শত্রুতামূলক অসহযোগিতার কারণে। প্রকৃতপক্ষে এটা তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন যুগপৎ সুবাদারি ও দিওয়ানি (১৭১৬-র পরে তিনি নিজে সরাসরি দিওয়ান ছিলেন না; কিন্তু তাঁর অনুগত ও ঘনিষ্ঠ জনেরাই এই পদে অধিষ্ঠিত ছিল, ফলে স্বভাবতই তাদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল সুপ্রচুর ও কার্যকর) তাঁর একক হাতে ন্যস্ত হয়। ফলত এই অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারীরূপে (স্মর্তব্য, দিওয়ান হিশেবেও অর্থ ও রাজস্ববিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগে তিনি ছিলেন সুবাদারের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত) প্রায় সিকি শতাব্দী কালের শাসন-পর্বে নবাব মুর্শিদকুলি খান অন্ত্য-মধ্য বাংলার জন্যে ভূমিরাজস্ব-সম্বন্ধীয় যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী ও সফল পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেগুলিই এখন এক-এক করে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

সম্রাট আকবর থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেব পর্যন্ত মোগল কেন্দ্রীয় ভূমিরাজস্ব নীতির মূল কথা ছিল দু'টি, প্রথমত রাজস্ব-প্রদাতা রায়তের সাধ্য-সামর্থ্যের মধ্যে যতোটা সম্ভব উচ্চ কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ও সহনীয় হারে ভূমিরাজস্ব ধার্য করা, এবং দ্বিতীয়ত ধার্য রাজস্ব আদায়কালে রায়তকে কখনই এমন অবস্থায় নিপতিত করা যাবে না যা তার সচ্ছল আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটায় এবং পরিণামে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে। এছাড়া রায়ত যাতে করে পতিত ও অনাবাদি জমি চাষাবাদের জন্য উৎসাহিত হয় সেটা দেখাও

১০৪ A History of India, Drs. Sinha & Ray, pp. 408.

ভূমিরাজস্ব নিরূপণকারীদের জন্যে জরুরি।[১০৫] এ সম্পর্কে রসিক দাসকে লেখা সম্রাট আওরঙ্গজেবের পত্রের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, প্রশাসনিক ও জীবনাচারের প্রায় সকল ক্ষেত্রে সম্রাট আওরঙ্গজেব ছিলেন মুর্শিদকুলি খানের অনুসরণীয় আদর্শ (Model); স্বভাবতই মুর্শিদকুলি চাইতেন তাঁর অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা, মোগলদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অন্তত আওরঙ্গজেবের গৃহীত কর্মসূচির অনুসরণে সম্পাদিত হোক, বা তার কাছাকাছি পর্যায়ের কিছু একটা দাঁড় করাতে পারলেই তিনি ছিলেন খুশী। ড. মুহম্মদ মোহর আলি বলেন, 'Murshid Quli Khan's revenue administration was aimed at (a) securing an increase in the revenue without imposing an extra burden on the ra'yats; (b) ensuring regularity in the collection; and (c) protecting the ra'yats from any oppressive demands by the revenue-collecting agencies like the 'amils and the zamindars. These were precisely the objects which the emperor Aurangzeb himself had in view and about which he had repeatedly reminded his viceroys from Shaista Khan onwards.'[১০৬] অবশ্য মুর্শিদকুলি খান যে প্রচলিত ব্যবস্থার সর্বক্ষেত্রেই আমূল সংস্কার করেছিলেন তা নয়। বরং কিছু কিছু সাহসী ও যুগোপযোগী পদক্ষেপ ছাড়া তাঁর অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার ব্যাপকাংশই ছিল পূর্ববর্তী দিওয়ান ও সুবাদারদের সময়কার প্রচলিত ব্যবস্থার এক ধরনের সম্প্রসারণ ও ব্যাপকায়ন। ড. আলি'র ভাষায় বলা যায়, 'In fact Murshid Quli Khan's measures were in essence a continuation and completion of a policy outlined by his predecessors. He did not bring about any fundamental or drastic change in the revenue administration. Within the framework of the existing system he skilfully managed to achieve the above mentioned objects with considerable success.'[১০৭] পূর্ববর্তীদের তুলনায় তাঁর এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব ও অনন্যতা এখানে ছিল যে, এটি একদিকে যেমন বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে সময় ও প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট হতে পেরেছিল, তেমনি অন্যদিকে এটি যেন শুধু কাগজে-পত্রেই আদর্শ ব্যবস্থা হিশেবে টিকে না থেকে বরং সর্বত্র কঠোর কিন্তু ন্যায়সঙ্গত ভাবে অনুসৃত ও গৃহীত হয়, সে বিষয়েও তিনি যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। উদাহরণত বলা যায়, তিনি অযোগ্য ও খেলাপি জমিদারদের সরিয়ে তদস্থলে ইজারাদার নিয়োগ করেছিলেন; প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে এটি ছিল একটি নতুন এবং ভিন্ন ব্যবস্থা। ফলত এদের কাছ থেকে ভূমি রাজস্ব আদায়ে তাঁর কড়াকড়ির কোন অন্ত ছিল না। নির্মমতার সকল সীমা তা ছাড়িয়ে যেতো বললে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত এটি ছিল তাঁর ব্যবস্থার কঠোরতার একটি দিক। অন্যদিকে তাঁর ব্যবস্থার যে ন্যায়সঙ্গত দিকও ছিল তার প্রমাণ তিনি রায়তদেরকে 'তাকাবি ঋণ' প্রদানের পূর্বতন ধারা অব্যাহত রেখে ছিলেন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির ফলে রায়তের

১০৫ Murshid Quli Khan and His Times, pp. 74.
১০৬ History of the Muslims of Bengal, Vol. IA, pp. 547.
১০৭ Ibid., pp. 547.

শস্যোৎপাদনহ্রাস পেলে বা আদৌ না হলে আনুপাতিক হারে তাদের দেয় খাজনা মওকুপ করতেন। এমন কি যে সকল জমিদার জাগতিক অর্থ-প্রতিপত্তি লাভের উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রধানত জনহিতকর ও দাতব্য কাজে জমিদারি পরিচালনা করতেন, যেমন বীরভূমের রাজা বা জমিদার আসাদউল্লাহ খান—এদের জমিদারির দেয় যথেষ্ট সহৃদয়তার সঙ্গে আদায় করতেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখক গোলাম হোসায়ন সলীম বর্ণনা করেন, 'বীরভূমের জমিদার আসাদুল্লাহ্ ধার্মিক ও দরবেশতুল্য ব্যক্তি ছিলেন; তিনি তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক বিদ্বান, ধার্মিক ও দরবেশদের জন্য মদদ-ই-মাশরূপে দান করেছিলেন এবং গরীব ও দুঃস্থদের জন্য দৈনিক দান বরাদ্দ করেছিলেন। সেইজন্য মুরশিদ কুলী খান তাঁর উপর কোনো প্রকার উৎপীড়ন করতেন না।'[১০৮] মোট কথা এ ক্ষেত্রে আমাদের বলার কথা এই যে, অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্বে মুর্শিদকুলি খানের শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে বাংলায় যে ভূমিরাজস্ব প্রথা ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল প্রকৃতিগতভাবে তা ছিল অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু ন্যায়সঙ্গত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগারের জন্য যথেষ্ট অনুকূল।

বাংলার দিওয়ান হিশেবে মুর্শিদকুলি খান সম্রাটের পূর্বানুমতি নিয়ে সর্বপ্রথম যে কাজ করেন তা হলো বাংলাস্থ্ রাজকর্মচারীদের জায়গিরগুলির প্রায় অধিকাংশই বাতিল ঘোষণা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জায়গিরদারদের ওড়িশায় পুনর্বাসন। সচরাচর জায়গির প্রদান করা হতো উচ্চপদস্থ্ রাজকর্মচারীদেরকে তাদের বেতনভাতার পরিবর্তে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য প্রতিপালনের ব্যয় নির্বাহার্থে। প্রচলিত ব্যবস্থায় 'মুঘল সাম্রাজ্যের ভূমিরাজস্বের প্রায় পাঁচ ভাগের চার ভাগই ছিল জায়গিরদারদের নিয়ন্ত্রণে'[১০৯]। এবং সত্যি বলতে 'মোগল শাসকশ্রেণী আর্থিকভাবে এই জায়গীরগুলির উপর (ই) দাঁড়িয়েছিল।'[১১০] তা সত্ত্বেও বাংলার জন্যে বাস্তবতা এই ছিল যে সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের শুরু নাগাদ এখানকার জায়গিরগুলির অবস্থা ও অবস্থান প্রদেশের স্থিতিশীলতার জন্যেই ছিল বেশ ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। কারণ প্রায় গোটা সুবাটাকেই স্থানীয় শাসকশ্রেণী তাদের নিজেদের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও স্বার্থের যূপকাষ্ঠে ক্রমে ক্রমে জায়গিরদারদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছিল বা দিতে বাধ্য হয়েছিল। অথচ আবহমান বাংলার বিস্তীর্ণ ভূভাগ চিরকালই ছিল খুব উর্বর ও অল্প শ্রমে, অল্পায়াসে অধিক শস্যেৎপাদনক্ষম। অষ্টাদশ শতকের আগে একটা সময় পর্যন্ত এ প্রদেশ ছিল উদ্‌বৃত্ত রাজস্বের জন্য বিখ্যাত, যে কারণে একে 'জান্নাত-উল-বিলাদ' বা 'প্রদেশসমূহের স্বর্গ' প্রভৃতি আখ্যাও দেয়া হয়েছিল। কিন্তু শুনতে আশ্চর্য মনে হলেও মুর্শিদকুলি খানের আগমনের বেশ কিছু কাল আগে থেকেই সুবার আর্থনীতিক অবস্থা ছিল এ রকম : 'অন্য প্রদেশ থেকে টাকা এনে মাঝে মাঝে বাংলার প্রশাসনিক আয় ব্যয়ের ঘাটতি মেটাতে হত।'[১১১] সুতরাং অবস্থা কী

১০৮ পৃষ্ঠা ১৯৮।
১০৯ অষ্টাদশ শতকের মুঘল সংকট ও আধুনিক ইতিহাস চিন্তা, পৃষ্ঠা ১৯।
১১০ পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, ড. রজত কান্ত রায়, পৃষ্ঠা ১১৭।
১১১ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১; ড. এম. এ. রহিমও স্বীকার করেন, 'সম্রাট আলমগীর এমন সময় মুর্শিদকুলী খানকে বাংলার দীউয়ান হিসেবে প্রেরণ করেন যখন রাজস্ব শাসন ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল এবং রাজস্ব সংগ্রহ এত কম ছিল যে,

দাঁড়িয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র 'সায়ের' বা বাণিজ্য শুল্কই ছিল রাষ্ট্রীয় অর্থাগমের উৎস। ফলে মুর্শিদকুলি খান ভূমিরাজস্ব থেকে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রথম সুযোগেই বাংলার উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহ ও রাজকর্মচারীদের অনুকূলে ইতোপূর্বে বরাদ্দকৃত জায়গিরগুলির মঞ্জুরি বাতিল করেন এবং সেগুলিকে সরাসরি 'খালসা' জমির অন্তর্ভুক্ত করেন, অন্য কথায় সরকারের প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এতে করে, ঐতিহাসিক জেমস গ্রান্টের দেয়া তথ্য মতে, 'খালসা' জমি থেকেই সুবার আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল ১০,২১,৪১৫ টাকা।

তবে বলাবাহুল্য যে, মোগল প্রশাসনযন্ত্রের অবকাঠামোগত বিন্যাসের কারণেই মুর্শিদকুলির পক্ষে স্থিত সমুদয় জায়গির বাতিল করা সম্ভব হয়নি[১১২], এবং পদচ্যুত জায়গিরদারদেরকেও তিনি নির্মূল করতে পারেননি। সত্য বলতে সে চেষ্টাও তিনি করেননি। উপরন্তু তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে যে সকল জায়গিরদার জায়গির হারালেন তাদেরকে তিনি ওড়িশার অনধিকৃত, অনুর্বর ও জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে নতুনভাবে জায়গির প্রদান তথা পুনর্বাসিত করেন। অবশ্য এর পিছনে তাঁর অন্য একটি উদ্দেশ্যও ছিল। মুর্শিদকুলি চেয়েছিলেন পুনর্বাসিত জায়গিরদারগণ নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই ওড়িশার অনাবাদি, পতিত ও অরণ্যবেষ্টিত ভূমিখণ্ডগুলি ধাপে ধাপে চাষাবাদের আওতায় আনবে এবং এর ফলে রাষ্ট্রের আয়ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। যা হোক, এটি ছিল নতুন দিওয়ানের ভূমি-রাজস্ববিষয়ক সংস্কারের উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক পদক্ষেপ। এরপর তিনি বাংলার শক্তিশালী জমিদারদের প্রতি দৃষ্টি দেন। তবে এটা করতে গিয়ে তাঁকে আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।

হায়দারাবাদের পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে মুর্শিদকুলি খান বুঝতে পেরেছিলেন যে, এতদঞ্চলের বিশৃঙ্খল ও বৈরী পরিবেশে একটি যুগোপযোগী ও সুষ্ঠু ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে এখানকার দেশাচার ও জন-মানুষের অভিরুচি সম্বন্ধে সম্যক ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ একান্তই জরুরি। সম্রাটের পূর্বানুমতি নিয়ে এ জন্য তিনি প্রায় সমগ্র প্রদেশ পরিভ্রমণ করেন। এর ফলে তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করেন যে, 'সুবার বিশৃঙ্খল আর্থিক অবস্থার প্রতিষেধক হচ্ছে জরীপ পদ্ধতির ভিত্তিতে রাজস্ব ব্যবস্থার পরিপূর্ণ সংস্কার সাধন করা।'[১১৩] তবে দিওয়ান হিশেবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এতদসত্ত্বেও কিছু কিছু কাজ তিনি করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে যখন তাঁর হাতে সুবার প্রকৃত ক্ষমতার সন্নিবেশন ঘটে তখন আর তাঁর পক্ষে সমগ্র সুবা জরিপ করায় কোন বাধা ছিল না। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তাঁর সময় আদৌ কি বাংলার সমুদয় ভূখণ্ড জরিপ করা হয়েছিল—যেমনটা 'তাওয়ারীখ-ই-বঙ্গালাহ'-এর লেখক সলিমুল্লাহ

প্রদেশের প্রশাসন ও সৈন্যবাহিনীর ব্যয় সংকুলানের জন্য অন্যান্য সুবা থেকে অর্থ সরবরাহ করতে হয়েছিল।' (বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১২-১১৩)।

১১২ তখনও বাংলায় ১৩টি বিভিন্ন শ্রেণীর জায়গির যেমন 'জায়গির-ই-সরকার-ই-আলি' বা সরকার-প্রধান বা সুবাদারের জায়গির, 'জায়গির-ই-বান্দা-ই-আলি দরগাহ' বা দিওয়ানের জায়গির, 'আল-তমঘা', 'নওয়ারা' বা নৌ-বহরের জন্য নির্দিষ্টকৃত জায়গির প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল যাদের সমষ্টিগত আয় ছিল প্রায় ৩৩,২৭,৪৭৭ টাকা।

১১৩ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।

বলেছেন? তাঁর ভাষায়, 'প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক খণ্ড জমিতে এবং প্রত্যেক রায়তের জমিতে এইরূপ জমির (শিকদার, আমিন ও কারকুনদের সাহায্যে কৃত কৃষি ও পতিত জমির জরিপ) করা হয় এবং এভাবে সমগ্র বাংলার জরিপ সম্পন্ন করা হয়।'[১১৪] মূলত দু'ভাবে এর জবাব দেয়া যায়। এক. বাংলার কিছু কিছু অঞ্চলের জরিপ স্থানীয় বা অন্যবিধ কারণে করার দরকার হয়নি, যেমন বীরভূমের জমিদার আসাদউল্লাহ খানের এলাকা। আগেই বলেছি তিনি স্বীয় জমিদারির অর্ধেকেরও বেশি নানা জনহিতকর কার্যে সমর্পিত করেছিলেন। স্বভাবতই সেখানে জরিপ করে কোন লাভ ছিল না, তাই বীরভূম ছিল জরিপমুক্ত। আবার বিষ্ণুপুর অঞ্চল যেহেতু দুর্গম ও কম-জন-অধ্যুষিত ছিল, সেহেতু সেখানে বীরভূমের মতো অবস্থা বিরাজ না করা সত্ত্বেও জরিপ কর্ম সম্ভব হয়নি দুরধিগম্যতার কারণে। এ ছাড়া ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত কলকাতা প্রভৃতি এলাকা মুর্শিদকুলির সময়ে জরিপ করা হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।[১১৫] দুই. অন্যভাবে বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে, প্রাক-ইংরেজ যুগে নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়েই তৎকালীন বাংলার যে সকল অঞ্চল এবং ভূমিখণ্ড জরিপ করা হয়েছিল তা পূর্ণাঙ্গভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। তবে আধুনিক যুগের জরিপ কর্মের সঙ্গে এর মৌল পার্থক্য হলো—এখন কৃষি ও পতিত ভূমি ও ভূমি সংলগ্ন সব কিছু যেমন পাহাড়, নদী, টিলা, গাছ, অরণ্য, পাকা অবকাঠামো, জলাশয় প্রভৃতি সরেজমিনে জরিপ করে বিস্তারিত পরিসংখ্যানভিত্তিক খতিয়ান তৈরি করা হয় তখন বাস্তব কারণেই এতো কিছু করা হতো না, এবং তার দরকারও ছিল না। কারণ মধ্যযুগে ভূমি জরিপে রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভূমিরাজস্ব নিরূপণ করা, ফলে চাষাধীন ও অদূর ভবিষ্যতে চাষের আওতায় আসতে পারে এমন ভূমি বা ভূমি খণ্ড জরিপ করাই ছিল জরিপ কর্মীদের কাজ। সলিমুল্লাহ নিজেও স্বীকার করেছেন যে আমিলরা প্রত্যেক পরগণায় শিকদার, আমিন, কারকুন প্রভৃতির সাহায্যে 'কৃষি ও পতিত জমি জরিপ সম্পাদন করেন।'[১১৬] সুতরাং কাজের পরিধি যেহেতু কম ছিল, তখন স্বাভাবিকভাবেই ধরা যায় যে, মুর্শিদকুলির সময়কার ভূমি জরিপ ছিল আপেক্ষিক অর্থেই ব্যাপকভিত্তিক।

যা হোক এভাবে সম্পাদিত জরিপের ফলে যে বিস্তৃত 'হস্ত ও বুদ' তৈরি করা হয়, তাতে বাংলার প্রায় সমুদয় ভূমিকে চাষযোগ্য বা আবাদি, পতিত বা অনাবাদি ও বন্ধ্যা—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। এতে ভূমির অতীত ও বর্তমান অবস্থা, উৎপন্ন ফসলের বিগত কয়েক সনের হিসাব, স্থানিক বর্ণনা ও রায়তের আর্থিক সামর্থ্য প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।[১১৭] এ ছাড়া তিনি জমিদারদের অধীন জমিগুলিতে 'কত ফসল উৎপন্ন হয়, সেই ফসলভিত্তিক খাজনা কি হতে পারে, সেই খাজনা আদায়ের জন্য সরকারের কত অর্থ ব্যয়িত হতে পারে, প্রকৃত আদায় থেকে আদায়ের খরচ ও জমিদারদের মুনাফা দিয়ে কি পরিমাণ রাজস্ব সরকারের তহবিলে জমা পড়তে পারে তা

১১৪ সংগৃহীত, 'বাংলাদেশের ইতিহাস' (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২।
১১৫ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৩।
১১৬ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১-৫২।
১১৭ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৬; বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৪।

স্থির করলেন। এইভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের ভিত্তিতে দেশের রাজস্ব নির্ধারিত হল।'[১১৮] নতুন এই বন্দোবস্তের চূড়ান্ত হিসাব বা তালিকা (Rent Roll) ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শাহ্ শুজার ১৬৫৮ সালের বন্দোবস্তে বাংলার ভূমিরাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রীয় আয় নির্ধারিত হয়েছিল যেখানে ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা, সেখানে ১৭২২ সালের মুর্শিদকুলির বন্দোবস্তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকায়।[১১৯]

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে, মুর্শিদকুলির বন্দোবস্তের বিভিন্ন সন-ওয়ারি যে বিবরণ জেমস গ্রান্ট তাঁর সুবিখ্যাত 'Analysis of the Finances of Bengal (1786)'- গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন, সেটা কী ভূমি থেকে প্রাপ্য সম্ভাব্য সমষ্টিভূত রাষ্ট্রীয় আয়, এক কথায় 'রাজস্ব-মান' (Valuation),—স্বনাম-খ্যাত ঐতিহাসিক Moreland যাকে 'Demand' বলেছেন, নাকি প্রকৃত আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব-আয় তা? তবে সত্যি বলতে প্রামাণ্য তথ্যপঞ্জির অভাব যেখানে খুবই বেশি, সেখানে দুরূহ এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। বলাবাহুল্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এ বিষয়ে প্রচুর মত পার্থক্য রয়েছে। যেমন জেমস গ্রান্ট মনে করেন, এটি ছিল প্রকৃত আদায়কৃত ভূমিরাজস্ব (aggregate)। তাঁর প্রধান যুক্তি মুর্শিদকুলির সময়ে ধার্য ভূমিরাজস্বের অংক সম্পূর্ণ পরিমাণ ফী-বছর সংগ্রহ করা হতো। কারণ তাঁর রাজস্ব আদায়ে যে কড়াকড়ির কথা জানা যায় তাতে তা না-হওয়াটাই অসম্ভব। অন্যদিকে Moreland-এর মতে এটি ছিল প্রাপ্য ভূমিরাজস্বের সমষ্টিভূত আয়ের হিসাব।[১২০] তবে মুর্শিদকুলির সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা যা-ই থাক, এবং নিয়মিতভাবে বার্ষিক ভূমিরাজস্ব আদায়ে তাঁর যতো কড়াকড়ির বদনামই থাকুক না কেন, এটা সত্য যে, দাবিকৃত ভূমিরাজস্বের পুরোটুকু বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করা কোন রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষেই কখনও সম্ভব হয় না। কারণ ভূমিরাজস্ব প্রদাতাশ্রেণী তথা আপামর রায়তের আর্থিক সামর্থ্য, সাংবাৎসরিক প্রকৃতির প্রভাব (যা প্রায় সময়ই ফসলোৎপাদনের জন্য নেতিবাচক হয়) ও স্থানীয় জনরুচি এবং অভিজ্ঞতা—এর জন্যে দায়ী। ফলত কোন-না-কোন কারণে নিরূপিত ভূমিরাজস্ব আদায়কালে প্রতি বছরই কিছু-না-কিছু বকেয়া পড়েই। মুর্শিদকুলির সময়েও এর ব্যতিক্রম ছিল না তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেক্ষেত্রে জেমস গ্রান্টের উপস্থাপিত তালিকা Moreland-এর ব্যাখ্যা ও মতানুযায়ী দাবিকৃত ভূমিরাজস্বের সমষ্টিভূত আয় হওয়াই অধিক সম্ভবপর। মুর্শিদকুলির জীবনী-লেখক ড. আবদুল করিমও বিষয়টি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন। তাঁর বিশ্লেষণটি কিছুটা দীর্ঘ হলেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় এখানে তা তুলে ধরা হলো। ড. করিমের ভাষায়, 'মুর্শিদকুলী খান যে অঙ্কের রাজস্বের জন্য বন্দোবস্ত করেন এবং যে পরিমাণ অর্থ সম্রাটের কাছে পাঠাতেন, তার তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, উভয় অঙ্কের মধ্যে মিল নেই। জেমস গ্রান্ট কোষাগারের যে স্মারক প্রকাশ করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, ফররুখশিয়রের রাজত্বের পঞ্চম বর্ষ থেকে মুহম্মদ শাহের রাজত্বের

১১৮ প্রবন্ধ 'আঠারো শতকে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা : কয়েকটি দিক', ড. রঞ্জিত সেন, সংগৃহীত, 'ইতিহাস অনুসন্ধান/২', পৃষ্ঠা ১২৯।

১১৯ The Fifth Report, Appendix 4, pp. 189-91.

১২০ Moreland-এর বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাঁর, 'The Agrarian System of Moslem India', pp. 209-15.

নবম বর্ষ পর্যন্ত মোট ১৫ বছর ৯ ম্যাস ৫ দিনে মুর্শিদকুলী খান সম্রাটের কাছে ১৪,০৭,৩৮,১৩৬-১-৮ খালিসা রাজস্ব পাঠান। এই স্মারক মতে মুর্শিদকুলী খান গড়পড়তা প্রতি বছর ৯৪ লক্ষ টাকা দিল্লীতে পাঠান। কিন্তু বন্দোবস্তের পরিসংখ্যানে খালিসা রাজস্বের পরিমাণ ১০৯ লক্ষ টাকারও বেশি। অতএব গড়পড়তা প্রতি বছর ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখা যায়। সুতরাং বন্দোবস্তের রাজস্ব-অঙ্কের চেয়ে সংগৃহীত রাজস্ব কম পড়ে। সলিমুল্লাহ এবং গোলাম হোসেন সলিমের মতে, মুর্শিদকুলী খান রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন এবং খেলাপকারীদের অমানুষিক অত্যাচার করতেন। সুতরাং রাজস্বে ঘাটতির জন্য সংগ্রহে শিথিলতাকে দায়ী করা যায় না। গ্রান্ট এই ঘাটতির জন্য মুর্শিদকুলী খানকে দায়ী করেন এবং বলেন যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরূপ বা আত্মসাৎ করেছিলেন। কিন্তু কোষাগারের স্মারকপত্রে আরো দেখা যায় যে, মুর্শিদকুলী খানের পরিত্যক্ত অর্থ-সম্পদ তাঁর মৃত্যুর পরে শুজাউদ্দিন খান দিল্লীতে পাঠান, এই অর্থ-সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬১ লক্ষ টাকা। অথচ মুর্শিদকুলী খান বছরে ১৫ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করলে ১৫ বছরে তাঁর সম্পদের পরিমাণ হতো প্রায় সোয়া দুই কোটি টাকা। তাছাড়া মুর্শিদকুলী খান ১৭০৪ সাল থেকে প্রায় ২৩ বছর বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এই হিসাবে মুর্শিদকুলী খানের বার্ষিক সঞ্চয় আড়াই লক্ষ টাকার বেশি হয় না। সুতরাং মনে হয় না যে, মুর্শিদকুলী খান তহবিল তসরূপ করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের চরিত্র এবং সম্রাটের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্যের কথা বিচার করলেও বলা যায় না, মুর্শিদকুলী খান এইরূপ ঘৃণ্য কাজ করতে পারতেন। যদিও উপরের আলোচনা মুর্শিদকুলী খানের বন্দোবস্ত রাজস্বমান বা রাজস্বদাবি ছিল কিনা সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য বিশেষ সহায়ক নয়, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বন্দোবস্তের রাজস্ব কোন সময়েই সম্পূর্ণ সংগৃহীত হয়নি। তাই বন্দোবস্তকৃত রাজস্ব রাজস্বমান হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'[১২১] আবার অন্য দিক থেকে বিচার করলে এটি যে রাজস্ব-মান ছিল— সে কথাও খুব নিশ্চয়তার সঙ্গে বলা যায় না। কারণ প্রথমত জেমস গ্রান্ট যে ভূমিরাজস্ব-তালিকা দিয়েছেন তাতে অনেকগুলি বছরেরই হিসাব বিদ্যমান। ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান তাঁর ভূমিরাজস্ব-বন্দোবস্তের চূড়ান্ত বিবরণী প্রকাশ করেন। স্মর্তব্য তিনি বাংলায় দিওয়ানি ও সুবাদারি দায়িত্ব পালন শুরু করেন যথাক্রমে ১৭০০ ও ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে, তিনি ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে যখন বন্দোবস্ত হিসাব প্রণয়ন করেছিলেন, তখন ইতোমধ্যে তাঁর পক্ষে বিগত বছরগুলির ভূমিরাজস্বের সন-ওয়ারি দাবি এবং সে অনুযায়ী প্রকৃত আদায় কতো হয়েছিল সেটার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান তাঁর নখদর্পণেই ছিল। ফলে জেমস গ্রান্ট যে তালিকা দিয়েছেন তাতে ভূমিরাজস্বের দাবির প্রেক্ষিতে প্রকৃত আদায়ের হিসাব থাকাও খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। বস্তুত এই সম্ভাবনা আরও সত্য হওয়ার পক্ষে প্রবল যুক্তি হিশেবে আমরা জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত হিসাবের দু'একটি সন-ওয়ারি বিবরণী নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে পারি।

১২১ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬২-৬৩; Murshid Quli Khan and His Times, pp. 84-5.

তাঁর প্রদত্ত তালিকা (পরে বিস্তারিত উদ্ধৃত হয়েছে) থেকে দেখা যায়, মুর্শিদকুলির আগমনের বছর ১৭০০ সালে বাংলার ভূমিরাজস্ব ছিল ১,১৭,২৮,৫৪১ টাকা। তাঁর চেষ্টার ফলে প্রথম বছরেই অর্থাৎ ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে তা ৩,২১,৪৪৮ টাকা বেড়ে দাঁড়ায় ১, ২০,৪৯,৯৮৯ টাকা। ১৭০২ সালে তা আরও বেড়ে হয় ১,২৪,৭৯,২৫১ অর্থাৎ ৪,২৯,২৬২ টাকা বেশি। আমরা জানি যে, যে কোন অর্থনীতিতে রাজস্ব ধার্যের প্রকৃতিই হচ্ছে তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি বা সম্প্রসারণ। এখন Moreland-এর মতানুযায়ী আমরা যদি ধরে নিই যে, এই বছরগুলিতে মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব-মান তথা দাবি বৃদ্ধি করেছিলেন (ধরে নিই তা আদায়ও করেছিলেন) বলে তা শতকরা ৩.২ ও ৩.৬ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। সঙ্গত কারণে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির এই ধারা তথা রাজস্ব-মান অব্যাহত রাখার জন্যে এর পরবর্তী বছরগুলিতেও তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখতে পাই? এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে বলা দরকার যে, ১৭০৩ সালে ভূমিরাজস্ব ৬,১৭,৬৭ বৃদ্ধি পেয়ে (পূর্ববর্তী বছরের শতকরা ০.৫ হারে) হয়েছিল ১,২৫,৪১,০১৮ টাকা এবং অব্যবহিত পরবর্তী বছরে (১৭০৪) ০.৯% হারে ১,১৪,৫৫১ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১,২৫,৫৫,৫৬৯ টাকা। বলাবাহুল্য ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির এই হার পরেও অব্যাহত ছিল, যদিও কখনও কখনও তা কমেও গেছে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়। সেক্ষেত্রে এই রাজস্ব-হ্রাসের কারণ কী? নিশ্চয়ই সেটি যদি রাজস্ব-মান বা দাবি হতো, তা হলে তা গত বছরের তুলনায় খুব বেশি বৃদ্ধি না পাক, কোন অবস্থাতেই হ্রাস পাওয়ার কথা নয়। মুর্শিদকুলির সময়ে এই জাতীয় কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটের কথা বাংলায় শোনা যায়নি। বস্তুত এটি দাবির অনুকূলে প্রকৃত আদায়ের হিসাবও হতে পারে এই জন্য যে, সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে দাবি ঠিকই পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে অধিক করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে বিভিন্ন কারণে আদায় কম হয়েছে, যে কারণে জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত তালিকায় মুর্শিদকুলির সময়কার কোনও কোনও বছরের ভূমিরাজস্বের হিসাব পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় সামান্য বেশি বা কম। অর্থাৎ এই দৃষ্টি কোণ থেকে এটিকে ভূমিরাজস্ব-মান না-ও বলা যেতে পারে।

মুর্শিদকুলি খানের ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তে রায়তের দেয় রাজস্বের প্রকৃত হার কী ছিল সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে বিষয়টি জ্যেষ্ঠ মোগল সম্রাটদের বিশেষ করে সম্রাট আকবর থেকে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত শাসককুলের সময়কার প্রেক্ষাপটে বিচার করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, তাঁর সময়ে ভূমি রাজস্বের হার কোন অবস্থাতেই উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না। কারণ প্রথমত মোগল ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার প্রকৃতি বা চারিত্র্য, যার মোদ্দা কথা আপামর রায়তশ্রেণীকে কষ্টকর অবস্থার মধ্যে ঠেলে দিয়ে নিষ্ঠুর নিষ্পেষণের মাধ্যমে ভূমিরাজস্ব ধার্য ও তা আদায় না-করার নীতি; এবং দ্বিতীয়ত যে সম্রাটকে মুর্শিদকুলি খান তাঁর শাসন কার্যের প্রায় সকল বিষয়ে আদর্শ হিশেবে অনুসরণ করতেন সেই আওরঙ্গজেবের কঠোর নির্দেশ (যদিও কেউ কেউ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার উৎপন্ন শস্যের $\frac{১}{২}$ ছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখিয়েছি যে, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত দ্রব্যের $\frac{১}{৩}$ অংশের অধিক ছিল না); তৃতীয়ত মুর্শিদকুলির ১৭২২ খ্রিস্টাব্দ-পূর্ববর্তী বিভিন্ন বছরে প্রকৃত আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে আমাদের এই মত প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি যখন দিওয়ান

হিশেবে বাংলার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন তখন প্রদেশের বার্ষিক ভূমিরাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,১৭,২৮,৫৪১ টাকা এবং ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে যখন তাঁর সুবিখ্যাত বন্দোবস্ত হিসাব চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয় তখন এর পরিমাণ ছিল ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা। এখানে তাঁর কর্মকালীন মধ্যবর্তী কিছু বছরের ভূমিরাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করা হলো :[১২২]

বছর	ভূমিরাজস্বের পরিমাণ (টাকায়)	বার্ষিক বৃদ্ধি (টাকায়)	হার (শতকরা)
১৭০১	১,২০,৪৯,৯৮৯	৩,২১,৪৪৮	৩˙২
১৭০২	১,২৪,৭৯,২৫১	৪,২৯,২৬২	৩˙৬
১৭০৩	১,২৫,৪১,০১৮	৬১,৭৬৭	০˙৫
১৭০৪	১,২৫,৫৫,৫৬৯	১,১৪,৫৫১	০˙৯
১৭০৫	১,২৬,৬৮,০৬৯	১৩,৫০০	০˙৯
১৭১০	১,২৫,৭৮,৭২৪	বাংলায় পুনঃনিয়োগের বছর	
১৭১১	১,৩৪,০০,১৭৫	৭,২১,৪৫১	৫˙৭
১৭১২	১,৩৪,২৬,৯৩৮	২৬,৭৬৩	০˙২
১৭১৩	১,৩৫,৭০,০৮৭	৪৩,১৪৯	
১৭১৪	১,৩৫,৭১,৫১৭	১,৪৩০	
১৭১৫	১,৩৪,৭৯,৫৪৮	পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাসপ্রাপ্ত	
১৭১৬	১,৩৯,৩৯,৪০১	৪,৫৯,৮৫৩	
১৭১৯	১,৪০,৩০,৩৫৩	বাংলায় পুনঃনিয়োগের বছর	
১৭২০	১,৪০,৯১,৩২৬	৬০,৯৭৩	০˙৪৩
১৭২১	১,৪১,০৯,১৯৪	৭৭,৮৬৮	০˙১৩

উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানে মুর্শিদকুলি খানের রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ বছরসমূহের বাৎসরিক ভূমি রাজস্বের হেরফের প্রদর্শিত। এতে দেখা যায় যে, তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনকালে ১৭০২, ১৭১১ এবং ১৭১৬ খ্রিস্টাব্দে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছিল। উল্লেখ্য ১৭০০ সালে তিনি দিওয়ানের দায়িত্ব লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে সেটি ছিল বছরের একেবারে শেষের দিকে (১৭ নভেম্বর) অর্থাৎ দিওয়ান হিশেবে কাজ গুছিয়ে নেয়ার জন্যে তিনি সে বছরটিকে খুব একটা কাজে লাগাতে পারেননি তা সহজেই অনুমেয়। সত্যি বলতে কাজে লাগিয়েছিলেন পরের বছরটিকে। উক্ত বছরেই রাজস্ব বৃদ্ধি পায় ৩,২১,৪৪৮ টাকা। বলাবাহুল্য প্রদেশের ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় সর্বময় কর্তৃত্বাধিকারী হিশেবে তিনি যে এ সময়ে রাজস্ব বৃদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ও করছিলেন তা অনস্বীকার্য। এই প্রচেষ্টারই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর দিওয়ানির ৭ বছরকালের মধ্যে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে, যখন ভূমিরাজস্বের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৭,২১,৪৫১ টাকা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে স্মর্তব্য যে, ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য

১২২ তথ্য সংগৃহীত 'আঠারো শতকের প্রথমার্ধে সুবে বাংলার জমিদারী ব্যবস্থার পরিবর্তন : একটি সমীক্ষা', ড. রঞ্জিত সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান/১, পৃষ্ঠা ৬৭।

পরিমাণে রাজস্ব বৃদ্ধি এবং পরবর্তী বছরেও এই ধারা অব্যাহত রাখার আশু পুরস্কার স্বরূপ তিনি ১৭০২ সালে সম্রাট কর্তৃক 'মুর্শিদকুলি খান' উপাধি লাভ করেছিলেন। আবার দ্বিতীয়বার বাংলায় এসে (১৭১০) অব্যবহিত পরের বছরই (১৭১১) ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ খুবই উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রেও ভুলে গেলে চলবে না যে, মাত্র কয়েক বছর আগে আওরঙ্গজেব-উত্তর শাসককুলের কোপ দৃষ্টিতে পড়ে মুর্শিদকুলি খান বাংলা থেকে অপসারিত হয়েছিল। স্বভাবতই সেই বাংলায় পুনর্বার নিয়োগ লাভের পর ক্ষমতাসীন শাসককুলের নেক-নজরে থাকার জন্যে এবং তাঁদের কাছে নিজেকে অধিক গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যে রাজস্ব বৃদ্ধি করে তা যথাসময়ে কেন্দ্রে প্রেরণ করাটা ছিল তাঁর অস্তিত্বের জন্যেই অত্যন্ত জরুরি। ফলত তিনি সেটা করেও ছিলেন। তা সত্ত্বেও সত্য এই যে, মুর্শিদকুলি যতোটা যেভাবেই রাজস্ব বৃদ্ধি ও তার আদায়ের চেষ্টা করুন না কেন, প্রদর্শিত পরিসংখ্যান থেকে আমরা দেখতে পাই, একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে এই রাজস্ব আর কোনভাবেই বাড়ানো সম্ভব হয়নি। উপরন্তু কখনও কখনও তা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় হ্রাসও পেয়েছে। ফলে উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটিকে আপাত সঠিক ধরে যদি আমরা পূর্ববর্তী দু'টি ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের সঙ্গে এর তুলনা করি, তা হলে আমরা যেটা লক্ষ্য করবো তা হলো :[১২৩]

১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবরের সময়ে টোডরমলকৃত বন্দোবস্ত

খালসা ভূমির রাজস্ব	৬৩,৪৪,২৬০	টাকা
জায়গির ভূমির রাজস্ব	৪৩,৪৮,৮৯২	"
সর্বমোট	১,০৬,৯৩,১৫২	টাকা

১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা শুজার বন্দোবস্ত

আসল খালসা (টোডরমলের) ভূমির রাজস্ব	৬৩,৪৪,২৬০	টাকা
ইজাফা বা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি	৯,৮৭,১৬২	"
বিজিত ও নবসংযোজিত ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব	১৪,৩৫,৫৯৩	"
জায়গির ভূমির আসল জমা	৪৩,৪৮,৮৯২	"
সর্বমোট	১,৩১,১৫,৯০৭	টাকা

১৭২২ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খানের বন্দোবস্ত

শাহ শুজার সময়ের খালসা ভূমির রাজস্ব	৮৭,৬৭,০১৫	টাকা
বৃদ্ধি	১১,৭২,২৭৯	"
জায়গির থেকে খালসায় রূপান্তর ভূমির জমা	১০,২১,৪১৫	"
তদাবধি স্থিত জায়গির ভূমির জমা	৩৩,২৭,৪৭৭	"
সর্বমোট	১,৪২,৮৮,১৮৬	টাকা

১২৩ তথ্য সংগ্রহ 'Indian Land System : Ancient, Mediaeval and Modern, Dr. R.K. Mookerji, in 'Report 1940', Vol, II., pp. 208-9.

উপরোদ্ধৃত চিত্র বিশ্লেষণে করলে আমরা দেখতে পাবো যে, বাংলার ১ম বন্দোবস্তে ভূমিরাজস্বের সমষ্টিভূত পরিমাণ পরবর্তী ৭৬ বছরে (১৬৫৮-১৫৮২) ২য় বন্দোবস্ত প্রণয়নকালে শতকরা ১৫ $\frac{১}{২}$ ভাগ এবং ২য় বন্দোবস্তের পরবর্তী ৬৪ বছরে (১৭২২-১৬৫৮) ৩য় বন্দোবস্ত প্রণয়ন কালে শতকরা ১৩ $\frac{১}{২}$ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, সম্রাট আকবরের সময়কার তথা মূল (আসল) খালসা'র ভূমিরাজস্ব পরবর্তী ৭৬ বছরে যেখানে ৯,৮৭,১৬২ টাকা বেড়েছিল, সেখানে শাহ্ শুজার খালসা'র ভূমিরাজস্ব পরবর্তী ৬৪ বছরে মাত্র ২,২৪,১১৭ টাকা বেড়েছিল। অন্য দিকে যদি এ কথা স্মরণে রাখা যায় যে, আকবরের সময়ের চেয়ে শাহ্ শুজার সময়ে বাংলার ভূখণ্ডগত আয়তন ও চাষাবাদের ভূমির পরিমাণ বেড়েছিল, এবং মুর্শিদকুলির সময়ে ১ম বন্দোবস্ত থেকে ৩য় বন্দোবস্তের অন্তর্বর্তী প্রায় ১৫০ বছরে বাংলার আয়তনিক বিশালতার পাশাপাশি চাষের জমি তথা ফসল উৎপাদনের মাত্রা ও পরিমাণ দুই-ই উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল, সেক্ষেত্রে আসল অর্থাৎ টোডরমলের ভূমিরাজস্বের তুলনায় মুর্শিদকুলির সময়ে রাজস্বের পরিমাণ খুব বেড়েছিল, এ কথা বলা যায় না। বরং তা কমেছিল। সুতরাং সম্রাট আকবরের সময়ে ভূমিরাজস্বের হার যদি উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ থাকতে পারে (অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই এটা স্বীকার করেছেন), তাহলে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে এই হার বৃদ্ধির সঙ্গত কোন কারণ থাকতে পারে না। উল্লেখ্য মুর্শিদকুলির সময়ে ভূমিরাজস্বের হার যে উৎপন্নের এক-তৃতীয়াংশ বা ক্ষেত্রত তারও কম ছিল সেটা অন্যভাবেও প্রমাণ যায়।

ড. করিম, ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিলের সভাপতি লর্ড ক্লাইভের একটি মন্তব্য ও ১৭১৩ সালের চট্টগ্রামের ফৌজদার মির হাদির বাৎসরিক ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান[১২৪] প্রভৃতির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে ভূমিরাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশের অধিক ছিল না।[১২৫]

তবে মুর্শিদকুলির সময়ে ভূমিরাজস্বের হার যাই থাক না কেন, এটা ঠিক যে, তিনি ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোরতা, নিয়ম নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'তাওয়ারীখ-ই-বঙ্গলাহ'-এর লেখক বলেন, 'মুর্শিদকুলী খান নিজে দৈনিক আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে বালাম বই-এ প্রত্যেক দিন সই করতেন। তিনি প্রত্যেক মাসে নির্ধারিত হারে রাজস্ব আদায় করতেন। সরকারি রাজস্বে ঘাটতি দেখা দিলে খেলাপি জমিদার, আমিল, কানুনগো এবং মুৎসুদ্দীদের দীউয়ানি দফতরে আটক থাকতে হতো।

১২৪ চট্টগ্রামের ফৌজদার মির হাদি ১৭১৩ সালে তাঁর ফৌজদারির ভূমিরাজস্ব বাবদ আদায় করেন ১,৭৫,৪৫৮ টাকা যা সমকালীন চট্টগ্রামের মোট আবাদি জমি (প্রায় ৪ লক্ষ কানি)-এর সঙ্গে বিভাজন করলে বিঘা বা কানি প্রতি ৮ থেকে ১২ আনা-র মতো পড়ে। মুর্শিদকুলির সময়ে চালের যে বাজার মূল্য ছিল (টাকায় ৪ থেকে প্রায় ৫ মণ) তার ভিত্তিতে যাচাই করলে ভূমিরাজস্বের হার এক-তৃতীয়াংশের বেশি হওয়ার কথা নয়।

১২৫ বস্তারিত জানার জন্য দেখুন, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫। Murshid Quli Khan and His Times, pp. 86-88.

খেলাপিদের খাদ্য দেয়া হতো না, পানি পান করতে দেয়া হতো না এবং এমন কি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেও দেয়া হতো না। তাদের এভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বন্দী করে রাখা হতো এবং কোন কোন সময় তাদের মাথা নিচের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হতো, বেত্রাঘাত করা হতো। এইরূপ শাস্তি প্রদানের পরেও যারা সরকারি পাওনা পরিশোধ করতো না, তাদের স্ত্রীপুত্রসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হতো।'[১২৬] সলিমুল্লাহর অনুসরণে কোনও কোনও আধুনিক ঐতিহাসিকও বিশেষ করে হিন্দু ইতিহাসকারগণ ভূমিরাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলির কঠোরতার কথা উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁদের অনেকের উক্তিই স্ববিরোধিতায় পূর্ণ। যেমন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মুর্শিদকুলি খাঁ প্রাপ্য রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতেন না, এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে আদায়ের জন্য যে-কোন ঘৃণ্য ও নির্মম পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায়ের প্রতি তাঁহার কোন লালসা ছিল না। রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের ফলে তাঁহার সুবাদারি কালে কিছু দিন বাংলার ভাগ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল।.... অন্যান্য সুবাদারদের তুলনায় (শায়েস্তা খাঁ, খান জাহান, আজিম-উশ্-শান প্রভৃতি) মুর্শিদকুলি লোভী ছিলেন না। তাঁহার সময়ে বাড়তি 'আবওয়াব' ধরা বন্ধ হইয়া যায়—তিনি নিজেও খুব সংযত জীবন যাপন করিতেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে সুবাদার সাহেব অত্যন্ত নির্মম ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ রাজস্ব দিতে অপারগ হইলে বা বিলম্ব করিলে তিনি তাহাদিগকে অমানুষিক শাস্তি দিতেন, অনেককেই বলপূর্বক মুসলমান করিতেন। কিন্তু চরিত্র-দুষ্টি ও অন্যান্য ঘৃণ্য আচরণ হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। যাহা হউক তাঁহার সুবাদারি কালে বাংলার শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।'[১২৭] অন্যত্র ড. বন্দ্যোপাধ্যায় সলিমুল্লাহর অনুসরণে আরও স্বীকার করেন যে, 'তিনি (মুর্শিদকুলি খাঁ) ইসলামি আদর্শ ও আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন, স্বহস্তে কোরান নকল করিতেন, দুই হাজার কোরান পাঠককে ভরণপোষণ দিতেন। অশনেবসনে তিনি প্রায় ঔরংজেবের মতো মিত্যব্যয় ও সদাচারী ছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক লাগিলে তিনি যথাসাধ্য দান-খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।.... শাসন ও বিচার বিভাগে তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মোল্লা বা কাজীর বিচারের মতো অবিচার ঘটিত না। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন, এক-স্ত্রী লইয়া সুখে বাস করিয়া গিয়াছেন। হারেমে খোজা প্রহরী ও আওরত সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতেন, যাহাতে শুদ্ধান্তঃপুরে অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে। তাঁহার চরিত্রে এইরূপ নানা সদ্গুণ ছিল।'[১২৮] এ বিষয়গুলি এখানে একটু বিস্তৃত করে আলোচনার উদ্দেশ্য এই যে, অধিকাংশ হিন্দু লেখকশ্রেণী ও ঐতিহাসিকগণ মুসলিম আদর্শ চরিত্রগুলির যে কোন উৎস থেকে সামান্য খুঁত বা অসঙ্গতি পেলেই তা যাচাই-বাছাই ছাড়াই অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেন। অথচ একবারও চিন্তা করেন না যে প্রাপ্ত সূত্রটি প্রকৃতই সঠিক ও বিশ্বাসযোগ্য কি-না? উদাহরণ হিশেবে ড.

১২৬ সংগৃহীত 'বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড', পৃষ্ঠা ১৫২
১২৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৫-৬।
১২৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫-৬।

বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত বক্তব্যের সূত্র তথা সলিমুল্লাহর উদ্ধৃত বর্ণনার কথা বলা যায়। উল্লেখ্য যে, সলিমুল্লা মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক খেলাপি ভূমিরাজস্বের জন্য হিন্দু জমিদার প্রভৃতিকে জোরপূর্বক মুসলমান করণের কোন প্রমাণ বা সূত্র উল্লেখ করেননি। সম্ভবত তিনি এটা শুনে থাকবেন এবং শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে ভূমিরাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলির কঠোরতার চিত্র তুলে ধরার জন্যে এই বক্তব্য প্রদান করেন। অথচ তাঁর এই বক্তব্যকে যথার্থ ধরে নিয়ে ড. বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপরাপর হিন্দু ঐতিহাসিকগণ যখন কোন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন তখন তার সঠিকতা ও প্রাসঙ্গিকতার বিষয়টি একবারও ভাবেন না। ড. বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি থেকেই বলা যায় যে, যে লোক (এখানে মুর্শিদকুলি খান) ভূমিরাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্যের অতিরিক্ত গ্রহণের প্রতি 'কোনরূপ' 'লালসা'গ্রস্ত নন, বাড়তি 'আবওয়াব' ধরা যাঁর সময়ে বন্ধ হয়ে যায়[১২৯], নিজেও খুব 'সংযত জীবনযাপন' করতেন, 'চরিত্র-দুষ্টি ও অন্যান্য ঘৃণ্য আচরণ হইতে দূরে থাকিতেন', 'অশনেবসনে' প্রায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের মতো 'মিতব্যয়ী ও সদাচারী' ছিলেন এবং দেশে দুর্ভিক্ষ-মড়ক দেখা দিলে 'যথাসাধ্য দান-খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না', এবং শাসন ও বিচার বিভাগে যার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মোল্লা বা কাজির বিচারের মতো অবিচার ঘটতো না, এবং সর্বোপরি যাঁর সুবাদারিকালে বাংলার শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থর কিছুটা (?) উন্নতি হয়েছিল; সেই তিনি 'ইসলামি আদর্শ ও আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন' করেও হিন্দু জমিদারগণ রাজস্ব দিতে অপারগ হলে বা বিলম্ব করলে তাদেরকে অমানুষিক শাস্তি দিতেন— এটা বিশ্বাস করা গেলেও শুধুমাত্র ভূমিরাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাদেরকে সপরিবারে বলপূর্বক মুসলমান করতেন, এই কাজ পূর্বোক্ত সদ্‌গুণাধিকারী একজন ব্যক্তির পক্ষে কতোটুকু সম্ভবপর, তা আদৌ প্রশ্ননিরপেক্ষ নয়। বস্তুত মুসলিম ঐতিহাসিক বললেই যে তা বাছবিচারহীনভাবে মেনে নিতে হবে এটা কোন নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের কাজ হতে পারে না। কেননা আমরা দেখেছি, সুলতান মুহম্মদ বিন তুগলক সম্পর্কে ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানি ও সম্রাট আকবর সম্পর্কে ঐতিহাসিক বদাউনি এমন অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছেন যা পরবর্তীকালে নিরপেক্ষ বিচারে আধুনিক ঐতিহাসিকদের কাছে ভ্রান্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রসঙ্গত মুর্শিদকুলি খানের দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানি সম্বন্ধে কিছুটা আভাস দেয়া যায়। তাঁর দাক্ষিণাত্যের দিওয়ানির উল্লেখযোগ্য কীর্তি সম্বন্ধে ড. কোকা আন্তোনভা বলেন, 'শাহ্ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব নিযুক্ত হলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। এই যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষধ্বস্ত দেশে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারটি নিয়মিত করার উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেবের 'দেওয়ান' (ভূমি-রাজস্ব বিভাগের প্রধান) মুর্শিদকুলি খাঁ খাজনা ধার্য করার এক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এই পদ্ধতিটি 'মুর্শিদকুলি খানী ধারা' নামে পরিচিত। এই নতুন পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য ছিল 'রায়ত'দের পরিত্যক্ত জমিগুলিতে এসে বসবাস করা ও চাষ-আবাদ করার জন্যে 'তকাবি' বা আগাম টাকা দাদন দিয়ে তাঁদের আকৃষ্ট করা। সেচের ব্যবস্থাযুক্ত জমির ওপর নিচুহারে খাজনা ধার্য হল, দেয় রাজস্বের পরিমাণ হিসাব করার প্রথা প্রবর্তিত হল

---

১২৯ জমিদারদের ওপর মুর্শিদকুলি খান কর্তৃক ধার্য একমাত্র ভূমিরাজস্ব-বহির্ভূত কর বা সেস ছিল 'আবওয়াব-ই-খাসনবিশি'।

রাজকর্মচারি ও 'রায়ত'রে মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে, অর্থাৎ রাজস্ব দেয়ার ব্যাপারে কৃষকদের সামর্থ্যও ধরা হল হিসাবের মধ্যে। যদিও পরে দাক্ষিণাত্যের সামন্ত-ভূস্বামীরা প্রধান ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রায় চৌদ্দটির মতো অতিরিক্ত ধরনের কর কৃষকদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তবু 'মুর্শিদকুলি খানী ধারা' চালু করার ফলে দাক্ষিণাত্যে চাষ-আবাদের ক্রমিক পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।'[১৩০] এখানে বলার কথা এটাই যে, দাক্ষিণাত্যে যিনি অপেক্ষাকৃত নমনীয় ভূমিরাজস্ব নীতি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে চাষাবাদের ক্রমিক পুনরুদ্ধার তথা রায়তের মঙ্গল সাধন করেছিলেন, তিনিই বাংলায় এসে কোন প্রকার উচ্চাভিলাষ ছাড়া এবং পূর্বের সুনামের কথা ভুলে গিয়ে শুধু মাত্র ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে জমিদার প্রভৃতির ওপর নৃশংস অত্যাচারের চূড়ান্ত হিশেবে ধমান্তরকরণ শুরু করে দেবেন এবং ভুলে যাবেন যে, তাঁর এই অত্যাচার-নিপীড়নের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া পড়বে সাধারণ রায়তশ্রেণীর ওপর, এটাই বা কতোখানি বিশ্বাসযোগ্য? অবশ্য এটা স্বীকার করতে দোষ নেই যে, 'In regard to the collection of revenue Murshid Quly Khan was exceptionally severe and exacting.'[১৩১] ঐতিহাসিক গোলাম হোসায়ন সলীমও এ কথা স্বীকার করেন। তিনি বলেন, 'কিস্তি-খেলাফী জমিদারদের কারারুদ্ধ ক'রে এবং অভিজ্ঞ ও সৎ রাজস্ব-আদায়কারীদের মহালে পাঠিয়ে তিনি খাজনা ক্রোক করেন ও বাদশাহী রাজস্ব আদায় করেন।'[১৩২]

মুর্শিদকুলির সময়ে রায়তগণ সরাসরি আমিল প্রভৃতি সরকারি কর্মচারীদের দপ্তরে ও জমিদারদের কাছারিতে ভূমিতে উৎপাদিত ফসলে ও নগদ অর্থে দেয় খাজনা পরিশোধ করতে পারতো। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাৎসরিক ভূমিরাজস্ব প্রাপ্তি নিশ্চিত ও নিয়মিত করণে তিনি যে বহুল আলোচিত পন্থা বেছে নিয়েছিলেন নবাবি বাংলার ইতিহাসে তা 'মাল-জামিনি ব্যবস্থা' হিশেবে চিহ্নিত। এই পদক্ষেপটি গ্রহণে তাঁকে প্রভূত ঝুঁকি নিতেও সাহসিকতার পরিচয় দিতে হয়েছিল। এ পর্যায়ে 'মাল-জামিনি ব্যবস্থা' সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

মুর্শিদকুলি খানের আগমনের অনেক আগে থেকেই তথা সুলতানি আমল থেকেই বাংলায় খালসা ভূমির রাজস্ব সাধারণত জমিদারদের দ্বারা আদায় করা হতো। এ জন্যে তারা আদায়কৃত রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশ কমিশন বা পারিশ্রমিক হিশেবে লাভ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের পক্ষে জমিদাররাই রায়ত সাধারণের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে স্থানীয় সরকারি কোষাখানায় আমিল প্রভৃতির দপ্তরে জমা করতেন। কোনও কোনও সময় তারা সরাসরি প্রাদেশিক দিওয়ানের দপ্তরেও রাজস্ব জমা করতে পারতেন। বস্তুত ভূমিরাজস্ব আদায়ের এই পুরোনো ধারা প্রাক-মুর্শিদকুলি যুগ পর্যন্ত (তাঁর শাসনের কিছুকাল অবধিও) অব্যাহত থাকলেও নিয়মিত ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রমে বংশানুক্রমিক জমিদারদের মধ্যে ততোদিনে প্রভূত শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল, বিশেষ করে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার ফলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাজকর্মে

১৩০ ভারতবর্ষের ইতিহাস, ড. কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৪৪-৪৫।
১৩১ History and Culture of Bengal, Dr. Atul Krishna Sur, pp. 129.
১৩২ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ১৯৭।

তাঁর যে অনিচ্ছাকৃত মনোনিবেশের অভাব সৃষ্টি হয়েছিল, যার প্রভাব পড়েছিল প্রশাসনের সর্বত্র; সেই কারণে এবং বাংলায় অযোগ্য ইব্রাহিম খান ও দুর্নীতি-পরায়ণ আজিম-উশ-শানের সুবাদারিকালে স্থানীয় জমিদারদের মধ্যে এই অবহেলা ও নৈরাজ্য প্রকটরূপ ধারণ করেছিল। এরা রায়তদের কাছ থেকে যেন-তেন প্রকারে ভূমিরাজস্ব নিয়মিত আদায় করলেও সরকারি কোষাখানায় তা সহজে জমা দিতেন না। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'জমিদারদের মধ্যেও অনেকেই অলস, অকর্মণ্য ও বিলাসী হওয়ায় নিয়মিত রাজস্ব দিতেন না।'[১৩৩] প্রায়শই 'মার' পড়তো তাদের দেয়, অন্য কথায় জমিদাররা এগুলি নিজেরাই আত্মসাৎ করতো। ফলে অভিজ্ঞ দিওয়ান মুর্শিদকুলি জমিদারদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার প্রত্যাহার করে নিতে মনস্থ করেন। জায়গির তো তিনি আগেই অনেকাংশে বাতিল করেছিলেন। এবার এই উভয় শ্রেণীর ভূমির রাজস্ব একটি প্রধান ও একক খাত 'খালসা'য় পর্যবসিত করে সেগুলি নতুনভাবে বিলি-বণ্টনের ব্যবস্থা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিপুল পরিমাণ অধিগৃহীত ভূমি তিনি ছোট-বড় বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে এক-একটা অঞ্চল চুক্তির মাধ্যমে 'ইজারা' দেন। এই ব্যবস্থার মূল কথা হলো ইজারা বা ঠিকা গ্রহীতাগণ (Contractors) প্রতিবছরই নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিরাজস্ব (সরকারি পরিভাষায় 'মাল') আদায় করার অধিকার লাভের জন্য রাষ্ট্রের বরাবরে লিখিত 'কড়ারি খত্' বা অঙ্গীকার-পত্র (সরকারি পরিভাষায় 'জামিন') সম্পাদন করতো, যাতে যে অঙ্কের ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার তাদেরকে দেয়া হতো অনুরূপ হিসাবের উল্লেখ থাকতো। অন্যদিকে রাষ্ট্রও এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ঠিকা-গ্রহীতাকে একটি নির্দিষ্ট এলাকার (পুরো একটি জমিদারি বা তার অংশবিশেষ) রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করতো। ফলত এই কারণে একে 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থা বলা হতো। প্রসঙ্গত শেরশাহের আমলের '·াট্টা-কবুলিয়ত' ব্যবস্থার কথা এখানে বলা যায়। বস্তুত পাট্টা-কবুলয়িত প্রথায় ভূমিরাজস্ব বিষয়ক চুক্তি যেখানে রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে সরাসরি কোন তৃতীয় মাধ্যম ছাড়াই সম্পাদিত হতো অর্থাৎ এক কথায় তা ছিল 'রায়তওয়ারি'; সেক্ষেত্রে 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থায় ভূমিরাজস্ব প্রদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে অন্তর্বর্তী যোগসূত্র হিশেবে স্থিত ব্যবস্থায় যেখানে জমিদারেরা কাজ করতেন, নতুন ব্যবস্থায় এই দায়িত্বটি পায় ঠিকা-গ্রহীতা বা 'মাল-জামিনদার'। অন্যভাবে বলা যায় রাষ্ট্র-জমিদার-রায়ত—এই ত্রি-স্তরবিশিষ্ট কর-পদ্ধতি শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র-ঠিকাদার-রায়ত—এই ত্রি-স্তরে পর্যবসিত হয়। ফলে এই দিক থেকে বিবেচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থা ছিল জমিদারওয়ারি ব্যবস্থার অনুরূপ। অবশ্য এ কথা বলার অর্থ এটা নয় যে মুর্শিদকুলি খানের সমগ্র ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাই ছিল জমিদারওয়ারি। বরং তখন পর্যন্ত রায়তওয়ারি ব্যবস্থা আদৌ বিলুপ্ত না হওয়ায়, অনেক অঞ্চলে আমিল, আমিন প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারী সরাসরি রায়তদের কাছ থেকে খাজনা গ্রহণ অব্যাহত রাখায়, মুর্শিদকুলির রাজস্ব ব্যবস্থাকে প্রকৃতার্থে একটি মিশ্র ব্যবস্থা বলাই অধিক শ্রেয়।[১৩৪] যদিও

১৩৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০।

১৩৪ ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'মুর্শিদকুলির ভূমি-রাজস্ব বন্দোবস্ত সেদিক থেকে রায়ত, আমিল ও জমিদারদের নিয়ে গঠিত একটি মিশ্র ব্যবস্থা বলা যেতে পারে।' দেখুন, বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৭; তবে ড. করিম এই

এর প্রধান অংশ ছিল ঠিকাদার-জমিদার প্রভৃতির কব্জায়। এরা রায়তদের কাছ থেকে নির্ধারিত সময়ে ভূমিরাজস্ব আদায় বাবদ কমিশন হিশেবে উশুলকৃত দ্রব্য বা অর্থের একটা সামান্য অংশ লাভ করতেন।[১৩৫] এ ছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমিদাররা কিছু 'নানকর' ভূমিও লাভ করতেন বলে মনে হয়।[১৩৬]

এখানে একটা প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে মুর্শিদুকলির সময়ে এই সকল ঠিকাদার বা ইজারাদারগণ সরকারি কর্মচারী ছিল, না কি মধ্যস্বতভোগী সরকারি-সহযোগী ছিল? এ সম্পর্কে ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'অকর্মণ্য জমিদারদের হাত থেকে খাজনা আদায়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল;... খাজনা আদায়ের ভার দেওয়া হল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ইজারাদারদের।...তাদের নগদ বেতন দেওয়া হত, অথবা তাদের সংগৃহীত রাজস্বের উপর কমিশন দেওয়া হত, অথবা সাময়িকভাবে জায়গীর দেওয়া হত, এ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।..... মোটামুটি বলা যায়, ইজারাদারেরা ছিল সরকারী কর্মচারী, সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিয়ে প্রজাদের কাছ থেকে নিজেদের ইচ্ছামত খাজনা আদায় করার অধিকার তাদের ছিল না।'[১৩৭] কিন্তু আমাদের মনে হয় ড. বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ বক্তব্য সম্পূর্ণ সঠিক নয়। কেননা বছরের সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অবধারিতভাবে খাজনা জমা দানের লিখিত 'কড়ারি খত্' যে ব্যক্তি পূর্বেই সম্পাদন করেন, তিনি রায়তদের নিরূপিত হারে যথাসময়ে খাজনা আদায় করতে গিয়ে কিছু পরিমাণে হলেও (মুর্শিদকুলির কঠোর শ্যেন দৃষ্টির কারণে এর মাত্রা ছিল খুবই কম ও সীমিত) প্রজাদের সঙ্গে স্বেচ্ছাচার করবেন না, এই ধারণা না-করা অসঙ্গত বলেই মনে হয়। বস্তুত ইজারাদারদের নিজেদেরও প্রবল ভয় ছিল বছর শেষে যে কোন মুহূর্তে পদচ্যুত হবার এবং সেই সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে যারপরনাই লাঞ্ছিত হবার। এলাকাভিত্তিক ভূমিরাজস্ব আদায়ের গাফলতির জন্য আমিল প্রভৃতি সরকারি কর্মচারীদের একটি মুখ্য শাস্তি ছিল বদলি বা অন্যত্র স্থানান্তর; কিন্তু ইজারাদারদের ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করার সুযোগই ছিল না। সুতরাং এই একটি দিক বিচার করেও বলা যায়, ইজারাদাররা সরকারি কর্মচারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

যা হোক, মুর্শিদকুলির 'মাল-জামিনি' প্রথার প্রবর্তন খুব সহজে ও স্বার্থান্বেষী মহলের প্রতিক্রিয়াহীনভাবে সম্পন্ন হয়নি। স্যার যদুনাথ বলেন, 'The radical change in the revenue system of Bengal was not effected without opposition.'[১৩৮] নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে যে সকল জমিদার ও সরকারি কর্মচারী, বিশেষ করে আমিলেরা বিভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ

বন্দোবস্তকে জেমস গ্রান্টের অনুসরণে 'জমিদারওয়ারি' ছিল বলে মনে করেন। বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯।

১৩৫ ড. রঞ্জিত সেন বলেন, 'প্রত্যেক জমিদার কৃষকদের কাছ থেকে আদায়কৃত রাজস্বের এক দশমাংশ নিজের পারিশ্রমিক হিসাবে রেখে অবশিষ্ট নয়ের দশমাংশ রাষ্ট্রের তহবিলে প্রেরণ করত।' (ইতিহাস অনুসন্ধান/৪, পৃষ্ঠা ১৬৭)। তবে এই বিভাজন স্থান ভেদে বিভিন্ন হতো বলে মনে হয়।

১৩৬ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ১৯৭।

১৩৭ মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৩৩।

১৩৮ The History of Bengal, Vol. II., pp. 411.

দায়ের করে। তাদের অভিযোগের মূল প্রতিপাদ্য ছিল, 'মুর্শিদকুলীর নিযুক্ত ইজারাদাররা প্রজাদের উপর দৌরাত্ম্য করিয়া টাকা আদায় করিতেছে এবং কৃষির অবস্থার অবনতি হইতেছে।' কিন্তু সম্রাট আগে থেকেই মুর্শিদকুলি সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল এবং যারপরনাই সন্তুষ্ট; দাক্ষিণাত্যে থাকতেই তাঁর রাজস্ববিষয়ক কাজেকর্মে যে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার ছাপ ফুটে উঠেছিল এবং রায়তদের অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল, সে কথা সম্রাটের অগোচর ছিল না।[১৩৯] স্বভাবতই তিনি (সম্রাট) জমিদার-আমিলদের অভিযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি না দিয়ে মুর্শিদকুলিকে শুধু এই মর্মে পত্র দেন, 'আপনাকে তিনটি প্রদেশের পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন দীউয়ান নিয়োগ করা হইয়াছে এবং শাহজাদা (আজিমুদ্দীন)-র সম্পত্তির দীউয়ান রূপেও আপনাকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। আপনি সুবাদারের পরামর্শ নিয়া ও তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজস্বের সুব্যবস্থার জন্য যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহা করিবেন।... আমি জানিয়াছি যে, আপনি ওড়িশা শাসনের ব্যাপারে আপনার পূর্ববর্তীদের অপেক্ষা বেশি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন এবং জমিদারদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই জন্য আপনি প্রশংসা পাইবার যোগ্য।'[১৪০] উল্লেখ্য, সম্রাটের এই পত্র ও জবাব যে মুর্শিদকুলির বিরোধীদের সমালোচনা ও প্রতিরোধকে গোড়াতেই রুখে দিয়েছিল এবং তাঁর গৃহীত কর্মসূচি আরও ব্যাপক পরিসরে ও নবোদ্যমে বাস্তবায়নের প্রেরণা যুগিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য।

অবশ্য মুর্শিদকুলি খান ব্যাপকভাবে 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থার প্রচলন করলেও স্থিত জমিদারি প্রথার একেবারে উচ্ছেদ সাধন করেননি। জায়গির ব্যবস্থার ন্যায় জমিদারি প্রথাও যেহেতু মোগল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল, সেহেতু এর সম্পূর্ণ মূলোৎপাটন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, জরুরিও ছিল না। এ কথা সত্য যে, তাঁর প্রবর্তিত 'মাল জামিনী ব্যবস্থার ফলে অনেক পুরাতন জমিদার, বিশেষত মুসলমান পরিবার জমিদারী হারান এবং যে সমস্ত জমিদারী অবশিষ্ট থাকে সেগুলিও ইজারাদারদের প্রতিপত্তি ও নিজেদের আর্থিক অধঃপতনের দরুন কিছুকালের মধ্যে অস্তিত্বহীন হইয়া পড়ে।'[১৪১] তবে এ থেকে ধারণা করা ঠিক হবে না যে, মুর্শিদকুলির হাতে জমিদারির যবনিকা ঘটেছিল বা তিনি ব্যক্তিগতভাবে জমিদারির বিরুদ্ধে ছিলেন। বরং পূর্বোক্ত অবস্থা ছিল তাঁর

১৩৯ দাক্ষিণাত্যে, বিশেষ করে বালাঘাটের (খান্দেশ ও বেরার-এর অংশবিশেষ ব্যতীত) দিওয়ান থাকাকালীন মুর্শিদকুলি খান তাঁর ভূমিরাজস্ববিষয়ক বিস্তৃত জ্ঞান ও পরিকল্পনার বিকাশ বাংলায় আসার আগেই দেখিয়েছিলেন। সেখানে তার গৃহীত প্রথা-পদ্ধতির বিভিন্ন আলোচনা শেষে ড. ঈশ্বরী প্রসাদ সমাপ্তি টেনেছেন এভাবে : 'This carefully organised system worked well and resulted in the improvement of agriculture. The peasantry lived a happy and contented life and were no longer at the mercy of the revenue department. Much high-handedness and oppression came to an end, and the Deccan provinces attained a high level of prosperity.' (A Short History of Muslim Rule in India, pp. 411).

১৪০ সংগৃহীত 'বাংলাদেশের ইতিহাস', ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ২৯৫।

১৪১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৯৫। ড. মজুমদারও বলেন, 'এই নূতন ব্যবস্থার (ইজারাদারি ব্যবস্থা) ফলে প্রাচীন জমিদারেরা প্রায় লুপ্ত হইল এবং নূতন ইজারাদারেরা তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া দুই তিন পুরুষের মধ্যেই রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধি পাইলেন।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২০)।

অনুসৃত ব্যবস্থার প্রতিফলবা একটা দিক। বাস্তবে মুর্শিদকুলি খান ছোট-বড় অনেক জমিদারির অবসান তো ঘটানইনি, এমন কি নিজেও কিছু সংখ্যক বড় জমিদারি সৃষ্টি করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৪২] উদাহরণস্বরূপ মুর্শিদকুলির নায়েব কানুনগো ও বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা রঘুনন্দনের ভ্রাতা রামজীবন-এর নামে সৃষ্ট রাজশাহি জমিদারির কথা বলা যায়। এর অন্তর্গত পরগণার সংখ্যা ছিল ১৩৯ এবং বাৎসরিক জমা'র পরিমাণ (জায়গির ব্যতীত) ১৬,৯৬,০৮৭ টাকা।[১৪৩] তৎকালীন বাংলার সর্ববৃহৎ জমিদারি বর্ধমান-এর পরেই ছিল রাজশাহি জমিদারির অবস্থান। ড. এ. বি. এম. মাহমুদ এ সম্পর্কে বলেন, 'This Zamindari of Rajshahi thus became the best example of Murshid Quli Khan's policy of creating big zamindars. It was through Raghunandan that the Rajshahi Zamindari was assembled, but its successful consolidation was largely due to the shrewdness and energy of his elder brother Ramjivan. He established a strong central authority and maintained peace and order in the vast estate.'[১৪৪] এ ছাড়া এ সময়ে আরও কিছু জমিদারি—যেমন দীঘাপাতিয়ার জমিদারি (রঘুনন্দনের অনুগত কর্মচারী দয়ারাম কর্তৃক গঠিত), মোমেনশাহির জমিদারি (কানুনগো শ্রীকৃষ্ণ হালদারকর্তৃক গঠিত), আলপশাহি (মুক্তাগাছা)-র জমিদারি (জনৈক শ্রীকৃষ্ণ আচার্য কর্তৃক গঠিত) প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল। সুতরাং এ কথা কোনও অবস্থাতেই বলা যায় না যে, মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে বাংলার প্রাচীন ও বড় বড় জমিদারশ্রেণীর বিনাশ ঘটেছিল। বরং উল্টোটাই সত্য—মুর্শিদকুলি এদেরকে ভবিষ্যতে সুপ্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ভিত্তি দান করেছিলেন। প্রফেসর জন আর. ম্যাকলেন প্রকৃতই বলেন, 'The most powerful Hindu zamindars of mid- and late eighteenth-century Bengal acquired the bulk of their estates under Murshid Quli Khan. These estates were so large that when Shuja-ud-din, Murshid Quli's son-in-law and successor, concluded a new settlement in 1728, he reorganized Bengal's fiscal divisions around

১৪২ প্রাচীন ও বড় বড় জমিদারির মধ্যে বর্ধমান, নদীয়া, দিনাজপুর, লস্করপুর, সুসঙ্গ, বীরভূম, বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি তখনও বিদ্যমান ছিল। ফলত আগের এই সব বড় বড় জমিদারি ও মুর্শিদকুলি খানকর্তৃক নবসৃষ্ট ও বর্ধিত ছোট-বড় জমিদারিগুলি মিলে স্থিত ব্যবস্থাকে পুরোপেক্ষা আরও শক্তিশালী করেছিল। অধ্যাপক সমর কুমার মল্লিক উল্লেখ করেন, 'আসলে মুর্শিদকুলির আমলে জমিদারী ব্যবস্থা দুর্বল হবার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জমিদার তাঁর দেনা পাওনা মিটিয়ে দিলে সরকারের কিছু করার থাকতো না।.... মোট ১০৪৫টি পরগণা (১৬৬০টি পরগণা-র মধ্যে ৬১৫টি ছিল ১৬ জন বড় জমিদারের দখলে) অসংখ্য ছোট জমিদারীতে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে শুধু ঢাকাতেই ছিল ৪১৮ জন জমিদার। মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে এই সংখ্যা ছিল আরও বেশী—যথাক্রমে ৩,০০০ ও ১,৫০০। সুতরাং মুর্শিদকুলির আমলে বাংলার জমিদারী ব্যবস্থা দুর্বল হয়েছিল বললে তা সত্যের অপলাপ হবে।' (আধুনিক ভারতের দেড়শো বছর, পৃষ্ঠা ৮৩-৮৪)।

১৪৩ পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৫১। জায়গিরসহ এই জমা'র মোট পরিমাণ ছিল ১৭,৪১,৯৮৭ টাকা (The Revenue Administration of Northern Bengal, Dr. A. B. M. Mahmood, pp. 19).

১৪৪ The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 15.

these zamindaris.'[১৪৫] এরাই পরবর্তীকালে, 'The large zamindars established themselves as major partners with the Mughal subahdars (governors) in ruling Bengal, commanding small armies, administering justice, and building palaces, forts, and temples that by Bengal's modest architectural standards were impressive in size.'[১৪৬]

এখানে একটি বিষয় খুব তাৎপর্যের সঙ্গে লক্ষণীয় যে, মুর্শিদকুলির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে যে সকল জমিদারি সৃষ্ট বা পূর্বাপেক্ষা ধনে-জনে-মানে বর্ধিত হয়েছিল, সেগুলির সবই ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বিশেষের। এর মুখ্য কারণ ছিল ভূমিরাজস্ব আদায়ে মুর্শিদকুলির এক ধরনের ধর্ম-নিরপেক্ষ নীতি। সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে সম্রাট আওরঙ্গজেবের (অন্য মোগল সম্রাটদের) যেমন দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মুসলিম রাষ্ট্র নির্বিশেষে আক্রমণ ও সেখানকার আপামর জনমণ্ডলীকে পর্যুদস্ত করে বিজিত ভূখণ্ডকে মোগল অধিভুক্ত ও করতলগত করতে স্ব-ধর্ম কোন বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তেমনি ভূমিরাজস্বের সর্বাধিকরণ-নীতি (Policy of Maximization of Land Revenue) তথা যে কোন উপায়ে এবং যে কোন শ্রেণীর লোক নিয়োগ করে অধিক পরিমাণে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ করতে মুর্শিদকুলির স্ব-ধর্ম তাঁকে পক্ষপাত-দুষ্ট করেনি। বরং যেখানে যাকে নিযুক্ত করলে রাষ্ট্রের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের সম্ভাবনা বেশি, তিনি সেটাই করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই বিবেচনায় তিনি হিন্দুদেরকেই রাজস্ব-বিভাগে প্রায় একচেটিয়া নিযুক্তি ও প্রাধান্য দানকে অধিক সমীচীন বলে মনে করেছিলেন।

অভিজ্ঞতা থেকে মুর্শিদকুলি লক্ষ্য করেছিলেন, ভূমিরাজস্ব আদায় কর্মে অধিকাংশ মুসলিম জমিদার যাদের উৎপত্তি মূলত প্রাক-মোগল বা সুলতানি যুগে (এরা প্রধানত ছিল পাঠান-আফগান বংশোদ্ভূত), এরা ততোদিনে প্রচণ্ড বিলাসী ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। এক কথায় রাজস্ব আদায়ে এদের কোন মনোযোগ ছিল না। রায়তদের কাছ থেকে যা-ও বা তারা আদায় করতো, সেটাও তারা সরকারি কোষাখানায় জমা না করে প্রায়শ নিজেরাই আত্মসাৎ করতো। এদের কাছ থেকে সহজে তা আদায় করা যেতো না। নিজেরা মুসলমান ও ভূতপূর্ব শাসকশ্রেণীর বংশধর হওয়ায় এরা যেমন ক্ষমতাসীন শাসককুলকে ভয় পেতো না, তেমনি শুধুমাত্র রাজস্বের কারণে এদের বিরুদ্ধে কঠোর কোন ব্যবস্থা নিলে তা মুসলমান জনসমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। অন্যদিকে হিন্দুদের তরফ থেকে এ দু'টো সম্ভাবনার কোনটারই বিশেষ আশঙ্কা ছিল না। মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে থেকেও এরা ছিল সর্বদা শান্ত ও ভীরু প্রকৃতির (দু'একজন বিদ্রোহীর কথা আলাদা)। ফলে ভূমিরাজস্ব আদায়ের জন্য হিন্দু জমিদারদের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করাও ছিল অপেক্ষাকৃত সহজতর, ও প্রায় প্রতিক্রিয়াহীন। সলিমুল্লাহ নিজেও বলেছেন, মুর্শিদকুলি খান রাজস্ব এবং সায়ের শুল্ক আদায়ের জন্য বাঙালি হিন্দুদেরকেই কেবল

১৪৫ Land and Local Kingship in Eighteenth-Century Bengal, John R. McLane, pp. 37.
১৪৬ Ibid., pp. 38.

নিয়োগ করতেন, কেননা তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় সহজসাধ্য ছিল।[১৪৭] সুতরাং এক অর্থে মুর্শিদুকলির ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে ও জমিদারি বণ্টনে হিন্দু তোষণ-নীতি রাজনৈতিক স্বার্থসমন্বিত ছিল এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'It was not a case of liberal treatment of the infidels in pursuit of wise statesmanship, nor was it an example of confidence in their efficiency and integrity. Their political helplessness which exposed them to 'punishment' and made their 'pusillanimity' harmless, was the factor responsible for Murshid Kuli's choice.'[১৪৮]

কার্যত হিন্দু-মুসলিম আপামর রায়তশ্রেণীর কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব আদায়ের যে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিন্দু জমিদারগণ লাভ করেছিলেন, তাতে করে স্বভাবতই তারা বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনের একটি উচ্চতর স্তরে আসন গাঁড়ার সুযোগ পান, অবচেতনে হলেও মুর্শিদকুলি তাদের জন্য এই সোপান তৈরি করে দিয়েছিলেন। যদুনাথ সরকারের ভাষায়, 'He thus created a new landed aristocracy in Bengal, whose position was confirmed and made hereditary by Lord Cornwallis.'[১৪৯]

তবে এর বিপরীত দিকও ছিল। বিগত কয়েকশত বছরের মুসলমান শাসনামলে সঙ্গত কারণেই বাংলার অনেক প্রাচীন জমিদারি ও ভূখণ্ড মুসলিম জমিদার ও অঞ্চলাধিকারীদের দখলে এসেছিল। এদের প্রধান অংশ ছিল জায়গিরদার। মুর্শিদকুলির আগমনের পর প্রথম ধাক্কায় এদের জায়গির বাতিল হয়ে যায় এবং এরা ওড়িশায় স্থানান্তরিত হন। অর্থাৎ ক্ষমতার মূল কেন্দ্র থেকে এরা দূরে সরে যেতে বাধ্য হন। পরে যখন 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে খাজনা আদায়ের প্রায় একচেটিয়া অধিকার হিন্দুদের হাতে চলে যায়, তখন বাস্তব কারণেই মুসলমান উচ্চবিত্ত ও জমিদারশ্রেণী চরমভাবে হতাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ এখানে আলপশাহি (মুক্তাগাছা) ও মোমেনশাহি জমিদারির কথা বলা যায়। মূলত এ দু'টি জমিদারি ছিল বিখ্যাত 'বারো-ভূঁইয়া' নেতা ঈসা খান-মুসা খানদের উত্তরাধিকারীদের করতলগত। কিন্তু মুর্শিদকুলি খান তা নতুনভাবে বিন্যস্ত করে পূর্বোক্ত শ্রীকৃষ্ণ হালদার ও শ্রীকৃষ্ণ আচার্যকে দেন। অনুরূপভাবে মাহমুদপুর (নদীয়া-যশোর) ও জালালপুর প্রভৃতি মুসলমান শাসিত পরগণা'র ছোট ছোট জমিদারি নিয়ে সৃষ্ট নাটোর জমিদারি দেন পূর্বোক্ত রামজীবনকে। যা হোক, এ দিক থেকে বিবেচনা করলে আমরা অবশ্যই স্বীকার করতে বাধ্য যে, 'The land policy of Murshid Quli weakened the power of the Muslim landed aristocracy.'[১৫০] তা ছাড়া মুর্শিদকুলির সময়ে ভূমিরাজস্ব প্রশাসন ও বিভাগে আর একটি কারণেও হিন্দু কর্মচারীদের যথেষ্ট প্রভাব ও প্রাধান্য সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলার মোগল

১৪৭ দেখুন, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২১।

১৪৮ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 50.

১৪৯ The History of Bengal, Vol. II., pp. 409-10; Also see, 'The Agrarian System of Bengal, Vol. I'., pp. 50.

১৫০ The Muslim Society and Politics in Bengal (1757-1947), Dr. Muhammad Abdur Rahim, pp. 3.

শাসনের প্রায় প্রারম্ভ থেকে উত্তর ভারতের কয়েকটি অগ্রসর প্রদেশ যেমন দিল্লি, আগ্রা, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত যে সকল মুসলমান ও হিন্দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ (এরা কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত হতেন) এখানকার সামরিক, সাধারণ প্রশাসনিক ও বিচার এবং বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব বিভাগে যথেষ্ট সুনাম ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে আসছিলেন[১৫১], অষ্টাদশ শতকের সূচনায় বিশেষত সম্রাট আওরঙ্গজেবের তিরোধানের পর এদের বাংলায় আগমনের সেই ধারা অনেকটা স্তিমিত ও পরে একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। স্বভাবতই এদের অবর্তমানে প্রাদেশিক প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে যোগ্য ও দক্ষ রাজ-কর্মচারীর সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, যা পূরণ করা ছিল মুর্শিদকুলি খানের মতো বিচক্ষণ প্রশাসকের জন্য আশু জরুরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তর ভারতীয় এই সকল উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে ইতোমধ্যে বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নস্তরের কর্মচারীরা রাজস্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। এরা নিজস্ব গরজেই শাসকশ্রেণীর ভাষা 'ফারসি' ও রাজকার্যের অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলি শিখে নিয়েছিল। ফলে মুর্শিদকুলি খান এদেরকে ভূমিরাজস্ব ও দিওয়ানি বিভাগের শূন্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে নিযুক্ত করেন। ড. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ বলেন, 'Murshid Quli employed none but the Bengali Hindus for the collection of revenues.'[১৫২] 'কানুনগো'র মতো ভূমি রাজস্ব বিভাগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে একচেটিয়া হিন্দুদেরই ছিল অধিকার[১৫৩], বলা যায় মুর্শিদকুলির প্রায় সিকি শতকের রাজত্বকালে (এবং পরেও) এ পদটি সংরক্ষণই করা হয়েছিল একান্তভাবে হিন্দুদের জন্যই।

যা হোক ভূমিরাজস্ব ও দিওয়ানি বিভাগে ব্যাপক হারে হিন্দু রাজকর্মচারীদের নিয়োগের পশ্চাতে মুর্শিদকুলির যে মৌল উদ্দেশ্য ছিল তা একার্থে সফলই হয়েছিল বলা যায়। হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তাদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও মনীষা, এবং কাজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও শ্রম দ্বারা তাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতার প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। সমকালীন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী যেমন রঘুনন্দন, ভূপৎ রায়, দর্প নারায়ণ, কিঙ্কর রায়, দিলপৎ সিং, আলম চান্দ লাহিরি মল, হাজারি মল প্রমুখ মুর্শিদকুলির অধীনে কাজ করে প্রভূত প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অর্থ ও রাজস্ব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে কাজ করার ফলে এরা কালক্রমে প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকাবস্থায় এরা স্ব নামে ও আত্মীয়-পরিজনের নামে ছোট-বড় অনেক তালুক ও জমিদারি ক্রয় করেছিলেন, যার কয়েকটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। সত্যি বলতে আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিকভাবে শক্তিশালী এই অবস্থানের কারণে এরা

১৫১ এঁরা কখনই এদেশে এদের স্থায়ী নিবাস গড়েননি। (The History of Bengal, Vol. II., pp. 410).

১৫২ History of India, Drs. N.K. Sinha & A.C. Banerjee, pp. 417.

১৫৩ ড. আবদুল করিম বিভিন্ন তথ্য-সূত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন এই বলে যে, 'As the office of qanungo was hereditary, it may be assumed that the early 18th century qanungos, and in fact all the qanungos in the Muslim period, were Hindus.' (Murshid Quli Khan and His Times, pp. 70).

মুর্শিদকুলি-উত্তর অন্ত্য-মধ্য বাংলার রাজনীতির উত্তাল দিনগুলিতে ক্ষমতার অন্তরালে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেছিলেন, যা ঐতিহাসিক মাত্রই স্বীকার করেন।

এ পর্যায়ে আমরা মুর্শিদকুলি খানের ভূমিরাজস্ব নীতির আরও দু'একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও তার প্রাসঙ্গিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে উল্লেখ করে এ আলোচনা শেষ করবো।

একটা বিষয় ঠিক যে রাজস্ব সংস্কার যতো যুগোপযোগী, সঠিক ও সফলভাবেই করা হোক, এবং এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় আয় যতোই বৃদ্ধি করা সম্ভব হোক না কেন, বাস্তবে এই সমুদয় প্রচেষ্টাই মূলত ব্যর্থ হতে বাধ্য যদি না এর পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের কাজও সমান্তরাল গতিতে করা হয়। সত্যি বলতে মুর্শিদকুলি খান এই অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ততোধিক সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। তিনি সরকারের ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করেন।

এর মধ্যে মুখ্য ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্কার বা স্থিত প্রশাসনিক অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস, এবং দ্বিতীয়ত সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস, কঠোর হস্তে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় রোধ এবং রাজস্ব কর্মচারীদের চিরাচরিত দুর্নীতি ও ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা হ্রাস কল্পে ব্যক্তিগতভাবে নিয়মিত রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরণ প্রভৃতি।

মুর্শিদকুলি খানের প্রশাসনিক অবকাঠামো পুনর্বিন্যাসের পূর্ব পর্যন্ত 'সরকার' ব্যবস্থা-ই ছিল বাংলার মোগল প্রশাসনের বৃহত্তম ইউনিট। এ সময় এর মোট সংখ্যা ছিল ৩৪টি।[১৫৪] 'সরকার'-এর অব্যবহিত পরবর্তী নিম্ন স্তর ছিল পরগণা বা মহাল। এর মোটামুটি সংখ্যা ছিল ১,৩৫০টি। মুর্শিদকুলি এগুলির পুনর্বিন্যাসের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিশেবে সুবা ওড়িশা থেকে মেদিনীপুরকে বিচ্ছিন্ন করে তা বাংলা সুবার অন্তর্ভুক্ত করেন। সলিমুল্লাহ বলেন, 'চাকলা মেদিনীপুরকে ওড়িশা থেকে কেটে নিয়ে সুবা বাংলার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।'[১৫৫] তিনি নববর্ধিত অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলাকে 'সরকার' অপেক্ষা বৃহত্তর অংশে বিভক্ত করেন, যার নাম দেন 'চাকলা' (বিস্তৃত জানার জন্য দেখুন সপ্তম অধ্যায়ের 'চাকলা' শীর্ষক আলোচনা)। জেমস গ্রান্টের দেয়া তথ্য মতে 'চাকলা'গুলির সর্বমোট সংখ্যা ছিল ১৩টি[১৫৬], এবং এগুলির একটা থেকে অন্যটি ছিল পৃথক, সুবিন্যস্ত, সীমানা-পরিচিহ্নিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত-'Compact, well and permanenlty ascertained in boundary, regularly assessed for the standard Crown rent, and each under separate administration of a faujedar aumildar or intendant of finance.'[১৫৭] নবগঠিত ১৩টি 'চাকলা' বিভাগ হলো : (১) বন্দর বালাশোর, (২) হিজলি, (৩)

১৫৪ ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ৩২টি (মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৩২), তবে এটি ঠিক নয়।

১৫৫ বাংলাদেশের ইতিহাস(১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১।

১৫৬ অধিকাংশ আধুনিক ঐতিহাসিকই জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত 'চাকলা' সংখ্যা ১৩টি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা'-র লেখক এই সংখ্যা ১১টিতে সীমাবদ্ধ করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'মুর্শিদকুলি খান....বাংলাদেশকে ১১টি অংশে বিভক্ত করেন এবং প্রতি ভাগের নাম রাখেন চাকলা।' (পৃষ্ঠা ৭২)।

১৫৭ Quoted from, 'The Agrarian System of Bengal', Vol. I., pp. 45.

মুর্শিদাবাদ, (৪) বর্ধমান, (৫) সাতগাঁও বা হুগলি, (৬) ভূষণা, (৭) যশোহর, (৮) রাজমহল বা আকবরনগর, (৯) ঘোড়াঘাট, (১০) করৈবাড়ি (কোচবিহার ও আসামের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত), (১১) সিলেট বা শ্রীহট্ট, (১২) ঢাকা বা জাহাঙ্গির নগর ও (১৩) ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম। 'চাকলা'গুলির অধীনে মোট পরগণা ছিল ১,৬৬০টি।[১৫৮] এর মধ্যে 'খালসা'-র অন্তর্গত ছিল ১,২৫৬টি এবং জায়গির-এর ৪০৪টি।[১৫৯] যা হোক, এ সময় থেকে বাংলার ভূ-রাজনীতিতে 'চাকলা' ও 'পরগণা শব্দের সর্বত্র ব্যাপক প্রচলন শুরু হয় এবং 'পরগণা'-র প্রতিশব্দ হিশেবে প্রচলিত 'মহাল' শব্দের ব্যবহার অনেক কমে আসে। যদিও দাপ্তরিক নথিপত্র ও সাধারণ ব্যবহারে 'সরকার' নামের প্রচলন তখনও উল্লেখযোগ্য হারে থেকে গিয়েছিল।

'চাকলা' বিভাগের প্রধান নির্বাহি হিশেবে এক-একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হতেন। সাধারণত এদের পদবি হতো 'আমিল'[১৬০]। তবে কখনও কখনও 'আমিন'[১৬১] এবং স্থানীয়ভাবে ফারসি 'দার' প্রত্যয় যোগে 'চাকলাদার' নামেও এরা অভিহিত হতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে মুর্শিদকুলির সুবাদার হবার (১৭১৭ খ্রিঃ) অনেক আগে থেকেই বলা যায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই যেহেতু স্থানীয় প্রশাসনে কেন্দ্র থেকে রাজ-কর্মচারী নিয়োগের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছিল এবং কালেভদ্রে নিয়োগ করা হলেও তাতে মুর্শিদকুলির পরামর্শ গ্রহণ করা হতো[১৬২] (পরে তো নিয়োগ একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল), সেহেতু 'চাকলা' প্রশাসনের শীর্ষ থেকে নিম্ন পদের প্রায় সকল কর্মচারীই হতো মুর্শিদকুলির ব্যক্তিগত পছন্দের ও আস্থাভাজন লোক। তাদের দায়বদ্ধতাও ছিল সম্পূর্ণত তাঁর কাছেই। তাদের কাজ কর্মে সামান্য শৈথিল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দিলে সুবাদার তা কঠোর হস্তে নিবারণ করতেন।

এখানে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, 'চাকলা' ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে মোগল প্রশাসন যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিশেবে প্রচলিত 'সরকার' পদ্ধতির পুরোপুরি বিলোপ হয়েছিল কি-

১৫৮ ঐতিহাসিক কেদারনাথ মজুমদার তাঁর 'ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৩১) মুর্শিদকুলির রাজস্ব বন্দোবস্তে মহাল (পরগণা)-এর সংখ্যা ১৬৭০টি বলে মন্তব্য করেছেন। (দেখুন, বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার : বৃহত্তর ময়মনসিংহ, নূরুল ইসলাম খান সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ৪৬৩)।

১৫৯ The Agrarian System of Bengal Vol. I., pp. 44.

১৬০ ড. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রত্যেক চাকলায় একজন ফৌজদার ও একজন আমিলদার নিযুক্ত করা হয়েছিল। এরা দু'জনেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে ছিলেন স্বাধীন।' (বাংলার আর্থিক ইতিহাস, অষ্টাদশ শতাব্দী, পৃষ্ঠা ৫)। তবে আমাদের মনে হয় 'চাকলা'র প্রধান নির্বাহি 'আমিল' বা 'চাকলাদার' ছিলেন এবং ফৌজদার ছিলেন 'ফৌজদারি'র প্রধান। ফৌজদারি, 'চাকলা' অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ছিল, স্বভাবতই ফৌজদারের ক্ষমতাও ছিল সীমিত।

১৬১ Indian Land Systems in Report 1940, Vol. II., pp. 208.

১৬২ এক পর্যায়ে এমন হয়েছিল যে, মুর্শিদকুলি 'খানের পরামর্শ ব্যতীত বাংলায় কাউকে নিযুক্ত করা হত না। বাংলা একটি উর্বর দেশে পরিণত হয়েছে শুনে বাদশাহী মনসবদারগণ এখানে চাকুরীর আবেদন করতেন। নওয়াব জাফর খান এই সকল প্রার্থীদের তাঁর অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত করতেন।' (রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২০১)। সম্রাট আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশায় একজন প্রাদেশিক সুবাদারের পক্ষে রাজ-কর্মচারী নিয়োগের এই ক্ষমতা-প্রাপ্তি নিঃসন্দেহে নবাব মুর্শিদকুলি তথা যে কোন সুবাদারের পক্ষে অত্যন্ত শ্লাঘার বিষয়।

না? নির্ভরযোগ্য তথ্য-সূত্রের অভাবে এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেয়া কঠিন। তা সত্ত্বেও বলা যেতে পারে, সম্ভবত এই ব্যবস্থা রহিত হয়ে গিয়েছিল। কেননা আমাদের পর্যালোচনায় এটা লক্ষ্য করা গেছে, 'সরকার' পদ্ধতিতে যতোটা সাধারণ প্রশাসনের অংশীদারিত্ব ছিল তার চেয়ে কোন অংশে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অংশীদারিত্ব কম ছিল না। অন্য কথায় সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব প্রশাসন—এই দুই নিয়েই ছিল এক-একটি 'সরকার', এবং দুই বিভাগের প্রধান-নির্বাহি ছিলেন দু'জন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি, যাদের পদবি, দায়িত্ব ও ক্ষমতা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ও প্রায়-স্বাধীন প্রকৃতির। কিন্তু 'চাকলা' ব্যবস্থাপনায় এই দু'টি পদ-ই মূলত একজন রাজ-কর্মচারীর হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। তিনিই এর সাধারণ প্রশাসন ও ভূমিরাজস্ব এবং অর্থ-সংক্রান্ত বিভাগের নিয়ন্তা ছিলেন। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রেও মুর্শিদকুলির ব্যয় সঙ্কোচন-নীতি কাজ করেছিল। কারণ দু'টি পদ ও স্থাপনার স্থলে এক পদে ব্যয় কম এবং পদাধিকারী ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা তুলনামূলক সহজতর, এ কথা সুবাদার ভালো করেই জানতেন। আর যেহেতু দূরবর্তী প্রদেশ হিশেবে বাংলা তখন দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত হতো না, এবং মুর্শিদকুলিই ছিলেন এখানকার সর্বেসর্বা, সেহেতু এ দু'টি পদ-কে আর পূর্বের ন্যায় স্বতন্ত্র রাখার প্রয়োজন ও যৌক্তিকতা ছিল না। বস্তুত ভূমিরাজস্ব আদায় কর্মে সুষ্ঠুতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা প্রতিষ্ঠার জন্যই যেখানে 'চাকলা'-র সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর দেখা যায় সেটি মূল লক্ষ্য অর্জনের পাশাপাশি একটি সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বও অত্যন্ত গুরুত্বর সঙ্গে নির্বাহ করেছে। ফলে এই দিক থেকে বিবেচনা করে অবশ্যই বলা যায় যে, 'The Chakla was more an administrative than a fiscal unit....The creation of an enlarged administrative division termed Chakla was due to the need for giving the Zamindar full scope for the discharge of his many administrative duties entrusted to him in addition to those of collecting rents and paying revenue.'[১৬৩]

প্রতিটি 'চাকলা'-র অন্তর্ভুক্ত হতো এক বা একাধিক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জমিদারি, তালুকদারি প্রভৃতি। জমিদার ও তালুকদার রায়তদের কাছ থেকে রাষ্ট্র নির্ধারিত হারে খাজনা আদায় করে বছরের নির্দিষ্ট সময়গুলিতে এককালীন বা কিস্তিতে 'চাকলা'স্থ কোষাখানায় তা পৌঁছে দিতেন। এ জন্যে এরা আদায়কৃত রাজস্বের কিয়দংশ 'রসুম' বা 'কমিশন' হিশেবে পেতেন। অন্যদিকে 'চাকলাদার'গণও কিছু কিছু এলাকায় রায়তদের কাছ থেকে সরাসরি ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন। তবে এরা সচরাচর সেই সকল এলাকার ভূমিরাজস্ব আদায় করতেন যেখানে জমিদার ও তালুকদাররা রাজস্ব আদায়ে উৎসাহী হতো না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, যে সমস্ত ক্ষুদ্র জমিদার ও তালুকদার সরকারি রাজস্ব নিয়মিত পরিশোধ করতে পারতো না, তাদের এলাকাগুলি মুর্শিদকুলি খান প্রায়শই পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও সচ্ছল জমিদারির সঙ্গে একীভূত করার আদেশ দিতেন। এভাবেই গড়ে উঠতো এক-একটি বৃহৎ জমিদারি। মুর্শিদকুলির সময়ে ১৬ জন খুব বড় জমিদার ছিলেন যাদের আওতায় ৬১৫টি পরগণা'র ভূমিরাজস্ব আদায়ের ভার

১৬৩ Indian Land Systems, Reoprt..., pp. 208.

ছিল।[১৬৪] এদের মধ্যে আবার বর্ধমান, রাজশাহি, দিনাজপুর প্রভৃতি ৬টি জমিদারি থেকে যে খাজনা পাওয়া যেতো তা ছিল সমকালীন বাংলার মোট ভূমিরাজস্বের প্রায় অর্ধেক।[১৬৫] প্রতিটি জমিদারিতেই এক বা একাধিক কাছারি থাকতো। সচরাচর রায়তগণ সেখানেই খাজনা দিতো। আবার জমিদারের বিভিন্ন পদবিধারী কর্মচারী যেমন আমিন, পেশকার, মুন্সি, পোদ্দার ('ফোতাহদার'-এর অপভ্রংশ) প্রভৃতি রায়তের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে, ফসল ওঠার সময়ে ক্ষেতে-মাঠে উপস্থিত হয়ে খাজনা আদায় করতো। এইভাবে সংগৃহীত খাজনা থেকে নির্ধারিত পাওনা কেটে রেখে জমিদাররা তা গরুর গাড়িতে করে 'আমিল'-এর দপ্তরে অথবা সুবা'র প্রধান কোষাগারে পাঠিয়ে দিতেন। মুর্শিদকুলির রাজত্বের শেষ দিকে প্রচলিত ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় 'হুণ্ডি'র মাধ্যমে জমিদার প্রমুখেরা বেশির ভাগ সরকারি পাওনা পরিশোধ করতেন। 'The zamindars and amils negotiated the gross revenue with the bankers, who paid the amount in siccas to the treasury charging a certain rate of exchange from the zamindars. At the beginning of each financial year, the zamindars and amils closed the previous year's accounts and contracted for the ensuing year.'[১৬৬] তবে ভূমিরাজস্ব ধার্য করণ ও আদায় কার্যে জমিদাররা যাতে করে প্রভূত ক্ষমতাশালী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না-পারে এবং কোন একক 'চাকলাদার'-এর পক্ষে স্থানীয়ভাবে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব পরিগণিত হলে সেক্ষেত্রে উক্ত বৃহৎ জমিদারির বিভিন্ন অংশ একাধিক 'চাকলা'র অন্তর্ভুক্ত করা হতো। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে রাজশাহি জমিদারির কথা বলতে পারি। এই জমিদারিটিকে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, ভূষণা ইত্যাদি মোট ৮টি 'চাকলা'য় বিভক্ত করা হয়েছিল। বস্তুত এইভাবে সংশ্লিষ্ট বিশাল অঞ্চলাধিকারী জমিদারকে কয়েকজন 'চাকলাদার'-এর সার্বক্ষণিক তীক্ষ্ণ নজরের মধ্যে রেখে মুর্শিদকুলি খান স্থানীয় জমিদারদের ওপর তাঁর নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন।

অন্যদিকে ১৩টি 'চাকলা'র বিশাল ভূখণ্ডের বাৎসরিক খাজনা আদায়ের মূল দায়িত্ব পূর্বের ন্যায় আমিল, আমিন প্রভৃতি সরকারি কর্মচারীদের ওপর থেকে ব্যাপকভাবে সরিয়ে নিয়ে তা স্থানীয় জমিদার, তালুকদার ও 'ঠিকাদার'-দের দেয়ায় এতে করে যে ভূমিরাজস্ব আদায়ে প্রশাসনিক ব্যয় অনেক কমে গিয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়।

মুর্শিদকুলি খান তাঁর সুবিস্তৃত প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপটি সবচেয়ে সাহসিকতা কিন্তু কার্যত অপরিণামদর্শিতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করেছিলেন তা হলো সামরিক বাহিনীর স্থিত সদস্য সংখ্যা হ্রাসকরণ এবং এর মাধ্যমে প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচন। বস্তুত এটি এই জন্যে সাহসী পদক্ষেপ যে, আমরা দেখেছি যে আগাগোড়া মোগল প্রশাসন-যন্ত্র ছিল প্রথমত ও শেষত সামরিক আমলা ও সদস্য নির্ভর একটি কঠোরভাবে কেন্দ্র-নিয়ন্ত্রিত চলমান অবকাঠামো। সামরিক বাহিনীই ছিল এর প্রাণ। 'মনসবদার' প্রধান এই

১৬৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. মজুমদার, পৃষ্ঠা ২২৩।
১৬৫ The Revenue Administration of Northern Bengal, pp. 7.
১৬৬ The Role of the Zamindars in Bengal (1707-1772), Dr. Shirin Akhtar, pp. 62-63.

অবকাঠামোয় সামরিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করাই যেখানে রীতি এবং ক্ষমতাসীনদের টিকে থাকা বা অস্তিত্বের স্মারক, এবং মুর্শিদকুলির আগ-পর্যন্ত সেটাই হয়ে এসেছে, সেখানে তিনিই সেই রীতিতে প্রথম ও শেষ ব্যতিক্রমের জন্ম দেন। তাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদকেন্দ্রিক অষ্টাদশ শতকী বাংলার মূল সামরিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল মাত্র ২,০০০ অশ্বারোহী ও ৪,০০০ পদাতিক সৈন্যের সমন্বয়ে।[১৬৭] এর বাইরে ইতোপূর্বেকার বিশাল বাহিনীর সকল সদস্যকে তিনি ছাঁটাই করেছিলেন। সাবেক ৩৪টি 'সরকার'-এর অধীনে যে অসংখ্য 'ফৌজদারি' ও 'নিয়াবত' ('নায়েব-ই-নাজিম' শাসিত অঞ্চল) ছিল সেগুলিও তিনি মোটামুটি বিলুপ্ত করে মাত্র ১০টিতে তা সীমাবদ্ধ করেন। এগুলি— (১) ঢাকা, (২) ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম, (৩) সিলেট, (৪) মেদিনীপুর, (৫) রাঙ্গামাটি, (৬) রংপুর, (৭) রাজশাহি, (৮) পূর্ণিয়া, (৯) হুগলি ও (১০) কাটোয়া।[১৬৮]

বস্তুত তথাকথিত এই সাহসী ও ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুর্শিদকুলি সামরিক খাতে তথা প্রশাসনিক ব্যয় অনেক কমাতে পেরেছিলেন সত্য, কিন্তু এটি যে একটি ভ্রান্ত ও প্রদেশের স্থিতির জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল এর প্রমাণ পাওয়া যায় পরবর্তীকালে মারাঠা আক্রমণ প্রতিহত করণে ক্ষমতাসীন নবাব আলিবর্দির শোচনীয় অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে। বলাবাহুল্য মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে বাংলায় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজমান ছিল। তাঁর প্রায় সিকি শতাব্দীর শাসনকালে বাংলা যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি হয়নি, তেমনি তাঁর কঠোর শাসনের যাঁতাকলে বিচ্ছিন্ন ২/১টি ছাড়া স্থানীয় কেউ নবাবি শাসনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পায়নি। কারণ, 'During his (Murshid Kuly Khan) administration no wrongs remain undressed and no offenders could escape punishment.'[১৬৯] ফলত এই উভয় অবস্থায় মুর্শিদকুলির সৈন্যবল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে কোন বড় ধরনের ঝামেলায় পড়তে হয়নি। কিন্তু আলিবর্দি এবং পরবর্তী নবাবদের সময়ে এই অবস্থার সমূহ পরিবর্তন ঘটেছিল। যা হোক, তিনি সৈন্য সংখ্যা হ্রাস ছাড়াও দরবারের ও নবাবের অনেক অপ্রয়োজনীয় খরচ ও সমস্ত ধরনের অপব্যয় বন্ধ করেন।[১৭০] ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় আদায়— আয়ের হিসাব, কাগজপত্র এবং যে সকল ক্ষেত্রে সামান্য ব্যয়ের নির্দেশ থাকতো সেগুলির সবই মুর্শিদকুলি খান স্বয়ং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এ ব্যাপারে নিম্নস্থ কর্মচারীদের ওপর তিনি কোন ভরসা করতেন না।[১৭১] চাকুরি জীবনের আগে থেকেই পালক-প্রভু সফি ইস্ফাহানির সঙ্গে থাকার সময়েই তিনি রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের চিরাচরিত দুর্নীতি ও ফাঁকিবাজি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছিলেন। সম্ভবত এই কারণে তিনি এদেরকে আদৌ বিশ্বাস করতেন না। গোলাম হোসায়ন সলীমও বলেন, 'মুৎসুদ্দিদের (ভূমিরাজস্বের এজেন্ট বা আধিকারিক) তিনি মোটেই বিশ্বাস করতেন না; তিনি নিজে

১৬৭ The History of Bengal, Vol. II., pp. 412.
১৬৮ পলাশীর ষড়যন্ত্র ও সেকালের সমাজ, পৃষ্ঠা ৪৫।
১৬৯ History and Culture of Bengal, Dr. Sur, pp. 132.
১৭০ ড. রঞ্জিত সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান/৪, পৃষ্ঠা ১৬৮।
১৭১ তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৩।

প্রত্যহ আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ ও জমা ওয়াসিলের খাতা পরিদর্শন ক'রে স্বাক্ষর করতেন। প্রতি মাসান্তে তিনি খালসা (খাস জমির) ও জায়গীরসমূহের একরারনামা বাজেয়াফত করতেন...।'[১৭২] নিরীক্ষাকালে কোনরূপ গরমিল বা রাজস্ব ঘাট্‌তি পরিলক্ষিত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। 'রিয়াজ'-এর ভাষায়, 'একরারনামা মোতাবেক সমস্ত রাজস্ব বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় পরিশোধ না করা পর্যন্ত মুৎসুদ্দি, আমিল, জমিদার, কানুনগো ও অন্যান্য কর্মচারীদের চেহেল সতুন প্রাসাদের দেওয়ানখানায় আটক ক'রে রাখতেন। বকেয়া আদায়ের জন্য আদায়কারী পিওন নিযুক্ত ক'রে কিস্তি-খেলাফীদের পানাহার অথবা পেশাব-পায়খানা করতে অনুমতি দিতেন না এবং পিওনরা যাতে ঘুষ নিয়ে তৃষ্ণার্ত কিস্তি-খেলাফীদের কাউকে পানি না দেয়, সেজন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করতেন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই প্রকারে পানীয় ও খাদ্য ব্যতীত তাদের অতিবাহিত করতে হত। সেই সঙ্গে পা উপর দিক ক'রে ঝুলিয়ে বেঁধে রাখা হত; পা পাথরে ঘর্ষিত হত; চাবুক মারা হত। বেত্রাঘাত করাতে তিনি কাউকে খাতির করতেন না।'[১৭৩]

বস্তুত উপরোল্লিখিত বিভিন্ন সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মুর্শিদকুলি খান সুবে বাংলার ভূমিরাজস্ব বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এক সময়ের 'জান্নাত-উল-বিলাদ', পরবর্তীকালে অযোগ্য সুবাদার-দিওয়ানদের কবলে পড়ে রাজস্ব-ঘাট্‌তির জন্য যার দুর্নাম রটেছিল, অন্য প্রদেশ থেকে অর্থ এনে যার প্রশাসনিক ব্যয় মিটাতে হতো, সেই প্রদেশ—বাংলা, মুর্শিদকুলির মতো সুযোগ্য শাসকের হাতে পড়ে মাত্র স্বল্পকালের মধ্যে তার হৃত গৌরব ফিরে পায়। তাঁর আমলে বাংলা-প্রদেশের টাকা দিয়ে তিনি শুধু এখানকারই প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করেননি, উপরন্তু দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধমান ও প্রতিনিয়ত অর্থ-সংকটের সম্মুখীন সম্রাট আওরঙ্গজেবকেও প্রতি বছর ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা 'পেশকাশ' প্রেরণ করেন। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন, 'All these enabled Murshid Quli Khan to remit to the emperor crores of rupees as surplus revenue of Bengal during the latter's (Aurangzib) years of anxiety and embarrassment towards the close of his career when the imperial exchequer had been heavily depleted on account of the 'endless war'in the Deccan.'[১৭৪] দিল্লিতে 'পেশকাশ' প্রেরণের এই ধারা মুর্শিদকুলি খান তাঁর শাসনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিলেন। যত দূর জানা যায় তিনি সর্বমোট ২৫ কোটি টাকার মতো দিল্লিতে পাঠিয়েছিলেন।[১৭৫] নগদ উপহার-উপঢৌকন যার মধ্যে সচরাচর সামিল হতো— 'হাতী, তঙ্গন ঘোড়া, মহিষ, পোষা হরিণ, জাহাঙ্গীর নগরে (ঢাকায়) সংরক্ষিত পাখী, ব্যাঘ্রচর্মের ঢাল, স্বর্ণখচিত শীতল পাটি, মশারি, সিলেটের গঙ্গাজলি কাপড়— যার

১৭২ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ১৯৯।
১৭৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৯-২০০।
১৭৪ A Comprehensive History of India, Vol. IX. (1712-1772). Ed. by Drs. A. C. Banerjee and D. K. Ghose, pp. 169.
১৭৫ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ৯।

ভেতর দিয়ে সাপ প্রবেশ করতে পারতো না, এবং হাতীর দাঁত, মৃগনাভি, বাদ্যযন্ত্র ও খ্রিস্টান বণিকদের নিকট প্রাপ্ত ইউরোপে প্রস্তুত দ্রব্যাদি ও.অন্যান্য দুর্লভ বস্তু'[১৭৬], তবে সম্ভবত সায়ের শুল্ক এর বহির্ভূত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে মুর্শিদকুলি খান দিল্লিতে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে 'পেশকাশ' প্রেরণের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখক এর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন যেটি এখানে উল্লেখ করা জরুরি এ জন্যে যে, এ থেকে বুঝা যাবে মুর্শিদকুলি রাজস্ব আদায়েই শুধু কঠোর ও নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন না, বরং রাজস্বের যথাযথ সংরক্ষণ ও পরিচালনেও তিনি অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। গোলাম হোসায়ন সলীম থেকে জানা যায়, 'এক বৎসর শেষ হয়ে নতুন বৎসর আরম্ভ হওয়ার পর ফারওয়ার্দি (অর্থাৎ আষাঢ়) মাসে সমস্ত সম্পদ ওজন ক'রে মুরশিদ কুলি খান রাজস্ব বাবদ দু'শ' গরুর গাড়ী বোঝাই ক'রে এক কোটি তিন লক্ষ টাকা ছয় শত অশ্বারোহী ও পাঁচ শ' পদাতিক সৈন্যের তত্ত্বাবধানে বাদশাহের নিকট প্রেরণ করতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি জায়গীরসমূহ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ও অন্য আদায়কৃত অর্থ বাদশাহী খাজাঞ্চিখানায় প্রেরণ করতেন।... উক্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি (ইতোপূর্বে বর্ণিত উপঢৌকনাদি) প্রেরণের সময় তিনি অশ্বারোহণে নগরের উপকণ্ঠ পর্যন্ত সঙ্গে যেতেন এবং এই বিষয় দরবারের কাগজপত্রে সরকারী ইশতেহারে লিপিবদ্ধ করাতেন। ঐ সকল দ্রব্য ও অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি ছিল এইরূপ : ধনদৌলত বোঝাই গাড়ীগুলো অন্য সুবার সুবাদারের এলাকায় পৌঁছালে উক্ত সুবাদার তার নিজের লোকজন দ্বারা গাড়ীগুলো নিজ দুর্গে আনতেন এবং পূর্বের গাড়ীগুলো থেকে মাল নামিয়ে নতুন গাড়ী বোঝাই করতেন এবং পূর্বের গাড়ী ও পাহারাদারদের ছেড়ে দিয়ে নিজ পাহারাদারদের তত্ত্বাবধানে সেগুলো পাঠাতেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের নিকট উপহার দ্রব্যাদি না পৌঁছানো পর্যন্ত পরপর সুবায় এই পদ্ধতিতে কাজ হত।'[১৭৭]

বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রে যে-ই শাসকই ক্ষমতাসীন থাকুক না কেন, তাঁকে 'পেশকাশ' প্রেরণে নবাবের এই সদা সতর্কতা, আন্তরিকতা ও নিয়মানুবর্তিতাই যে তাঁকে (মুর্শিদকুলি) দিল্লির বিভিন্ন শাসক (বলাবাহুল্য এঁদের কারও কারও সঙ্গে তাঁর একদা বৈরিতা থাকা সত্ত্বেও)-এর কাছে প্রিয় ও আস্থাভাজন করেছিল তা না বললেও চলে। মুনশী তায়েশ যথার্থই বলেন, '...রাজ্যের ব্যয়, দিওয়ানীর খরচ, দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যয় ভার মিটানোর পর প্রতি বছর বাংলার বিশেষ রাজস্বরূপে... এ টাকা পাঠানোর ব্যাপারে তিনি (মুর্শিদকুলি খান) কখনো অবহেলা ও বিলম্ব করতেন না। এটিই একমাত্র কারণ যে, যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসতেন, মুর্শিদকুলি খানকে সুবেদারি পদে বহাল রাখতেন।'[১৭৮] কঠোর-কোমল সব ধরনের মন-মানসিকতার শাসকবর্গের এরূপ প্রিয়ভাজন হতে পারা নিঃসন্দেহে কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

মুর্শিদকুলির সময়ে বাংলার ভূমিরাজস্ব-সংস্কৃতিতে নতুন একটি উপসর্গের যোগ হয়, যদিও সত্যি বলতে তা একেবারে অভিনব না হলেও বলা চলে তাঁর সময় থেকেই এটি

১৭৬ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২০০-২০১।
১৭৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২০০-২০১।
১৭৮ তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৩।

আবার নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে প্রতিপালিত হতে শুরু করেছিল। এই উৎসবটির নাম 'পুণ্যাহ'। আভিধানিক অর্থে 'পুণ্যাহ' বলতে বুঝায় 'পবিত্র দিন'[১৭৯] , এর মৌলিক অর্থ, ড. মুহম্মদ এনামুল হকের ভাষায়, 'পুণ্য কাজ অনুষ্ঠানের পক্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রানুমোদিত প্রশস্ত দিন'[১৮০] । তবে ভূমিরাজস্ব সংস্কৃতিতে এর একটি স্বতন্ত্র অভিধা রয়েছে। ব্যাপকভাবে 'পুণ্যাহ' পালনের মধ্য দিয়ে নবাব, জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় পাওনা বাবদ ভূমিরাজস্ব বছরের নির্দিষ্ট দিনে (মাস বলাই সঙ্গত) ও নির্ধারিত স্থানে (সচরাচর সদর কাছারি) আদায় করণের কাজ নিয়মিত করেন। সলিমুল্লাহর ভাষ্য মতে, 'চৈত্র মাসে রাজস্ব আদায় শেষ হতো এবং বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে মুর্শিদকুলি খান পুণ্যাহ উৎসব পালন করতেন।'[১৮১] যে সকল জমিদার, ইজারাদার, তালুকদার প্রভৃতি বিগত বছরের দেয় সম্পূর্ণ পরিশোধে সক্ষম হতো, এবং নিজেদের এলাকার উন্নয়ন ও রায়ত-নিপীড়নের অভিযোগ থেকে মুক্ত গণ্য হতো তাদেরকে কর্ম ও জিম্মাদারির স্বীকৃতিস্বরূপ 'পুণ্যাহ' উৎসবের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে অশ্ব ও 'খেলাত' (বিশেষ সম্মানের প্রতীক একজাতীয় জমকালো পোশাক) দিয়ে সম্মানিত করা হতো। অন্যদিকে ১লা বৈশাখের হিসাব-নিকাশের পর যাদের দেয় প্রাকৃতিক বা অন্য অনিবার্য কারণে আংশিক বাকি পড়তো তাদের কাছ থেকে সত্বর বকেয়া খাজনার জন্য মুচলেকা গ্রহণ করা হতো অথবা ন্যায়সঙ্গত পাওনা মওকুপ করা হতো। আবার ইচ্ছাকৃত কিস্তি-খেলাপিদের বন্দোবস্ত বাতিলসহ তাদেরকে নানারূপ শাস্তি দেয়া হতো। এ ছাড়া আগামী বছরের জমিদারি সনদ ও ইজারা বন্দোবস্তও 'পুণ্যাহ'-এর সময়ে দেয়া হতো। সুতরাং দেখা যায় 'পুণ্যাহ' এই সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ ও নতুন তাৎপর্য নিয়ে এসেছিল।

এ পর্যায়ে এ পর্যন্ত আলোচিত নবাব মুর্শিদকুলি খানের ভূমিরাজস্ববিষয়ক নানা সংস্কার ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বাংলার মোগল, বা আরও নির্দিষ্ট করে বললে নবাবি আমলে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যে চালচিত্র আমরা দেখতে পাই, তাতে এর সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে সম্পর্কিত সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি তথা আপামর রায়ত সাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল, সেটাই এখন আমাদের পর্যালোচনার বিষয়। তবে সে আলোচনায় প্রবেশের আগে আমরা এখানে আধুনিক ঐতিহাসিকদের এতদসংক্রান্ত কয়েকটি উদ্ধৃতির উল্লেখ করতে চাই যাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে এ সম্পর্কিত আধুনিক ঐতিহাসিকদের দ্বিধা-বিভক্তি।

স্যার যদুনাথ সরকার অভিমত পোষণ করেন, মুর্শিদকুলি খান তাঁর কঠোর শাসনে রায়তদের বেঁচে থাকার উদ্‌বৃত্তটুকু পর্যন্ত কেড়ে নেয়ায় সমসাময়িক বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটেছিল। তাঁর ভাষায়, 'The land revenue was forced up so high only by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman

১৭৯ সরল ছাত্রবোধ অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত, পৃষ্ঠা ২৮৯।

১৮০ প্রবন্ধ 'বাংলা নববর্ষ বা পয়লা বৈশাখ', সংগৃহীত 'বাংলা সন ও তার ঐতিহ্য', সম্পাদনা শামসুজ্জামান খান, পৃষ্ঠা ২৫।

১৮১ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫২।

torture of the contractor collectors. The pressure applied by the Nawab at the top naturally passed through the intermediate grades finally on to the actual cultivators, who were left with the bare means of existence, but every portion of the annual increase of the fields and looms above that minimum was taken away by the State. Thus, while the luxury of Delhi and Murshidabad was pampered, and Murshid Quli every year buried a new hoard in his treasure-vaults, the mass of the people browsed and died like human sheep.'[১৮২] ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন। তাঁর ভাষায়, 'মুর্শিদ কুলী খান রাজস্বের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে প্রজাদের করভার অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইল। ইহাতে তাহাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।'[১৮৩]

অন্যদিকে একই প্রসঙ্গে ড. অতুল কৃষ্ণ সুর মন্তব্য করেন, 'Under Murshid Kuly Khan Bengal enjoyed both security and prosperity. Everybody felt that there was a strong ruler at the head of the administration. ..... and the general masses enjoyed great happiness due to rice selling at only two annas a maund during his administration.'[১৮৪] অনুরূপভাবে ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও (যদিও তিনি অনেক ক্ষেত্রেই বিরূপ মন্তব্য করতে পিছপা হননি) শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের ফলে তাঁহার (মুর্শিদকুলি খাঁ) সুবাদারিকালে কিছুদিন বাংলার ভাগ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল।'[১৮৫] সুতরাং স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে মুর্শিদকুলির শাসনকালের বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে দু'ধরনের মূল্যায়নই বিদ্যমান।

তবে মোটের ওপর এ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হলো এই যে, মুর্শিদকুলির ভূমিরাজস্বের হার ছিল গতানুগতিক, অর্থাৎ সমগ্র মোগল রাজস্ব ব্যবস্থায় গড়পরতা যে হারে ও পরিমাণে রায়তদের কাছ থেকে খাজনা ধার্য ও আদায় করা হতো, তাঁর সময়েও এর বেশি ছিল না। অধিকন্তু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে রায়তের শস্যোৎপাদন হ্রাস পেলে বা আদৌ না হলে সেক্ষেত্রে পাওনা ভূমি রাজস্ব আনুপাতিক হারে কম গ্রহণ বা সম্পূর্ণ মওকুপ করা হতো, এবং একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত রায়তকে অগ্রিম 'তাকাবি ঋণ' সরবরাহের ধারাও তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন। এক কথায় এই সমুদয় বিষয়ে তিনি প্রচলিত মোগল ধারাকেই অনুসরণ করেছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে সুবিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অন্যান্য সুবাগুলিতে রায়তদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যেমন ছিল এখানেও তার ব্যতিক্রম, অন্তত যুক্তির খাতিরে বললে, না থাকার-ই কথা। তবে বাস্তবে এই অবস্থা আরও ভালো ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। এর কারণ, এক. তাঁর

১৮২ The History of Bengal, Vol. II., pp. 417.
১৮৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২২।
১৮৪ History and Culture of Bengal, pp. 131-32.
১৮৫ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৫।

কঠোর হস্তে বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ও দুই. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তাঁর পক্ষপাতহীন ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা।

মুর্শিদকুলি খান এ কথা ভালোভাবেই জানতেন যে, ভূমিরাজস্ব থেকে রাষ্ট্রীয় আয়-সম্পদ বৃদ্ধি এবং আপামর জনসাধারণ বিশেষত রায়তের জীবনের মানোন্নয়ন—এ দু'টি ধারা সমান্তরাল গতিতে প্রবাহমান রাখতে হলে প্রশাসনিক কঠোরতার পাশাপাশি সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ও ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠাই শুধু যথেষ্ট নয়, বরং সেই সঙ্গে মানুষের নৈমিত্তিক আয়-উপার্জনের সাথে দ্রব্য মূল্যের সঙ্গতি রক্ষা তথা বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করাও অত্যন্ত জরুরি। এটা করতে গিয়ে তিনি সুলতান আলাউদ্দিন খলজির নীতি অনুসরণ করেন। তিনি প্রতি সপ্তাহে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য-তালিকা তৈরি করে বাজারে-বাজারে টাঙ্গিয়ে দিতেন। সে অনুযায়ী বিশেষ গুপ্তচর নিয়োগ করে প্রতিটি বাজারের প্রতিদিনের দ্রব্য মূল্য যাচাই ও ব্যবসায়ীদের মজুতদারির খবর নিতেন। কেউ অপ্রয়োজনে মূল্য বৃদ্ধি করলে এবং অসদুদ্দেশ্যে কোন দ্রব্যের মজুতদারি শুরু করলে বা ওজনে কম দিলে তাকে ধরে এনে কঠোর শাস্তি দিতেন। তাঁর এই ব্যবস্থা সম্পর্কে গোলাম হোসায়ন সলীম খুব চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'খাদ্য দ্রব্যাদির মূল্য সস্তা করার জন্য তিনি (মুরশিদ কুলি খান) সদা সচেষ্ট ছিলেন; কাউকে খাদ্য শস্য মজুত ক'রে রাখতে দিতেন না। প্রতি সপ্তাহে তিনি খাদ্যশস্যের মূল্য-তালিকা প্রস্তুত করাতেন এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা প্রকৃত যে মূল্যে খরিদ করতো তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। দরিদ্রদের নিকট থেকে তালিকা-নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অধিক দাম আদায় করলে তিনি ব্যবসায়ী, মহলদার ও ওজনদারদের নানা প্রকার শাস্তি দিতেন এবং গাধার পিঠে চড়িয়ে শহর ঘোরাবার আদেশ দিতেন।'[১৮৬]

এ ছাড়া কৃত্রিমভাবে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টির যে কোন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন এবং তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। কোন এলাকায় খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে সেখানে যাতে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি না পায় সে জন্যে ত্বরিৎ পার্শ্ববর্তী অন্যান্য অঞ্চল থেকে সেখানে খাদ্য-শস্য সরবরাহের পদক্ষেপ নিতেন। এজন্য পণ্য সরবরাহকারীদের বাণিজ্য শুল্ক রেয়াত দিতেন। অন্যদিকে ইংরেজ, ফরাসি প্রভৃতি বিদেশি বণিকেরা যাতে রপ্তানি নিষিদ্ধ পণ্য ও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসামগ্রী অনুমোদিত পরিমাণের অধিক বিদেশে পাচার করতে না পারে সে জন্যে কড়া চৌকির ব্যবস্থা করতেন। 'রিয়াজ'-এর লেখক বলেন, 'জাহাজের কাপ্তেনরা কোনো প্রকার খাদ্যশস্য রফতানি করতে পারতো না; জাহাজের লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের অধিক তারা জাহাজে নিতে পারতো না। জাহাজ ঘাটে ভিড়বার সঙ্গে সঙ্গে হুগলী বন্দরের ফৌজদার জাহাজ পরিদর্শনের জন্য একজন কর্মচারী পাঠাতেন ও সমস্ত খাদ্যশস্য আটক করতেন, যাতে জাহাজের লোকদের প্রয়োজনের অধিক খাদ্যশস্য রফতানি না হয়।'[১৮৭] প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক জে. ট্যালবয়েজ হুইলারও মুর্শিদকুলি খানের বাজার মূল্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, 'He kept down the price of grain by a despotic process

১৮৬ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২২১।
১৮৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২২১।

which is greatly admired in Oriental countries. He employed spies to learn all that was going on in the markets. He punished every attempt to raise prices. He broke up private hoards, and compelled the owners to sell them in the bazars. He prohibited all exportations of grain, and would not permit European ships to carry away more than was necessary for victualling the crew during the voyage.'[১৮৮]

বস্তুত বাজারে দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের এ সকল ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রতিপালিত হওয়ায় প্রায় ১০০ বছর আগেও দ্রব্য মূল্য যা ছিল, মুর্শিদকুলির সময়েও তা একরূপ অনড় ছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাঁর সময়ে বাজারে চালের মূল্যের কথা বলতে পারি। পর্তুগীজ পরিব্রাজক সেবাস্টিন মানরিক-এর ১৬২৮ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ভ্রমণের বিবরণী থেকে জানা যায় যে তৎকালে বাংলায় ইউরোপের চেয়ে উন্নত মানের সুগন্ধি চাল ('Rice....far superior to that of Europe particularly the scented variety which is not only of extraordinary fineness and delicacy of flavour, but even retains its fragrance after it had been cooked, ...'[১৮৯]) টাকায় প্রায় ৫ মণ পাওয়া যেতো।[১৯০] ঠিক অনুরূপভাবে প্রায় এক শতাব্দী পরে মুর্শিদকুলির রাজত্বকালে বাংলায় টাকায় সাধারণত ৪ মণ(সলিমুল্লাহ[১৯১]) বা ৫/৬ মণ[১৯২] চাল কিনতে পাওয়া যেতো। বস্তুত এই দীর্ঘ সময়ে দেশে কৃষি কাজের উন্নতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, অথচ দ্রব্য মূল্য প্রায় শতাব্দী কাল আগের পর্যায়ে স্থিতিশীল ছিল; এটি একদিকে যেমন জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না-পাওয়ার ইঙ্গিত করে (এ জন্যে অনেক আধুনিক ঐতিহাসিক মুর্শিদকুলির বিরূপ সমালোচনাও করেছেন), তেমনি অন্যদিকে যে কোন দেশের যে কোন কালে ও অঞ্চলে সামগ্রিক অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি তথা উন্নতি-অবনতি যা-ই ঘটুক না কেন, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াই যেখানে সাধারণ নিয়ম ও রীতি, সেখানে জনগণের ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধি না করেও (যা সচ্ছলতার নিদর্শন নয় হেতু দেশীয় অর্থনীতির জন্যও মঙ্গলজনক নয় স্বীকার করি) বর্তমানের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে জনগণকে প্রায় শতাব্দী কাল আগের মূল্যে দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয়ের সুযোগ প্রদান নিশ্চয়ই কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। সুতরাং ড. সুশীল চৌধুরীর ধারণার সাথে এক মত হয়ে আমরা নিঃসন্দেহে এ উক্তি করতে পারি যে, 'নবাবি আমলে বাংলায় সাধারণ মানুষের আয় যে খুবই কম ছিল তা সুস্পষ্ট। কিন্তু এ অল্প আয়েও সে বেশ স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারতো। টাকার ক্রয়ক্ষমতা এত বেশি যে মাসে কয়েক আনা খরচ করে একজন লোক প্রচুর খেতে পারতো। কোম্পানির আমল, আঠারো শতকের শেষদিক ও উনিশ শতকের প্রথমদিকের তুলনায় একজন সাধারণ মানুষ নবাবি আমালের বাংলায় অনেক বেশি খেতে পেতো এবং তার আর্থিক অবস্থাও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে অনেক বেশি ভাল ছিল।'[১৯৩]

১৮৮ India Under the Muslim Rule, Vol. IV., Part. II., pp. 527.
১৮৯ দেখুন, 'বাংলার বিদেশী পর্যটক', ড. ওয়াকিল আহমদ, পৃষ্ঠা ১২৯।
১৯০ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'বাংলায় বিদেশী পর্যটক', পৃষ্ঠা ৬৭।
১৯১ The History of Bengal, Vol. II., 417.
১৯২ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২২১।
১৯৩ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬১।

একজন রাজস্ব-প্রশাসক হিশেবে মুর্শিদকুলির খ্যাতি যে পরিমাণ, তার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না ন্যায়-বিচারক হিশেবে তাঁর প্রসিদ্ধি। প্রতি সপ্তাহে দু'দিন তিনি স্বয়ং বিচার কার্য করতেন।[১৯৪] সকলের প্রতি সমান দৃষ্টিতে ন্যায়-বিচার করতেন। তাঁর ন্যায় বিচারের প্রকৃতি এমনই ছিল যে অপরাধ করার জন্য তিনি স্বীয় পুত্রকে পর্যন্ত প্রাণ দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত হননি। 'So impartial was he in his decisions, and so rigid in the execution of the sentence of the law, that he put his own son to death for an infraction of its regulations.'[১৯৫] কোথাও চুরি-ডাকাতি হলে তিনি আগে সংশ্লিষ্ট এলাকার ফৌজদার ও জমিদারদেরকে ধরতেন। হয় তারা দুষ্কৃতকারীকে ধরে দিতো, নতুবা চুরি যাওয়া দ্রব্যের সমমূল্য ক্ষতিগ্রস্তকে দিতে বাধ্য হতো। আর চোর-ডাকাত ধরা পড়লে তাদেরকে জীবিত শূল বিদ্ধ করে হত্যা করা হতো। সেই সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো। নবাবের ভাবশিষ্য ও কাটোয়া-মুর্শিদগঞ্জের থানাদার মুহম্মদ জান কখনও কখনও চোর-ডাকাত ধরে কেটে টুকরো টুকরো করে সদর রাস্তার ওপর লটকিয়ে রাখতেন। যা হোক, এর ফলে এমন ব্যাপার হয়েছিল যে, 'নওয়াবের শাসন কালে চোর, ডাকাত, লুটেরা ও নরহন্তাদের নাম বাংলা থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। শহর ও গ্রামের বাশিন্দাগণ পূর্ণ শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাস করতো।'[১৯৬]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে নবাব মুর্শিদকুলি খানের প্রায় সিকি শতাব্দীর শাসনকালে অন্ত্য-মধ্য বাংলার হিন্দু-মুসলিম আপামর রায়তশ্রেণীর আর্থিক সামর্থ্যের বিকাশ না-ঘটলেও মোটের ওপর তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অসচ্ছল ছিল না। অধিকন্তু সামাজিক জীবনে অভূতপূর্ব শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় থাকায় দিল্লিকেন্দ্রিক ক্ষয়িষ্ণু মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গা-গড়ার ডামাডোল বাংলাকে মোটেও আচ্ছন্ন করতে পারেনি। ফলে যে দু'টি মৌল উদ্দেশ্য (ভূমিরাজস্ব থেকে রাষ্ট্রীয় আয়-সম্পদ বৃদ্ধি এবং একই সঙ্গে রায়তের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রতিষ্ঠা) নিয়ে মুর্শিদকুলি বাংলায় দিওয়ানি ও পরবর্তীকালে সুবাদারি শুরু করেছিলেন, যে কোন বিচারে তাঁর সেই মিশন সফল হয়েছিল— এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।[১৯৭]

১৯৪ তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭৩।
১৯৫ A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 175.
১৯৬ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২১৯।
১৯৭ ড. আবদুল করিমও বিষয়টি চমৎকার বলেছেন, 'The evidence of agricultural loans (taqawi) having been advanced, of the moderate assessment of revenues, the policy of basing assessment on the productivity of the land and the capacity of the husbandmen to pay, of the strict collection of revenues and their regular despatch to the imperial court, all these suggest that Murshid Quli Khan's reforms were aimed at achieving the double purpose of collecting as much revenue as possible and at the same time making the peasants happy and prosperous.' (Murshid Quli Khan and His Times, pp. 90).

নবাব শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান (১৭২৭-১৭৩৯)

নবাবি আমলের বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মূলভিত্তি ও সোপান মুর্শিদকুলি খানের যুগ থেকেই এক প্রকার স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। 'রাজস্ব পরিচালনার নীতি, রাজস্বের গতি ও প্রবণতা এবং রাজস্বের সঞ্চয় ও ব্যয়ের মৌল প্রকরণগুলি মুর্শিদকুলি খাঁই নির্দিষ্ট করে গিয়েছিলেন।'[১৯৮] শুজাউদ্দিনের উত্তরসূরী ও পুত্র সরফরাজ খান এবং পরবর্তী নবাবেরা কেউ-ই স্থিত ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার মূল সূত্র ও কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন করেননি। সম্ভবত এর কোন প্রয়োজনও তখন ছিল না। তাঁরা শুধু 'আবওয়াব' বৃদ্ধি করেই রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের সঙ্গে আয়ের সঙ্গতি রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও সত্য বলতে আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত উদ্‌বৃত্ত ভূমিরাজস্ব আয়-এর বৃহদংশই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন নবাবদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও ভোগ-বিলাসেই ব্যয়িত হয়েছিল, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও কৃষির উন্নয়নে এর অবদান ছিল শূন্যই বলা যায়। বস্তুত এ বিষয়গুলিকে মনে রেখে আমরা এখন মুর্শিদকুলি খান-উত্তর বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা নিয়ে নীচে আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

মুর্শিদকুলি খানের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। তাঁর মৃত্যুর পরে জামাতা শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান বাংলার মসনদ অধিকার করেন (জুলাই ১৭২৭ খ্রিঃ)। তবে মুর্শিদকুলির ব্যক্তিগত পছন্দ ও দুর্বলতা ছিল দৌহিত্র সরফরাজ খানের প্রতি।[১৯৯] কিন্তু পিতা-পুত্রের সম্ভাব্য অন্তর্ঘাতী লড়াই শেষ পর্যন্ত রক্তপাতহীনভাবেই পিতা শুজাউদ্দিনের দিকে ঝুঁকে যায়। দিল্লির দরবারি রাজনীতি, উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদের ব্যাপক সমর্থন ও বিশেষত মুর্শিদকুলির বিধবা পত্নীর হস্তক্ষেপ প্রভৃতি ওড়িশার নায়েব-নাজিম (সহকারী সুবাদার) শুজাউদ্দিনকে বাংলা ও ওড়িশার সুবাদার বা নবাব পদে আসীন করলেও ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত তিনি বিহারের সুবাদারি পাননি। এ যাবৎ তিনি বাংলা ও ওড়িশার সুবাদার হিশেবে বাদশাহি দরবারে বার্ষিক নিয়মিত 'পেশকাশ' প্রেরণ করে আসছিলেন। ফখরুদ্দৌলা ছিলেন এ সময় বিহারের সুবাদার। তার পদচ্যুতির পর বিহারের দায়িত্ব ভারও শুজাউদ্দিনের ওপর অর্পিত হয়। এখানে প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা দরকার যে, এই প্রথম বাংলা, বিহার ও ওড়িশা—এই তিনটি সুবার প্রশাসনিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা একই সঙ্গে এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইতোপূর্বে মুর্শিদকুলি খান মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত বাংলা ও ওড়িশার সুবাদার ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও বিহারের সুবাদারি বা নিদেন পক্ষে সহকারী সুবাদারের দায়িত্বও পাননি। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিহার-এর দিওয়ান হিশেবে নিযুক্তি লাভ করলেও সেই দায়িত্ব মূলত একজন সহকারী বা ডেপুটিকে দিয়েই আগাগোড়া পালন করে এসেছেন, স্বয়ং কখনও সেখানে পদার্পণ করেননি।[২০০] সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিহারের সুবাদারি লাভের ফলে 'বাংলা-বিহার-ওড়িশার প্রশাসনিক ঐক্য স্থাপিত

১৯৮ ড. রঞ্জিত সেন, ইতিহাস অনুসন্ধান/৩, পৃষ্ঠা ১৭৭।

১৯৯ সরফরাজকে বাংলার সুবাদার করার জন্য তিনি দিল্লিতে বাদশাহের দরবারে সরফরাজের পক্ষে তদ্বির করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছিলেন এবং দৌহিত্রের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি জীবদ্দশায় চুনাখালিতে জমিদারিও ক্রয় করেন। তা সত্ত্বেও মৃত্যু পথযাত্রী প্রবল পরাক্রমশালী মুর্শিদকুলির সেই শেষ ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

২০০ The History of Bengal, Vol. II., pp. 399.

হল সুজাউদ্দীনের আমলে।'[২০১] সেই সঙ্গে এটাও জানিয়ে রাখা দরকার, মুর্শিদকুলি খানের জ্যেষ্ঠ জামাতা হিশেবে শুজাউদ্দিন নবাব বা সুবাদার নিযুক্ত হওয়ায় মোগল শাসনতন্ত্রের ঐতিহ্য-বিরোধীভাবেই শুধু শুজাউদ্দিনের মাধ্যমে বংশানুক্রমিক সুবাদারির যুগ শুরু হল না[২০২], পরন্তু তা এই তিন প্রদেশের ভবিষ্যত রাজনীতির ধারা ও উত্তরাধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যা হোক, নতুন নবাব বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবিশাল ভূখণ্ডে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার মৌল প্রবণতাগুলিতে পূর্বাপর অক্ষুণ্ন রেখেও যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা এক-এক করে আলোচনা করা হলো।

এক. শুজাউদ্দিন খান মসনদে আরোহণের পর মুর্শিদকুলি খান প্রবর্তিত 'মাল-জামিনি' ব্যবস্থা তথা ইজারাদারদের সঙ্গে সম্পাদিত রাজস্ব বন্দোবস্ত অব্যাহত রাখেন। এর পাশাপাশি তিনি জমিদারদের সঙ্গেও সম্পর্কোন্নয়নের সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। বলা যায় এ বিষয়ে তিনি উদার নৈতিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভূমিরাজস্ব অনাদায় ও অন্যান্য কারণে যে সমস্ত জমিদার-তালুকদার প্রভৃতিকে মুর্শিদ্‌কুলি খান কয়েদ করে ন্যানারূপ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনে নিপতিত করেছিলেন (এদের অনেকে বছরের পর বছর এভাবে অন্ধকার শীতল প্রকোষ্ঠে কালাতিপাত করছিলেন), শুজাউদ্দিন তাদেরকে কিছু শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেন। 'সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন'-এর স্বনামধন্য লেখক সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাব্‌তাবায়ী এ সম্পর্কে বলেন, 'নিজের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া শুজা খাঁ যে সকল জমিদার ও অন্যান্য ভূম্যধিকারীকে নির্দোষ এবং অপরাধ বা প্রতারণামুক্ত দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।'[২০৩] বকেয়া খাজনা কিস্তিতে এবং ভবিষ্যতে তা নিয়মিত যথাসময়ে প্রদানের অঙ্গীকারে তিনি জমিদারদের সঙ্গে নতুনভাবে চুক্তিতে আবদ্ধ হন। দীর্ঘদিন বিবিধ উৎপীড়ন ও তীব্র যন্ত্রণা ভোগের পর মুক্তির অনাবিল আনন্দে জমিদারগণও নতুন নবাবের 'সদাশয়তা ও মহত্ত্বে তাহারা তাঁহার প্রশংসায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং আল্লাহর নিকট তাঁহার (শুজাউদ্দিন) অভগ্ন সুদীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া সর্বসম্মতভাবে উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এখন হইতে তাহারা পূর্বাপেক্ষা সহস্রগুণ নিয়মিতভাবে খাজনা দিবেন।'[২০৪] এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, জমিদারদের প্রতি এই উদারতা ও নমনীয়তা প্রদর্শনের ফলে রাষ্ট্রের স্বার্থ হানি তথা ভবিষ্যত ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রমের কোন ক্ষতি বা ব্যত্যয় হয়েছিল কি-না? এর উত্তর দু'ভাবে দেয়া যায়। প্রথমত মুর্শিদকুলির সময়ে তাঁর কঠোর নীতির কারণে এটা স্বীকার করতেই হবে, এতদঞ্চলের বেশ কিছু জমিদারি ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল এবং রাষ্ট্র ও

২০১ মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৩৮।

২০২ শুজাউদ্দিনের আগে আর কেউ প্রাদেশিক পর্যায়ে বংশানুক্রমিক শাসন-কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বাংলার জন্যই শুধু নয়, বরং সমগ্র মোগল যুগের প্রেক্ষাপটেই এটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী প্রাথমিক নমুনা। অযোধ্যা প্রদেশে, এর সূচনা হয় ১৭৩৯ খ্রিস্টাব্দে, নবাব সাদাত খানের মৃত্যুর পর তদীয় জামাতার নবাবি লাভে। অনুরূপভাবে হায়দারাবাদে নবাব নিজাম-উল-মুলুক-এর মৃত্যুর পর তৎপুত্র নাসির জং ১৭৪৮ সালে নবাব হওয়ায় সেখানেও বংশানুক্রমিক নবাবির ধারা চালু হয়। সুতরাং সময়ের বিচারে এ ক্ষেত্রে বাংলাই ছিল 'পাইওনীয়ার'।

২০৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩০০।

২০৪ পৃষ্ঠা ৩০৯।

রায়তের মধ্যবর্তী এই উল্লেখযোগ্য ও মোগল শাসনতন্ত্র-স্বীকৃত স্তরটি সততই প্রবল হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নতুন সুবাদারের আমলে রাষ্ট্র ও জমিদারের এই শীতল সম্পর্কের অবসান ঘটে। পরিবর্তিত অবস্থায় জমিদারগণ যে নিয়মিত ও যথা পরিমাণে খাজনা পরিশোধ করতো, তার প্রমাণ শুজাউদ্দিনের সময়েও রাষ্ট্রীয় পাওনা আগের মতোই পাওয়া যেতো বা দাবি অনুপাতে অনুরূপ আদায় করা সম্ভব হয়েছিল।[২০৫] সুতরাং জমিদারদের প্রতি শুজাউদ্দিনের এই নমনীয়তা রাজকোষের জন্য মোটেও ক্ষতিকর হয়নি। Hunter বলেন, 'Despite this leniency there was no falling off in the revenues.'[২০৬] দ্বিতীয়ত মুর্শিদকুলির সময়ে সমগ্র 'খালসা' অঞ্চলে যে ২৫টি 'ইহ্‌তিমাম' (১৫টি বৃহৎ জমিদারি ও ১০টি ক্ষুদ্র জমিদারি ও মুস্কুরি তালুক সমন্বিত এলাকা) নিয়ে গড়ে উঠেছিল তা এই আমলেও অব্যাহত ছিল। এবং সত্যি বলতে এই 'ইহ্‌তিমাম'গুলি ছিল রাষ্ট্রীয় ভূমিরাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস। এগুলি থেকে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্বের একটি বিস্তৃত তালিকা বা পরিসংখ্যান নীচে উদ্ধৃত হলো :

ইহ্‌তিমাম-এর নাম	পরগণার সংখ্যা	ভূমিরাজস্বের পরিমাণ
বর্ধমান	৫৭	২০,৪৭,৫০৬ টাকা
রাজশাহি	১৩৯	১৬,৯৬,০৮৭ "
দিনাজপুর	৮৯	৪,৬২,৯৬৪ "
নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর	৭৩	৫,৯৪,৮৪৬ "
বীরভূম	২২	৩,৬৬,৫০৯ "
কলকাতা	২৭	২,২২,৯৫৮ "
বিষ্ণুপুর	২	১,২৯,৮০৩ "
ইউসুফপুর (যশোর)	২৩	১,৮৭,৭৫৪ "
লস্করপুর (পুটিয়া)	১৫	১,২৫,৫১৬ "
রুকনপুর	৬২	২,৪২,৯৪৩ "
মাহমুদশাহি (ভূষণা)	২৯	১,১০,৬৩৩ "
ফতেসিংহ	১১	১,৮৬,৪২১ "
ইদ্রাকপুর (ঘোড়াঘাট)	৬০	৮১,৯৭৫ "
ত্রিপুরা (অধিকৃত অঞ্চল)	২৪	৪৭,৯৯৩ "
পাচেত বা পঞ্চকোট	২	১৮,২০৩ "
জালালপুর (ঢাকা নিয়াবত)	১৫৫	৮,৯৯,৭৯০ "
শেরপুর-ধর্মপুর (পূর্ণিয়া)	১৩	৯৮,৬৬৪ "
শেখের কুণ্ডি (রংপুর)	২৪৪	২,৩৯,১২৩ "

২০৫ 'His collection of the revenues was not less exact than that of his predecessor, while he was free from the reproach of cruelty and religious bigotry.' (A Statis. Acc., Vol. IX., p. 178).

২০৬ Ibid., pp. 178.

কাঁকজোল (রাজমহল)	১০	৭৪,৩১৭	"
তমলুক (হিজলি)	১৬	১,৮৫,৭৬৫	"
শ্রীহট্ট বা সিলেট	৩৬	৭০,০১৬	"
ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম	অধিকাংশই জায়গির ভূমি		
বন্দর বালাশোর (বলেশ্বর)	২৮	১,২৯,৪৫০	"
সায়রাত মহল	৩	৯,১৩,৬৪৭	"
মুস্কুরি ও হুজুরি তালুক	১৩৬	৭,৮৫,২০১	"
	১,২৭৬ টি	১,০৯,১৮,০৮৪	টাকা

এখানে উল্লেখ্য যে শুজাউদ্দিন খানের সময়ে ভূমিরাজস্ব থেকে রাষ্ট্রের মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা। উপরের তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় এই রাজস্বের দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি মুর্শিদকুলি খানের সময়কার 'ইহ্‌তিমাম'—যা শুজাউদ্দিনের রাজত্বকালেও বহাল ছিল এবং বস্তুত যেগুলির ভূমিরাজস্ব আদায় নিয়ে তখন পর্যন্ত কোন বড়ো রকমের সমস্যা ছিল না,—এ থেকে 'হাসিল' হতো। উপরন্তু শুজাউদ্দিনের পরিবর্তিত উদার নীতি ও নমনীয়তার ফলে যদি ঐতিহাসিকের এ উক্তিকে যথার্থ বলে ধরে নিই যে, 'সুজাউদ্দীনের আমলে জমিদারী এলাকা হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পেয়েছিল'[২০৭], এবং 'এই কৌশলে (জমিদারদের প্রতি গৃহীত ব্যবস্থা) তিনি জায়গীরের মুনাফা ও গুদাম প্রভৃতির উপর ধার্য কর ছাড়াও সহজেই এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায়'[২০৮] করতে সমর্থ হয়ে থাকেন, তা হলে নিঃসন্দেহে বলতে হয়, জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এজেন্টদের প্রতি নবাব শুজাউদ্দিনের গৃহীত নীতি বাস্তব ও সময়োপযোগী ছিল, এবং রাষ্ট্রের জন্য তা মঙ্গলজনক হয়েছিল।

দুই. ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহার প্রদেশের দায়িত্ব লাভের পর তিনটি সুবাদারির শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার্থ শুজাউদ্দিন সমগ্র নিজমাত-অঞ্চলকে ৪টি প্রধান প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত করেন। মোগল প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্থিত অবকাঠামোয় এটি ছিল একটি নতুন পদ্ধতি।[২০৯] তবে তিনি মূলত বাংলা সুবাকেই খণ্ডিত করেছিলেন, অন্য দু'টি সুবা অখণ্ডই ছিল। নতুন এই প্রশাসনিক বিভাগ বা অঞ্চল (প্রদেশের অধীনে একে 'উপপ্রদেশ'ও বলা যেতে পারে[২১০]) গুলি নিম্নরূপ :

(ক) পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কিছু অংশ নিয়ে কেন্দ্রীয় বা মুর্শিদাবাদ বিভাগ;

(খ) পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ, সিলেট ও চট্টগ্রাম এবং উত্তরবঙ্গের অবশিষ্ট এলাকা নিয়ে ঢাকা বা জাহাঙ্গিরনগর বিভাগ; এবং (গ) বিহার ও (ঘ) ওড়িশা।

২০৭ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৩।
২০৮ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২২৮।
২০৯ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১।
২১০ প্রাক্-পলাশী বাংলা, ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০।

এগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদকেন্দ্রিক প্রধান বা কেন্দ্রীয় বিভাগের শাসন কর্তৃত্ব নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত রেখে[২১১] অন্য ৩টি বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্বে তিনি ৩ জন 'নায়েব-নাজিম' বা সহকারী সুবাদার নিযুক্ত করেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে, রাজধানীকেন্দ্রিক প্রশাসনিক বিভাগের জন্য তিনি ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা-পর্ষৎ বা কাউন্সিল গঠন করেন এবং এই কাউন্সিলের সদস্যমণ্ডলীর পরামর্শক্রমে এর শাসন কার্য পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখক যদিও বলেন, যে, তিনি (শুজাউদ্দিন) 'আরাম-আয়েশপ্রিয় হওয়ায় নিজামতের কার্যাদি সম্পাদনের জন্য.....তিনজনের সমন্বয়ে একটি কাউন্সিল গঠন ক'রে তাদের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং নওয়াব নিজে ভোগবিলাসে রত হন'[২১২] , তথাপি আমাদের মনে হয় কাউন্সিল গঠন করে উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাজ্য শাসন প্রক্রিয়ায় নবাব শুজাউদ্দিনের উদার মানসিকতা ও অত্যুজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল। ড. আবদুল করিম বলেন, 'প্রশাসনে শুজাউদ্দিনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠন।'[২১৩] এক হিসেবে এই কাউন্সিলে নবাব যে ৩ জন ব্যক্তি (হাজি আহমদ, রায় আলম চাঁদ ও জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ[২১৪])-র সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাংলার এক একজন দিকপাল ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সুযোগসন্ধানীও বটে। এঁদের মধ্যে বৈচিত্র্যময় জীবনের অধিকারী হাজি আহমদ ছিলেন কূটনীতিতে অত্যন্ত পরদর্শী। নবাব প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁর পরামর্শকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। রায় আলম চাঁদ ছিলেন নিজামত ও দিওয়ানির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর পরামর্শেই মূলত দিওয়ানি বা ভূমিরাজস্ব বিভাগের যাবতীয় নীতি-কাঠামো পরিচালিত হতো, যদিও সরকারিভাবে তখন পর্যন্ত দিওয়ান ছিলেন নবাব-তনয় সরফরাজ খান। 'রিয়াজ'-এর লেখক নিজেও স্বীকার করেন, 'নিজামত ও দেওয়ানির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হওয়ার পর রায় আলমচাঁদ সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট হ্রাস করেন এবং তজ্জন্য এক-হাজারীর ব্যক্তিগত মনসব ও 'রায়-রায়নে' উপাধি লাভ করেন।'[২১৫] উল্লেখ্য বাংলার নিজামত ও দিওয়ানি নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেও এই জাতীয় 'রায়-রায়ান' উপাধি ইতোপূর্বে আর কেউ পায়নি।[২১৬] সুতরাং এটি অবশ্যই ছিল রায় আলম চাঁদের কাজের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও তাঁর জন্যে শ্লাঘার বিষয়। অন্যদিকে কাউন্সিলের শেষোক্ত জন ছিলেন জগদ্বিখ্যাত (ততোধিক কুখ্যাতও) জগৎশেঠ ফতেহচাঁদ—তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার, ভারতের বিভিন্ন শহরে ও বন্দরে যার ব্যবসায়িক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছিল। বলা যায় 'জগৎশেঠের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও বণিকরা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে টাকা ও মাল পাঠাইত। এই ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর আয় হইত। জমিদাররা তাঁহার

২১১ Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 174.
২১২ পৃষ্ঠা ২২৯।
২১৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১।
২১৪ প্রথম দিকে আলিবর্দি খানও এই কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। (দেখুন, ড. করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮১, ৮৪।
২১৫ পৃষ্ঠা ২৩০।
২১৬ পৃষ্ঠা ২৩১।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে রাজকোষে রাজস্ব জমা দিতেন। অনেক সময় জগৎশেঠ তাঁহাদের রাজস্বের জন্য নবাবের নিকট জামিন হইতেন। নবাব শুজাউদ্দিন জগৎশেঠের মাধ্যমে সম্রাটের নিকট রাজস্ব পাঠাইতেন। সমৃদ্ধ ব্যাঙ্কার হিসাবে সর্বত্র জগৎশেঠের খাতির ছিল। নবাবের দরবারে তাঁহার অসামান্য প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২১৭] তবে সত্যি বলতে উপরিউক্ত তিন ব্যক্তির ওপর নবাবের অত্যধিক নির্ভরশীলতা এবং রাজত্বের শেষ দিকে প্রশাসনিক কাজকর্মে উদাসীনতা ও দিনরাত ভোগ-বিলাসে রত হয়ে পড়ার ফলে এঁরা নিজেদের অবস্থানগত প্রশাসনিক সুযোগসুবিধাকে প্রবলভাবে ব্যক্তিস্বার্থে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। ড. করিমের ভাষায়, 'সুবাদারের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানের অভাবে উপদেষ্টা কাউন্সিলের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা নিজেদের স্বার্থে তা ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম দেশের স্বার্থের জন্য পরম ক্ষতিকর হয়।'[২১৮] শুজাউদ্দিন সুবাদার হলেও এক পর্যায়ে মসনদের অন্তরালে এঁরাই প্রশাসনের সকল বিষয়ে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। এঁদের হীন স্বার্থপরতা ও দরবারি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র নবাব ও তৎপুত্র সরফরাজের মধ্যে পর্যন্ত মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে।[২১৯]

যা হোক, অন্য তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে শুজাউদ্দিন খান যাঁদেরকে 'নায়েব-ই-নাজিম' বা ডেপুটি নিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষত তাঁর আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ জন[২২০] হলেও প্রকৃতপক্ষে এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব পদে উপযুক্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঢাকা নিয়াবত বা জাহাঙ্গিরনগরের নায়েব-নাজিম ছিলেন তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান বা মিরজা লুৎফুল্লাহ। তিনি বস্তুত নবাব মুর্শিদকুলির সময়ে এই পদে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। শুজাউদ্দিন তাঁর নিয়োগ বহাল রাখেন। শ্বশুরের মতো বিলাস-ব্যসনের প্রতি তাঁর কোন আসক্তির কথা জানা না গেলেও কাব্যচর্চার মতো সুকুমার কলার প্রতি তাঁর প্রবল দুর্বলতা ছিল।[২২১] তাঁর সুযোগ্য ও বিশ্বস্ত নায়েব মির হাবিব ঢাকা নিয়াবতের প্রশাসনিক ব্যয় সঙ্কোচন ও ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে খুবই তৎপর ছিলেন। তিনি দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব স্বয়ং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করতেন। তাঁর কঠোর ব্যয় সঙ্কোচন-নীতি অনুসরণের ফলে নৌ-যুদ্ধবহর, গোলন্দাজ ও সৈন্যবাহিনীর ব্যয় হ্রাস পায়। এতে করে প্রাদেশিক রাজকোষের ওপর চাপ অনেকটা কমে যায়। তবে তাঁর মধ্যেও ব্যক্তি-স্বার্থ চরিতার্থ করার অভিলাষ ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত ঢাকা নিয়াবত সব সময়ই ছিল তুলনামূলক উর্বর অঞ্চল। এখানে ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল লাভজনক। স্বভাবতই তাঁর (মির হাবিব) পরামর্শ ও প্ররোচনায় নায়েব-নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান নতুনভাবে আজিম-উশ-শানের আমলে 'সওদা-ই-খাস' বা ব্যক্তিগত

২১৭ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩০৩।
২১৮ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩।
২১৯ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৩৩।
২২০ যুবরাজ সরফরাজ খান (পুত্র,), মুহম্মদ তকি খান (পুত্র), দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান (জামাতা) প্রমুখ।
২২১ ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন, 'Shuja-ud-din's son-in-law, Murshid Quli II., ...possessed a fine taste for poetical composition and calligraphy.' (The History of Bengal, Vol. II., pp. 426).

(এখানে নবাব সরকারের) ব্যবসা শুরু করেন। এ ছাড়া অন্যান্য উপায়েও এ সময়ে ঢাকা নিজামত বিশেষ করে এর নাজিম ও তাঁর নায়েব যথেষ্ট অর্থ-বিত্ত সঞ্চয় করেন।[২২২] বাদশাহি রাজস্ব আদায়ের অজুহাতে তিনি পরগণা জালালপুরের জমিদার নূরুল্লাহ খানকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করে মৃতের 'কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের টাকাকড়ি, জহরতাদি, রেশমের বস্ত্রাদি ও নূরউল্লাহর হাবসী নারীপুরুষ দাসদাসীদের বাজেয়াফত করেন।'[২২৩] মির হাবিব পাট-পসারের জমিদার আগা সাদেক (পরবর্তীকালে মিরজা সৈয়দ আহমদ নামে অধিক পরিচিত ও রংপুর-ঘোড়াঘাট অঞ্চলের ফৌজদার নিযুক্ত)-কে দিয়ে কৌশলে নামমাত্র যুদ্ধে ত্রিপুরা রাজকে পরাজিত করে শেষোক্তের রাজধানী চণ্ডীগড় অধিকার করেন এবং 'বিপুল মালমাত্তা, মূল্যবান দ্রব্যাদি ও বহু হস্তী'[২২৪] দখলপূর্বক জাহাঙ্গিরনগর নিজামতের কব্জায় নিয়ে আসেন।[২২৫]

ঢাকায় প্রায় ৭ বছরের নায়েব-ই-নাজিমের দায়িত্ব পালন শেষে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান ওড়িশায় একই পদে বদলি হন।[২২৬] হাবিবও তাঁর সঙ্গে যান। সেখানেও তিনি (হাবিব) নানা কূটকৌশল, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও চাতুর্য এবং কর্ম-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে স্থানীয় জমিদারদেরকে নবাবের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে নিয়মিত ভূমিরাজস্ব আদায় করেন। ফলত বিভিন্নভাবে 'ওড়িশার শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে মীর হবিব উক্ত সুবাকে উদ্‌বৃত্ত অঞ্চলে পরিণত করেন।'[২২৭]

দুই. মুর্শিদকুলির ঢাকা ত্যাগের পর এখানকার নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত হন নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খান। তবে তিনি কখনও রাজধানী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এদিকে আসেননি, বরং বরাবরই একজন ডেপুটি নিয়োগ করে এই গুরু দায়িত্ব পালন করেন। এই ডেপুটির নাম ছিল গালিব আলি খান। তিনি অনুপস্থিত নায়েব-ই-নাজিমের কর্তব্যকর্ম বেশ দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পাদন করেন। তার সহকারী হিশেবে এই সময় দিওয়ানি বিভাগের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন যশোবন্ত রায়। রায় মুর্শিদকুলি জাফর খানের সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তিনি ছিলেন 'রাজস্ব দফতরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মকর্তা'। এক কথায় ঢাকা নিজামতের 'রাজস্ব ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি, খাস জমি-ব্যবস্থা, জায়গীর, নৌবহর ও গোলন্দাজ বাহিনী, হিসাব নিকাশ ও শুল্ক বিভাগীয় সমস্ত কাজের ভার'[২২৮] তাঁর ওপর ন্যস্ত হয়েছিল। তিনি 'সততা, আন্তরিকতা ও বিজ্ঞতার সাথে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোনিবেশ করে কেবল যে রাজ্যের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি

---

২২২ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৩৫।

২২৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৫।

২২৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৬।

২২৫ ড. মুহম্মদ মোহর আলি, ত্রিপুরা বিজয়াভিযানকে মির হাবিবের 'সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব' ('most notable achievement') বলে বর্ণনা করেছেন। (History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A, pp. 585).

২২৬ ওড়িশায় এই সময় নায়েব-নাজিম ছিলেন শুজাউদ্দিনের অপর পুত্র মুহম্মদ তকি খান। তিনি শাসন কার্যে ততোটা যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়।

২২৭ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৩৭।

২২৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭।

করেছিলেন তাই নয়, পরন্তু প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যও বৃদ্ধি করেছিলেন।'[২২৯] তিনি মির হাবিবকর্তৃক প্রজা-উৎপীড়নমূলক যে সমস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল সেগুলির বিলোপ সাধন করেন এবং 'সওদা-ই-খাস' সম্পূর্ণ বাতিল করেন। এছাড়া যশোবন্ত রায়ের কঠোর ব্যবস্থায় জাহাঙ্গিরনগরের খাদ্যশস্যের বিক্রয় মূল্য এতো নিচু স্তরে নেমে এসেছিল যার তুলনা একমাত্র নবাব শায়েস্তা খানের আমলের সঙ্গেই চলে।[২৩০] তবে এই অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

আগেই বলেছি ১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে বিহারের সুবাদারিও শুজাউদ্দিনের ওপর অর্পিত হয়। নবাব বিহারের সহকারী সুবাদার হিশেবে নিয়োগের জন্য সরফরাজ খানের নাম প্রস্তাব করে বাদশাহের দরবারে পাঠান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরফরাজের আপত্তি ও স্বীয় স্ত্রী (সরফরাজের মাতা জিন্নাতুন্নেসা বেগম)-র বিরোধিতার কারণে তাঁকে সেখানে পাঠানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। পরে এই দায়িত্ব পান নবাবের অন্যতম সহযোগী হাজি আহমদের সহোদর ভাই মিরজা মুহম্মদ আলি ওরফে আলিবর্দি। নবাব তাঁকে 'নূতন উপাধি এবং নূতন সম্মান ও মর্যাদায় ভূষিত'[২৩১] করে নতুন কর্মস্থলে প্রেরণ করেন। যা হোক, 'Bihar offered to 'Alivardi Khan a challenging field for displaying his military and administrative abilities as well as for building up his personal power which enabled him subsequently to capture the masnad of Bengal. .....'Alivardi Khan was determined to pacify the land and to bring the rebellious zamindars and tribes under authority.'[২৩২] আলিবর্দি কঠোর শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অত্যল্প কালের মধ্যে বিহারে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুখসমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনেন। তিনি আফগানদের সহযোগিতায় বিঠিয়া এবং বাঞ্জারার বিদ্রোহী রাজাদের পরাস্ত করে তাদের বিপুল ধনসম্পদ হস্তগত করেন এবং স্থানীয় অপরাপর রাজাদেরকেও বাদশাহি প্রাপ্য কর দানে স্বীকৃত করেন। ভোজপুরের জমিদার নামদার খান ও টিকারির জমিদার সুন্দর সিং প্রমুখও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে ও খাজনা দেয়।[২৩৩] ফলত এভাবে, 'He (Alivardi) cherished the troops and the ryots by his good administration, and in a short time made all rebels and turbulent persons obedient to him.'[২৩৪]

তিন. এইভাবে কেন্দ্রে এবং নবগঠিত তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে যোগ্য নায়েব-ই-নাজিম নিয়োগ করে শুজাউদ্দিন বাংলার শাসন-ঐতিহ্যে যে নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন তা একদিকে তাঁর নিজের রাজত্বকালকে নিষ্কণ্টক করলেও, এবং এই অঞ্চলগুলিতে তাঁর গৃহীত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও নীতি কমবেশি অনুসৃত হলেও, এই প্রশাসনিক পুনর্গঠন

---

২২৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩৭।

২৩০ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন, 'শুজাউদ্দীনের শাসনকালে ঢাকায় চাউলের দর আবার টাকায় আট মণ হইয়াছিল।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৪)।

২৩১ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন 'সিয়ারে মুতাখখিরীন', পৃষ্ঠা ৩১১-১২।

২৩২ History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A, pp. 589-90.

২৩৩ নায়েব-ই-নাজিম (বিহার) আলিবর্দির সঙ্গে এই সকল জমিদার, রাজা ও ভূস্বামীদের যুদ্ধের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'Bengal Nawabs', Trans, by Sir JaduNath Sarkar, pp. 14-19.

২৩৪ Ibid., pp. 14.

বিশেষত উপদেষ্টা কাউন্সিল সৃষ্টি তাঁর ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের জন্য আদৌ মঙ্গলজনক হয়নি। বরং মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

ভূমিরাজস্ব নীতি ও কাঠামোর ক্ষেত্রে শুজাউদ্দিন খান তাঁর পূর্বসূরী মুর্শিদকুলি জাফর খানের প্রবর্তিত ব্যবস্থাকেই বহাল রেখেছিলেন। তবে মুর্শিদকুলি খান ভূমিরাজস্ব-বহির্ভূত কর বা 'আবওয়াব'-এর ক্ষেত্র ও পরিমাণ-কে যেখানে অত্যন্ত সীমিত ও গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, সেখানে শুজাউদ্দিনের সময়ে তা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। মুর্শিদকুলির সময়ে আবওয়াব খাতে বাৎসরিক আয় হতো ২,৫৮,৮৫৭ টাকা[২৩৫] , যা শুজাউদ্দিনের সময়ে বেড়ে হয়েছিল ১৯,১৪,০৯৫ টাকা।[২৩৬] উল্লেখ্য ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে শুজাউদ্দিন মুর্শিদকুলির প্রবর্তিত রাজস্ব বন্দোবস্তের যে ঈষৎ সংশোধিত তালিকা (সাধারণত 'শুমার' নামে পরিচিত) প্রকাশ করেন, যা অন্ত্য-মধ্য বাংলার ৪র্থ ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্ত হিশেবে পরিচিত এবং আধুনিক ঐতিহাসিকগণ যাকে 'important land mark in the history of Settlement'[২৩৭] বলে মত প্রকাশ করেছেন, এতে পূর্বাপেক্ষা যে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছিল তা ছিল মূলত আবওয়াব বৃদ্ধির ফল বা বহিঃপ্রকাশ। জেমস গ্রান্টের মতে এটি ছিল টোডরমলের 'আসল তুমার জমা'-র $\frac{১}{৫}$ অংশ[২৩৮] এবং মুর্শিদকুলি জাফর খানের 'জমা-ই-কামিল তুমারি'-র $\frac{১}{৭}$ অংশেরও বেশি। মুর্শিদকুলির সময়কার মূল 'জমা'-র পরিমাণ অক্ষুণ্ন রেখে নতুন 'শুমার'-এ অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির পিছনে শুজাউদ্দিনের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, রায়তগণ জঙ্গল ভূমি পরিষ্কার করে এবং পতিত ও অনাবাদি ক্ষেত্র আবাদ করে নিত্য নতুনভাবে চাষের জমির আওতা বাড়ায় এবং সেই অনুপাতে ফসল উৎপাদনও করে অধিক, জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি এই অধিক উৎপন্নের ভাগ পেলেও রাষ্ট্র যেহেতু বছরের প্রথমেই তাদের দেয় নির্ধারিত করে দেয়, সেহেতু রায়তের এই অধিক উৎপাদনের কোন ভাগ পায় না। অথচ ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বছর বছর স্থির রাখলে তাতে করে রাষ্ট্রের প্রতিনিয়ত ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না। আবার সরাসরি 'আসল জমা' বৃদ্ধি করা হলে তা থেকে কেন্দ্রকেও এ যাবৎ নির্দিষ্ট 'পেশকাশ'-এর অধিক প্রদান করতে হয়। অধিকন্তু রায়তদের ওপরও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। স্বভাবতই শুজাউদ্দিন জমিদার-তালুকদারদের ওপর এই নতুন রাজস্বের ভার চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

২৩৫ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২০।
২৩৬ The History and Culture of the Indian People : The Maratha Supremacy, Vol. VIII., Ed. By Dr. R. C. Majumdar, pp. 107.
২৩৭ The Report of 1940, Vol. II., pp. 209.
২৩৮ A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 179. ইতিহাস অনুসন্ধান/৩, পৃষ্ঠা ১৮২।

যা হোক, জেমস গ্রান্টের বিখ্যাত 'An Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal' নামক গ্রন্থে নবাব শুজাউদ্দিন মুহম্মদ খান প্রবর্তিত যে ৪টি নতুন আবওয়াবের বিষয়ে অবগত হওয়া যায় তা নিচে বর্ণনা করা হলো :

(ক) নজরানা মোকাররারি—জমিদার-তালুকদারদের গোপনীয় আয় ও সম্পদের পরিমাণ জানার জন্য অনেক সময় রাষ্ট্রকর্তৃক তদন্ত-দল (সাধারণত আমিলের নেতৃত্বে) নিয়োগ করা হতো। সঠিক হস্তবুদ প্রণয়নের লক্ষ্যে কখনও কখনও কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের জমিদারির প্রকৃত ভূমিরাজস্ব আয় কতো তা নির্ধারণের জন্য জরিপ-দল সেখানে প্রেরণ করা হতো। এছাড়া সবল জমিদারদের ওপর যথাযথ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য তত্ত্বাবধায়ক-আমিল নিযুক্ত করা হতো। রাষ্ট্রনিযুক্ত ও প্রেরিত এই সমস্ত দল ও ব্যক্তির যাবতীয় খরচ জমিদার-তালুকদারদেরকেই বহন করতে হতো। অনিয়মিত এই সকল প্রক্রিয়া তাদের জন্য বাড়তি একটি বিড়ম্বনার মতো ছিল। তাই জমিদাররা এ থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য ফি-বছর রাষ্ট্রীয় কোষাগারে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আগেই জমা দিতো বা দেয়ার অঙ্গীকার করতো। বলা যায় এটি ছিল এক ধরনের স্থায়ী বা পাকা বন্দোবস্ত। এর হার ছিল উৎপন্নের শতকরা ৬ $\frac{১}{২}$ ভাগ এবং সীমান্তবর্তী জমিদারিগুলির ক্ষেত্রে সাধারণত এই আবওয়াব কার্যকর হতো না। নজরানা মোকাররারি খাতে রাষ্ট্রের মোট আয় ছিল ৬,৪৮,০৪০ টাকা।

(খ) জার মাথোট— মূল খাজনা (শুমার)-এর ওপর এই খাতে জমিদাররা শতকরা ১$\frac{১}{২}$ টাকা রাষ্ট্রকে দিতেন। মোট পরিমাণের (১,৫২,৭৮৬ টাকা) দিক থেকে জার মাথোট (মাথুত) অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আবওয়াব[২৩৯] হলেও এটির ছিল ৪টি উপ-বিভাগ। এক. নজর-পুণ্যাহ— সাধারণত ১লা বৈশাখ বা অনুরূপ সময়ে যেদিন জমিদারদের সঙ্গে প্রথম সরকারের বন্দোবস্ত সম্পন্ন হতো, সেদিন তারা রাজকোষে নজরানা স্বরূপ কিছু পরিমাণ অর্থ জমা করতো, কখনও কখনও উপহার সামগ্রীও, এটাকে বলা হতো নজর-পুণ্যাহ; দুই. বাহা-ই-খিল বা বখেলাত—পুণ্যাহ-অনুষ্ঠানে জমিদার-তালুকদারেরা বিগত বছরের তাদের কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ যে দামি 'খিলাত' প্রভৃতি উপহৃত হতো; বলাবাহুল্য উক্ত পোশাকাদির মূল্য তাদেরকেই এই খাতে পরিশোধ করতে হতো; তিন. পুস্তাবন্দি— রাজধানী মুর্শিদাবাদের কেল্লা ও লালবাগের সম্মুখস্থ গঙ্গা নদী যাতে করে বাঁধ ভেঙ্গে কূল-প্লাবিত করতে না-পারে তজ্জন্য বাঁধ রক্ষার খরচ বাবদ জমিদারদেরকে পুস্তাবন্দি দিতে হতো; চার. রুসুম নেজারত—মফস্বল থেকে জমিদার-তালুকদারদের দেয় ভূমিরাজস্ব ও নজরানা বয়ে আনতো যে সব পাইক-বরকন্দাজ-জমাদার তাদের বহন খরচ বাবদ এই খাতে নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করা হতো। জমিদার-তালুকদারদের দেয় বার্ষিক ভূমিরাজস্বের

২৩৯ কোম্পানী আমলে ঢাকা, জেমস টেলর, পৃষ্ঠা ১৩৮।

ওপর এটি কমিশন-আকারে ধরা হতো যার পরিমাণ ছিল লক্ষ টাকা প্রতি ১ আনা। এই কমিশন রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা পড়তো।

(গ) মাথোট ফিলখানা— ফারসি 'ফিল' বা 'পিল' অর্থ হাতি। মুর্শিদাবাদে নবাব ও দিওয়ানের হাতিশালের যাবতীয় খরচ এই আবওয়াব থেকে প্রাপ্ত অর্থে নির্বাহ করা হতো। বড় জমিদারি (এরা এমনিতেই বিপুল রাজস্ব দিতো) এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি ক্ষুদ্র জমিদারি ছাড়া অধিকাংশ জমিদারিকেই সরকারকে মাথোট ফিলখানা খাতে টাকা দিতে হতো। এভাবে সরকার বছরে ৩,২২,৬৩১ টাকার মতো আদায় করতো।

(ঘ) ফৌজদারি আবওয়াব—এই কর মূলত ফৌজদারি এলাকার প্রত্যন্ত জমিদারিগুলি থেকে আদায় করা হতো। 'কোম্পানী আমলে ঢাকা' গ্রন্থের স্বনামধন্য লেখক জেমস টেলর এর স্বরূপ বর্ণনায় বলেন, 'এটা জমির উপর স্থায়ী কর, এটা নায়েব কর্তৃক তোলা হতো এবং অফিসের বকশিশ হিসেবে তাঁর দ্বারা সংরক্ষিত হতো।'[২৪০] স্থান ভেদে এর বিভিন্ন রূপ ছিল।[২৪১] এর মোটামুটি ৩টি ভাগ ছিল। সেগুলি নিম্নরূপ :

প্রথম ভাগ

১.	শ্রীহট্ট বা সিলেটের ফৌজদারি আবওয়াব	১,৫৯,৫৩৫	টাকা
২.	পূর্ণিয়ার ফৌজদারি আবওয়াব	২,৮৩,০২৭	,,
৩.	ত্রিপুরা-রোশনাবাদের ফৌজদারি আবওয়াব	১,৮৪,৭৫১	,,
৪.	রাজধানীতে বিক্রয়ার্থ ঘোড়া ও অন্যান্য গবাদি পশু আনা হলে তার ওপর 'নিখাস' নামক আবওয়াব	১১,৬৭৯	,,
৫.	সৈন্যদের অস্থায়ী ছাউনি এলাকায় গড়ে ওঠা ভ্রাম্যমাণ হাটেবাজারে বিক্রিত মদের ওপর 'থানাজোত' আবওয়াব.	৪৮,০০০	,,
৬.	রাঙ্গামাটির ফৌজদারি আবওয়াব (মূলত হাতি শিকারের 'খেদা'-র খরচ সংক্রান্ত)	২৪,০০০	,,
৭.	ভূষণার অন্তর্গত নলদির ফৌজদারি আবওয়াব	২৪,০৫২	,,
৮.	মাহমুদশাহির ফৌজদারি আবওয়াব	৯০,৮৬০	,,
৯.	অপরাপর ১৯টি থানাদারির আবওয়াব	৮,৮৪৩	,,

দ্বিতীয় ভাগ

১.	চাকলে ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত বিভিন্ন জমিদারি ও পরগণার ওপর ধার্য ফৌজদারি আবওয়াব	১৯,২৭৯	,,

তৃতীয় ভাগ

১.	মুর্শিদাবাদের ওপর ধার্য ফৌজদারি আবওয়াব (এর মধ্যে জরিমানা, থানাদারি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র কর অন্তর্ভুক্ত)	১৬,৬৩৯

---

২৪০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৮।

২৪১ James Grant,op.cit, See 'The Agrarian System of Bengal, Vol.I.,pp. 55.

ফৌজদারি আবওয়াব খাতে কম-বেশি প্রতি বছর ৭,৯০,৬৩৮ টাকা[২৪২] সরকারি কোষাগারে জমা হতো। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উপরে বর্ণিত ৪ ধরনের আবওয়াব যা সাধারণ্যে 'আবওয়াব শুজা খানি'[২৪৩] নামে পরিচিত ছিল, এর বাইরে নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খানের একমাত্র আবওয়াব 'ওয়াজাসত-ই-খাসনবিশি'ও চালু রেখেছিলেন। এক কথায় তাঁর সময়ে আবওয়াব থেকে রাষ্ট্রের বাৎসরিক আয় হতো (১৯,১৪,০৯৫+২,৫৮,৮৫৭=) ২১,৭২,৯৫২ টাকা।[২৪৪] এই সঙ্গে মুর্শিদকুলির 'জমা-ই-কামিল তুমারি' যোগ করে নবাব শুজাউদ্দিন বাংলার জন্য যে চতুর্থ রাজস্ব বন্দোবস্ত বা 'শুমার' প্রণয়ন করেন তাতে মোট ভূমিরাজস্ব আয় দাঁড়িয়েছিল (জায়গিরসহ) ১,৬৪,৬১,১৩৮ টাকা। এক হিসেবে তা টোডরমলের ১$\frac{১}{২}$ গুণের কিছু বেশি। প্রায় দেড় শতাব্দী (১৪৬ বছর) কালের ব্যবধান বিবেচনায় এই বৃদ্ধিকে খুব উচ্চ ও মাত্রাতিরিক্ত বলা যায় না। তবে এখানে 'শুজা খানি আবওয়াব' সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলা যায়।

প্রথমত 'আবওয়াব' যে নামেই আদায় হোক না কেন, তা বাহ্যত জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এজেন্টদের কাছ থেকে উশুল করা হলেও শেষ পর্যন্ত এর দায় রায়তগণের ওপরে গিয়েই বর্তাতো। এর ফলে যেমন 'নজরানা মোকাররারি'র অধীনে জমিদারদের দখলে থাকা অবৈধ ও গোপন হিসাবের অন্তর্গত ভূমি ও তার রাজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সুযোগ রাষ্ট্রের থাকলেও রাষ্ট্র 'উপ্‌রি' কিছু হাসিলের বিনিময়ে সেই সুযোগ ও ক্ষমতা প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতো। অন্যদিকে রাষ্ট্রকে বাড়তি রাজস্ব দিতে হয় অজুহাতে জমিদার-তালুকদারগণও প্রজার কাছ থেকে নির্ধারিত রাজস্বের অতিরিক্ত, এবং অধিকাংশ সময় জোরপূর্বক তা আদায় করে নিতে কসুর করতো না। সুতরাং রাষ্ট্র ও জমিদারের এই অবৈধ চুক্তি বা সম্বন্ধের গ্যাঁড়াকলে পড়ে প্রজা স্বভাবতই হিমশিম খেতো তা বলাইবাহুল্য।

দ্বিতীয়ত (এটি পরবর্তী ইংরেজ যুগের তুলনায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা) আগেই দেখিয়েছি যে, সম্রাট আকবর থেকে নবাব শুজাউদ্দিন (রাজস্ব বন্দোবস্ত প্রণয়ন কালাবধি) পর্যন্ত প্রায় ১৪৬ বছর কাল-সীমায় যে রাজস্ব বৃদ্ধি ঘটেছে সময়ের বিচারে তা খুব বেশি নয়। এর কারণ হিশেবে বলা যায় মোগল ভূমিরাজস্ব নীতির প্রভাব বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, 'বাংলার নবাবরা আসল জমাকে কখনোই খুব বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি করতে চাইতেন না।'[২৪৫] ফলে যুগ ও রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে তাঁদেরকে আবওয়াব নামীয় অতিরিক্ত করের দিকে ঝুঁকতে হতো। এই কর তাঁরা জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির কাছ থেকে এবং এরা অপরিহার্যভাবে রায়তদের কাছ থেকে তা আদায় করলেও এখানে দেখার বিষয় এটাই যে, এই রাজস্ব-বৃদ্ধির কাজ করতে গিয়ে তাঁরা (নবাবরা) কখনই জমিদার-তালুকদারদেরকে ভূমির মালিক করে দেননি বা

২৪২ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ১৩; ইতিহাস অনুসন্ধান/৩, পৃষ্ঠা ১৮২।
২৪৩ See, The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 53.
২৪৪ A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 179.
২৪৫ ইতিহাস অনুসন্ধান/৩, পৃষ্ঠা ১৮০।

শেষোক্তদের এমন সুযোগ করে দেয়া হয়নি যাতে করে তারা প্রবল শক্তিধর ও স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে। অথচ পরবর্তীকালে, ইংরেজ যুগে সেটিই ঘটেছিল বাংলার ভাগ্যে। ড. রঞ্জিত সেন তাই যথার্থই বলেছেন, '....মনে রাখা দরকার যে মুঘল শাসকরা আসল জমাকে নিরঙ্কুশভাবে বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করেননি। এখানেই মুঘল শাসনব্যবস্থার বিশিষ্টতা, পরবর্তীকালে ইংরেজরা নিরঙ্কুশভাবে জমিদারদের দেয় রাজস্বকে বৃদ্ধি করেছিলেন। তার প্রভাব গিয়ে পড়েছিল কৃষকদের উপর।.... মুঘল শাসকরা আসল জমাকে বেশি বাড়তে দেননি বলে প্রজা শোষণের ঘটনাটি সীমার মধ্যে বাঁধা ছিল। ইংরেজ যুগে এই সীমা ভেঙে যায়।'[২৪৬]

চার. শুজাউদ্দিনের সময়ে আসল জমা-বহির্ভূত অতিরিক্ত সর্বমোট ২১,৭২,৯৫২ টাকা রাজকোষে অন্তর্ভুক্ত হলেও এবং তা-ও ভূমিরাজস্ব খাত থেকে, এক্ষেত্রে বাস্তব ঘটনা এই ছিল যে, এর একটি টাকাও দিল্লিতে বাদশাহি খাজাঞ্চিখানায় পাঠানো হয়নি[২৪৭], এমন কি তা প্রত্যক্ষত রায়ত বা দেশীয় কৃষির উন্নয়নের জন্যও ব্যয়িত হয়নি, বরং প্রায় গোটাটাই নবাবি দরবারের জাঁকজমক ও জৌলুস এবং তাঁর হারেম ও ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনে শেষ হয়।[২৪৮] তবে স্বস্তির কথা এই যে, নবাব এই অর্থে তাঁর প্রায় এক যুগের রাজত্বকালে রাজধানী মুর্শিদাবাদ নগরে বেশ কিছু সরকারি দপ্তর ও সুদৃশ্য ইমারত-অট্টালিকা, মসজিদ প্রভৃতি[২৪৯] নির্মাণ করেছিলেন।

পূর্বসূরী বাদশাহ-ভক্ত মুর্শিদকুলি জাফর খানের মতো শুজাউদ্দিনও দিল্লির কেন্দ্রীয় মোগল রাজকোষে নিয়মিত বার্ষিক 'পেশকাশ' প্রেরণ অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে মুর্শিদকুলির সময় থেকে এর পরিমাণ বেশ বেড়েছিল। আগে যেখানে বাদশাহি দরবারে প্রতি বছর ১ কোটি ৩ বা ৯ লক্ষ টাকা প্রেরণ করা হতো, তিনি সেখানে ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পাঠাতে শুরু করেন।[২৫০] তাঁর মোট ১১ বছর ৮ মাস ১৩ দিনের শাসন কালে তিনি দিল্লির দরবারে সর্বমোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা ১৩ আনা প্রেরণ করেন।[২৫১] তবে সত্যি বলতে কেন্দ্রীয় মোগল শাসনযন্ত্রের তখন যে দুরবস্থা তাতে করে তিনি এই বিপুল পরিমাণ 'পেশকাশ' সেখানে প্রেরণ না-করলেও কেন্দ্রকর্তৃক প্রদেশ আক্রান্ত অথবা নবাবের ক্ষতি

২৪৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩।

২৪৭ The History of Bengal, Vol. II., pp. 434.

২৪৮ Ibid., pp. 434.

২৪৯ 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখকের বর্ণনায় পাওয়া যায়, শুজাউদ্দিন 'নওয়াব জাফর খান নির্মিত সরকারি অট্টালিকাসমূহ নিজের দরাজ মতের তুলনায় ক্ষুদ্র গণ্য ক'রে তিনি সেগুলো ভেঙ্গে তৎপরিবর্তে একটি বৃহৎ জাঁকজমকপূর্ণ প্রাসাদ, একটি অস্ত্রাগার, একটি সুউচ্চ সিংহদ্বার, একটি দিওয়ানখানা, একটি আম-দরবার, একটি খিলওয়াতখানা, মহিলাদের খাস-কামরা, একটি জলুসখানা, একটি খালিসা কাছারি ও একটি ফরমান বাড়ী তৈরী করান।... ভাগিরথী নদীর তীরে দেহ্ পাড়ায় একটি মসজিদ ও উদ্যান নির্মাণের... (কাজ) সম্পূর্ণ করেন...। তিনি উদ্যানে হাউজসহ কতকগুলো জাঁকালো প্রাসাদ, খাল ও অসংখ্য ফোয়ারা তৈরী ক'রে অত্যন্ত সুসজ্জিত করেছিলেন।' (পৃষ্ঠা ২২৮-২৯)।

২৫০ The History of Bengal, Vol. II., pp. 433; Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 176 & The Maratha Supremacy : Vol. VIII. pp. 107.

২৫১ Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 176.

হওয়ার সম্ভাবনা ছিল নিতান্তই ক্ষীণ। ফলত এই প্রায় ১৫ কোটি টাকার বিনিময়ে বাংলা, দিল্লি থেকে কিছুই পায়নি।

পাঁচ. প্রশাসনের বিভিন্ন পদ ও বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব বিভাগীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় মুর্শিদকুলির ন্যায় শুজাউদ্দিনও অভিজ্ঞ ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু কর্মচারীদের নিয়োগ বজায় রেখেছিলেন।[২৫২] জাহাঙ্গিরনগর বা ঢাকা নিজামতের নায়েব যশোবন্ত রায়ের কথা আগেই বলেছি। এ ছাড়া তাঁর সময়ে আরও যাঁরা রাষ্ট্রীয় পদে থেকেও বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজা রাজবল্লভ, নন্দলাল, বসন্ত রায় প্রমুখ।

ছয়. একজন সুবা-প্রশাসক বা শাসনকর্তা হিশেবে শুজাউদ্দিন, নবাব মুর্শিদকুলি খান অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়েই কম-যোগ্যতাবান হওয়া সত্ত্বেও অন্তত একটি ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরীর চেয়ে অধিক প্রশাসনিক ধীশক্তি ও বিজ্ঞতা এবং দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। বলা উচিত এ বিষয়ে তিনি মুর্শিদকুলির অনুসরণীয় নীতিকে সম্পূর্ণই বর্জন করেছিলেন। মুর্শিদকুলির সময়ে রাজধানীকেন্দ্রিক বাংলার মূল সৈন্যবাহিনী মাত্র ৬,০০০ (২,০০০ অশ্বারোহী ও ৪,০০০ পদাতিক) সেনা-সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল, বা অন্যভাবে বললে তিনি স্থিত সৈন্যবাহিনীর লোক সংখ্যা কাটছাঁট করে ছয় হাজারে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। এতে তাঁর খরচ কমেছিল বটে, কিন্তু তা বাংলার প্রতিরক্ষাকে সবসময়ই বড় রকমের হুমকির সম্মুখীন করে রেখেছিল। বস্তুত এই অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন শুজাউদ্দিন। তাই সিংহাসনে আরোহণের অল্প কালের মধ্যে তিনি বিরাজমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের দিকে নজর দেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর জনবল ৬ হাজার থেকে ২৫ হাজারে উন্নীত করেন।[২৫৩] অবশ্য আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ এই সংখ্যাকে আরও ১০ গুণ বেশি বলেছেন। স্যার যদুনাথ সরকার সম্পাদিত (ড. কালীকিঙ্কর দত্ত লিখিত) 'History of Bengal, Vol. II.' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪২৫) নবাব শুজাউদ্দিনের সময়ে বাংলার সম্মিলিত (পদাতিক ও অশ্বারোহী) সামরিক বাহিনীর সর্বমোট সংখ্যা বলা হয়েছে ২,৫০,০০০; এঁর অনুসরণে পরবর্তীকালে আরও দু'একজন যেমন ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[২৫৪] প্রমুখও এই মত সমর্থন করেন। তবে আমাদের মনে হয় তৎকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মুর্শিদকুলির সময়কার ৬,০০০ সৈন্যবলকে কিঞ্চিদধিক মাত্র ১ দশকে নবাব শুজাউদ্দিনের পক্ষে আড়াই লক্ষে উন্নীত করা আদৌ সম্ভব ছিল না। তাছাড়া শুজাউদ্দিন যদি প্রকৃতই এত বিপুল সৈন্যবল রেখে মৃত্যু বরণ করে থাকেন (১৩ই মার্চ, ১৭৩৯), তবে মাত্র তিন বছর পরে (১৭৪২) মারাঠাদের আক্রমণ প্রতিরোধে তৎকালীন সুবাদার নবাব আলিবর্দি খানকে মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো না।[২৫৫] এ দিক

২৫২ The Muslim Society & Politics in Bengal, Dr. M.A.Rahim, pp. 5.

২৫৩ ড. কালীকিঙ্কর দত্তের মতে, এতে পদাতিক ও অশ্বারোহীর সংখ্যা সমান-সমান ছিল। (The History of Bengal, Vol. II., pp. 425).

২৫৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ৮।

২৫৫ ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের মারাঠা নায়ক ও সেনাপতি রঘুজি ভোসলা মাত্র ৪০,০০০ সৈন্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলা আক্রমণ করতে পাঠান, তখন তাকে প্রতিরোধ করতে নবাব আলিবর্দি খানকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। নিশ্চয়ই তাঁর কাছে ২,৫০,০০০ সৈন্যের বিশাল বাহিনী

থেকে বিচার করলে শুজাউদ্দিনের সৈন্য সংখ্যা ২৫ হাজার হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা'র লেখকও বলেন, 'শুজা উদ্দীন...রাজ্যের ৫ হাজার সেনাদল বৃদ্ধি করে ২৫ হাজারে উন্নীত করেন...।[২৫৬] এখানে উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে ড. কালীকিঙ্কর দত্তও স্বীয় পূর্ব-মত পরিবর্তন করে নবাব শুজাউদ্দিনের সৈন্য সংখ্যা ২৫,০০০ ছিল বলে উল্লেখ করেছেন।[২৫৭]

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, নবাব শুজাউদ্দিনের উপরোল্লিখিত নানা প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার ফলে তাঁর রাজত্বকালে পূর্বের তুলনায় রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও সেই ব্যয় বৃদ্ধিজনিত রাজকোষের ঘাট্‌তি পূরণের জন্য আশু পদক্ষেপ হিশেবে তিনি আসল জমা না বাড়িয়ে বহুবিধ 'আবওয়াব'-এর দিকেই ঝুঁকে ছিলেন, এবং এর তাৎক্ষণিক চাপ জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি রাজস্ব সংগ্রহকারী এজেন্টদের ওপর পড়লেও চূড়ান্ত প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া গিয়ে সাধারণ রায়তশ্রেণীকেই স্পর্শ করেছিল, এবং সর্বোপরি শেষ বয়সে ইন্দ্রিয়-ভোগবিলাসের প্রতি অধিক মাত্রায় লিপ্ত হয়ে পড়ায় শাসন কার্যে শুজাউদ্দিনের শৈথিল্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গিয়েছিল এই বাস্তবতা স্বীকার করেওসমসাময়িক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সৈয়দ গোলাম হোসায়ন খান তাব্‌তাবায়ীর ভাষায় বলা যায় 'এই সুখী জনপদের অধিবাসীরা' তখনও মোটামুটি সুখে-শান্তিতে ছিল (তিনি প্রাচুর্য, সুখ ও সমৃদ্ধি— তিনটিরই উল্লেখ করেছেন[২৫৮]), অধিকন্তু দীর্ঘকালব্যাপী বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ বড় ধরনের কোন সমস্যা না-থাকায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটায়[২৫৯] এবং সর্বোপরি নবগঠিত প্রশাসনিক বিভাগগুলিতে অত্যন্ত সুদক্ষ ও বিচক্ষণ কর্মকর্তা (যার মধ্যে হিন্দুদেরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল) নিয়োগ করায় এবং তাঁদের মোটামুটি সুশাসনে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক চালচিত্র এমন হয়ে ছিল যে, 'নবাব শুজাউদ্দিন খানের আমলে খাদ্যদ্রব্যের সুলভ মূল্য গল্প-কথায় পরিণত হয়েছিল।'[২৬০] অবশ্য সেই নিরিখে প্রজার ক্রয়-ক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্য কী ছিল তা বলা দুষ্কর।

থাকলে এতো বেগ পেতে হতো না। বরং তিনি অতি সহজেই আক্রমণকারী দলকে প্রতিহত ও পরাজিত করতে সক্ষম হতেন।

২৫৬ পৃষ্ঠা ৭৪। ডব্লিউ হান্টারও মন্তব্য করেন, 'He was convinced that the very reduced military establishment kept up by Murshid Kuli Khan inadequate to the security of the country, and raised the army to 25,000 men, of whom half were cavalry, and half infantry armed with matchlocks.' (Statis. Acc., Vol. IX., p. 179).

২৫৭ Comprehensive History of India, Vol, IX., pp. 177. আরও দেখুন, History of the Muslims of Bengal, Vol, 1A., pp. 584; প্রাক্-পলাশী বাংলা, ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১০।

২৫৮ সিয়ারে মুতাখখিরীন, পৃষ্ঠা ৩১০।

২৫৯ The History of Bengal, Vol. II., pp. 434.

২৬০ ড. সুশীল চৌধুরী, প্রবন্ধ 'সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা : নবাবি আমল', বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২।

নবাব আলিবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিঃ)

নবাব শুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খান বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদার হন (১৩ই মার্চ, ১৭৩৯)। চরিত্রগত দিক থেকে তিনি ছিলেন পিতার মতোই পরম ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কিন্তু প্রশাসক হিশেবে তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিল, তিনি পিতার ন্যায় অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন না এবং যথাসময়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁর দৃঢ় মনোবলের অভাব ছিল। স্বভাবতই বলা যায় 'তিনি যেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই উচ্চাসনের উপযুক্ত তিনি ছিলেন না।'[২৬১] তা সত্ত্বেও নবাব সরফরাজ খান প্রায় ১ বছর ১ মাস[২৬২] তিন প্রদেশের সুবাদারের দায়িত্ব নির্বাহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সময়কার বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসন সম্বন্ধে একটি কথাই বলা যায়, তিনি, পিতা শুজাউদ্দিনের অনুসৃত প্রথা-পদ্ধতিই বহাল রেখেছিলেন।

১৭৪০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই এপ্রিল আলিবর্দি খান বাংলার মসনদ জবর-দখল করেন। তবে যে পদ্ধতিতে একদা প্রভু, আশ্রয় ও জীবিকাদাতা (শুজাউদ্দিন)-র পুত্রকে একান্ত বিশ্বাসঘাতকতামূলকভাবে গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত ও হত্যা করে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তা নিঃসন্দেহে ছিল 'চরম অকৃতজ্ঞতার দৃষ্টান্ত'। এই জাতীয় দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানে তাঁর ব্যক্তিগত অভিলাষ ও অভিসন্ধি যতোখানি না কার্যকর ছিল, তার চেয়ে অধিক ছিল ক্ষমতাসীন সুরা-সাকিমত্ত বিলাসী নবাবের ক্ষমাহীন নির্লিপ্ততা ও অযোগ্যতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আলি আহমদের ক্ষমতা গ্রহণের গোপন আমন্ত্রণ ও উস্কানি এবং নবাবি দরবারের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বিশেষত আলম চাঁদ ও জগৎ শেঠের নৈতিক সমর্থন,—আলিবর্দি খানকে বাংলার সিংহাসনের প্রতি লালায়িত করে। সেই সঙ্গে ছিল মোগল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় তখ্‌তে আসীন সম্রাটের অমার্জনীয় দুর্বলতা। উল্লেখ্য স্বয়ং আলিবর্দি ও তদীয় ভ্রাতা হাজি আলি আহমদ এ কথা ভালো করেই জানতেন যে, কেন্দ্রীয় মোগল শক্তির এই ক্রম-ক্ষীয়মাণ শোচনীয় দুরবস্থা বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশে সুবাদারি নিয়ে যে অনাচার ও অনৈতিকতাই শুরু হোক না কেন, তা নিবারণের প্রয়োজনীয় বল ও স্পৃহা কোনটাই দশম (প্রকৃতার্থে দ্বাদশ) মোগল সম্রাট মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রিঃ)-এর নেই। ফলত এই সামগ্রিক অনুকূল পরিস্থিতি নবাবি বাংলায় প্রাক-মোগল আমলীয় প্রাথমিক সুলতানদের সময়কার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও অবৈধ পন্থায় ক্ষমতা গ্রহণের রক্তক্ষয়ী অধ্যায়ের জন্মদানের মতো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে আলিবর্দি খানকে অনুপ্রাণিত করে। ড. কালীকিঙ্কর দত্তের ভাষায় বলা যায়, 'Weakness of Delhi authority, inefficiency of Sarfaraz and machinations of Haji Ahmad at Murshidabad in collaboration with Ray-i-rayan and Jagat Seth Fateh Chand exited 'Ali Vardi's ambition to seize the masnad of Bengal for himself.'[২৬৩]

২৬১ ড. আবদুল করিম, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৬।

২৬২ Muzaffar-Namah by Karam Ali, See 'Bengal Nawabs', Trans. Sir Jadu Nath Sarkar, pp. 23.

২৬৩ The Maratha Supremacy, pp. 109.

যা হোক, অবৈধ পন্থায় প্রাপ্ত ক্ষমতাকে বৈধকরণে নতুন নবাব আলিবর্দি খান হতভাগ্য ও নিহত নবাব সরফরাজ খানের রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ (৭০ লক্ষ টাকার নগদ মুদ্রা ও তৎসহ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থের সমন্বয়ে প্রায় ৫ কোটি টাকা মূল্যমানের অলঙ্কারাদি[২৬৪]) চতুর্দিকে দু'হাতে ব্যয় করেন। নবাবি অর্থ-ভাণ্ডারের এই বিপুল পরিমাণ সঞ্চয় যা মূলত ভূমিরাজস্ব বাবদ বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তথা রায়ত সাধারণের কাছ থেকেই আদায় করা হয়েছিল, তা দেশীয় অর্থনীতির কল্যাণের জন্য ব্যয় না করে একজন মানুষের দুষ্কৃতি ঢাকার জন্য কিভাবে ব্যয়িত ও অপচয়িত হয়েছিল নীচে তার সামান্য কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

বাংলার মসনদ দখলের অব্যবহিত পরপরই আলিবর্দি খান নিহত নবাবের পরিবারবর্গ ও আত্মীয়স্বজন বিশেষত সরফরাজ খানের বোন নফিসা বেগমের সমর্থন লাভের আশায় শেষোক্তের প্রাসাদে সশরীরে হাজির হয়ে ঘটে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাপারটি মৃত নবাবের অদৃষ্টের লিখন বলে মেনে নেয়ার আহ্বান জানান।[২৬৫] তিনি নফিসা বেগমকে ভবিষ্যতে সর্বতোভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। তাৎক্ষণিকভাবে আলিবর্দি তাঁকে ১ লক্ষ টাকার অধিক আয়সম্বলিত খাস ভূমি প্রদান করেন। এ ছাড়া ইতোপূর্বে নফিসা বেগমের ভোগদখলে যে জায়গির ছিল তাও রাখার অনুমতি দেন তাঁকে। তিনি সরফরাজের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণপোষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত আলিবর্দি আনুষ্ঠানিকভাবে সুবাদারি পদের সনদ লাভের জন্য দিল্লিতে বাদশাহের দরবারে ১ কোটি টাকা[২৬৬], মতান্তরে ৪০ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ এবং নির্ধারিত রাজস্ব ছাড়াও অতিরিক্ত প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা দিল্লিতে প্রেরণ করেন।[২৬৭] সেখানকার দরবারের উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদেরকেও তিনি সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্যে উজির কমরউদ্দিন খানকে ৩ লক্ষ ও আসফ জা নিজাম উল মুলককে ১ লক্ষ টাকার উপঢৌকন দেন।[২৬৮] এ ছাড়া বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য বাদশাহের প্রেরিত প্রতিনিধি আমির মুরিদ খানকেও কয়েক লক্ষ টাকা ও স্বর্ণ-রৌপ্যের কিছু সৌখিন পাত্র ও কিছু সংখ্যক হাতি অর্পণ করেন।[২৬৯] এক কথায় এগুলি ছিল স্রেফ 'ঘুষ', যা দিল্লির তৎকালীন ক্ষমতাসীন বাদশাহ ও অন্যান্যদের বশীভূত করার জন্য উপহৃত ও প্রদত্ত হয়েছিল।[২৭০]

তৃতীয়ত নবাব স্বীয় বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের সন্তোষ বিধানে তাদের নগদ প্রায় ৪ লক্ষ টাকা ও কিছু উপহার সামগ্রী প্রদান করেন, সেই সঙ্গে তাদের বেতনও অর্ধেক বৃদ্ধি করেন।[২৭১]

২৬৪ The History of Bengal, Vol, II., pp. 442.
২৬৫ The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi by Yusuf Ali Khan, p. 17. আরও দেখুন, Alivardi and His Times, Dr. Kalikinkar Datta, pp. 29-30.
২৬৬ সিয়ারে মুতাখ্খিরীন, পৃষ্ঠা ৪১৮।
২৬৭ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৫৫।
২৬৮ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ২৫৫।
২৬৯ সিয়ারে মুতাখ্খিরীন, পৃষ্ঠা ৪১৮।
২৭০ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৫৫।
২৭১ Ahwal-I-Mahabat Jang by Yusuf Ali, See Bengal Nawabs, p.90; The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi, pp. 19.

ফলত উপরিউক্ত বিভিন্ন ব্যবস্থাদি গ্রহণের কারণে বাংলার সিংহাসন জোরপূর্বক দখলের ফলে নানা পর্যায়ে নবাব আলিবর্দি খানের প্রতি যে বৈরী ও প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, তা অনেকটাই কেটে যায়। যদিও সত্যি বলতে তখন পর্যন্ত বাংলা ও বিহারের ওপর নতুন নবাবের একচ্ছত্রাধিপত্য মোটামুটি কায়েম ও নিশ্চিত হলেও ওড়িশা ছিল তাঁর নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ড. আবদুল করিম বলেন, 'আলিবর্দী খান মুর্শিদাবাদের মসনদ ঠিকই দখল করেন, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে তিন প্রদেশে তিনি কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেননি। বিশেষ করে ওড়িশা তাঁর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।'[২৭২] ওড়িশায় এই সময় আগে থেকেই নিযুক্ত ছিলেন ভূতপূর্ব নবাবের ভগ্নিপতি (শুজাউদ্দিন খানের কন্যা দুর্দানা বেগমের স্বামী) রুস্তম জং (দ্বিতীয় মুর্শিদকুলি খান); তিনি স্ত্রী ও অন্যদের প্ররোচনায় শ্যালকহন্তা আলিবর্দির ক্ষমতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বসেন। উভয়পক্ষে ১৭৪১ খ্রিস্টাব্দের ৩রা মার্চ বলেশ্বর নদীর তীরে ফুলাহার নামক স্থানে (একটি গ্রাম) এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে কটক-অধিপতি রুস্তম জং সদলবলে পরাজিত হন এবং ওড়িশা ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।[২৭৩] অবশেষে আলিবর্দি খান বিজয়ীর বেশে ওড়িশায় পদার্পণ করেন এবং প্রথমবারের মতো তিন প্রদেশের সুবাদারি করতলগত করেন।

আসলে এ অধ্যায়ে আমরা মূলত দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলার এই আমলের ভূমিরাজস্ব নীতি ও ব্যবস্থার আলোচনা অব্যাহত রাখবো। যেহেতু প্রায় সকল আধুনিক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে, নবাব আলিবর্দি খান মূলত নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খান ও নবাব শুজাউদ্দিন খানের আমলে অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন[২৭৪] অর্থাৎ জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির সঙ্গে সম্পাদিত ভূমিরাজস্ব-বন্দোবস্তের মাধ্যমে রায়তদের কাছ থেকে 'মাল' আদায় করতেন[২৭৫] , সেহেতু এখানে আমাদের লক্ষ্য হবে তাঁর সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ডামাডোল—বহিঃশত্রু হিশেবে মারাঠাদের সঙ্গে একের পর এক যুদ্ধ-সংঘর্ষ ও অভ্যন্তরীণভাবে আফগান বিদ্রোহী সেনাপতি ও জমিদারদের প্রতি পরিচালিত অভিযানের ব্যয় নির্বাহার্থ তাঁর রাজকোষের ওপর যে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল (পূর্ববর্তী নবাবদের সময়ে এটি প্রায় ছিলই না), তার আলোচনা এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক রদ-বদল ও রাজস্ব-আদায়কারী এজেন্ট বা জমিদার-তালুকদারদের ওপর নবাবের বাড়তি রাজস্বের চাপ ('আবওয়াব' রূপেই যা পরিচিত) প্রয়োগ করে সঙ্কট মোকাবিলার চিত্র তুলে ধরা।

আগেই উল্লেখ করেছি যে ওড়িশা দখলের মধ্য দিয়েই নবাব আলিবর্দি খান বস্তুত তিন প্রদেশের একচ্ছত্র শাসনাধিকার অর্জন করেন। সঙ্গত কারণে এবার তিনি স্থিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাসের দিকে মনোনিবেশ করেন। সমসাময়িক মুসলিম

২৭২ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯১।

২৭৩ এই যুদ্ধের বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 'The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi, Yusuf Ali Khan, Trans. by Dr Abdus Subhan, pp. 20-26.

২৭৪ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩২০।

২৭৫ মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৪৭; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 57-58.

ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'আলিবর্দী খাঁ এখন তাঁহার রাজ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার শাসন-কার্যের প্রত্যেকটি শাখা সুব্যবস্থিত করেন।'[২৭৬] অবশ্য ওড়িশা জয়ের আগেই তিনি ভাইপো ও জামাতা নওয়াজিশ মুহম্মদ খানকে বাংলার খালিসা বিভাগের দিওয়ান নিযুক্ত করেন এবং একই সঙ্গে তাঁকে (নওয়াজিশ) জাহাঙ্গিরনগর (ঢাকা)-এর নায়েব-ই-নাজিমের দায়িত্ব ভারও অর্পণ করা হয়।[২৭৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নওয়াজিশ মুহম্মদ খান ঢাকা শাসনের দায়িত্ব 'আংশিক বা সম্পূর্ণ' আবার হোসেন কুলি খান নামক নবাবের জনৈক সুদক্ষ ও চতুর কর্মচারীর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন।[২৭৮] নবাব তাঁর অপর এক ভাইপো ও জামাতা[২৭৯] জয়েনউদ্দিন মুহম্মদ খান (সিরাজউদ্দৌলার পিতা)-কে বিহারের (পাটনা বা আজিমাবাদ) নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত করেন। আলিবর্দি নিজ ভগ্নিপতি (পরবর্তীকালে কুখ্যাত) মির জাফর আলি খানকে পুরোনো সৈন্যবাহিনীর বখশি নিযুক্ত করেন এবং একই সঙ্গে শ্যালক কাশিম আলি খানের কাছ থেকে নতুন সৈন্যবাহিনীর বখশির দায়িত্ব প্রত্যাহার করে তাঁকে (কাশিম আলি খান) রংপুরের ফৌজদার নিযুক্ত করেন। প্রত্যাহৃত বখশির দায়িত্ব পান নবাব পরিবারের বিশ্বস্ত সদস্য নসরুল্লাহ্ বেগ খান। এছাড়া রাজকীয় নৌ-বহর ও গোলন্দাজ বাহিনীর দায়িত্ব অর্পণ করেন দুই দৌহিত্র—যথাক্রমে মিরজা মুহম্মদ (পরবর্তীকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা) ও মিরজা কাজিমের ওপর। রাজমহলের ফৌজদার ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদের জামাতা আতাউল্লাহ্ খানকে একই সঙ্গে ভাগলপুরের ফৌজদারও নিযুক্ত করা হয়। 'সিয়ারে মুতাখ্খিরীন'-এর বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক তাবৃতাবায়ীর মামা আবদুল আলি খানকে তিরহুতের শাসনকর্তা ও কয়েকটি পরগণার আমিল নিযুক্ত করা হয়। অন্যদিকে 'রায়-রায়ান' আলম চাঁদ গিরিয়ার যুদ্ধে মারাত্মক আহত ও পরে মৃত্যু বরণ করায় তাঁর স্থলে খালসা বিভাগের সহকারী দিওয়ান নিযুক্ত করা হয় চিন বা চিনু রায় (চৈতন্য রায়?)-কে এবং তাঁকেও সম্মান জনক 'রায়-রায়ান' উপাধি দেয়া হয়।[২৮০] যা হোক ইত্যবসরে নবাব বাদশাহি দরবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদারি-সনদ লাভ করেন। এ জন্যে যে তাঁকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ অকাতরে ব্যয় করতে হয়েছিল তা আগেই উদ্ধৃত হয়েছে। বাদশাহের এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বীকৃতি[২৮১] অর্জনের পর আলিবর্দি খান কাগজেপত্রে যেমন সুবাদারির বৈধতা হাসিল

২৭৬ সিয়ারে মুতাখখিরীন, পৃষ্ঠা ৪১৯।
২৭৭ The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi, pp. 19.
২৭৮ Ibid., pp. 19. Alivardi and His Times, p. 30.
২৭৯ আলিবর্দি খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁর ৩ কন্যার ৩ জনকেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহমদের ৩ পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই এই তিনজন একদিক দিয়ে তাঁর ভাইপো হলেও অন্যদিকে তারা তাঁর জামাতাও ছিল বটে। ফলত পুত্রসন্তান না থাকায় এদেরকে প্রাদেশিক প্রশাসনের বিভিন্ন শীর্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে অধিষ্ঠিত করে তিনি মূলত শাসন ক্ষমতাকে আরও সুসংহত, নিষ্কণ্টক ও কুক্ষীগত করতে চেয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য। ড. করিম বলেন, 'এ হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার এক সনাতন কৌশল।' (বাংলাদেশের ইতিহাস: ১৭০৪-১৯৭১, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৩)।
২৮০ The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi, pp. 19.
২৮১ *এটা ঠিক যে মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর ক্ষমতাসীন কেন্দ্রীয় মোগল সম্রাট ছিলেন স্তিমিত শক্তিপ্রায়, দর্পহীন, গৌরবশূন্য শাসকের প্রতিভূ; সুবা নিয়ন্ত্রণ তো দূরের কথা, নিজের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা-বলয়ের*

করেন, তেমনি অন্যদিকে এখন থেকে তাঁর অধীনে কর্মরত ব্যক্তি ও পোষ্যদেরকেও তিনি বিভিন্ন রকমের উপাধি (খেতাব ও খিলাত) প্রদানের নৈতিক ভিত্তি অর্জন করেন। ফলত নবাব প্রথম সুযোগেই তিন সুবার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিযুক্ত পূর্বোক্ত তিন ভাইপো-জামাতাদের অনুকূলে বাদশাহের কাছ থেকে আনীত উপাধি[২৮২] বলে নওয়াজিশ মুহম্মদ খানকে 'শাহমত জং', জয়েনউদ্দিন মুহম্মদ খানকে 'হজরত জং' ও সৈয়দ আহমদ খানকে 'সওলত জং'—ঘোষণা করে সংশ্লিষ্টদের সম্মানিত করেন। 'সওলত জং' উপাধিপ্রাপ্ত সৈয়দ আহমদ খানকে (ইতোপূর্বে তিনি রংপুরের ফৌজদার হিশেবে কর্মরত ছিলেন[২৮৩]) আলিবর্দি ওড়িশার নায়েব-ই-নাজিম পদে অধিষ্ঠিত করেন। শুজাউদ্দিনের শাসন-পর্ষদের মতো জামাতার নেতৃত্বে ওড়িশার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য সেখানে একটি 'শাসন-পর্ষৎ' গঠন করেন।[২৮৪] এখানে নায়েবি দায়িত্ব-কর্তব্য নির্বাহ কালে ভূতপূর্ব নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খানের ন্যায় সৈয়দ আহমদ খানও একই ভুল করেন। তিনি সুবার প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর লক্ষ্যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সদস্য সংখ্যা হ্রাস, এমন কি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা-রক্ষীদেরও বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধাদি সীমিত করতে প্রবৃত্ত হন।[২৮৫] স্বভাবতই এর ফলে সেখানে নিয়োজিত নবাবি সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধে এবং শেষ পর্যন্ত অনেকেই চাকুরি পরিত্যাগ করে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়। বস্তুত মধ্য-অষ্টাদশ শতকের পরিবর্তিত অবস্থায় বাংলা তথা ভারতীয় রাষ্ট্রনৈতিক পরিমণ্ডলে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা যেখানে নতুন ভাবে অনুভূত হচ্ছিলো, সেখানে ওড়িশার নবীন ও অনভিজ্ঞ নায়েব-ই-নাজিমের এই অপরিণামদর্শী পদক্ষেপ যে চরম ভুল ছিল তার প্রমাণ আমরা অচিরেই দেখতে পাই আলিবর্দি খানের উক্ত সুবা ত্যাগ করে বাংলায় ফিরে যাওয়ার পরপরই।

আলিবর্দি খান ওড়িশা ত্যাগ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদে পৌঁছে এই সময় সার্বিক প্রশাসনে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণের কাজ কেবল শুরু করেছিলেন। 'সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন-এর লেখকের ভাষায়, 'এই বিশ্রামকাল তিনি অবিশ্রান্ত রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার নির্ধারণে, তাঁহার সৈন্যদলকে নিয়মানুবর্তী করণে ও (যথাস্থানে) স্থাপনে, কৃষকদের নিরুদ্বেগ করণে এবং প্রত্যেক আমীর ও যে সকল সাধারণ লোক তাঁহার নিকটে আসিত, তাহাদের প্রত্যেককে অনুগৃহীতকরণে ব্যয়িত করিলেন।'[২৮৬] কিন্তু এই

আশপাশ শাসনের ক্ষমতাও তাঁর ছিল না বললে চলে। তথাপি গোলযোগপূর্ণ প্রাদেশিক রাজনীতির প্রকৃতি এমনই ছিল যে, যে যখনই এবং যেভাবেই ক্ষমতা গ্রহণ করুক না কেন, প্রত্যেকেই চাইতো অন্তত কেন্দ্রের অনুমোদন—সম্রাটের সহিমোহরাঙ্কিত তথাকথিত মূল্যবান স্বীকৃতি-সনদ। যে কোন উপায়ে এর প্রাপ্তি অন্যদের ও বিশেষ করে প্রজাসাধারণের কাছে তাঁর বা তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা বাড়িয়ে দিতো। স্বভাবতই তখনও পর্যন্ত ক্ষমতা জবরদখলকারী সুবাদারদের কাছে তা ছিল অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিত ও মূল্যবান।

২৮২ সম্রাট মুহম্মদ শাহ, বাংলা, বিহার ও ওড়িশার সুবাদার হিশেবে নবাব আলিবর্দি খানকে স্বীকৃতি প্রদানসহ তাঁকে 'হোসামউদ্দৌলা জং' উপাধিতে ভূষিত করেন।

২৮৩ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৬১।

২৮৪ সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

২৮৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩৩।

২৮৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২৮।

কাজগুলি করার সুযোগ তিনি খুব স্বল্প কালের জন্য লাভ করেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলার নবাব হইয়া প্রবীণ[২৮৭] আলিবর্দি বেশী দিন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না, বা বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা ও শাসনসংক্রান্ত সুপরিকল্পনাগুলিরও রূপ দিবার সুযোগ পাইলেন না।'[২৮৮] আলিবর্দির প্রত্যাবর্তনের অনতিকাল মধ্যে ওড়িশার অসন্তুষ্ট সৈন্যদের প্রচ্ছন্ন আহ্বানে দ্বিতীয় মুর্শিদকুলির জামাতা মিরজা বাকের যিনি এই সময় প্রদেশের সীমান্তে অবস্থান করছিলেন, তিনি একদল মারাঠা সৈন্যসহ অকস্মাৎ ওড়িশা আক্রমণ করেন। নায়েব-ই-নাজিমের সৈন্যবাহিনীর কিছু বিদ্রোহী ও অসন্তুষ্ট সদস্যও তাকে সহযোগিতা করে। ফলে মিরজা বাকের অনেকটা সহজেই কটকে প্রবেশ করেন এবং সৈয়দ আহমদ খানকে পরিবার-পরিজনসহ পরাজিত ও বন্দি করে কারারুদ্ধ করেন (আগস্ট, ১৭৪১)। বাংলার নবাব এই দুঃসংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুনঃ ওড়িশা-অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন। তিনি একই বছরের ডিসেম্বরে ওড়িশা দখলকারী বাকেরকে রায়পুরের যুদ্ধে পরাস্ত করে নায়েব পরিবারের বন্দি সদস্যদের কারা মুক্ত করেন। পরে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করে 'দেশ (ওড়িশা) সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে এবং ইহার রাজস্ব ও রাজ্যের আয় স্বাভাবিক অবস্থায় আনীত হইয়াছে'[২৮৯] দেখতে পেয়ে সেখানকার সহকারী সুবাদার পদে প্রথমে মুখলিস আলি খানকে ও পরে উক্ত পদে শাহ মুহম্মদ মাসুম[২৯০] , মতান্তরে শেখ মাসুম[২৯১] -কে এবং তাঁর সহযোগী ভূমিরাজস্ব বিভাগের দিওয়ান বা 'পেশকার' হিশেবে দুর্লভরাম[২৯২] (রাজা জানকিরামের পুত্র)-কে নিযুক্ত করে নবাব মুর্শিদাবাদের পথে যাত্রা করেন।

কিন্তু পথিমধ্যে যখন তিনি মেদিনীপুরে পৌঁছান তখন দূত মারফত সংবাদ পান যে, বেরার-এর রঘুজি ভোঁসলার প্রধান সেনাপতি ও দিওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত প্রায় ৪০,০০০ সৈন্য[২৯৩], মতান্তরে ৬০,০০০ অশ্বারোহী[২৯৪] সৈন্য নিয়ে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদের আশেপাশের অঞ্চল আক্রমণ করেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে নবাবের কাছে এই সময় অল্পসংখ্যক সৈন্য ছিল। তাই নিয়ে তিনি দুরাচারী মারাঠাদের বাধা প্রদান করেন। এখানে বলে রাখা ভালো যে, বাংলার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী মারাঠাদের বর্বরতা ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আগে থেকে অবহিত থাকলেও তাদের চোরাগোপ্তা রণনীতি ও কৌশল সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিল। তা সত্ত্বেও আলিবর্দি চমৎকার বিচক্ষণতা ও অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করে বিক্ষিপ্ত যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে হটিয়ে সে যাত্রা কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে কাটোয়া

২৮৭ আলিবর্দি যখন বাংলার মসনদ দখল করেন তখনই তাঁর বয়স ষাটের বেশি ছিল। (দেখুন, বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩০৯)।

২৮৮ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ১২।

২৮৯ সিয়ারে মুতাখ্খিরীন, পৃষ্ঠা ৪৪৫-৪৬।

২৯০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬৬।

২৯১ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৬৫।

২৯২ এঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra (Rai-Durlabh). Dr. Subhas Chandra Mukhopadhyay.

২৯৩ সিয়ারে মুতাখ্খিরীন, পৃষ্ঠা ৪৫৪। তাবৃতাবায়ীর মতে মূল মারাঠা বাহিনীতে মাত্র ২৫,০০০ সৈন্য ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে লুণ্ঠনেচ্ছুদের যোগদানে তা ৪০ হাজারে ফুলে ফেঁপে ওঠে।

২৯৪ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৬৫।

পৌঁছান। যদিও শেষ পর্যন্ত মারাঠা বর্গীরা[২৯৫] জগৎ শেঠের কুঠি থেকে ৩ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ও বহু মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী লুট করে নিয়ে যায়। গোলাম হোসায়ন সলীমের ভাষায়, 'বাংলার সৈন্য (হত ক'রে), অশ্ব, হস্তী ও উট দস্যুরা দখল ক'রে নিয়ে গেল।.... গ্রাম শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ পুড়িয়ে, লোকজনকে হত্যা অথবা বন্দী ক'রে, শস্য ভাণ্ডারে আগুন দিয়ে মারাঠা দস্যুরা ধ্বংসলীলা সৃষ্টি করে ছিল।'[২৯৬] পরে নবাব ওড়িশায় সেনাপতি আবদুর রসুল খানকে (মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে মাসুম খান নিহত হওয়ায়) নায়েব-ই-নাজিম নিয়োগ ও ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রম নিয়মিত করে এবং বর্গী-লুণ্ঠিত অঞ্চলসমূহে পুনরায় দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ফৌজদার নিযুক্ত করে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

যা হোক, এরপর ষটতিপর বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দি খানকে প্রায় দীর্ঘ ১০ বছরব্যাপী (১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) মারাঠাদের কমপক্ষে পাঁচটি বড় ধরনের আক্রমণ (১৭৪২, ১৭৪৩, ১৭৪৪, ১৭৪৫, ১৭৪৮) ও বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ মোকাবিলা করতে হয়। মারাঠাদের উপর্যুপরি আক্রমণ, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও লুণ্ঠন, শিশু হত্যা ও নারী ধর্ষণ প্রভৃতি দুরাচার-বৃত্তির ফল এক কথায় এই হয়েছিল যে, 'বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলাদেশ শ্মশান হইয়া গেল—আলীবর্দির চোখের সামনেই তাঁহার সাধের সুবা লুণ্ঠিত হইল—অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হৃতগৌরব, হতাশ ও অর্থশূন্য হইয়া পড়িলেন।'[২৯৭] সত্যি বলতে প্রতিটি যুদ্ধ ও সংঘর্ষে স্বপক্ষে প্রচুর সৈন্য হতাহত ও প্রভূত অর্থ ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও আলিবর্দি 'সর্বথা প্রশংসনীয় অপূর্ব সাহস, অধ্যবসায় ও রণকৌশলের পরিচয়'[২৯৮] দিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধ শুধু বহিঃশত্রুর দিক থেকেই ছিল না। অভ্যন্তরীণভাবে এককালে নিজের দলীয় ও পরে বিদ্রোহী আফগান সেনাপতি গোলাম মুস্তফা খান ও তার সৈন্যদের বিদ্রোহ মোকাবিলা (১৭৪৫), শীর্ষস্থানীয় আফগান নেতাদের[২৯৯] গণ-অভ্যুত্থান প্রতিহতকরণ (১৭৪৮), সুযোগসন্ধানী স্থানীয় অবাধ্য জমিদার ও ভূস্বামীশ্রেণীর বিদ্রোহ চেষ্টা দমন, এমন কি নিজের নয়নের মণিসদৃশ সিরাজউদ্দৌলা[৩০০]-র স্বপক্ষ ত্যাগ ও বিদ্রোহ ঘোষণা

২৯৫ 'বর্গী', মারাঠা 'বার্গীর' শব্দের অপভ্রংশ। নিম্নস্তরের যে সকল সৈন্যকে মারাঠা সরকার অস্ত্র ও অশ্ব সরবরাহ দিতেন, তাদেরকে সাধারণত 'বার্গীর' বলা হতো। মূলত এই 'বার্গীর'গণই বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত ভীতিকর ও বীভৎস অত্যাচারের প্রতীক রূপে 'বর্গী' আখ্যা পায়।

২৯৬ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৬৬-৬৭।

২৯৭ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ১২।

২৯৮ বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৬১।

২৯৯ এই সময় বিহারের নায়েব-ই-নাজিম ছিলেন জয়েনউদ্দিন খান। তাঁকে শমসের খান, মুরাদ শের খান, সর্দার খান, বখশি বাহেলা প্রমুখ দুর্ধর্ষ আফগান নেতা ও সেনাপতি এক জোট হয়ে গোপন মন্ত্রণা কক্ষে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরা নায়েবের প্রাসাদ লুট করে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ও বহু মূল্যবান রত্নাদি হস্তগত করে। (The Comprehensive Hist. of India, IX, p. 191)। উল্লেখ্য, এরা প্রায় ৩ মাস পাটনা দখল করে রেখেছিল। পরে আলিবর্দি খান সেখানকার আফগান বিদ্রোহ দমন ও এর হোতাদের হত্যা ও বিতাড়িত করেন (১৬ই এপ্রিল, ১৭৪৮)। তিনি তরুণ সিরাজউদ্দৌলাকে বিহারের নায়েব নিযুক্ত করেন, যদিও অন্তরালে জানকি রামই সিরাজের মন্ত্রণাদাতা হিশেবে প্রশাসনের মূল দায়িত্ব পালন করেন।

৩০০ আগেই বলেছি যে, আলিবর্দি খানের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তিনি যে বছর বিহারের নায়েব-ই-নাজিম নিযুক্ত হন (১৭৩৩), সে বছর তাঁর সর্বকনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের গর্ভে সিরাজের জন্ম।

(১৭৫০) প্রভৃতি একের পর এক সঙ্কট প্রবৃদ্ধ নবাবকে একেবারে ক্লান্ত, পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম করে ফেলে। অবশেষে 'নিজের বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা, সৈন্যদের ক্লান্তি ও সেনাপতিদের পরিশ্রম-বিমুখতার কথা বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষত মারাঠা দুস্যদের হাত হইতে বাংলার লোকের জান-মালের নিরাপত্তা বিধানের জন্য'[৩০১] তিনি মারাঠা-নেতা রঘুজির সঙ্গে তিনটি শর্তে সন্ধি স্থাপনে সম্মত হন। অবশ্য মারাঠারাও উপর্যুপরি ব্যর্থ আক্রমণ ও যথেচ্ছ ঘৃণ্য লুণ্ঠন কার্যক্রমে যারপরনাই এই সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তারাও চাইছিল সম্মানজনক প্রত্যাবর্তন। উভয়পক্ষে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দের মে/জুন মাসে বহু-প্রতিক্ষিত শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির শর্ত গুলি ছিল নিম্নরূপ* :

(ক) মির হাবিব আলিবর্দি খানের অধীনে ওড়িশার নায়েব-ই-নাজিম হবেন বটে, তবে এই প্রদেশের প্রশাসনিক ও অন্যবিধ ব্যয়োত্তর যে উদ্‌বৃত্ত রাজস্ব থাকবে তা মারাঠা সৈন্যদের ব্যয়ার্থে রঘুজি ভোঁসলা পাবেন;

(খ) 'চৌথ-মারাঠা' (এক-চতুথাংশ) বাবদ বাংলার সংগৃহীত ভূমিরাজস্ব থেকে প্রতি বছর ১২ লক্ষ টাকা সর্বাধিক দুই কিস্তিতে নবাব মারাঠাদের প্রদান করবেন, এবং

(গ) বিনিময়ে মারাঠা সৈন্যরা সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে ভবিষ্যতে আর কখনও বাংলাদেশ আক্রমণ করবে না।

আপাত বিচারে উপরোল্লিখিত শর্তাধীনে এই চুক্তি বাংলার নবাবের জন্য ছিল অবমাননাকর ও পরাজয়মূলক। ড. মুহম্মদ মোহর আলি বলেন, 'The treaty was undoubtedly an acknowledgement of defeat on the part of 'Alivardi Khan.'[৩০২] এ উক্তির যাথার্থ্য আরও প্রকটরূপে প্রকাশিত হয় যখন মাত্র এক বছর পরেই জানোজি ভোঁসলার মারাঠা সৈন্যরা মির হাবিবকে হটিয়ে (তারা তাকে হত্যা করে) মুসলেহউদ্দিন নামীয় রঘুজির জনৈক সভাসদকে সেখানে নায়েব হিশেবে প্রতিষ্ঠিত করে (২৪শে আগস্ট, ১৭৫২)। তথাপি বাংলার নবাবের জন্যে এটাই পরম সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে আলিবর্দির জীবদ্দশায় আর কখনও মারাঠারা বাংলা আক্রমণ করেনি।[৩০৩] যা হোক, এই চুক্তির ফলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার জন্ম হয়েছিল।

এক. ওড়িশায় আলিবর্দি খানের পক্ষে নায়েব-ই-নাজিম হিশেবে একদা নবাবি প্রশাসনের কর্মচারী কিন্তু পরে বিদ্রোহী ও মারাঠানুগত মির হাবিব দায়িত্ব পালন করলেও

স্বভাবতই মাতামহ আলিবর্দি ও তদীয় স্ত্রী তাঁকে নিজেদের সৌভাগ্যের প্রতীক হিশেবে মনে করতেন। উভয়ে সিরাজকে অসম্ভব স্নেহ করতেন ও ভালো বাসতেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা তাঁদের এই অযাচিত ও লাগামহীন স্নেহ-ভালোবাসাই অল্প বয়স থেকেই সিরাজকে দুরাচারী ও ভবিষ্যত নবাব হওয়ার অযোগ্য করে তুলেছিল।

৩০১ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩১৭-১৮।

* বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Alivardi and His Times, pp. 91.

৩০২ History of the Muslims of Bengal, Vol. 1A, pp. 637.

৩০৩ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩১৮।

বস্তুত তার সময় থেকেই ওড়িশায় বাংলা ও বিহার অধিপতির কর্তৃত্ব লোপ পায় এবং এটি চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন হয় জানোজির হাতে হাবিবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। কার্যত ১৭৫২ সালের আগস্টের পর থেকে ওড়িশা মারাঠাদের নাগপুর রাজ্যের একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হয়েছিল।[৩০৪]

দুই. এইভাবে ওড়িশা বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে অনিবার্যভাবে বৃহত্তর সুবে বাংলার নির্দিষ্ট সীমানাও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। পশ্চিমে বাংলার ভৌগোলিক সীমা নতুনভাবে নির্ধারিত হয় বলেশ্বরের নিকট সুবর্ণরেখা নদী পর্যন্ত। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ মেদিনীপুর বাংলা থেকে বাহ্যত আলাদা হয়ে নাগপুর রাজ্যের প্রদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

তিন. মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ বিদেশি বণিক বিশেষত ইংরেজদের জন্যে 'শাপে বর' হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাদের অতর্কিত আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অজুহাতে ইংরেজরা কলকাতা ও অন্যত্র তাদের বাণিজ্য কুঠি ও দুর্গগুলিকে আরও মজবুত ও দুর্ভেদ্য এবং নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করার সুযোগ পেয়েছিল। এ বিষয়ে নবাবের অনুমতির খুব একটা ধার তারা ধারেনি। উপরন্তু তারা হুগলি নদীর পূর্ব তীর থেকে পালিয়ে আসা ও তাদের (ইংরেজ) কাছে আশ্রয়-প্রার্থী লোকজনের অনুরোধে ও নবাবের নীরব সম্মতিতে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জমিদারি এলাকার সুতানটির উত্তর থেকে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত প্রায় ৩ মাইলব্যাপী নিজস্ব খরচে একটি খাল ('মারাঠা ডিচ বা খাল' নামেই অধিক পরিচিত) খনন করে। নবাব যদিও পরবর্তীকালে মারাঠাদেরকে কলকাতা থেকে বহুদূরে বিতাড়িত করেন, তথাপি কলকাতা ও তার সন্নিহিত অঞ্চলের লোকজন এই আপৎকালে ইংরেজদের গৃহীত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় সাময়িক শান্তি ও নির্বিঘ্নতার যে নমুনা পেয়েছিল, স্থানীয় মানুষের সেই আস্থা ও বিশ্বাসকে পুঁজি করেই পরবর্তীকালে ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠী বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের বিপর্যয়ের জন্ম দিতে পেরেছিল, এবং এর ফলও তারা পেয়েছিল।

চার. মারাঠাদের আক্রমণের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক ছিল এতে বাংলার কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য মারাত্মক দুর্দশায় নিপতিত হয়েছিল। সমাজ জীবনে মানুষের নিরাপত্তার অভাব এবং তার ফলে সৃষ্ট অস্থিরতা ও আতঙ্কিত জনসাধারণের মধ্যে স্থানান্তরের (দেশান্তরও বলা যায়) প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে রাজধানী মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান প্রভৃতি বাংলার পশ্চিমাংশে বহিঃশত্রুর আক্রমণের অভিঘাত এই অঞ্চলের শান্তিপ্রিয় অধিবাসী ও কৃষকদেরকে বাংলার পূর্বাঞ্চলে ও ইংরেজদের জমিদারি এলাকা প্রধানত কলকাতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। এর ফলে পূর্বাঞ্চলে হঠাৎ জনসংখ্যার স্ফীতি ঘটে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিসহ আর্থ-সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রবল চাপের সৃষ্টি হয়েছিল।

পাঁচ. এই পর্বের বাংলার ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার যেটা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় দিক তা হলো এই যে, বস্তুত ঘন ঘন মারাঠা আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণভাবে বিভিন্ন জমিদারশ্রেণীর বিদ্রোহ দমন ও আফগানদের সঙ্গে সংঘর্ষ প্রভৃতির অনিবার্য ও তাৎক্ষণিক ফল এই হয়েছিল, তা বাংলার রাজকোষের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। তখন সঞ্চয় বলে কিছুই

৩০৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১৮।

থাকতো না।[৩০৫] বলা যায় জলের স্রোতের মতো এ সময় মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে অর্থ বেরিয়ে যাচ্ছিলো। এতে করে বাংলা থেকে দিল্লিতে নিয়মিত রাজস্ব বা 'পেশকাশ' প্রেরণও এক প্রকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'তাঁর (আলিবর্দ্দী) সময়ে দিল্লীতে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হয়ে যায়।'[৩০৬]

ছয়. মারাঠা আক্রমণ একদিকে আলিবর্দি খানকে যারপরনাই বিপর্যস্ত ও আর্থিক ও ভৌগোলিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করলেও অন্যদিকে এর একটা নঞর্থক শুভ দিকও তাঁর জন্যে বহন করে এনেছিল। এ যাবৎ বাংলার সকল নবাবই কেন্দ্রে যে শাসক থাকুক ও যে অবস্থায়ই বিরাজ করুক না কেন, তাঁরা প্রায় নিয়মিতই দিল্লির সম্রাটের পাওনা পরিশোধ করে এসেছেন। কিন্তু প্রদেশের গোলযোগপূর্ণ রাজনীতির কারণে আলিবর্দির অসম্ভব ব্যস্ততা ও অপরিমিত রাজস্ব ব্যয় তাঁকে কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণের তাগিদ দিলেও সুযোগ ও সামর্থ্য দেয়নি। এক পর্যায়ে এটির প্রয়োজনও সম্ভবত আর তিনি অনুভব করেননি। তাছাড়া এই সময় দিল্লির মোগল বাদশাহ মুহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) ও তৎপুত্র আহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪)-এর প্রদীপের স্তিমিত প্রায় আলোর ন্যায় ক্ষমতার যে ঔজ্জ্বল্য ছিল, তাতে করে সত্যি বলতে দূরবর্তী সুবাগুলিকে বিশেষ করে বাংলাকে নিয়ন্ত্রণের তাঁর আর কোন ক্ষমতাও ছিল না। ভূতপূর্ব নবাবরা (মুর্শিদকুলি থেকে পরবর্তী) স্বাধীনভাবে সুবা শাসন করলেও তাঁরা নিয়মিত 'পেশকাশ' প্রেরণ করে সম্রাটের আনুগত্যের প্রতি যে সৌজন্য ও সমীহ দেখিয়ে আসছিলেন, রাজত্বের প্রথম একটি বছর আলিবর্দিও সে ধারা অব্যাহত রাখলেও পরবর্তীতে তিনি তা একেবারেই ঝেড়ে ফেলেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি তখন ছিলেন দিল্লির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও অধীনতা মুক্ত—কী শাসন ক্ষমতার যথেচ্ছ প্রয়োগে, কী রাজস্বের একক ভোগ-দখলে। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাই যথার্থই বলেছেন, 'His (Alivardi) government was entirely free from imperial control, for the period of his personal rule coincided with the total collapse of the Mughal Empire.'[৩০৭]

যা হোক, মারাঠাদের সঙ্গে অনাক্রমণ ও শান্তি চুক্তি স্থাপনের পর থেকে জীবনের শেষ পাঁচটি বছর (১৭৫১ থেকে ১৭৫৬) নবাব আলিবর্দি খান এক প্রকার শান্তি ও নিশ্চিন্তে বাংলা ও বিহার শাসন করেছিলেন। 'তাওয়ারীখ-ই-ঢাকা'-এর লেখকের ভাষায়, 'শান্তি ও যুদ্ধ—সব সময় আলিবর্দী খান অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। সাহস, শৌর্যবীর্য, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতায় তিনি সবার ওপরে ছিলেন। সুবেদারীর মসনদে আরোহণ করার শুরু থেকে দীর্ঘ ১০ বছর ধরে সবসময় মারাঠা ও বিদ্রোহী সেনাপতিদের শান্তি দেওয়ার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। রাজ্যের শাসন, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক

৩০৫ ড. বি. বি. মিশ্র বলেন, 'The marauding activities of the invaders (the Marathas) contributed to the dislocation of the entire economic life of the peasant, and seriously affected the finances of the Nawab's government.' (The Judicial Administration of the East India Company in Bengal, 1765-1782, pp. 3)..

৩০৬ প্রাক্-পলাশী বাংলা, ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১২।

৩০৭ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 56.

ব্যাপারে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য নানা কাজে তিনি পাঁচ বছর সময় ব্যয় করেন।'[৩০৮] মোটামুটি এ সময়টুকুকেই তিনি প্রশাসনিক কাজে ও ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও কৃষি তথা রায়তের উন্নতির জন্য ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর অনুসৃত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অংশই ছিল গতানুগতিক অর্থাৎ মুর্শিদকুলি জাফর খান ও শুজাউদ্দিন খানের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ মাত্র। প্রচলিত আবওয়াব আরোপের ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা পরিবর্তন এনেছিলেন। এ পর্যায়ে নবাব আলিবর্দি খানের প্রবর্তিত আবওয়াব ও অন্য দু'একটি আনুষঙ্গিক বিষয়ে নীচে আলোচনা করবো।

নবাব আলিবর্দি খান জমিদার-তালুকদারদের সঙ্গে প্রচলিত রাজস্ব বন্দোবস্ত—'মাল-গুজারি' বহাল রেখেছিলেন। কাগজে-কলমে এই খাতের আসল জমা ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা অটুট ছিল। কিন্তু যেহেতু মারাঠাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থাপনের পর এবং এর অনেক আগে থেকেই ওড়িশা নিয়ে বর্তমান নবাব (আলিবর্দি) ও ভূতপূর্ব নবাবের উত্তরাধিকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে সৃষ্ট বিরোধের কারণে সেখান থেকে রাষ্ট্রের আয় খুবই অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল, সেহেতু তিন প্রদেশের ওপর ভিত্তিশীল আসল জমা বাস্তবে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিল, তা বলাইবাহুল্য। এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে, এবং বাহ্যত মারাঠাদের বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা প্রদানের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে আলিবর্দি বিভিন্নভাবে রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। প্রথমত মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধকালে এতদঞ্চলের জমিদারগণ যদিও নবাবকে নিয়মিত ভূমিরাজস্বের বাইরেও সম্মিলিতভাবে ১ কোটিরও বেশি অর্থ সাহায্য করেছিলেন[৩০৯], তথাপি সেটা মনে রেখেও আলিবর্দি তাদের কাছ থেকে অনিয়মিত হয়ে পড়া ভূমিরাজস্ব আদায় কার্যক্রম নতুনভাবে এবং যথেষ্ট কড়াকড়ির সাথে শুরু করেন। অবশ্য এর অর্থ এটা নয় যে তিনি জমিদার-তালুকদারদের ওপর অহেতুক নিপীড়ন শুরু করেছিলেন। বরং তাদের সঙ্গে তাঁর (আলিবর্দি) ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত সম্পর্ক ছিল চমৎকার সমঝোতাপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও পরিমিত, স্বনামখ্যাত জন শোর-এর ভাষায়— 'a moderat assessment, in which the interests of the zamidars were consulted'.'[৩১০]

তবে যে সমস্ত জমিদার সরকারি পাওনা পরিশোধে ঢিলেমি ও দীর্ঘসূত্রতার আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের প্রতি তিনি প্রকৃতই কঠোরতা প্রদর্শন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ১৭৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি নদীয়ার জমিদার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্রের কাছে ১২ লক্ষ টাকা 'নজরানা' দাবি করেছিলেন কিন্তু রাজা তা দিতে গড়িমসি করায় নবাব তাঁকে নজরবন্দি করেন। অবশ্য এটা তাঁর রাজত্বের একেবারে প্রথম দিককার ঘটনা যখন ওড়িশায় রুস্তম জঙ্গকে সবেমাত্র পরাজিত ও বিতাড়িত করে তিনি প্রশাসনিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন। তিনি বিদেশি বণিকদের কাছেও মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ ও যুদ্ধের খরচ সঙ্কুলানের জন্য 'সাময়িক সাহায্য' (Casual aids)-এর নামে অর্থ দাবি করেন। মোটামুটি ৩টি ইউরোপীয় কোম্পানির প্রত্যেকটির ওপর ২,০০০ টাকা করে যুদ্ধকালীন কর ধার্য

৩০৮ পৃষ্ঠা ৮১। ঐতিহাসিক ড. হান্টারও স্বীকার করেন, 'The years from this date (1751) till his (Ali Vardi Khan) death in 1756 formed the only quiet period of his reign.' (Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp.182).

৩০৯ Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp.182.

৩১০ Quoted from 'The Agrarian System of Bengal, Vol. I.', pp. 58.

করেন[৩১১] এবং এর বাইরেও সময়ে-সময়ে তাদের কাছে বিভিন্ন অঙ্কের রাজস্ব দাবি করেন, যদিও তার সবটুকু পূরণ না হলেও কিছু কিছু পূরণ করতে বিদেশিরা বাধ্য হতো। প্রসঙ্গত ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কথা বলা যায়। ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে নবাব তাঁর সৈন্যদের দু'মাসের খরচ বাবদ কোম্পানির কাশিমবাজার কুঠির প্রধানের কাছে প্রায় ৩০,০০,০০০ টাকা দাবি করেন। কিন্তু কোম্পানি প্রধান নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩ দিন) এই বিপুল অঙ্কের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় নবাব এক আদেশে তাদের বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ করে দেন। পরে একই বছরের অক্টোবরে কোম্পানি প্রায় ৪ লক্ষ টাকা জমা দিয়ে তাদের বাণিজ্যাধিকার ফিরে পায়।[৩১২] তবে সত্যি বলতে আলিবর্দি খান ব্যক্তিগতভাবে বিদেশি বণিকদের প্রতি মোটেও সহানুভূতিহীন ও অবিবেচক ছিলেন না। এ সমস্ত যা কিছু তিনি করেছিলেন, তা প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে করেছিলেন তা বলাইবাহুল্য। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত মহাশয়ও স্বীকার করেন, 'Alivardi's attitude towards the European traders in Bengal was strict, but he was not oppressive towards them. He exacted money from them occasionally under pressing financial needs due to extraordinary circumstances, and not on "groundless pretences"...'[৩১৩]

বস্তুত এত কিছু করা সত্ত্বেও রাজকোষের সঞ্চয় পরিস্থিতির আদৌ উন্নতি না হওয়ায় এবং মারাঠাদের প্রতিশ্রুত 'চৌথ' পরিশোধের অজুহাতে নবাব শেষ অস্ত্রস্বরূপ 'আবওয়াব'কেই বেছে নেন। তিনি শুজাউদ্দিন খান ও সরফরাজের আমলের প্রচলিত আবওয়াবের পরিবর্তে নতুনভাবে ৪ ধরনের আবওয়াব চালু করেন। এগুলি নিম্নরূপ :

(ক) চৌথ মারাঠা— ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে নাগপুরের মারাঠাধিপতি রঘুজি ভোঁসলার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদেরকে দেয় বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা আদায়ের লক্ষ্যে নবাব খালসা বা রাজকীয় ভূমির[৩১৪] ওপর এই কর আরোপ করেন। এ খাতে বাৎসরিক মোটামুটি ৩,০২,৪৮০ টাকা[৩১৫] আদায় হতো, এবং আলিবর্দি খানের জীবদ্দশায় সর্বমোট ১৫,৩১,৮১৭ টাকা[৩১৬] আদায় হয়।

(খ) নজরানা মনসুরগঞ্জ— নবাব-দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক মোতিঝিল নামক হ্রদের তীরে নির্মিত 'হীরাঝিল' প্রাসাদের সন্নিকটে গড়ে ওঠা বাজার ও গঞ্জের ওপর ধার্য আবওয়াব। এর মোট পরিমাণ ছিল ৫,০১,৫৯৭ টাকা[৩১৭]।

৩১১ British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad (1757-1772), Dr Subhas Chandra Mukhopadhyay, pp. 36-37.

৩১২ এই ৪ লক্ষ টাকার মধ্যে কোম্পানি সরাসরি নবাবকে দিয়েছিল ৩,৫০,০০০, মুর্শিদাবাদ দরবারের উচ্চপদস্থ আমির-ওমরাহদেরকে ৩০,৫০০, জাহাঙ্গিরনগর ও বিহারের কর্মকর্তাদেরকে যথাক্রমে ৫,০০০ ও ৮,০০০ টাকা। (দেখুন, British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, pp. 37.)

৩১৩ The History of Bengal, Vol. II., pp. 452.

৩১৪ কোম্পানী আমলে ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৩৮।

৩১৫ Statistical Account of Bengal, Vol. I., pp. 358.

৩১৬ বাংলার আর্থিক ইতিহাস (অষ্টাদশ শতাব্দী), পৃষ্ঠা ১৩; মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৪৭।

৩১৭ Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 71.

(গ) আহুক প্রভৃতি— সরকারি প্রয়োজনে সিলেট অঞ্চল থেকে চুন কেনাবেচা ও পরিবহনের ওপর নির্দিষ্ট হারে ধার্য কর। এ খাতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৮৪,১৪০ টাকা।

(ঘ) কীমত খিস্ত গৌড়—মধ্য বাংলার এককালীন রাজধানী গৌড় থেকে সুদৃশ্য ও মজবুত ইট, পাথর প্রভৃতি আনার খরচ বহন বাবদ কর। উল্লেখ্য গৌড়ে সুলতানি শাসনামলের নানা সুদৃশ্য কারুকার্যখচিত প্রাসাদসমূহের যে ধ্বংসাবশেষ ছিল সেগুলি থেকে ব্যবহারযোগ্য মূল্যবান সুচিক্কণ ইস্টক ও প্রস্তর এনে আলিবর্দির জীবদ্দশায় মুর্শিদাবাদ শহরের প্রায় মাইল দু'য়েক দক্ষিণে মোতিঝিলের তীরে প্রিয়-দৌহিত্র তরুণ সিরাজ বিপুল ব্যয়ে যে প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন, সেই ইস্টক ও প্রস্তর পরিবহনের খরচ সঙ্কুলানের জন্যই মূলত 'কীমত খিস্ত গৌড়' আরোপিত হয়েছিল। এ খাতের আয় ছিল ৮,০০০ টাকা।

এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, বিরূপ পরিস্থিতির চাপে পড়ে যদিও নবাব আলিবর্দি খানকে জমিদার-তালুকদার প্রভৃতি ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট ও সংশ্লিষ্টদের ওপর উপরোল্লিখিত আবওয়াবসমূহ চাপিয়ে দিতে হয়েছিল এবং বাস্তবে এর অনিবার্য প্রভাব গিয়ে পড়তো রায়ত সাধারণের ওপর, তথাপি এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কখনই চাননি প্রজাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত রাজস্বের অতিরিক্ত আদায় করতে, এবং কেউ নবাবি পাওনা পরিশোধের অজুহাতে জোরজবরদস্তিমূলক খাজনা দাবি ও আদায় করুক, এটিও তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত বলেন, 'Ali Vardi never realized money forcibly from the people, and the mode of collection was not arbitrary. But to meet extraordinary financial needs during the first eleven years of his government, when the revenue collections fell short of the standard assessments, he took 'casual aids' from the European traders and the principal zamindars of the province.'[৩১৮] অন্যত্রও তিনি বলেন, 'The ryots were not subjected to arbitrary revenue assessments. ...No additional pecuniary demands were made by the state on the masses of the people.'[৩১৯] বরং ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের ফাঁকে ফাঁকে, 'Alivardi encouraged rural reconstruction and uplift in all possible ways.'[৩২০] সমসাময়িক বিখ্যাত একজন ঐতিহাসিকের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে ড. মুহম্মদ আবদুর রহিম মন্তব্য করেন, 'প্রজাদের শান্তি ও কল্যাণ নবাব আলিবর্দীর কাম্য ছিল এবং তাঁহার শাসনকালে প্রজারা এইরূপ সুখশান্তিতে ছিল যে, যেন তাহারা পিতা বা মাতার ক্রোড়ে শায়িত আছে। জমিদাররা যাহাতে প্রজাদের উপর উৎপীড়ন না করিতে পারে সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।.... তাঁহার সময়ে.... রাজস্বের হার পরিমিত হওয়ায় (থাকায়) জমিদাররা কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা

৩১৮ The Maratha Supremacy, pp. 111.
৩১৯ Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 195; The History of Bengal, Vol. II., pp. 449.
৩২০ Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 195.

করিতে উৎসাহিত হয়।'[৩২১] বস্তুত নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়ে বাংলায় যে সকল নতুন জমিদারির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল এবং মারাঠা আক্রমণের করাল গ্রাস থেকে যেগুলি মুক্ত ছিল যেমন রাজশাহির জমিদারি, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারি প্রভৃতি[৩২২] আলিবর্দির রাজত্বকালে সেগুলি আরও সমৃদ্ধ হয়েছিল। ফলে সার্বিক বিচারে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "আবওয়াব" ধার্য করা সত্ত্বেও আলিবর্দির শাসনকালের শেষ ভাগে বাংলার প্রজারা মোটামুটি সচ্ছল ছিল।'[৩২৩]

আলিবর্দির শাসনকালের ভূমিরাজস্ব বিভাগসহ সার্বিক প্রশাসনযন্ত্রের একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অপরিহার্য বিষয় ছিল হিন্দু রাজকর্মচারীদের অবস্থান। মূলত প্রশাসনের প্রায় সর্বক্ষেত্রে যেমন এদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল, তেমনি অর্থ ও রাজস্বসংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ এবং সমর বিভাগের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিতেও যোগ্য হিন্দু কর্মচারীরা স্থান করে নিয়েছিলেন। বাংলার মুসলমান শাসনামলে প্রশাসনের কোনও কোনও বিভাগে হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগের যে প্রবণতার শুরু সুলতানি যুগের প্রায় সূচনায়, যার ব্যাপক লক্ষ্যণীয় প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল নবাব মুর্শিদকুলি জাফর খানের স্বার্থদুষ্ট বদান্যতায়, পরবর্তীকালে সেটিই বিস্তৃত পরিণতি লাভ করে আলিবর্দির সময়ে। বিষয়টি তাই প্রাগাধুনিক মুসলিম ঐতিহাসিকদের যেমন সৈয়দ গোলাম হুসায়ন খান তাব্‌তাবায়ী (সিয়ারে মুতাখ্‌খিরীন), ইউসুফ আলি খান (তারিখ-ই-বঙ্গালহ-ই-মহব্বতজং), করম আলি (মুজাফফর-নামা), গোলাম হোসায়ন সলিম (রিয়াজ-উস-সালাতীন) প্রমুখ, তেমনি আধুনিককালের হিন্দু-মুসলিম সকল ঐতিহাসিকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। এখানে দু'একজন আধুনিক ঐতিহাসিক-এর এ সংক্রান্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। ড. কে. এম. করিম বলেন, 'নবাব আলিবর্দী খানের সময়ে হিন্দু রাজকর্মকর্তাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। তারা ঐ সময়ে সামরিক, বেসামরিক ও রাজস্ব বিভাগে বিপুল সংখ্যক পদ লাভ করেন।'[৩২৪] ড. সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও বলেন, 'Alivardi preferred the services of the Hindus in his court for his own interest, as well as for the interest of the realm and he employed numerous Hindu officers in the state, who discharged their duties satisfactorily.'[৩২৫] পূর্বোদ্ধৃত মুসলমান লেখকদের সংশ্লিষ্ট রচনায় এঁদের যে তালিকা পাওয়া যায় তা থেকে তৎকালীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম নীচে উল্লেখ করা হলো।

রাজা জানকিরাম সোম (সম্ভ্রান্ত 'সোম' পরিবারের লোক ছিলেন)—মুর্শিদাবাদে ইনি 'দিওয়ান-ই-তান' হিশেবে ও বিহারে নায়েব-ই-নাজিম এবং আলিবর্দি খানের দুঃসময়ে

৩২১ বাংলাদেশের ইতিহাস, পৃষ্ঠা ৩২০। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেন, 'The zamindars encouraged cultivation by the peasantry and did not press for immediate payment when the ryots were in distress;.' (The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 58.).

৩২২ The History of Bengal, Vol. II., pp. 449.

৩২৩ ড. সুশীল চৌধুরী, বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২।

৩২৪ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯।

৩২৫ The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra..., pp. 10.

তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও পরামর্শকরূপে কাজ করেন; তৎপুত্র বিখ্যাত-কুখ্যাত রাজা দুর্লভরাম মহিন্দ্র ('রায়-দুর্লভ' নামেই অধিক পরিচিত)—প্রথমে ইনি ওড়িশার সহকারী সুবাদার শেখ মাসুমের 'পেশকার' ছিলেন এবং পরে জাহাঙ্গিরনগর (ঢাকা)-এর দিওয়ান-ই-তান; বীরু ওরফে বায়রু দত্ত—কিছু কাল বাংলার দিওয়ান হিশেবে দায়িত্ব পালন করেন, পরে শোথ রোগে মারা যান; উমেদ রাম বা রায় ছিলেন তাঁর (বীরুদত্ত) 'পেশকার' ও নবাব কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে ইনি নিযুক্তি না পেয়েও তাঁর (নবাব) নীরব সম্মতিতে বাংলায় দিওয়ানি করেন; এঁর কাছ থেকেই বিখ্যাত 'রায়-রায়ান' আলম চাঁদ ফতেহ চাঁদের পুত্র কিরাত বা কিরীটী চাঁদ বাংলার দিওয়ানি গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিরাত চাঁদ দিওয়ান থাকাকালে চাকলে বর্ধমান থেকে নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত ১ কোটিরও বেশি টাকা আদায় করে মুর্শিদাবাদ খাজাঞ্চিতে জমা দেয়ায় নবাব আলিবর্দি খান তাঁর ওপর যারপরনাই তুষ্ট ও প্রীত হয়েছিলেন।[৩২৬] এ ছাড়াও চিন বা চিনু রায় (খালসা বিভাগের দিওয়ান), গোকুল চাঁদ (জাহাঙ্গিরনগরের দিওয়ান), শ্যাম সুন্দর (গোলন্দাজ বাহিনীর বখশি), রামরাম সিং (গোয়েন্দ দফতরের প্রধান) এবং জগদ্বিখ্যাত জগৎশেঠ প্রমুখ আলিবর্দির সময়ে প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর বাইরে ভূমিরাজস্ব আদায়কারী এজেন্ট হিশেবে হিন্দু জমিদারশ্রেণীর প্রায় এক চেটিয়া ভূমিকা তো ছিলই।

যা হোক, প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বিশেষ করে 'নায়েব-ই-নাজিম' (জানকিরাম) এবং 'দিওয়ান' ও 'দিওয়ান-ই-তান' এর মতো ভূমিরাজস্ব বিভাগের প্রায় নীতি-নির্ধারণী পদে (কখনও কখনও সহকারী দিওয়ানের পদও হিন্দু রাজকর্মচারীদের দেয়া হতো[৩২৭]) হিন্দু রাজকর্মচারীদের বাছবিচারহীন[৩২৮] সংখ্যাধিক্যের অনিবার্য ফল এই হয়েছিল যে, এঁদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতা ছাড়া প্রশাসনের কোন কাজ সম্পন্ন হতো না। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক রবার্ট ওর্মে (Robert Orme) পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছেন, 'Thus the Hindu connection became the most opulent influence in the government, of which it pervaded every department with such efficiency that nothing of moment could move without their participation and knowledge.'[৩২৯] অনেক হিন্দুই প্রশাসনের দৈনন্দিন কাজেকর্মে ও

৩২৬ 'During the Diwani, Raja Kirat Chand collected more than a crore of rupees, excluding the fixed revenue, from the chakla of Bardwan and submitted it to the Nawab's (public) treasury and the Nawab became extremely happy and pleased with him.' (The Tarikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi, pp. 112).

৩২৭ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩২০-২১।

৩২৮ 'বাছবিচারহীন' এই জন্যে বলা হচ্ছে যে, এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে খুব ভালো ভূমিকা নেননি। বিশেষ করে ক্ষমতা ও অর্থ-প্রতিপত্তির চরম সুযোগ-সুবিধা আলিবর্দি খানের কাছ থেকে গ্রহণ করা সত্ত্বেও এদেরই কেউ কেউ যেমন জগৎ শেঠ, রায় দুর্লভ, উমিদ চাঁদ প্রমুখ আলিবর্দিরই উত্তরসূরী ও প্রিয়-দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে ঝাড়ে-বংশে নিপাত করার জন্য অন্তরালে ইংরেজ বেনিয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছিল যা বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত।

৩২৯ Military Transactions of British Nation in Indostan, Vol. II., pp. 29, quoted from 'The Muslim Society and Politics in Bengal', Dr. Muhammad

পরামর্শে তাঁদের অপূর্ব দক্ষতা ও যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও শ্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু এর মধ্যেই সুযোগসন্ধানী কেউ কেউ বাংলার দীর্ঘ কয়েক শত বছরের মুসলিম শাসন যুগের অবসানের লক্ষ্যে অন্তরালে নিঃশব্দে কাজ করে চলেছিল— ইতিহাস যার নীরব সাক্ষী।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন জন নবাবের ন্যায় শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসনের সুযোগ না পেলেও এবং শেষ পর্যন্ত ওড়িশা ব্যতীত শুধু বাংলা ও বিহারের ওপর তাঁর নবাবি কর্তৃত্ব সীমিত হয়ে পড়লেও জীবনের শেষ ক'টি বছরের যে সময়টুকু তিনি পেয়েছিলেন, প্রবৃদ্ধ আলিবর্দি খান সেটিকেই জনদরদী শাসকের মতো প্রজার কল্যাণ ও কৃষির উন্নয়নে ব্যয়িত করেছিলেন। প্রতিকূল সময়ের বিচারে যোগ্যতায় ও গুণে পূর্বসূরী কারও তুলনায় তিনি কম ছিলেন না। বরং এক অর্থে, 'সুবায় সুশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ অপেক্ষাও প্রশংসা করিতে হইবে।'[৩৩০]

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে[৩৩১] বেশ কিছু দিন শোথ রোগে[৩৩২] শয্যাশায়ী থাকার পর নবাব আলিবর্দি খান আশি[৩৩৩] কি বিরাশি[৩৩৪] বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। আগেই বলা হয়েছে যে, তাঁর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। জীবিত ৩ কন্যা ও তাঁদের পুরুষ উত্তরাধিকারীদের[৩৩৫] মধ্যে মিরজা মুহম্মদ ওরফে সিরাজউদ্দৌলা[৩৩৬] আলিবর্দির

Abdur Rahim, pp 5; বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭), ড. এম. এ. রহিম, পৃষ্ঠা ৫।

৩৩০ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ১৪।

৩৩১ সমসাময়িক অধিকাংশ মুসলিম ও ইংরেজ ঐতিহাসিক এবং আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণ আলিবর্দি খানের মৃত্যুর এই তারিখ সমর্থন করেন। যদিও 'Muzaffar-Namah'-এর লেখক করম আলি তা ১৫ই রজব ১১৭০ হিজরি মোতাবেক ১৫ই এপ্রিল ১৭৫৬ বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন, Bengal Nawabs, pp. 61.

৩৩২ History of Bengal, Charles Stewart, 1904, pp. 555.

৩৩৩ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪; The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra, pp. 30.

৩৩৪ The History of Bengal, Vol. II., pp. 468; মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৫৫।

৩৩৫ আলিবর্দি খানের জীবিত তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা মেহের-উন-নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম ছিলেন নিঃসন্তান। মধ্যমার গর্ভের ছিল শওকত জং (পূর্ণিয়ার শাসক) ও মিরজা রমজানি (মসনদের লড়াই কালে এ ছিল অপ্রাপ্তবয়স্ক)। অন্যদিকে কনিষ্ঠা আমিনার ছিল ৩ পুত্র— মিরজা মুহম্মদ ওরফে সিরাজউদ্দৌলা, ইকরামউদ্দৌলা (ঘসেটি বেগম কর্তৃক দত্তক গৃহীত; কিন্তু ইনি আলিবর্দির মৃত্যুর বছর দু'য়েক আগে মারা যান) ও মিরজা মাহদি (অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিল)। এঁদের মধ্যে পূর্ণিয়ার ফৌজদার-নবাব শওকত জঙ্গের সঙ্গেই সিরাজউদ্দৌলার সংঘর্ষ বাঁধে। তাঁকে সিরাজ পরাজিত ও হত্যা করেন (রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৮৮)। আরও দেখুন, Sriajuddaullah and the East India Company, 1756-1757, Dr. Brijen K. Gupta, Appendix I.

৩৩৬ আলিবর্দি মিরজা মুহম্মদের জন্য এই উপাধি ('সিরাজউদ্দৌলা') বাদশাহের দরবার থেকে আনয়নের ব্যবস্থা করেছিলেন। (A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 185).

স্থলাভিষিক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আলিবর্দি এঁকে জীবদ্দশাতেই (১৭৫২ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে[৩৩৭]) বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মসনদের উত্তরাধিকারী পরবর্তী নবাব রূপে ঘোষণা করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী তরুণ মিরজা মুহম্মদকে নিজামতের মসনদে বসিয়ে নিজে (আলিবর্দি) এবং দরবারের অন্যান্য আমিরগণের দ্বারা আনুগত্য প্রদর্শন ও উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন।[৩৩৮] যা হোক, ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সিরাজ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ২৩ বছর।[৩৩৯] স্বভাবতই ধরে নেয়া যায় যে এই টগবগে তরুণ যুবা 'lacked both the experience and wisdom of his predecessor (i. e. Alivardi Khan).'[৩৪০]

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগের এই তরুণ নবাবের জন্যে তাঁর প্রাজ্ঞ পূর্বসূরী ঘরে-বাইরে প্রচুর শত্রু ও সমস্যা রেখে গিয়েছিলেন। ড. করিমের ভাষায়, 'আলিবর্দী খান তাঁর প্রিয় সিরাজের জন্য অনেক সমস্যা রেখে যান। তাঁর নিজের পরিবারেই ছিল অনৈক্য এবং তাঁদের মধ্যেও ছিল সিরাজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। সিরাজ মসনদে বসেই এই সমস্যাগুলির সম্মুখীন হন এবং দেখতে পান, চতুর্দিকে ষড়যন্ত্রকারীদের জাল পাতা রয়েছে। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে যেমন তাঁর শত্রু ছিল, সেনাবাহিনী এবং বে-সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যেও তাঁর শত্রুর অভাব ছিল না।'[৩৪১] অন্যদিকে ছিল বৈদেশিক শত্রু তথা বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও অভ্যন্তরীণ রাজনীতির সুবিধাবাদী চরিত্রের কারণে ক্রমশ শক্তিমান হয়ে-ওঠা ইংরেজ বণিক শক্তি, যারা ইতোপূর্বে কখনও কখনও মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে চাইলেও মুর্শিদকুলি থেকে আলিবর্দি খান অবধি সুযোগ্য ও কঠোর শাসকের কারণে বরাবরই পর্যুদস্ত হয়েছিল, তারাও এবার অদম্য সাহস ও নবীন স্পৃহায় মাঠে নেমে পড়ে। বস্তুত ঘরে-বাইরের এই প্রবল প্রতিকূল দ্বৈত শক্তির বিরুদ্ধে প্রায় একক ভাবে লড়তে গিয়ে তরুণ নবাব আত্মীয়স্বজনের বৈরিতা বাহ্যিকভাবে কঠোর হস্তে দমন[৩৪২] করতে

৩৩৭ The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra, pp. 28; British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs.., pp. 44. হেনরি বেভারিজ-এর মতে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে নয়, আলিবর্দি তরুণ সিরাজকে মসনদে বসিয়েছিলেন ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে। দেখুন, 'A Comprehensive History of India, Vol. I., pp. 674'.

৩৩৮ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৮৩।

৩৩৯ The Cambridge History of India, Vol. I., H. H. Dodwell, pp. 141. ড. এম. এ. রহিমের মতে এ সময় সিরাজউদ্দৌলার বয়স ছিল ২২ বছর (বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩২৫; ড. রাম গোপাল সিরাজের জন্ম সন উল্লেখ করেছেন ১৭২৯— সেই হিশেবে সিংহাসনে আরোহণকালে নবাবের বয়স ছিল ২৬/২৭ দেখুন, 'How The British Occupied Bengal : A Corrected Account..., pp. 61. শেষোক্ত বয়স আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়।

৩৪০ The Judical Administration of the East India Company in Bengal, 1765-1782, pp. 6.

৩৪১ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৫।

৩৪২ ঘসেটি বেগমের মোতিঝিলস্থ প্রাসাদ আক্রমণ করে এবং ভূতপূর্ব নবাব আলিবর্দির বিধবা পত্নীর মধ্যস্থতায় তাঁকে (ঘসেটি) সিরাজ বশীভূত করেছিলেন সত্য, যদিও মনে প্রাণে ঘসেটি কখনই সিরাজের নবাবিকে মেনে নেননি। অন্যদিকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার ও তরুণ নবাবের খালাতো ভাই শওকত জঙকে সিরাজ মণিহারী-বীরনগরের যুদ্ধে পরাজিত ও হত (প্রকৃতপক্ষে এই কাজ করেন সিরাজানুগত সেনাপতি মোহন লাল ও অন্যরা) করে তাঁর (শওকত জঙ) প্রায় ৫১টি হাতি, ঘোড়া ও

সক্ষম হলেও শেষপর্যন্ত এদেশীয় সুবিধাবাদী আমলা-মুৎসুদ্দিশ্রেণী ও বিদেশি বেনিয়াগোষ্ঠীর যৌথভাবে পাতা ষড়যন্ত্রের জালে কিভাবে পা দিয়েছিলেন এবং এর করুণ পরিণতি কী হয়েছিল, তা বাংলার ইতিহাসের এই পর্বের পাঠক মাত্রেরই অবগত থাকায় আমরা এখানে এর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। তাছাড়া সে আলোচনার সুযোগও এখানে নেই। তবে এ সংক্রান্ত দু'একটি কথা অবশ্যই বলা দরকার। নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মাত্র ১ বছর ৩ মাসের[৩৪৩] শাসনকালে প্রতিনিয়ত যেভাবে বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর (এখানে ব্রিটিশ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি) মোকাবিলা করে বাংলার স্বাধীনতার সূর্যকে অম্লান রাখতে চেষ্টা করেছিলেন, তাতে করে ইংরেজ ও হিন্দুরা তো বটেই, সমকালীন অনেক মুসলমান পরিবারও ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। যে কারণে ইংরেজ ও হিন্দু লেখক-ঐতিহাসিকশ্রেণীর বাইরেও সমসাময়িক কোনও কোনও মুসলিম ঐতিহাসিকও তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ ও সিরাজ চরিত্রকে কলঙ্কিত ও দুষ্ট প্রতিপন্ন করতে কুণ্ঠিত হননি। এঁদের দ্বারা বিশেষ করে এই সময়কার ইংরেজ লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তীকালের অনেক হিন্দু ও মুসলমান ঐতিহাসিকও যে সিরাজউদ্দৌলার প্রকৃত চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন তা বলাইবাহুল্য। ইংরেজ লেখক-ঐতিহাসিকদের সিরাজ-সম্পর্কিত মত ও মন্তব্য কত একপেশে, অন্ধ ও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল তা নিচের দু'টি উদ্ধৃতি থেকেই সম্যক উপলব্ধি করা যাবে।

বিখ্যাত ইংরেজ লেখক উইলিয়াম হেনরি কেরি বলেন, 'Suraj-o-Dowlah,... was of a crafty, treacherous and cruel disposition, ..'[৩৪৪] ঐতিহাসিক ও লর্ড ক্লাইভ-এর জীবনীকার টমাস ব্যাবিংটন মেক্‌লে'র মন্তব্য তো আরও অপমানজনক ও মারাত্মক। তিনি বলেন, 'Aliverdy Khan, ..died in 1756, and the sovereignty descended to his grandson, a youth under twenty years of age, who bore the name of Surajah Dowlah. Oriental despots are perhaps the worst class of human beings; and this uphappy boy was one of the worst specimens of his class.'[৩৪৫] এই মন্তব্যে একজন 'unhappy' লেখকের সিরাজউদ্দৌলা সম্পর্কিত অসুস্থ ও আপত্তিকর বক্তব্যই প্রকাশিত হয়নি, বরং তা প্রাচ্যদেশীয় সকল নৃপতি (যার মধ্যে মহান অশোক, মহামতি আকবর, জনপ্রিয় আলাউদ্দিন হুসেন শাহ প্রমুখও রয়েছেন)-র সম্বন্ধে এঁর অজ্ঞতা, নীচ ধারণা ও অবজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলাবাহুল্য এই সকল লেখকের হীন রচনার দ্বারা আধুনিক ইতিহাসবেত্তাগণও কমেবিশ প্রভাবান্বিত হয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সম্বন্ধে কিছু কিছু বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে আসছেন যার মধ্যে স্যার

উট এবং অন্যান্য মালমাত্তা সরকার-এ বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর নবাব পূর্ণিয়ার ফৌজদাররূপে মোহনলালের পুত্রকে নিযুক্ত করেন। (রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ২৮৮)।

৩৪৩ 'রিয়াজ-উস-সালাতীন-'এ বলা হয়েছে সিরাজউদ্দৌলার নিজামত ছিল ১ বছর ৪ মাস। (পৃষ্ঠা ২৯২)।

৩৪৪ The Good Old Days of Honourable John Company, Vol. I., Ed. by Prof. Nisith R. Ray, pp. 49.

৩৪৫ Critical and Historical Essays, Vol. I., pp. 503-4.

যদুনাথ[৩৪৬], রমেশচন্দ্র মজুমদার[৩৪৭], অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৪৮], অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৩৪৯] প্রভৃতিও রয়েছেন। তবে সুখের কথা এই যে অধুনা বাংলার এই পর্বের প্রকৃত ইতিহাস ও সিরাজ চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ঐতিহাসিকগণ ব্রতী হয়েছেন যাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান-অখ্যাত দু'ধরনের লেখকই রয়েছেন। প্রসঙ্গত এখানে শুধু ড. সুশীল চৌধুরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হলো। তিনি বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সম্বন্ধে এ যাবৎ উচ্চারিত বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করে একটি বিষয় বেশ জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, 'আসলে সিরাজউদ্দৌলার মতো বেপরোয়া তরুণ নবাব হওয়ায় শাসকশ্রেণীর সংখ্যাগরিষ্ঠ চক্রিদল, যার মধ্যে ব্যবসায়ী, জমিদার, রাজকর্মচারী সব শ্রেণীর লোকই ছিল, তারা সবাই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। আগের নবাবদের আমলে এই বিশেষ শ্রেণীই সম্পদ পুঞ্জীভবনে লিপ্ত ছিল। এখন তাদের উৎকণ্ঠা জাগে যে, সিরাজউদ্দৌলা হয়তো তাদের সম্পদ পুঞ্জীভবনের পথগুলো বন্ধ করে দেবেন।... মীর জাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি অভিজাত অমাত্যবর্গ এই ব্যবসায়ী শ্রেণীর (জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, খোজা ওয়াজেদ প্রমুখ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।... তাদেরও আশঙ্কা ছিল, সিরাজউদ্দৌলার মতো দুঃসাহসী তরুণ এমন কিছু করতে পারেন যাতে তাদের অনুকূল ক্ষমতার যে ভারসাম্য, তা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তাতে তাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।... সুতরাং সিরাজউদ্দৌলাকে হটানো প্রয়োজন যাতে ক্ষমতার যে ভারসাম্য তখন ছিল তা নষ্ট হয়ে না যায়, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সম্পদ পুঞ্জীভবনের সহজ পথ যাতে রুদ্ধ না হয় এবং নতুন কোন গোষ্ঠী এসে যেন শাসকশ্রেণীর চক্রিদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।'[৩৫০] অতএব সরাও সিরাজকে, এবং সে জন্যে তাঁর চরিত্রে যত কালিমা লেপন করা যায় ততই নিজেদের দুরাচারী ও ঘৃণ্য মনোবৃত্তি চাপা দেয়ার জন্য মঙ্গলজনক। বাস্তবে ঘটেও ছিল তাই। তারা শুধু সিরাজকে মারেনি, তাঁকে সামনে রেখে নিজেদের কলঙ্ক ও লজ্জা ঢাকতে বাংলার নবাবি আমলের ইতিহাসের একটা অধ্যায়কেও অন্ধকারাচ্ছন্ন ও কালিমালিপ্ত করে গেছে। 'So, Nawab Siraj-ud-daulah, the only potentate of the sub-continent, who could see

---

৩৪৬ The History of Bengal, Vol. II., pp. 468.

৩৪৭ বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৭।

৩৪৮ মধ্যযুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৫৬।

৩৪৯ ড. বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এটা স্বীকার করেছেন যে, 'সিরাজ চরিত্রে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ স্বাভাবিক কারণেই কালি লেপিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জন নিন্দার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সিরাজ মাত্র বৎসর খানেক মস্নদে বসিয়াছিলেন, তাও আবার অনেকটা সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ প্রাচ্য রাজার ঘৃণ্য চরিত্রের উদাহরণ হিসাবে যে সিরাজের চরিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক।' (বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, পৃষ্ঠা ২৪-২৫)। তারপরও তিনি বলেন যে, সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন 'উদ্ধত, নির্মম, বুদ্ধিহীন ও কামুক প্রকৃতির'। (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫)। এর জবাবে ড. সুশীল চৌধুরীর একটি বক্তব্যই যথেষ্ট যা তিনি সমকালীন বিভিন্ন তথ্যপ্রমাণ ঘেঁটে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর ভাষায়, 'স্ত্রী লুৎফুন্নেসার প্রতি সিরাজের গভীর ভালবাসা ও মদ্যপান না করার প্রতিশ্রুতি (আলিবর্দির মৃত্যুশয্যায় তিনি তাঁকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন) রক্ষার মধ্যে কিন্তু বদচরিত্রের লক্ষণ কিছু পাওয়া যায় না।' বাংলাদেশের ইতিহাস, (১৭০৪-১৯৭১) ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০৮।

৩৫০ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১), ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৫-৩৬।

through the desings of the British traders and who staked his life and dominion, for the expulsion of these mischief-makers out of the sole of Bengal was doubly martyred. Not only his body but also his character was butchered at the hands of his enemies.'[৩৫১]

যা হোক, নবাব সিরাজউদ্দৌলা ঘরে-বাইরের যে প্রবল প্রতিকূলতা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী শাসন ক্ষমতা নির্বাহ করেছিলেন তাতে তাঁর পক্ষে পূর্বসূরীদের ন্যায় প্রশাসনিক ও ভূমিরাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে যে উল্লেখযোগ্য কোন নীতি ও সংস্কার সাধন করা সম্ভব হয়নি তা সহজেই অনুমেয়। তবে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থাকেই অব্যাহত রেখেছিলেন তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ড. এম. এ. রহিম বলেন, 'Sirajuddaulah followed his grandfather's policy.'[৩৫২] আলিবর্দির জ্যেষ্ঠা কন্যা ও অতি স্নেহের পাত্রী হওয়ার সুবাদে তাঁর (আলিবর্দি) মৃত্যুর অব্যবহিত আগে-পরে মেহের-উন-নিসা ওরফে ঘসেটি বেগম (নওয়াজিশ আহম্মদ খানের বিধবা পত্নী) বাংলার রাজকোষের যে বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ ও অর্থ কৌশলে সরিয়ে মোতিঝিল প্রাসাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন, সিংহাসনে আরোহণের অনতিকাল মধ্যে[৩৫৩] সিরাজ পুনরায় তা রাজকোষে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখকের ভাষায়, 'সিরাজ-উদ-দৌলার সৈন্যগণ বেগমের (ঘসেটি) অট্টালিকাসমূহ ও প্রাসাদ ভূমিসাৎ ক'রে দিয়ে প্রোথিত ধনরত্ন উদ্ধার ক'রে মনসুরগঞ্জে নিয়ে যায়।[৩৫৪] স্বর্ণ-রৌপ্য মিলিয়ে এর মধ্যে প্রায় ৬১ লক্ষ টাকার নগদ অর্থ ও তৎসহ অন্যান্য মূল্যবান অলঙ্করাদি, হস্তী প্রভৃতি ছিল।[৩৫৫] তিনি কলকাতার কাশিমবাজার কুঠির অবাধ্য[৩৫৬] ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকেও প্রায় ৫০,০০০ টাকা আদায় করেন।[৩৫৭] এছাড়া ওলন্দাজ ও ফরাসি বণিকদের কাছ থেকেও যথাক্রমে ৪,৫০,০০০ ও ৩,৫০,০০০ টাকা আদায় করে রাজকোষ সমৃদ্ধ করেন।[৩৫৮] তবে জমিদার-তালুকদার প্রভৃতির কাছ থেকে নিয়মিত ভূমিরাজস্ব আদায়ের বাইরে এই

৩৫১ Siraj-ud-Daulah : The Undying Hero of Our Nationalism, Syed Amjad Hossain, pp. 16.

৩৫২ Muslim Society and Politics in Bengal, pp. 5.

৩৫৩ সিংহাসনে আরোহণের ১০ দিনের মধ্যে (British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, pp. 49.) এটি তিনি করেন।

৩৫৪ পৃষ্ঠা ২৮৪।

৩৫৫ A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 186.

৩৫৬ এই সময় কলকাতার কাশিমবাজার কুঠির ইংরেজ বণিকরা বাদশাহ-প্রদত্ত তাদের বাণিজ্য সুবিধার যে ব্যাপক অপব্যবহার শুরু করেছিল এবং তারা নবাবকেও অবজ্ঞা করতে পিছপা হয়নি, তার কিছু স্বীকারোক্তি ইংরেজ লেখক পি. ই. রবার্টস-এর রচনাতেও পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'They (The English) had also undoubtedly given Siraj-ud-daula some ground for complaint by abusing the trade privileges granted them by the farman of 1717.' (History of British India under the Company and the Crown, pp. 130).

৩৫৭ A Comprehensive History of India, Vol.I., Henry Beveridge, pp. 689; British Residents at the Darbar of Bengal Nawabs at Murshidabad, pp.62.

৩৫৮ A Comprehensive History of India, Vol. I., pp. 692-93.

বিপুল অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তি সত্ত্বেও মূলত নবাবের প্রায় সার্বক্ষণিক যুদ্ধ ব্যস্ততা ও সমরায়োজন এবং ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনে বেশুমার অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় তা একদিকে যেমন রাজকোষের সঞ্চয় বৃদ্ধি করেনি, তেমনি অন্যদিকে তা আপামর প্রজাসাধারণের কাজেও আসেনি। তবে এই আমলে নতুন কোন আবওয়াব ধার্যের কথা জানা যায় না। নিঃসন্দেহে তরুণ নবাব এ জন্যে কৃতিত্বের দাবিদার, কারণ পূর্বের এবং তাঁর পরের প্রত্যেক নবাবই তাঁদের রাজত্বকালে নতুন নতুন আবওয়াব ধার্য করেছেন। অবশ্য প্রচলিত কোনও কোনও আবওয়াব যে একেবারেই আদায় করা হতো না তা মনে হয় না।

সিরাজউদৌলা ভূমিরাজস্ব প্রশাসনসহ সামগ্রিক প্রশাসনিক যন্ত্রের বিভিন্ন পদে ও স্থাপনায় হিন্দু রাজকর্মচারী নিয়োগের পূর্বতন ধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রদ-বদল তিনি করেছিলেন যার মধ্যে অন্যতম রাজা দুর্লভরামের স্থলে মোহনলালকে বাংলার দিওয়ানরূপে নিযুক্তি[৩৫৯] ও মির জাফর আলি খানের স্থলে নবাবি সৈন্যের বখশি পদে মির মদনকে অধিষ্ঠিত করা।[৩৬০] সত্যি বলতে এঁরা দু'জন নবাবের ঘোর দুঃসময়ে ঘনিষ্ঠবন্ধু ও পরম আপনজনের ন্যায় তাঁকে সংঘ ও ভরসা দিয়েছিল।

তবে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, তরুণ নবাবের অনভিজ্ঞতা, চঞ্চলমতি মানসিকতা, প্রশাসনিক বিচক্ষণতার অভাব এবং সর্বোপরি প্রতিনিয়ত যুদ্ধ ব্যস্ততা তাঁকে দৈনন্দিন প্রশাসনের মতো ভূমিরাজস্ব বিভাগের কাজেকর্মে মনোযোগের প্রয়োজনীয় সময় ও সুযোগ দেয়নি। যে কারণে স্বভাবতই এই সময়ে কৃষক-প্রজার অবস্থা পূর্বের তুলনায় ক্রমাবনতির দিকে যাচ্ছিল।

নবাব মিরকাশিম আলি খান (১৭৬০-১৭৬৩ খ্রিঃ)

পলাশির তথাকথিত যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও শোচনীয় মৃত্যুর পর সেনাপতি মিরজাফর আলি খান 'বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিজামতের মসনদে আরোহণ' করেন

৩৫৯ এই নিযুক্তির ফলে তরুণ নবাবের বদান্যতা ও প্রচ্ছন্ন আস্কারায় কেন্দ্রীয় দিওয়ান হিশেবে কায়স্থ কুলোদ্ভব মোহনলালের ক্ষমতার প্রতিপত্তি এতোদূর প্রসারিত হয়েছিল যে, একজন আধুনিক ঐতিহাসিক জানাচ্ছেন, 'The Nawab entrusted the affairs of the state, even the power of appointment and dismissal of all ministers to Mohanlal and conferred many favours on him. When the latter got full control of all affairs, he did not behave properly with leading courtiers of Alivardi's time.' (The Career of Rajah DurlabhRam Mahindra.., pp. 53).

৩৬০ আলিবর্দি খানের জীবদ্দশায়ও একাধিকবার গোপন ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে মির জাফর একবার সেনাপত্য থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন, যদিও পরবর্তীকালে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের অনুরোধে আলিবর্দি তাকে পুনরায় চাকুরিতে বহাল করেন। সিরাজউদ্দৌলাও ক্ষমতারোহণের পর ঘসেটি বেগমের প্রতি মির জাফরের অধিক আনুগত্য ও তাঁর (সিরাজ) আদেশ পালনে মির জাফরের উদাসীনতা ও অনেক বিষয়ে ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাব লক্ষ্য করে তিনি তাকে নবাবি সৈন্যবাহিনীর বখশি পদ থেকে সরিয়ে দেন। তবে তাঁর পক্ষেও তাকে একেবারে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব হয়নি। পরে সিরাজ আবার তাকে পূর্ব পদে বহাল করেন। বলাবাহুল্য পদচ্যুতির এই অপমান মির জাফর কখনই ভুলতে পারেননি— 'Mir Md. Ja'far Khan, whose seed planted so many years ago was not sprouting up in the soil of revenge, was always planning with a party whom he thought to be his friends, how to put down Siraj-ud-daula.' (Muzaffar-Namah, Karam Ali, See 'Bengal Nawabs', pp. 75).

(২৯শে জুন, ১৭৫৭)। কিন্তু ইংরেজ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের বিশেষ করে লর্ড ক্লাইভের হাতের ক্রীড়ানক অযোগ্য মিরজাফর যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র, অশ্রুতপূর্ব বিশ্বাসঘাতকতা ও শঠতার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার রাজনীতির শীর্ষাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন; তাঁর অপরিসীম ভোগ-বিলাসিতা ও পরনির্ভরশীলতা (অবশ্য এ ছাড়া তাঁর আর কোনও উপায়ও ছিল না), এবং সর্বোপরি নবাবের চতুর্দিকে ঘিরে থাকা সুযোগসন্ধানী স্বার্থান্বেষী মহলের বিশেষত তাঁরই জামাতা ও পরবর্তী নবাব মিরকাশিমের ইংরেজদের সঙ্গে কৃত গোপন সন্ধি, এককথায় আর এক ষড়যন্ত্র মির জাফর আলি খানকে নিতান্ত অবমাননা ও মানসিক গঞ্জনা নিয়ে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে (২০শে অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিঃ)।[৩৬১] কিন্তু ইত্যবসরে বাংলার রাজকোষের তথা অর্থনীতির ক্ষতি তিনি প্রায় চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। এক বর্ণনায় দেখা যায়, মিরজাফর স্বীয় অল্পাধিক ৩ বছরের রাজত্বকালে[৩৬২] অর্থাৎ ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০— এই সময়পর্বে বাংলার রাজকোষ থেকে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পলাশির যুদ্ধজনিত জনবল, অস্ত্রশস্ত্র ও অবকাঠামোগত ক্ষতি পূরণার্থ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১ লা মে-র চুক্তির[৩৬৩] শর্তানুযায়ী অন্যূন ২,২৫,০০,০০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩৬৪] তন্মধ্যে কোম্পানির নিজস্ব ক্ষতিপূরণ বাবদ ১,০০,০০,০০০ টাকা (কোম্পানির প্রকৃত ক্ষতি হয়েছিল ১৯,৪৯,৪৮৯ টাকার), ইউরোপীয়দের জানমালের ক্ষতি বাবদ ৫০,০০,০০০ টাকা (এদের প্রকৃত ক্ষতি ছিল ৩৯,৪৬,১৩৮ টাকার), হিন্দু ও আরমেনীয় বাশিন্দাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৭,০০,০০০ টাকা এবং সেনা, নৌবাহিনী ও সিলেক্ট কমিটির সদস্যদেরকে প্রদত্ত ৫২,০০,০০০ টাকা।[৩৬৫] এ ছাড়াও কোম্পানির প্রধান প্রধান

৩৬১ রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক ব্যয় বিশেষ করে সৈন্যদের বেতন-ভাতা প্রদানে অক্ষমতার অভিযোগে ইংরেজ ও সভাসদদের সঙ্গে জামাতা মিরকাশিমের অনুকূলে মসনদ ত্যাগ সংক্রান্ত দিনভর আলোচনা ও শেষ পর্যন্ত জোর করে সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়ার ভীতির মুখে বৃদ্ধ নবাব মিরজাফর আলি খান ২০শে অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের দিনগত গভীর রাতে ক্ষমতাচ্যুত হন এবং ২২শে অক্টোবর রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

৩৬২ মিরকাশিমের পরে পুনরায় ১৭৬৩ থেকে ১৭৬৫—তাঁর রাজত্বকাল এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩৬৩ মিরজাফর ও অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে গোপন চুক্তির শর্তাবলী নিয়ে ইংরেজদের আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু হয় ১লা মে, কিন্তু দু'পক্ষে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৪ঠা জুন, ১৭৫৭ খ্রিঃ।

৩৬৪ Sirajuddaullah and the East India Company (1756-57) : Background to the Foundation of British Power in India, Brijen K. Gupta, pp. 126.

৩৬৫ অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার যে, সিলেক্ট কমিটি তথা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধিকাংশ সদস্যই যারা তথাকথিত 'জুন বিপ্লব'-এর সাথে নেতৃত্ব পর্যায়ে ভূমিকা রেখেছিল তাদের প্রায় প্রত্যেকেই ছিল বয়সে তরুণ, যেমন সর্বোচ্চ বয়সাধিকারী ওয়াটসন-এর বয়স ছিল ৪৩ বছর, ক্লাইভের ৩২, ওয়াটস-এর ৩৮ প্রভৃতি (ক্লাইব চরিত, সত্যচরণ শাস্ত্রী, দেখুন, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫২)। এই অতি অল্প বয়সেই এরা যে কে, কতো বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ (স্রেফ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সরিয়ে মিরজাফর আলি খানকে মসনদে বসানোর ঘুষ বাবদ) হাসিল করেছিল, সে সম্বন্ধে বিস্তারিত পরিসংখ্যান জানার জন্য দেখুন, 'আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী', ড. অতুল সুর, পৃষ্ঠা ৬১।

কর্মচারীদেরকে[৩৬৬] ঘুষ ও উপঢৌকন হিশেবে প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৫৮,৭০,০০০ টাকা। ক্লাইভ একাই হস্তগত করেছিলেন ২০,৮০,০০০ টাকা (কমিটির সদস্য হিশেবে ২,৮০,০০০ টাকা, ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ হিশেবে ২,০০,০০০ টাকা এবং ব্যক্তিগত নজরানা বা স্রেফ ঘুষ বাবদ ১৬,০০,০০০ টাকা[৩৬৭])। এতদসত্ত্বেও উল্লেখ করার বিষয় এই যে, মসনদে আরোহণের বিনিময়ে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য ইংরেজদের কাছে তিনি প্রতিশ্রুত্যাবদ্ধ ছিলেন তার সবটা কড়ায়-গণ্ডায় নবাব পরিশোধ করতে পারেননি। বস্তুত ইংরেজ সৈন্যদের চাহিদা তিনি যথানিয়মে পরিশোধ করতে সক্ষম হলেও তাঁর নিজের সৈন্যদের বেতন-ভাতাই পড়েছিল উপর্যুপরি বকেয়ার কবলে—'During the first period of his rule, he managed to pay a large portion of the restitution money and also of the donation to the army, but his own financial position became troubled, and the pay of his own army fell into arrear.'[৩৬৮] প্রাথমিকভাবে এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণের জন্য অচিরেই তাঁকে স্বীয় ব্যক্তিগত ধনাগারের প্রায় সমুদয় সম্পদ— স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মাণিক্য প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বিক্রি করে দিতে হয় এবং সেই সঙ্গে ১৭৫৮ সালে বর্ধমান ও নদীয়ার কিয়দংশের ভূমিরাজস্ব কোম্পানির বরাবরে প্রত্যর্পণ করতে হয়।[৩৬৯] কিন্তু এরপরও শেষ রক্ষা হল না। কোম্পানির লোকদের বিশেষ করে সৈন্যদের ছত্রচ্ছায়ায় নেতৃস্থানীয়দের নিত্য নতুন চাহিদা পেশ ও নবাবি সৈন্যবাহিনীর বেতন-ভাতার দাবিতে পূর্ণিয়া, মেদিনীপুর, পাটনা ইত্যাদি স্থানে বিদ্রোহ এবং শেষ পর্যন্ত সৈন্যদের নবাবের প্রাসাদ ঘেরাও-এর অনিবার্য পরিণতিতে মিরজাফর আলি খানকে অত্যন্ত অপমানিত, পর্যুদস্ত ও বিপন্ন অবস্থায় মুর্শিদাবাদের মসনদ ত্যাগ করে (২০শে অক্টোবর) কলকাতায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় (২২শে অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রিঃ)।[৩৭০]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলার তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের এই বিশেষ গোলযোগপূর্ণ ও টালমাটালময় পর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলা[৩৭১] থেকে শুরু করে পরবর্তী

৩৬৬ এদের মধ্যে পালের গোদা ক্লাইভ-এর বেতন ছিল ৪০ টাকা, লিউক স্ক্রাফটন ৫ টাকা, ওয়াটস ১৫ টাকা প্রভৃতি। সুতরাং পলাশির বিপর্যয়ে কাদের হাতে কী পড়েছিল, তা সহজেই অনুমেয়।

৩৬৭ British India, R. W. Frazer, LL. B., I.C.S., pp. 102.

৩৬৮ The Fifth Report, W.K. Firminger, pp. 420.

৩৬৯ Ibid., 420.

৩৭০ একদল ইউরোপীয় সৈন্যের কঠোর ও নিশ্ছিদ্র প্রহরায় নবাব মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেন এবং নৌকা যোগে ('রিয়াজ', পৃষ্ঠা ২৯৭) কলকাতার পথে রওনা হন। অতঃপর মিরকাশিম প্রদত্ত মাসিক ১৫,০০০ টাকায় পেনশনে তাঁর অবহেলিত নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। (The Cambridge History of India, Vol. V., H.H. Dodwell, pp. 168).

৩৭১ ইংরেজদের ইতোপূর্বেকার যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিয়েও পলাশির যুদ্ধের বিয়োগান্ত পরিণতির পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন বাংলার ভাগ্যাকাশ থেকে অন্তর্হিত হন, তখন, তাঁর প্রকাশ্য ধনাগারে এককোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্য-মুদ্রা, বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমোহর, দুই সিন্দুক সোনা, চারি সিন্দুক খচিত জহরত ও দুই সিন্দুক খুচরা হিরা-জহরত ছিল। 'তাঁহার গুপ্ত ধনাগারে অষ্টকোটি টাকা সঞ্চিত ছিল'...। (জগৎশেঠ, শ্রী নিখিলনাথ রায়, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৭)। পরবর্তীকালে ক্লাইভ যখন তার এতদ্দেশীয় অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত হয়ে ইংলন্ডের কমন্স সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য ভাষণ দিয়েছিলেন, সেখানে তার এতদসংক্রান্ত বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

নবাবদের বিশেষত মিরকাশিম পর্যন্ত সময়ে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ অনর্গল পানির স্রোতের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিলো, তাও জনকল্যাণে না হয়ে বরঞ্চ বিদেশি বেনিয়াদের মনোতুষ্টি ও চাহিদা পূরণে অপচয়িত হয়েছিল, একদিকে তা বাংলার অর্থনীতি-ভূমিরাজস্বের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচিত হলেও অন্যদিকে সত্য ছিল এটাই, নবাব আলিবর্দির আমল থেকেই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ও প্রশাসনের উন্নতি ও প্রসারণের জন্য এঁরা তেমন কোন কার্যকর বা যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ড. কালীকিঙ্কর দত্ত যথার্থই বলেছেন, 'No important change in the system of land-tenure, or in the mode of revenue-collection was effected during this period.'[৩৭২] সঙ্গত কারণেই অপাত্রে মিরজাফরের এই বিপুল ব্যয় ভূমিরাজস্ব প্রদেতা-শ্রেণী—বাংলার আপামর কৃষক জনগোষ্ঠীর জন্যে মাত্র দশকের মধ্যে (১৭৬৯-৭০) মন্বন্তরের মতো বিষময় ফল বয়ে এনেছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতিতে তৎকালীন বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল এবং উল্লেখ্য যে, এর মধ্যে কৃষকের মৃত্যুর হারই ছিল শতকরা ৫০ জন।[৩৭৩] ড. দত্তও এ কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'The growing political disorders in the province after 1757, and the oppressions of the aumils (government contractors for revenue) after 1765, added to the miseries of the Bengal agriculturists, who had their cup of distress filled to the brim by the great famine of 1770.'[৩৭৪] মিরজাফরের বিদায়ের ফলে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার মসনদের লোভনীয় পদ মিরকাশিম যে একেবারে আচানক পেয়েছিলেন, তা নয়। বরং তাঁকেও পূর্বসূরীর মতো ইংরেজদের সঙ্গে গোপন আঁতাত ও গ্লানিকর শর্ত সম্পাদন করে নবাবি সিংহাসনে আরোহণ করতে হয়েছিল। ২৭শে সেপটেমবর, ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে সম্পাদিত এই গোপন সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল— 'The negotiations with him were confided to Holwell in person; and on 27 September an agreement was reached by which Mir Kasim was to receive the office of deputy subahdar, with a guarantee of succession to the subahdari, while the English were to receive the three districts of Burdwan, Midnapur, and Chittagong for the maintenance of their troops. Mir Kasim also agreed to pay off the outstanding debts of Mir Ja'far to the Company.'[৩৭৫]

আলিবর্দি খান উত্তর বাংলার নবাবদের মধ্যে মিরকাশিমই ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ধীশক্তির অধিকারী, বিচক্ষণ রাজনীতিক ও দূরদর্শী সমরনায়ক। সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আজ হোক, কাল হোক, ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষ তাঁর অনিবার্য। তবে প্রথম আঘাত বা প্রতিরোধের সেই প্রয়োজনীয় শক্তি অর্জনের

যা হোক, এই সমুদয় অর্থই মিরজাফর ও তাঁর সহযোগী ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজরা লুটেপুটে খেয়েছিল। বাংলার আপামর জনসাধারণের তা কোন উপকারেই আসেনি।

৩৭২ Alivardi and His Times, pp. 173.

৩৭৩ Annals of Raral Bengal, W. W. Hunter, pp. 32.

৩৭৪ Alivardi and His Times., pp. 174.

৩৭৫ The Cambridge History of India, Vol. V., pp.168.

জন্য তাঁর সময়ের দরকার। বস্তুত সে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলে এবং কোম্পানির অদৃশ্য নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে তাঁকে সর্বাগ্রে সন্ধি অনুযায়ী বেনিয়াদের প্রতিশ্রুত পাওনা ও ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তাই ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ভাষায় বলা যায়, 'মিরজাফরের পরিত্যক্ত সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া মিরকাসিম ইংরেজ কোম্পানির মনসন্তুষ্টির জন্য নানা প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।'[৩৭৬]

মিরকাশিমকে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত চুক্তির শর্তানুযায়ী সিংহাসনে আরোহণের পরে পরেই চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের ভূমিরাজস্বের দাবি (খালসা ভূমি ব্যতীত) কোম্পানির সৈন্যদের ব্যয় বহনের জন্য ছেড়ে দিতে হয়েছিল। স্বভাবতই ভবিষ্যতে বাংলার ভূমিরাজস্বের আয় কমে গেল। অন্যদিকে আলিবর্দি—পরবর্তী পর পর দু'জন নবাবের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার অনেক বড় বড় জমিদারও নিয়মিত ভূমিরাজস্ব প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। অথচ এই সময়ে মির জাফরের রেখে যাওয়া রাজকোষও প্রায় শূন্য ছিল বলা যায়। তাতে সামান্য যে নগদ অর্থ ছিল (৪০/৫০ হাজার[৩৭৭], কি বড় জোর এক লক্ষ টাকা[৩৭৮]) এবং সোনা-রূপা মিলিয়ে যে কিছু পরিমাণ অলঙ্কার তাঁর হস্তগত হয়েছিল, সেগুলি নবাব নগদ মুদ্রায় পরিণত করেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদের পরিমাণও কম ছিল না।[৩৭৯] যা হোক, এই সকল অর্থ একত্রিত করে এবং জগৎশেঠ পরিবার থেকে ২ টাকা সুদে অর্থ ধার করে নবাবি পাওয়ার মাত্র সপ্তাহ দু'য়েকের মধ্যে মির কাশিম কোম্পানির সৈন্যদের ইতোপূর্বেকার যুদ্ধ ব্যয় বাবদ পাওনা নগদ ১০ লক্ষ টাকা[৩৮০], পাটনাস্থ ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় বাবদ ৫ লক্ষ এবং কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মচারী গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট (৫ লক্ষ), ক্যাইলয়েড (২ লক্ষ), হলওয়েল প্রমুখ ৭ জনকে প্রায় ১৭,৪৮,০০০ টাকা প্রদান করেন।[৩৮১] অর্থাৎ সিংহাসনে আরোহণের অত্যল্পকালের মধ্যে মির কাশিমকে যেনতেন প্রকারে ইংরেজদের প্রায় ৩২,৪৮,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হয়েছিল।[৩৮২] মিরজাফর পরিত্যক্ত রাজকোষের পূর্বোদ্ধৃত স্থিতি বিবেচনায় এই অর্থের পরিমাণ ও পরিণাম নিতান্ত

৩৭৬ জগৎশেঠ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫৯।
৩৭৭ বাংলা দেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৮৫।
৩৭৮ Mir Qasim : Nawab of Bengal (1760-1763), Dr NandaLal Chatterji, pp. 42; বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, ড. সিরাজুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪৫
৩৭৯ কারও কারও মতে মিরকাশিমের ব্যক্তিগত অর্থ-সম্পদের বিশেষত তাঁর সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরা-জহরত প্রভৃতির তৎকালীন বাজার মূল্য ছিল প্রায় ২০,০০,০০০ থেকে ৩০,০০,০০০ পাউন্ড, দেখুন, 'A Comprehensive History of India, Civil, Military and Social, Vol. I., Henry Beveridge, pp.866.
৩৮০ মাসিক ১ লক্ষ টাকার কিস্তিতে আরও ১০ লক্ষ টাকা পরিশোধের জন্য তিনি অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃষ্ঠা ১৮৫)।
৩৮১ অর্থ ভাগাভাগির এই পর্বে পলাশির নায়কেরা তথা ক্লাইভ প্রমুখ তখন এদেশে ছিল না। এবার যে সাত জন বখরা পেয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ৫৮,৩৩৩ পাউন্ড, হলওয়েল ৩০,৯৩৭ পাউন্ড, ম্যাকগুইয়ার ২৯,৩৭৫ পাউন্ড, সামনার ২৮,০০০ পাউন্ড, ক্যাইলয়েড ২২,৯১৬ পাউন্ড, স্মিথ ও ইয়র্ক প্রত্যেকে ১৫,৩৫৪ পাউন্ড। (আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৬১)।
৩৮২ বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৫।
৩৮৩ Op. Cit. pp. 108

কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ এর ফলে বাস্তব অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল, শাসনদণ্ড ছিল যার হাতে তিনি ছিলেন রিক্তহস্ত, অথচ শাসকের চারপাশে ঘিরে থাকা অদৃশ্য প্রভুদের ভাণ্ডার ছিল শাসকেরই প্রদত্ত অর্থে, সম্পদে বিপুল ঐশ্বর্যপূর্ণ। ইংরেজ ঐতিহাসিক আর. ডব্লিউ.ফ্রেজারও এ কথা স্বীকার করেছেন, 'The revenues of the whole of Bengal were now (then) in the hands of the servants of the Company.'[৩৮৩] এখন প্রশ্ন হলো, উপরোল্লিখিত এই বিপুল পরিমাণ অর্থ, এবং এর বাইরেও আরও যে প্রায় অর্ধ কোটি টাকা মিরকাশিম ইংরেজ কোম্পানি ও এর কর্মচারীদেরকে (ভাগ্যিস, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে নবাবের এই ভাগ-বাঁটোয়ারার সময়ে নিম্নস্তরের কর্মচারীরা সুযোগ পায়নি, না হলে অবস্থা কী দাঁড়াতো তা সহজে অনুমেয়) দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তা কিভাবে নবাব হাসিল করেছিলেন সেটাই এ পর্যায়ে আমাদের মুখ্য আলোচ্য।

মিরজাফরের পরিত্যক্ত রাজকোষের অর্থ, নবাবের ব্যক্তিগত সঞ্চিত অর্থসম্পদ ও শেঠ পরিবার থেকে ঋণ গ্রহণ—এ জাতীয় দু'একটি উৎসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে স্বীকার্য যে, প্রচলিত ভূমিরাজস্বের হার সংরক্ষণ, কয়েকটি নতুন কর-খাতের প্রচলন এবং কঠোর ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাপনা—এই ত্রিবিধ পন্থা অবলম্বন করেই বাংলা, বিহার ও ওড়িশার শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিম উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যদিও তার শেষ রক্ষা হয়নি। মিরকাশিমের এই অনুসৃত ব্যবস্থা নিচে আলোচনা করা হলো।

সমসাময়িক প্রায় সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে, 'At its start the Government of Mir Kasim Khan was full of bright promise.'[৩৮৪] সূচনা লগ্নেই যে কঠিন বাস্তবতার সম্মুখীন মিরকাশিম হয়েছিলেন, এবং পূর্ববর্তী নবাবদের সঙ্গে কোম্পানির নেতৃস্থানীয়দের আচরণের যে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অনৈতিকতা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে এটা বেশ ভালোভাবেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বেনিয়া ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ তিনি কোন ভাবেই এড়াতে পারবেন না। ফলে সেই অনাগত যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য, বিশেষ করে গতানুগতিক সমর শক্তিকে ইউরোপীয় ধাঁচে সংগঠিত ও সুসজ্জিত করার জন্য নবাবের প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। তাই সর্বাগ্রে 'The Nawab's chief care after his accession was to regulate the finances.'[৩৮৫] এ লক্ষ্যে তিনি রাজকীয় প্রতিটা বিভাগের ব্যয়ই শুধু সংকোচন করেননি, পরন্তু 'জায়গির ও অন্যান্য বিভাগের কর্মচারীবর্গের, নাগরিকগণের, এমন কি দাসদাসীগণেরও নিকট হইতে অর্থ দোহনের ব্যবস্থা' করেন। মোটকথা, রাজকোষের আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের জন্য যা কিছু করণীয়, তার সবই নবাব করার চেষ্টা করেন। বস্তুত এ জন্যে ব্যাপকার্থে তিনি যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তাকে মোটামুটি ৫টি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) পূর্ববর্তী নবাবদের আমল থেকে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনে জেঁকে বসা দুর্নীতিবাজ আমিল, জায়গিরদার প্রভৃতিকে বরখাস্ত বা পদাবনত করে তাদের বেআইনিভাবে অর্জিত

৩৮৪ The Fifth Report, pp. 421.
৩৮৫ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 42.

অর্থ-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা; (২) দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণ; (৩) সর্বস্তরে সরকারের প্রশাসনিক ব্যয় ভার হ্রাস; (৪) স্থিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার, বিশেষত নতুন কয়েকটি কর-খাতের প্রচলন, ও (৫) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার।[৩৮৬]

হতভাগ্য তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার অনভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক তদারকির অভাব, বৃদ্ধ, অযোগ্য ও ইংরেজদের হাতের পুতুল নবাব মিরজাফরের দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, বিশেষ করে ভূমিরাজস্ব প্রশাসনের অনেক সরকারি আমলা, মুৎসুদ্দি ও জায়গিরদারগণ এই সময়ে প্রবল দুর্নীতি ও কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। প্রচলিত রীতিনীতির বরখেলাপ করে যেনতেন প্রকারে সরকারি অর্থের অপচয় ও আত্মসাৎ করা ছিল তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। মিরকাশিম এই সমস্ত দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ উদ্ধারের জন্য একটি শক্তিশালী তদন্ত দল গঠন করেন।[৩৮৭] যারা আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব দিতে ব্যর্থ হয় তাদের সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। বলাবাহুল্য তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় অবৈধ ভাবে অর্জিত অর্থের হিসাব দিতে সক্ষম হবে না এবং এ জন্যে কারারুদ্ধও হতে পারে শঙ্কায় অনেক আমলা, মুৎসুদ্দি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে এভাবেও অনেক গুপ্ত ও সঞ্চিত অর্থ নবাবের হস্তগত হয়। দোষী সাব্যস্ত অনেক জায়গিরদারের লাখেরাজ সম্পত্তি তিনি বাজেয়াপ্ত করে সরাসরি খালসা ভুক্ত করেন। বস্তুত মিরকাশিমের এই কঠোর নীতির কারণে প্রশাসনে ও সমাজের উচ্চ স্তরে কিছুটা হলেও সাময়িক ভীতি ও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে আপামর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে সরকারের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস ফিরে এসেছিল, এবং ইংরেজদের পাওনা পরিশোধের পথ সুগম হওয়ায় ও আমিল প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচার হ্রাস পাওয়ায় নবাবের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টও স্বীকার করেছেন। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়মে লিখিত তাঁর এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'the Nawab applies with great diligence to the regulation of his affairs, and behaves so as to gain the affection of the people.'[৩৮৮]

দুর্নীতিবাজ আমিল-মুৎসুদ্দিদের থেকে উদ্ধারকৃত ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি থেকে যে অর্থ পাওয়া গিয়েছিল তা স্থিতিশীল প্রশাসন চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। স্বভাবতই নবাব আরও অর্থের জন্য লালায়িত ছিলেন। ভ্যান্সিটার্টের মধ্যস্থতায় সেটাও সম্ভব হয় শেঠ পরিবার থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যেনতেন প্রকারে অর্থকড়ি হাসিলের জন্যে মিরকাশিম যে কঠোর নীতি অনুসরণ করছিলেন, যার ফলে নবাবের বশংবদ কর্মচারীদের বাড়াবাড়ির কারণে কিছু পরিমাণে হলেও নিরীহ অনেকে হয়রানির শিকার হচ্ছিলো। ফলে শেঠ পরিবার ভ্যান্সিটার্টের মধ্যস্থতা সত্ত্বেও নবাবকে টাকা দিতে গড়িমসি করছিলো। পরে ভ্যান্সিটার্টের উপর্যুপরি আশ্বাস ও নবাবের কোপানলে পড়ার ভয়ে[৩৮৯] শতকরা ২ টাকা সুদে

৩৮৬ বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৪৫।
৩৮৭ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 42.
৩৮৮ Ibid., pp. 44.
৩৮৯ মিরজাফরকে মসনদ থেকে সরানোর ব্যাপারে ইংরেজদের পাশাপাশি জগৎশেঠ মহাতপ চাঁদও মিরকাশিমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল বন্ধুত্ব। কিন্তু যেই মাত্র মিরকাশিম নবাব হন, তখন নানা কারণে এই সম্পর্কে চিড় ধরে। মিরকাশিম রাতারাতি সকলের সঙ্গে রাজকীয়

তারা তা মঞ্জুর করতে বাধ্য হয়েছিলেন।[৩৯০] উল্লেখ্য শেষোক্ত পথে প্রাপ্ত এই অর্থ নবাব মূলত পাটনাস্থ ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় ভার নির্বাহার্থ গ্রহণ করেছিলেন।[৩৯১]

আগেই বলেছি যে নবাব মিরকাশিম সর্বস্তরে প্রশাসনিক ব্যয় কমানোর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিলেন। ভূতপূর্ব নবাবের আমলে তাঁর (মিরজাফর) আত্মীয়স্বজনের মধ্য থেকে অনেক কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল যাদের অনেকেই ছিল রাজদরবারে ও প্রাসাদে নিযুক্ত। কালে কালে এরা শুধু দুর্নীতিগ্রস্তই হয়ে পড়েনি, উপরন্তু নবাবের নিরাপত্তার জন্যেও হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এছাড়াও ছিল প্রচুর অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী। মূলত এদের এবং সকল স্তরের অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত গণ-কর্মচারীদের তিনি নির্মমভাবে ছাঁটাই করেন। ছাঁটাইকৃত কর্মচারীদের তালিকায় প্রাসাদস্থদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।[৩৯২] তিনি নিজস্ব খরচ কমান, ব্যয়বহুল ও জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি বন্ধ করেন এবং নবাবি হেরেমের চিরাচরিত বিলাস-ব্যসনও কমিয়ে দেন। এমন কি নবাবের গো-শালার গবাদি পশু পর্যন্ত তিনি বিক্রি করে দেন এবং গো-শালার কর্মচারীদের ছাঁটাই করতে কসুর করেননি।[৩৯৩]

উপরোল্লিখিত আশু ব্যবস্থাদি গ্রহণের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে হলেও নবাবের অর্থনৈতিক সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়। কিন্তু এটা ছিল একটা অস্থায়ী ও অন্তরবর্তীকালীন ব্যবস্থা। মিরকাশিম ভালো করেই জানতেন যে, অর্থনৈতিক সমস্যার স্থায়ী ও মজবুত সমাধান পেতে হলে তাঁকে অবশ্যই বিকল্প পন্থা তথা যুগোপযোগী ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সংস্কারের দিকে যেতে হবে। বলাবাহুল্য তখন পর্যন্ত এবং পরেও, ভূমিরাজস্বই ছিল সরকারি আয়ের প্রথম ও প্রধান খাত বা উৎস। গত্যন্তরবিহীন নবাব সেদিকেই ঝুঁকলেন। ড. সিরাজুল ইসলামের ভাষায় বলা যায়, 'মীরকাশিম জানতেন সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিহিত ভূমি-রাজস্ব সংস্কারের মধ্যে। সরকার প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ভূমিরাজস্বের উপর। অতএব ভূমিরাজস্ব শাসনে সংস্কার সাধন না করলে আর্থিক অনটন আবার ফিরে এসে মীরজাফরের ভাগ্যের পুনারাবৃত্তি ঘটাবে এ সম্পর্কে নবাব মীরকাশিম ছিলেন নিশ্চিত। তাই ভূমিরাজস্ব সংস্কারকে অগ্রাধিকার দিয়ে নীতি নির্ধারণ করেন নবাব।'[৩৯৪]

সুলভ আচরণ শুরু করেন। 'From the first, however, he (Mir Kasim) seems to have resolved to attempt to recover his independence, and to reduce the English to the position which they occupied in the good old days of Ali Vardi Khan.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 188-89). অনেক ক্ষেত্রে স্বয়ং ইংরেজদের সঙ্গেই যেহেতু নবাবের আচরণ বদলে গিয়েছিল, সুতরাং জগৎশেঠ নবাবকে ক্ষেপানো সুবিধার মনে করেননি। অথচ ভূতপূর্ব দুর্বল নবাব মিরজাফরকে অনেক সময় তিনি অবজ্ঞাও করতেন।

৩৯০ জগৎশেঠ, পৃষ্ঠা ২৬০।
৩৯১ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৬০।
৩৯২ বাংলার ইতিহাস : ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো, পৃষ্ঠা ৪৬।
৩৯৩ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।
৩৯৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬।

ভূমিরাজস্ব সংস্কারের উদ্দেশ্যে মিরকাশিম প্রধানত দু'টি বিষয়ের ওপর নজর দেন। এক. রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের সঙ্গে জড়িত কর্মচারী বিশেষ করে আমিল ও জমিদারদের ওপর কঠোর খবরদারি ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ, এবং দুই মূল ভূমিরাজস্বের হার না বাড়িয়ে বরং নতুন কিছু খাত সৃষ্টি করে প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি।

জমিদারদের সম্বন্ধে নবাবের একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল এই, অবস্থানগতভাবে তারা রাষ্ট্র ও রায়তের অন্তঃপাতী একটি মধ্যস্বত্বভোগী তৃতীয়পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও স্বভাবগতভাবে তাদের মৌল প্রবণতাই ছিল রাষ্ট্রীয় দাবি আদায়ের অজুহাতে তারা রায়তের কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে যা উসুল করে, তার অনেকটাই নানা কারণ দেখিয়ে নিজেরাই আত্মসাৎ করে। ফলে তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্র যা পায়, তা মূল আদায়ের তুলনায় বেশ কম। বস্তুত মধ্যস্বত্বভোগী এই জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব বিলোপ করে বা যথাসম্ভব তাদের কার্য পরিধি ও দৌরাত্ম্য সঙ্কুচিত করে রায়তের সঙ্গে সরাসরি রাষ্ট্রের যোগাযোগ স্থাপন এবং রায়ত প্রদত্ত সমুদয় ভূমিরাজস্ব রাষ্ট্রীয় তহবিলে আনয়ন ছিল মিরকাশিমের প্রধান লক্ষ্য। এ ছাড়া বড় বড় জমিদাররা প্রায়শই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাষ্ট্রীয় পাওনা বকেয়া রাখতো। বেশি চাপাচাপি করলে অনেক সময় তারা কখনও এককভাবে, আবার কখনও সম্মিলিত চেষ্টায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসতো। উদাহরণস্বরূপ বর্ধমান, মেদিনীপুর, বীরভূম, ভোজপুর, নদীয়া, দিনাজপুর, নাটোর প্রভৃতি স্থানের জমিদারদের কথা উল্লেখ করা যায়। বর্ধমানের জমিদার তিলক চাঁদ, নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র, বীরভূমের জমিদার আসাদুজ্জমান খাঁ প্রমুখ মিরকাশিমকে শুধু রাজস্বই দিতে গড়িমসি করেননি, উপরন্তু তাঁরা নবাবের বশ্যতাও অস্বীকার করেন। ফলত 'রাজস্ব আদায়ের জন্য মীরকাসিমকে এই সকল জমিদারের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনা করিতে হয়। বহুদিন যুদ্ধের পর তিনি ইহাদেরকে দমন করিতে এবং রাজস্ব আদায় করিতে সমর্থ হন। তিনি জমিদারদের সহিত রাজস্বের নূতন বন্দোবস্ত করেন।'[৩৯৫]

মিরকাশিম ভূমিরাজস্বের প্রচলিত হার বৃদ্ধি করেননি, কিন্তু পূর্ববর্তী নবাবদের মতো কয়েকটি নতুন কর আরোপ করেন। আপাতদৃষ্টিতে যদিও এগুলি জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী তৃতীয়পক্ষের ওপর প্রযুক্ত হয়েছিল, তথাপি স্বীকার করতে হবে যে, এর চূড়ান্ত চাপ গিয়ে বর্তেছিল সেই তৃণমূল রাজস্ব প্রদেতা কৃষককুলেরই ওপর। কারণ জমিদাররা তো তাদের কাছ থেকেই রাজস্ব আদায় করতো। যা হোক, মিরকাশিম প্রবর্তিত এই নতুন করগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) কৈফিয়ত হস্তবুদ : এককথায় এর অর্থ—'an increase on the previous collections'[৩৯৬] অর্থাৎ এ দ্বারা প্রাপ্য বা স্থিত ভূমিরাজস্বের ওপর অতিরিক্ত প্রাপ্তিকে বুঝানো হতো। সত্যি বলতে দু'টি বৃহৎ জমিদারির ওপর এই কর চাপানো হয়েছিল। অবস্থানিক কারণে বীরভূম ও দিনাজপুর জমিদারি ছিল সীমান্তবর্তী। ইতোপূর্বেকার আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি যে বীরভূমের মুসলমান জমিদার বংশ তাদের জমিদারি

৩৯৫ বাংলাদেশের ইতিহাস, ড. রহিম ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা ৩৩৬।
৩৯৬ Dr. Radha Kumud Mookerji, Indian Land-System in 'Report of the Land Revenue Commission, Bengal, Vol. II.', pp. 209.

সীমান্তবর্তী হওয়ায় এর প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সেই মোগল সম্রাট আকবরের আমল থেকেই একশ্রেণীর মুসলিম মিলিশিয়া প্রতিপালন করতেন। তাছাড়া এদের জমিদারিতে বিভিন্ন ধর্মীয় ও দাতব্য কাজের জন্য প্রচুর লা-খেরাজ ভূ-সম্পত্তিও ছিল। মূলত এ কারণে বীরভূম জমিদারি পূর্ববর্তী নবাবদের সময়েও প্রায় রাজস্ব মুক্ত ছিল। অন্যদিকে নানা কারণে দিনাজপুর জমিদারির দেয় খাজনার পরিমাণও ছিল প্রকৃত ধার্যের তুলনায় অনেক কম। নবাব এই দুই জমিদারির প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব একটি নির্ভরযোগ্য নিরীক্ষা দলের মাধ্যমে তদন্ত করান। এতে করে উভয় জমিদারিতেই ব্যাপক রাজস্ব ফাঁকির চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। সরকারি রাজস্ব ফাঁকির এই প্রবণতা রোধ করার জন্য তিনি এগুলিতে অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব ধার্য করেন—বীরভূমের ওপর ৮,৯৬,২৭৫ ও দিনাজপুরের ওপর ৫,৭৬,৩২৪ সর্বমোট ১৪,৭২,৫৯৯ টাকা।[৩৯৭] এখানে একটা জিনিস উল্লেখ করা দরকার যে, নবাব এই অতিরিক্ত রাজস্ব তাঁর সমগ্র রাজত্বকালে এখান থেকে উসুল করেছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে, এই জাতীয় আদায়ের মাধ্যমে—'It practically captured the entire ryoti rental, leaving the least margin to zemindars. It even assumed rents which the ryots could not always pay.'[৩৯৮]

(২) কৈফিয়ত ফৌজদারান : কৈফিয়ত হস্তবুদ ছিল মূলত বীরভূম ও দিনাজপুর জমিদারির ওপর আরোপিত। কিন্তু এককথায় কৈফিয়ত ফৌজদারান ছিল একইরূপ প্রক্রিয়ায় সীমান্তবর্তী কয়েকটি ফৌজদারি থেকে প্রাপ্ত অতিরিক্ত ভূমিরাজস্ব। ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'Kaifiyat Faujdaran meant profits realised by drawing into the public account a share of the increased rent imposed by the Faujdars on the ryots within their jurisdiction in an unauthorized manner'.[৩৯৯] মোট ৬টি ফৌজদারি যথা ঢাকা (১২,০১,৩১৫ টাকা), রংপুর (১,৫১,৪৯৩ টাকা), চট্টগ্রাম (১,৫৮,৩৪০ টাকা), বর্ধমান[৪০০] (১,৩৭,৬০০ টাকা), পূর্ণিয়া (১৫,২৩,৭২৫ টাকা) ও রাজমহল (৪২,৭৫, ৭ টাকা); এগুলি থেকে নবাব সর্বমোট ৩২,১৫,২৯৫ টাকার বর্ধিত রাজস্ব আদায় করেছিলেন বলে জেমস গ্রান্ট সূত্রে জানা যায়।[৪০১]

(৩) কৈফিয়ত সায়ের : ভূমি ব্যতীত রাজস্ব আয়ের অপরাপর খাত যেমন বহিঃশুল্ক, পণ্য বিক্রয় শুল্ক, চুঙ্গি কর প্রভৃতি যা এ যাবৎ সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীরা আদায় করতো ঠিকই, কিন্তু রাষ্ট্রীয় তহবিলে না দিয়ে অধিকাংশই নিজেরা আত্মসাৎ করতো, অথবা দায়িকদের সঙ্গে অবৈধ যোগসাজশে গোপন করে আর্থিক সুবিধা নিতো। নবাব কঠোর হস্তে এই প্রবণতা রোধ করেন এবং এই খাত থেকে রাজকোষে প্রায় ৪,৫৮,৯৪৪ টাকার

৩৯৭ The Fifth Report, Vol. II., pp.239, quoted from 'Mir Qasim : Nawab of Bengal', pp. 285.
৩৯৮ Indian Land-System, pp. 210.
৩৯৯ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 63.
৪০০ চট্টগ্রাম ও বর্ধমান যদিও হস্তান্তরিত ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল, তথাপি এর খালসা ভূমি ছিল সরকারি তত্ত্বাবধানে। এর ওপরই কৈফিয়ত ফৌজদারান চাপানো হয়েছিল।
৪০১ The Fifth Report, quoted from Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 285.

অতিরিক্ত কর আদায় করেন।[৪০২] কৈফিয়ত সায়ের নবাবগঞ্জের (মহানন্দা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে) চুনাখালি, আসাদনগর (মুর্শিদাবাদান্তর্গত), বন্দরদিহ (মুর্শিদাবাদের সন্নিকটস্থ), আজিমগঞ্জ (ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্তী) ও মোতিঝিল বা মোরাদবাগ প্রাসাদ সংলগ্ন চাঁদনী চকস্থ শুল্ক-ভবনের লুক্কায়িত অতিরিক্ত কর।

(৪) তৌফির জায়গিরদারান : এককথায় 'তৌফির' বলতে বুঝাতো—'the resumption of a concealed surplus.'[৪০৩] । নবাব জায়গিরদারদের কর-বহির্ভূত লুক্কায়িত সম্পত্তি থেকেও একই ভাবে রাষ্ট্রীয় আয় বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, যার মোট পরিমাণ ছিল (সমগ্র রাজত্বকালে) ১৮,৮১,০১৪ টাকা।[৪০৪]

উপরোল্লিখিত খাতগুলি ছাড়াও মিরকাশিম বিভিন্ন পদ্ধতিতে যেমন ফি-বছর রৌপ্যের বাজার মূল্য হ্রাসের অজুহাতে 'সিক্কা' টাকা বদলে 'বাট্টা' প্রথায় টাকা প্রতি দেড় আনা কর্তনের নামে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে নতুন একটি কর খাত চিহ্নিত করেন। এই খাতে মোট আয় ছিল ৪,৫৩,৪৪৮ টাকা।[৪০৫]

বস্তুত এই সামগ্রিক পন্থায়, ন্যায়সঙ্গত হোক, কি উৎপীড়নধর্মী, নবাব মিরকাশিম আগে যেখানে বিশেষ করে নবাব মুর্শিদকুলি খানের সময়ে (১৭২২ খ্রিঃ) ভূমিরাজস্ব ১,৪২,৮৮,১৮৬ টাকা[৪০৬] ছিল, সেখানে তাঁর সময়ে ১৭৬২-৬৩ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় (বাংলা, বিহার ও ওড়িশা মিলিয়ে) ৩,৩২,০০,০০০ সিক্কা টাকা[৪০৭], তন্মধ্যে 'হস্তান্তরিত ভূমি' (Ceded Districts)—চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের আয় বাবদ ৫১ লক্ষ ও মিরজাফর আলি খানের ব্যক্তিগত জায়গির-এর ২৩ লক্ষ একুনে ৭৪ লক্ষ টাকা বাদ দিয়ে ২,৫৬,২৪,২২৩ টাকা।[৪০৮] এখানে উল্লেখ্য যে, জেমস গ্রান্ট প্রদত্ত উক্ত হিসাবের সঙ্গে সমকালীন অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিকই এক মত পোষণ করেননি। তবে প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, নবাব মুর্শিদকুলি খান ও তৎপরবর্তী নবাবদের সময় থেকে এই আমলে 'কৈফিয়ত', 'তৌফির' প্রভৃতির নামে যে নতুন 'আবওয়াব' ধার্য ও আদায় করা হয়েছিল, এবং যার পরিমাণ ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি, এরই একটি চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো[৪০৯] :

মুর্শিদকুলি খান (১৭২২-১৭২৫ খ্রিঃ), শুজাউদ্দিন
খান (১৭২৫-১৭৩৯ খ্রিঃ) ও আলিবর্দি খান
(১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিঃ)— এঁদের আমলে আদায়কৃত

৪০২ The Fifth Report, Ibid., pp. 286.
৪০৩ Indian Land-System, pp. 209.
৪০৪ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 286; The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 64.
৪০৫ The Fifth Repor, quoted from 'Mir Qasim: Nawab of Bengal', pp. 287.
৪০৬ Indian Land-System, pp. 208; মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯৪।
৪০৭ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 66.
৪০৮ ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এর পরিমাণ ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকার বলেছেন। দেখুন, The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 66.
৪০৯ Indian Land-System, pp. 209.

ভূমিরাজস্বের ওপরে মোট আবওয়াবের পরিমাণ ছিল	৪২,২৩,৪৬৭ টাকা
কিন্তু নবাব মিরকাশিমের আমলে কৈফিয়তই ছিল	৪৫,২৩,৩৬৩ টাকা
এবং তৌফির	৩১,৬২,৩৫৮ টাকা

অর্থাৎ আগের তুলনায় মোট ৩৪,৬২,২৫৪ (৪৫,২৩,৩৬৩ + ৩১,৬২,৩৫৮= ৭৬,৮৫,৭২১— ৪২,২৩,৪৬৭) টাকা বৃদ্ধি। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, সম্রাট আকবর তথা টোডরমলের আমল থেকে পর্যালোচ্য সময়ে এসে বাংলার আপামর জন সাধারণকে ভূমিরাজস্বের অতিরিক্ত—আবওয়াব হিশেবেই বার্ষিক কমবেশি প্রায় ১,১৯,০৯,৩৮৮ টাকা গুণতে হতো।

এখন উপরের এই দীর্ঘ আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে যে, নবাব মিরকাশিমের পর্যালোচিত এই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা আদপে যুগোপযোগী ও প্রজাহিতৈষী ছিল কি-না?

এ বিষয়ে আলোচনার আগে প্রথমেই সমসাময়িক ও উত্তরকালীন দু'একজন ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করে নিতে চাই।

এককথায় ইংরেজ ঐতিহাসিক জন শোর ও ফিলিপ ফ্রান্সিস মিরকাশিম অনুসৃত সুবাদারি আবওয়াব তথা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটি 'লুণ্ঠন বা লুটেরা ব্যবস্থা' হিশেবে চিহ্নিত করেছেন— 'a mere pillage and rack-rent', 'a regular pillage (rather) than a system of government'. তাঁদের ভাষায়, মিরকাশিম 'collected almost double the ancient revenue of the country.'[৪১০] অন্যদিকে জেমস গ্রান্ট এই ব্যবস্থাকে অতোটা কঠোর ও নির্মম বলে মনে করেন না। তাঁর মতে মিরকাশিম মোগল আমলীয় গতানুগতিক প্রথা-পদ্ধতিকেই অনুসরণ করেছিলেন, তবে রাজস্ব কর্মচারীদের চিরাচরিত ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা রোধ করতে গিয়ে তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত যে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন সেটাই ছিল এর দৃশ্যমান নৃশংসতার কারণ। আদপে নবাব ভূমিরাজস্ব সঠিকভাবে নিরূপণ ও আদায়করণ—এই উভয় প্রক্রিয়াটিকে ব্যক্তিগত নজরদারি ও আন্তরিকতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলিম ঐতিহাসিক গোলাম হোসাইন তাবতাবায়ীও মিরকাশিমের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার বিরূপ সমালোচনা করেছেন।[৪১১] আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে মিরকাশিমের বিখ্যাত জীবনীকার ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়, ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৯৪) প্রমুখ তাঁর ভূমিরাজস্ব নীতির কঠোর সমালোচনা করেছেন। ড. চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট বলেছেন, 'Mir Qasim's revenue policy was not only strict, but was also vitiated by a strange disregard of the ultimate consequences of his extortionate demands. Had he been a prudent financier, he would not have preferred an immediate abnormal increase of revenue to a permanent

৪১০ দেখুন, The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 59; A Comprehensive History of India, Vol. IX., pp. 678.

৪১১ 'সিয়ারে-মুতাখখিরীণ'—ইংরেজি অনুবাদ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬০২।

growing income. He was only a relentless collector, rather than a far-sighted statesman. As such, his revenue administration was not better than an organised plunder.'[৪১২]

এটা ঠিক যে মিরকাশিমের সময়ে প্রচলিত ভূমিরাজস্ব হারের বাইরেও সুবাদারি আবওয়াব নামে যে পরিমাণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হতো, তা বছরওয়ারি হিসাবে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। সত্যি কথা বলতে এটি আদায় করার জন্যে নবাব সংশ্লিষ্টদের বিশেষ করে আমিল, জমিদার প্রভৃতির ওপর ব্যাপক চাপও সৃষ্টি করেছিলেন। তারপরও যদি নিতান্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা হয় তা হলে দেখা যাবে যে, তথাকথিত এই কঠোরতার সবটুকু দায় একা মিরকাশিমের নয়, বরং এর অনেকখানিই প্রাপ্য তাঁর সমকালের এবং সমকালীন বাংলার আর্থ-রাজনীতির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত সমাজের মাথাওয়ালা শ্রেণীর—যাদের অন্যতম ছিল জগৎশেঠ পরিবার ও অন্যান্য হিন্দু প্রধানগণ যেমন কুখ্যাত রাজবল্লভ, ভোজপুরের দেওয়ান দুলাল রায়, টিকারির রাজা ফতেহ্ সিং, আজিমাবাদের ডেপুটি সুবাদার রামনারায়ণ, রায় রায়ান উমিদ রায়, মুন্সি জগৎ রায় ও বিভিন্ন হিন্দু-মুসলিম জমিদার এবং সকলের পরামর্শ দাতা ও নাটের গুরু হিশেবে ফোর্ট উইলিয়মস্থ কোম্পানির ধুরন্ধর কর্মচারী গোষ্ঠী। নবাবের ওপর এদেরই অর্থ শোষণ ও কু-পরামর্শের প্রতিক্রিয়া গিয়ে পড়েছিল শেষ পর্যন্ত রাজস্ব প্রদাতা তৃণমূল শ্রেণীর ওপর। ড. মুহম্মদ আবদুর রহিমও উল্লেখ করেছেন, 'The failure of Mir Qasim against the English was primarily due to his financial weakness and the internal problems created by the Hindu officials and zamindars. .....The Hindu zamindars withheld payments of revenue. Whatever could be realized from them was realized by force. Ramnarain, Rajballabh, Jagat Seth and other Hindu chiefs and zamindars proved rebellious and they curried favour with the English.'[৪১৩] বস্তুত এদের এই জাতিগত বিদ্বেষ, নীচতা, বিশ্বাসঘাতকতা, আপদকালীন অসহযোগিতা ও সর্বোপরি ইংরেজদের সঙ্গে গোপন মিত্রতা—এই সবকিছুর চাপে নবাব মিরকাশিম অনেকক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। যা হোক এখন আমরা মিরকাশিমের কঠোর ভূমিরাজস্ব নীতির পিছনে যে কয়েকটি মোটা দাগের কারণ খুঁজে পাই তার কিছুটা পরিচয় নিচে তুলে ধরা হলো।

এক. আগেই দেখিয়েছি যে, মিরকাশিমকে মুর্শিদাবাদের মসনদে আরোহণের মূল্যস্বরূপ ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে সেপটেম্বরের সন্ধির শর্ত মোতাবেক ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরকে প্রচুর অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছিল (অবশ্য এ জন্যে সিংহাসনের প্রতি তাঁর সীমাহীন লোভ দায়ী ছিল)। বলাবাহুল্য প্রথম থেকেই রাজকোষের এই বিপুল ঘাটতি তিনি কোনদিনই পূরণ করতে পারেননি।

৪১২ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 289.
৪১৩ A Short History of Pakistan : Book Four : Alien Rule and Rise of Muslim Nationalism, Dr I.H. Qureshi Ed., pp. 65.

দুই. দিল্লির তৎকালীন মোগল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আলমকেও তাঁর স্বীকৃতির[৪১৪] জন্য নজরানা বাবদ কিছু সংখ্যক হাতি, মূল্যবান উপহার সামগ্রী ও নগদ ২ লক্ষেরও অধিক টাকা দিতে হয়েছিল।[৪১৫] ড. রমেশচন্দ্র মুজমদার এই নগদ অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করেন প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা।[৪১৬] এছাড়া মারাঠাদের 'চৌথ' পরিশোধের চাপও ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত মিরকাশিমের জীবদ্দশায় তা পরিশোধ করতে হয়নি।[৪১৭]

তিন. রাজ সিংহাসনে আরোহণের প্রথম দিন থেকেই তিনি এটা হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলেন যে, চতুর্পাশে শত্রুবেষ্টিত যে তোপের মুখে বসে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করছেন, তাতে করে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ একদিন অনিবার্য হয়ে উঠবে। ফলত সেই অনাগত যুদ্ধের প্রাথমিক প্রস্তুতি হিশেবে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গের-এ স্থানান্তরিত করেছিলেন[৪১৮] এবং ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষিত একটি নিয়মিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে ও সে অনুপাতে অস্ত্র-গোলাবারুদ তৈরির জন্য তাঁর প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।

চার. তিনটি গ্রামের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা শহর কলকাতা ও এর সংলগ্ন ৩৮টি গ্রাম বা মৌজা (১৭৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে এগুলি থেকে কোম্পানির আয় ছিল ৭,৩০,৫৯১ টাকা[৪১৯]), বর্ধমান (গভর্নর ভেরেলস্টের সূত্রে ১৭৬০-৬৩ পর্যন্ত এ থেকে কোম্পানির মোট ৮৩,৯৮,৬৩৬ টাকা পেয়েছিল), মেদিনীপুর (একই সূত্র/একই সময়ে ১৬,৯৮,২৩৮ টাকা) ও চট্টগ্রাম (একই সূত্র/ ১৭৬১-৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১১,৯৫,৮৭৬ টাকা)— অর্থাৎ বাংলার ৪টি মাত্র অঞ্চল থেকে মিরকাশিমের কী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হাতছাড়া হয়েছিল, তা

৪১৪ বাদশাহ তাঁকে (মিরকাশিম) 'নওয়াব আলীজাহ্ নাসির-উল-মুলক ইমতিয়াজ-উদ-দৌলা কাসিম আলী খান নসরত জং' উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছিলেন। ('রিয়াজ', পৃষ্ঠা ২৯৮)। এছাড়া খেলাত ও মূল্যবান উপহারসামগ্রীও প্রদান করেছিলেন। তবে উল্লেখ করা দরকার যে, এ জন্যে নবীন নবাব বাদশাহকে বার্ষিক ২৪ লক্ষ টাকা রাজকর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। (জগৎশেঠ, ইংরেজ শাসনে বাজেয়াপ্ত বই, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬২)।

৪১৫ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 68.

৪১৬ বাংলা দেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৭।

৪১৭ কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ফলে (বাংলার পশ্চিম অংশে ও বর্ধমান এলাকায়) তাদের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রতিরোধে মিরকাশিমের প্রভূত অর্থ ব্যয় হতো। The Fifth Report থেকে জানা যায়, মোগল বাদশাহ শাহআলম ও মারাঠা বাহিনী কর্তৃক নবাব পক্ষের প্রায় ৭,৯৩,০৮০-৩-৯ টাকার ক্ষতি হয়েছিল (pp. 440)।

৪১৮ এই স্থানান্তরে খরচের বহরটা কেমন ছিল সে সম্বন্ধে 'রিয়াজ' থেকে জানা যাক : 'তাঁর চাচা মীর তোরাব আলী খানকে মুর্শিদাবাদে ডেপুটি নাজিম পদে নিয়োগ ক'রে মীর কাসিম সমস্ত মালমাত্তা, হাতী, ঘোড়া, সম্পদ ও হারেমের গহনাপত্র, এমন কি ইমামবাড়ার স্বর্ণ ও রৌপ্য — যে সবের মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা— সব নিয়ে বাংলা ত্যাগ করেন। মুঙ্গেরে পৌঁছে সেখানকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন...।' (পৃষ্ঠা ২৯৮)। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে এই পর্বে বাংলার রাজকোষে থেকে কিভাবে অর্থ অপচয় হচ্ছিল।

৪১৯ কলকাতা ও সংলগ্ন জমিদারিসমূহ মিলিয়ে এই সময়ে কোম্পানির অধিকারে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল ব্যাপী এলাকা ছিল, যা তারা মিরজাফর আলি খানের কাছ থেকে পেয়েছিল। (Indian History— a Panoramic View, F. Yeats Brown, pp. 95)। এই বিস্তীর্ণ এলাকায় শুধু কলকাতা ও দু'একটি সন্নিকটবর্তী অঞ্চল থেকে কোম্পানি বিভিন্ন নামে কী বিপুল পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতো; সে সম্বন্ধে জানার জন্য দেখুন 'কলকাতার পুরাকথা', দেবাশিষ বসু সম্পাদিত, পৃষ্ঠা ১৩৬-৫৪।

উপরের তালিকা দেখলেই সহজে অনুমান করা যাবে। এছাড়া বিহার ও ওড়িশার অনেক অঞ্চল এই সময়ে বাংলার নবাবের পুরোপুরি কর্তৃত্বেও ছিল না। স্বভাবতই সেগুলি থেকে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ কিছুই পেতো না।

পাঁচ. জমিদারদের অনিয়মিত খাজনা প্রেরণ এবং অনেকের খাজনা প্রদান অস্বীকারের ফলে তাদেরকে শায়েস্তা করতে গিয়ে নবাবকে প্রায়শই সৈন্য পরিচালনা করতে হতো। এটিরও ব্যয় নিতান্ত কম ছিল না। বস্তুত এদেশীয়দেরই অত্যাচারে তথা জমিদার প্রভৃতির বিদ্রোহ দমনে রাজ্যের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ছুটতে ছুটতে ক্লান্ত ও অর্থ ব্যয়ে অতিষ্ঠ হয়ে নবাব শেষ পর্যন্ত তাদেরকে যেখানেই পেয়েছিলেন সেখানেই হত্যা করেছিলেন। 'রিয়াজ-উস-সালাতীন'-এর লেখকও স্বীকার করেন, 'সেখানে (বক্সারের যুদ্ধে সেনাপতি ও অন্যদের বিশ্বাসঘাতকতায় পরাজিত হয়ে আজিমাবাদে ফিরে) বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তিনি (মিরকাশিম) গুরগিন, জগৎশেঠ ও তার ভ্রাতা (স্বরূপচাঁদ)-কে (যারা এই বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন এবং জাফর আলি খান ও খ্রিস্টান-ইংরেজদের গোপন-পত্র দ্বারা আসতে বলেছিলেন ও যাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পত্র ধরা পড়েছিল) তাদের হত্যা করেন। অন্য যে সকল জমিদার কারারুদ্ধ ছিল ও সেকালে যারা প্রত্যেকেই ষড়যন্ত্র করতে অদ্বিতীয় ছিলেন তাদেরও হত্যা করেন।'[৪২০]

ছয়. তবে মিরকাশিমের ভূমিরাজস্ব ও সুবাদারি আবওয়াব ধার্য ও আদায়ের এই কঠোরতার একটি বড় কারণ হিশেবে যেটিকে আমরা নিঃসন্দেহে চিহ্নিত করতে পারি তা হলো ভূমিরাজস্ব ব্যতীত সরকারি আয় খাতের অন্যান্য উৎস—সায়ের কর, বাণিজ্য বা পণ্য শুল্ক প্রভৃতি থেকে রাষ্ট্রের আয় মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমল থেকে কেন্দ্রে তথা দিল্লিতে বার্ষিক নাম মাত্র কর (একে বাদশাহি নজরানা বলাই শ্রেয়) দিয়ে ইংরেজরা এদেশে প্রায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতো। শায়েস্তা খান, মুর্শিদকুলি খান প্রমুখের সময়ে তারা এই নিষ্কর বাণিজ্য সুবিধা প্রায় একচেটিয়া ভোগ করে। যদিও আইনত তারা তা পারতো না। মিরকাশিমের সময়েও তারা তা অব্যাহত রাখে। বরং এই আমলে তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এ যাবৎ ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এককভাবে যে সুবিধা লাভ করতো, এখন সেটা কোম্পানির ছোট বড় সকল কর্মচারীই নামে-বেনামে রাজ্যব্যাপী বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে শুরু করে।[৪২১] এতে করে দেশীয়

৪২০ রিয়াজ-উস-সালাতীন, পৃষ্ঠা ৩০০-৩০১।

৪২১ তারা শুধু বিনা শুল্কে ব্যবসায়ই করতো না, পরন্তু স্থানীয়দেরকে বিশেষ করে গ্রামবাসীদেরকে তাদের বেধে দেয়া মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করতো। অবস্থা কতো ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়েছিল তা অমুসলিম লেখকদের এই দু'টি বর্ণনা থেকেই জানা যাবে। ইংরেজ ঐতিহাসিক আর. ডব্লিউ, ফ্রেজার বলেন, 'Having the right of free passage, without payment of tax or toll, for the inland produce, in which they (servants of the Company) traded, they commenced for a consideration to smuggle the goods of native traders; they even forced the villagers to buy and sell at prices fixed by themselves.' (British India, pp. 108). ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বর্ণনা করেন, 'কিন্তু কলিকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের প্রস্তাবে (দেশি-বিদেশি সকল বণিক নির্বিশেষে পণ্য শুল্ক তুলে নেয়া সংক্রান্ত) অমত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের নিকট হইতেই শুল্ক আদায় করিতে হইবে—কারণ তাহা না হইলে ইংরেজ বণিকদলের অতিরিক্ত

বণিককুল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলো। সরকারি তহবিলে পণ্য শুল্ক পরিশোধ করে ব্যবসায়-বাণিজ্যে তারা কোম্পানির কর্মচারী-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় স্বভাবতই পেরে উঠছিলো না। অথচ নবাব একাধিকবার ফোর্ট উইলিয়মে এ বিষয়ে অভিযোগ করেও কার্যকর কোন সুরাহা করে উঠতে পারেননি। ফলে বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশি বিদেশি বণিক নির্বিশেষে বাণিজ্য শুল্ক তুলে দেন। যদিও এতে করে এদেশীয় বণিকগণ উপকৃত হয়েছিলেন এবং অনুরূপভাবে ইংরেজ বণিকগণ ও কোম্পানির স্বার্থান্বেষী চক্র সঙ্গত কারণেই নবাবের ওপর কুপিত হয়েছিল, তথাপি যে কোন বিচারেই ধরা যায় না কেন, মিরকাশিমের এই আত্মঘাতী পদক্ষেপের ফলে রাজকোষের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারও স্বীকার করেছেন, 'সমস্ত শুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় বাংলার রাজস্ব অর্ধেক কমিয়া গেল।'[৪২২]

ফলত উপরের এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা এটা বলতে পারি না যে, 'মীর কাশিমের রাজস্ব-ব্যবস্থা তাঁর প্রজাহিতৈষিতার পরিচয় দেয় না।'[৪২৩] ড. অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ফিলিপ ফ্রান্সিস, জন শোর প্রমুখ সূত্রে যেমনটা বলেছেন যে, 'He (Mir Kasim) thought that whatever the ryots paid should be appropriated by the Government and the zamindars should be 'totally excluded'......In some cases he tried even to deprive the ryots of what was allotted for their 'subsistence and emolument'.'[৪২৪] ঐতিহাসিকের এ সকল বক্তব্যের প্রথমাংশে কিছুটা সত্যতা থাকলেও (তখনও অনেক ছোট বড় জমিদারি ছিল এবং যেগুলি তিনি আদৌ উৎখাত করেননি, বরং সবগুলির ওপর তিনি কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন), দ্বিতীয়াংশে বর্ণিত বক্তব্য তথা কোনও কোনও ক্ষেত্রে মিরকাশিম রায়তের বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছিলেন এটি ঠিক নয়। প্রথমত এ সম্পর্কিত সমকালীন কোন নজির ড. বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থাপন করেননি। দ্বিতীয়ত নিচের দু'টি কারণও ঐতিহাসিকের এই বক্তব্যের সমর্থন যোগায় না।

এক. জেমস গ্রান্ট, জন শোর প্রমুখ প্রদত্ত নবাব মিরকাশিমের আমলের ভূমিরাজস্ব ধার্য সংক্রান্ত যে বিস্তারিত হিসাবটি আমরা পাই, সেটি যে ছিল একটি 'পেপার ওয়ার্ক' (paper assessment), সে সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা মোটামুটি একমত।[৪২৫] কাগজেপত্রে এগুলি ধার্য করা হলেও বরাবরের মতো এর অনেকখানিই আদৌ আদায় করা সম্ভব হতো না। উদাহরণস্বরূপ আমরা মিরকাশিমের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার কঠোর সমালোচক জন শোর উদ্ধৃত রংপুর ফৌজদারির হিসাবের কথা বলতে পারি। মূলে রংপুর

মুনাফা বন্ধ হয়।... ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল লিখিয়াছেন, স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচাররহিত ও লজ্জাহীন হইতে পারে, ইহা তাহার একটি চরম দৃষ্টান্ত।' (বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪)।

৪২২ বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪।

৪২৩ মধ্য যুগে বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ১৯৭।

৪২৪ The Agrarian System of Bengal, Vol. I., pp. 59.

৪২৫ ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় বলেন, '...Cossim Ali's Assessment was almost like a paper assessment and not realisable,....' (Indian Land-System, pp. 213.

ফৌজদারির ভূমিরাজস্ব ছিল (দাবি) ৩,৫৩,৯৮৬ টাকা; মিরকাশিমের আমিলগণ নতুনভাবে এর রাজস্ব নিরূপণ করেন ১১,২৯,৩২৪ টাকা, কিন্তু বাস্তবে তা আদায় (মাল উসুল) হয়েছিল ৬,৬৮,৯৬২ টাকা অর্থাৎ মূলের প্রায় দ্বিগুণ কিন্তু ধার্যের অর্ধেকের কিছুটা বেশি। একইভাবে দিনাজপুরের জন্য ভূমিরাজস্ব ধার্য হয়েছিল ২৬,৪৪,৭৩৩ টাকা কিন্তু বাস্তবে উসুল হয়েছিল ১৯ লাখের কিছু বেশি।[৪২৬]

দুই. মিরকাশিম যদি প্রকৃতই প্রজার ওপর ভূমিরাজস্বের চাপ পূর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি করার পক্ষপাতী হতেন, তা হলে রাজকোষের বিপুল ক্ষতি স্বীকার করে দেশীয় বণিকদের ওপর থেকে শুল্ক তুলে নিতেন না। বস্তুত দেশীয় বণিকদের বাণিজ্য শুল্ক ছাড় দিয়ে তাঁর কোন জনপ্রিয়তা বাড়েনি, বরঞ্চ আর্থিক ও রাজনৈতিক— উভয় দিক দিয়েই মারাত্মক ক্ষতি হয়েছিল। প্রসঙ্গত আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, দেশীয় বণিকদের এই অযাচিত সুবিধা দেয়ার ফলেই ইংরেজ বণিক তথা ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা নবাবের ওপর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষের এটি অন্যতম কারণ। অথচ নবাব চাইলে দেশীয় বণিকদেরকে বাণিজ্য শুল্ক দিতে বাধ্যবাধকতার মধ্যে রেখে অত্যন্ত সহজেই তাদের (ইংরেজদের) প্রিয়পাত্র হতে পারতেন, এড়াতে পারতেন সমূহ বিপর্যয়। ড. অতুল সুর যথার্থই বলেন, 'মিরকাশিমের মত সুদক্ষ ও সুযোগ্য' নবাবের[৪২৭] পক্ষে তাঁর প্রজাবৃন্দের ওপর কোম্পানি কর্মচারীদের অত্যাচার ও লোভাতুর আচরণ সহ্য করা অসম্ভব ছিল। কোম্পানির কর্মচারীরা এ সময় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করত। মাল কেনাবেচা সম্পর্কে লোকদের ওপর অত্যাচার ও দুর্দান্ত জুলুম করত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যেখানে নবাবের কর্মচারীরা হস্তক্ষেপ করত, তা তারা পদদলিত করত। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ইংরেজ কর্মচারীদের এরূপ আচরণ নিবারণ করতে না পেরে, মিরকাশিম নিজ প্রজাবৃন্দকে ইংরেজদের সঙ্গে সমান পর্যায়ে ফেলবার জন্য ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের সর্বত্র বাণিজ্য শুল্ক রহিত করেন। ইংরেজরা বাণিজ্য শুল্ক পুনরায় ন্যস্ত করবার দাবী জানায়। নবাব সে দাবী গ্রাহ্য করতে অস্বীকৃত হন। এই সকল বিবাদ-বিসংবাদের ফলে নবাবের সহিত ইংরেজদের শত্রুতা ঘটে।'[৪২৮] তবে অনস্বীকার্য যে, আঠারো শতকের বাংলার আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জনদরদী শেষ স্বাধীন নবাব মিরকাশিমের পক্ষে ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাগত প্রজা-কল্যাণধর্মী বিশেষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হয়নি, সে মুহূর্তে তা সম্ভবও ছিল না।

৪২৬ Indian Land-System, pp. 213-14.

৪২৭ প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক P. E. Roberts-ও নিঃসংকোচে লিখেছেন, 'Mir Kasim was a ruler of considerable administrative ability, and in many ways improved the position of his province, ..' (History of British India under the Company and the Crown, pp. 151). উইলিয়ম হান্টার মির কাশিমের যোগ্যতার কথা এভাবে স্বীকার করেছেন, 'He was eminently successful in restoring good order in the administration.' (A Statistical Account of Bengal, Vol. IX., pp. 189).

৪২৮ আঠারো শতকের বাংলা ও বাঙালী, পৃষ্ঠা ৫৯-৬০।

পরিশেষে নবাব মিরকাশিমের স্বল্পাধিক ৩ বছরের শাসনকালে তাঁর 'ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান, নির্দেশনা ও উদ্যম'-এর ফলে বাংলার এই পর্বের ভূমিরাজস্ব-ব্যবস্থার যে সর্বশেষ স্থিতি ও রূপরেখা দাঁড়িয়েছিল, এবং যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী যুগ তথা ইংরেজ ব্যবস্থাপনার সূত্রপাত ঘটেছিল সে সম্বন্ধে ড. নন্দলাল চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাতিদীর্ঘ বিবৃতি উল্লেখ করে এ গ্রন্থের আলোচনা শেষ করবো। তিনি বলেন, 'During his (Mir Qasim's) short rule, he completely changed the spirit of the revenue system which he had inherited from the previous regime, and sought to revolutionise it by introducing into it new principles, and reviving in a new form the methods and ideas that had once been associated with the administration of some of the former Nazims like Jafar Khan, Shuja Khan, or Ali Vardi Khan. The laxity, inefficiency, and corruption that had crept into financial administration in recent years deeply prejudiced him against the whole system, and the policy underlying it. He determined to clear the revenue administration of its chronic wastefulness, jobbery, and irregularities with a high hand, and himself set to infuse into it a vigour that was in a way unprecedented. Mir Qasim's revenue administration is therefore of peculiar interest. It not only gives a perfect insight into his characteristic severity and oppression, but forms the back-ground for the revenue administration of the East India Company in Bengal.'[৪২৯]

৪২৯ Mir Qasim : Nawab of Bengal, pp. 277-78.